সাইয়েদ কুতুব শহীদ
তাফসীর
ফী যিলালিল
কোরআন
১২তম খন্ড
কোরআনের অনুবাদ
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
AL-QURAN ACADEMY LONDON
আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর
ফী যিলালিল কোরআন

১২ খন্ড

সূরা আল হেজর
থেকে
সূরা আল কাহ্‌ফ

কোরআনের অনুবাদ ও
তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ
মাওলানা সোলায়মান ফারুকী
হাফেজ আকরাম ফারুক
হাফেজ শহীদুল্লাহ এফ, বারী

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

(১২তম খন্ড সূরা আল হেজর থেকে সূরা আল কাহ্ফ)

প্রকাশক
খাদিজা আখতার রেজায়ী
ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
১২৪ হোয়াইটচ্যাপল রোড (দোতলা) লন্ডন ই১ ১জে ই, ইউকে
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭৬৫০ ৮৭৭০, ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ মোবাইল: ০৭৫৩৯ ২২৪ ৯২৫, ০৭৯৫৬ ৪৬৬ ৯৫৫
অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
বাংলাদেশ সেন্টার
১৭ এ-বি, কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ পশ্চিম পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫ ৮৫২৬
বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ (৩৬২) ওয়ারলেস রেল গেইট (জামে মাসজিদ দোতলা), বড় মগবাজার ঢাকা
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট, দোকান নং ২১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭
প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮
১১ম সংস্করণ
রবিউস সানি ১৪৩২ মার্চ ২০১১ চৈত্র ১৪১৭
কম্পোজ
আল কোরআন কম্পিউটার

বিনিময়: দুইশত ত্রিশ টাকা

Bengali Translation of Tafseer

'Fi Zilalil Quran'

Author
Syed Qutb Shaheed

Translator of Quranic text into Bengali
&
Editor of Bengali rendition
Hafiz Munir Uddin Ahmed

12th Volume
(Surah Al Hejr to Surah Al Kahf)

Published by
Khadija Akhter Rezayee
Director Al Quran Academy London
124 Whitechapel Road (1st Floor) London E1 1JE, UK
Phone & Fax : 0044 020 7650 8770, 020 7274 9164 Mob : 07539 224 925, 07956 466 955
Bangladesh Centre
17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone & Fax : 00880-2-815 8526
Sales Centre: 507/1 (362) Wireless Railgate, (Masjid Complex 1st Floor)
38/3 Computer Market Stall No- 215, Bangla Bazar, Dhaka-1100
Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997
1st Edition 1998
11th Edition
Rabius Sani 1432 March 2011
Price Tk. 230 .00
E-mail: info@alquranacademylondon.com website: www.alquranacademylondon.com
ISBN NO- 984-8490-23-X

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ং আরশের মালিক
আল্লাহ জাল্লা জালা'লুহু
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দার পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যিই বড়ো বেমানান!

আসমানযমীন, চাঁদসুরুজ, মহাদেশমহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তার নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?
কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতান্ত্রিক উৎসর্গ নয়

এ হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মানবতার মুক্তিদূত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আ'লামীন
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহসান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক-এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি **কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নযরে** পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে **আমাদের জানাবেন**। **সর্বজন শ্রদ্ধেয়** ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই **কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়**– হেদায়াতের এ মহান উৎসটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন **আল্লাহ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব** নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে **আমরা আনন্দের সাথেই** তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংস্করণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত– এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সাথিত্য দিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে ক্ষমা করুন।

'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'–এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তাহচ্ছে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বহুবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি থেকে আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ বিষয় কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সন্ধিৎসু পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পূনর্বিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা এ মাস থেকেই এই পুর্নবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ।

বিদায়ের আগে উর্ধাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি ঃ 'রাব্বানা লা তুয়াআখেযনা ইন নাসীনা আও আখতা'না'–'হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে বসি–তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।' আমীন! ছুম্মা আমীন!!

খাদিজা আখতার রেজায়ী

লন্ডন
জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হযরত আলীর (রা.) প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে 'তোমাদের কথা' আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (সূরা আল আম্বিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো! মনে মনে বললেন, 'আমাদের কথা' আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে 'আমার' কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে–

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।' (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেযেক থেকে খরচ করে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।' (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, 'এরা দারিদ্র ও সাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো সে, 'এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।' (সূরা আল হাশর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, 'এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।' (সূরা আশ্-শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও 'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?' (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।' (সূরা আয যুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ—আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাযির হয়ে গেলো।' (সূরা আল মোদ্দাসসের, ৪২-৪৬)

হযরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের 'কথা' দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত 'নিজের' বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও.তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের 'দৌলত' পাওয়া সত্তেও নিজেদের গুনাহ্র ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুতপ্ত। কেন, আল্লাহ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরূম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না–এমন তো হতেই পারে না। তিনি হাল ছাড়লেন না। এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন। আবার তিনি কেতাব খুললেন।

কোরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই হযরত আহনাফ 'নিজেকে' উদ্ধার করলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই তো আমি!

'হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে–কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল। (সূরা আত্ তাওবা ১০২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহর কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কেতাবই অন্যত্র বলছে, 'আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল হেজর ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার 'ছবি'। কোরআনের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি!

হযরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে। তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

❑ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ বিন কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আহনাফের এই গল্পটি পড়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে একেকবার হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ডুবে গেছি বহুবার। সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা 'আমাকে' আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরবে।

❑ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথ। প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশমন ইসলামের দুশমন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি

চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হযরত মুসার পুন্যভূমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাত্মা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকৃষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হুংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে চড়িয়ে দেবো।' (সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো! সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলোনা!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো। এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা-শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহ তায়ালা আমার মরহুম আব্বা হযরত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আম্মা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোদ্ধারের জন্যে বুঝতে পারলাম আমার আরবীর গন্ডিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ

সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে 'ফী যিলালিল কোরআনের' গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তা আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লন্ডনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। 'ফী যিলালিল কোরআন' পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তরজমার কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে নিজের 'সেভিংস' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবদ্ধ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনভর 'কোরআনের ছায়াতলে' দেয়া তাঁর অগুনতি সহযোগিতার বিনিময়ে তুমিও তাকে 'আরশের ছায়াতলে' তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো 'লায়লাতুল মেরাজ'। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না—না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

'ফী যিলালিল কোরআন' এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে 'কোরআনের ছায়াতলে')। ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 'ফী যিলালিল কোরআন'। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা 'কোরআনের ছায়াতলে' সহ আরো কিছু প্রবন্ধ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্ডে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য 'সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের' দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর 'আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক', সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাষ্টে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক'-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র'। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত

একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বান্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বান্দার সংগ্রামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

আরেকটি কথা,

'ফী যিলালিল কোরআন' আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও ক্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো 'অনুবাদ' গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগিতে কথ্য ভাষার এক নতুন 'স্টাইল' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুঝতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রন্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২-এর মার্চ মাসে ঢাকায় 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটির উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই গ্রন্থটির আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বান্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাতায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বান্দার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছেন। নিযুত কোটী সাজদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা- কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশান্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ক্রুটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে গ্রন্থের মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত,

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

সম্পাদক 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'

অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও

ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

জানুয়ারী ১৯৯৫

এই খন্ডে যা আছে

সূরা আল হেজর

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরার প্রথম মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, কাফের ও মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে অপেক্ষমান ভয়ানক পরিণতির বিস্তারিত বিবরণ। এই মূল বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রয়েছে আনুষংগিক বিভিন্ন বিষয়ে কিছু আলোচনা, যা না-ফরমানদের ভয়াবহ কঠিন পরিণতির চিত্রটি আরো শানিত করে তাদের বিবেককে আঘাত করতে পারে। এ জীবন শেষে চিরস্থায়ী আর এক জীবনের দিকে তাদেরকে যেতে হবে, যেখানে অতীত জীবনের সকল বিষয় সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, কেয়ামতের সেই ভয়ানক দিনে তাদের সকল কাজ কর্মের চুল চেরা হিসাব নেয়া হবে এবং সেই বিচার অনুযায়ী কাউকে শাস্তি দেয়া হবে এবং কাউকে পুরস্কৃত করা হবে, এসব বিষয়ের বিশদ বিবরণ। সৃষ্টির দৃশ্যাবলী ও কেয়ামতের সেই বিভীষিকার চিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে এ আলোচনার মধ্যে।

ইতিমধ্যে সূরায়ে রা'দের আলোচনায় তার প্রেক্ষাপটের সাথে যেমন করে সূরায়ে আনয়ামের মিল দেখা গেছে, তেমনি করে সূরায়ে হেজরের প্রেক্ষাপটের সাথে সূরায়ে আ'রাফের প্রেক্ষাপটও খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে হয়। সূরাটির আলোচনা শুরু হয়েছে কেয়ামত এর ভীতি প্রদর্শন করে সে ব্যাপারে সতর্ক করার মাধ্যমে, আর এটা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে সামান্য কিছু শাব্দিক রদবদল থাকলেও সতর্কীকরণই হচ্ছে মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

সূরায়ে আ'রাফের শুরুতে ভীতিপ্রদর্শন সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন, 'এ হচ্ছে তোমার কাছে অবতীর্ণ এক গ্রন্থ, সুতরাং এর দ্বারা ভীতিপ্রদর্শন করার ব্যাপারে তোমার অন্তরে কোনো দ্বিধা সংকোচ যেন না আসে, আর এ কেতাব মোমেনদের জন্যে এক অতি মূল্যবান উপদেশ।' আর চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর আমি, আল্লাহ তায়ালা কতো দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি অতপর আযাব এসেছে রাতের বেলায় অথবা দুপুরের খাবার খেয়ে যখন তারা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন থেকেছে। তখন। তারপর এ সূরাতে আদম (আ.) ও ইবলিসের কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে। এমনি করে প্রসংগক্রমে আরো অনেক বিষয়ের ওপর আলোচনা এসেছে। অবশেষে জানানো হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবন শেষ হয়ে যাবে এবং সবাইকে তাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে এবং সেখানে তারা সতর্কীকরণের বাস্তবতাকে তারা প্রত্যক্ষ করবে.... বর্তমানের আলোচনায় সৃষ্টিজগতের কিছু দৃশ্যের বর্ণনা স্থান পেয়েছে, যেমন আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী, রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র, তাঁর নির্দেশে পরিচালিত তারকারাজি, বাতাস-মেঘ-পানি ও নানাবিধ ফলমূল.... আরো আমরা এখানে দেখতে পাবো–নূহ, হুদ, সালেহ, লূত শোয়ায়ব ও মূসা (আ.)-এর ঘটনাবলী। আলোচ্য সূরার কাহিনী সত্যিই মহান সতর্ককারী নবী মোহাম্মদ (স.)-এর সত্যতার পক্ষে সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এখানেও সূরায়ে হেজরের শুরুতে একইভাবে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু এমন ভাষা ও ভংগীতে কথাগুলো পেশ করা হয়েছে যে পাঠকের হৃদয় অজানা এক ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, যার কারণে– 'কাফেররা অনেক সময় মনে করে, হায় যদি তারা মোসলমান হয়ে যেতে পারতো। (কিন্তু পার্থিব স্বার্থ প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা মুসলমান হতে পারে না। তাই ছেড়ে দাও তাদেরকে, তারা ভোগবিলাসের মেতে থাকুক, সুখ সম্পদের মধ্যে গা ভাসিয়ে দিক এবং তাদের আশা আকাংখা তাদেরকে কর্তব্যচ্যুত করে রাখুক, শীঘ্রই তারা তাদের পরিণতি জানতে পারবে, আর আমি, যে সব এলাকাকে ধ্বংস করেছি, তা তাৎক্ষণিক কোনো ঘটনা ছিলো

না বরং তার সিদ্ধান্ত পূর্বেই জানা এক গ্রন্থের মধ্যে লিখিত ছিলো। ওই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কোনো জাতির ধ্বংস নেমে আসবে না বা ওই সময়ের পরেও ধ্বংস আসবে না'।.... তারপর এখানে প্রসংগক্রমে সৃষ্টিলোকের কিছু দৃশ্য পেশ করা হচ্ছে, এই যে সুউচ্চ আকাশ এবং এর মধ্যে অবস্থিত কেল্লাসম সুরক্ষিত স্তরসমূহ, সুবিস্তৃত পৃথিবী এবং এর গভীরে প্রোথিত পাহাড়-পর্বত, পরিপূর্ণ ভারসাম্যের সাথে উৎপাদিত বৃক্ষ-তরুলতা গুল্ম, পানি ভর্তি ভারী বাতাস, যা জমাট বেঁধে মেঘ সৃষ্টি হয় এবং পানি আকারে নেমে আসে, এর দ্বারা সিঞ্চিত হয় শুকনা মৃতপ্রায় যমীন এবং এর মধ্যে মৃতপ্রায় প্রাণ বৃষ্টির ফল্গুধারায়, পুনরায় ফিরে পায় নতুন জীবন, আবার সব কিছুর পরিসমাপ্তিতে আসবে মৃত্যু ও পুনরুত্থান.... এসব কিছু আদম ও ইবলিসের করুণ কাহিনীর সূত্র ধরে একের পর এক এসেছে বলে জানা যায়। পরিশেষে আসছে আদম (আ.)-এর অনুসারী ও মোমেনদের পরিণতি.... এসব ঘটনার মধ্যে বিশেষভাবে নজরে পড়ে ইবরাহীম, লূত শোয়ায়েব ও সালেহ (আ.)-এর ঘটনাবলী এবং তাদের কঠিন পরিণতি সম্পর্কেও জানা যায় যারা এ মহান নবীদেরকে শুধু অস্বীকারই করেনি, বরং তাদেরকে মিথ্যাবাদীও বানিয়েছিলো।

যাই হোক, সূরা দুটির মূল আলোচ্য বিষয় এক ও অভিন্ন। এতদসত্ত্বেও সূরা দুটির মধ্যে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের অবস্থার মধ্যে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তবে, ওই সব অবস্থার মধ্যে পারস্পরিক কিছু মিল থাকলেও একটি আর একটির মতো পুরোপুরি এক নয়। মহাগ্রন্থ আল কোরআনের নিয়ম অনুযায়ী এসব অবস্থাকে বিভিন্ন কায়দায় ও বিভিন্ন চিত্রে তুলে ধরা হয়েছে, যার ফলে এগুলোর মধ্যে একাধারে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়টি সুসামঞ্জস্য রূপে দেখা যায়। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, কোনো একটি বিষয়কে যে বারবার বলা হচ্ছে তাও নয় এবং একটা যে আর একটার সাথে পুরোপুরি মিল খাচ্ছে তাও নয়।

সূরাটিকে চার অথবা পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। এসব অধ্যায়ের প্রত্যেকটিতে এক একটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে রেসালাত, এর ওপর ঈমান এবং ঈমানকে অস্বীকার করার পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহর যে অমোঘ নিয়ম সে সম্পর্কে যার মধ্যে কোনো দিন কোনো পরিবর্তন হয়নি। এ আলোচনার শুরুতে এমন ভাষা ও ভংগীতে সতর্ক করা হয়েছে যা শোনার সাথে সাথে মনের ওপর এক অভূতপূর্ব আতংক ছেয়ে যায়। দেখুন, প্রথম আয়াতটির দিকে, অনেক সময় কাফেররা চায়, হায় যদি তারা মুসলমান হয়ে যেতে পারতো (তাহলে ওই ভয়াবহ আযাব থেকে তারা বেঁচে যেতো, তবে পার্থিব স্বার্থ অথবা সাময়িক সামাজিক মান মর্যাদা তাদেরকে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখছিলো অতএব), তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা পরম পরিতৃপ্তির সাথে (দুনিয়ার জীবনে) সর্বপ্রকার সুস্বাদু খাদ্য খাবার খেয়ে দেখে নিক এবং প্রাণ ভরে ভোগ করে নিক দুনিয়ার মাল মাত্তা, আর তাদের আশা আকাংখা তাদেরকে তাদের দায়িত্ব পালন করা থেকে গাফেল করে রাখুক, শীঘ্রই তারা (তাদের পরিণতি) জানতে পারবে।' অর্থাৎ, এ কথার সমাপ্তি টানা হয়েছে এই বলে যে মিথ্যা আরোপকারীরা অন্য কোনো কারণে নয়, শুধু হিংসা ও বিদ্বেষের কারণেই সত্যকে অস্বীকার করে, ঈমান আনালে ক্ষতি হবে মনে করে নয়, তাই বলা হচ্ছে,

'আর আমি, আল্লাহ তায়ালা, যদি তাদের সামনে আকাশ থেকে নেমে আসা কোনো দরজা খুলে দিতাম এবং সেই দরজা দিয়ে তারা ওপরের দিকে উঠে যেতে থাকতো, তবুও বলতো না, না, আমরা ওপরে উঠে যাচ্ছি প্রকৃতপক্ষে এটা সত্য নয়, বরং আমাদেরকে নযরবন্দী করে ফেলা হয়েছে অথবা আমাদেরকে যাদু করা হয়েছে বলেই আমরা এ রকম দেখছি।'.... আর ওদের সবাই এই একই মনোভাব রাখে, তারা নবীকে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না ও ঈমান আনবে না,

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা যায়, সৃষ্টির কিছু নিদর্শনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে, এখানে আকাশ, পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানের কিছু দৃশ্যের দিকে তাকাতে আহ্বান জানানো হয়েছে, এসব কিছু তো মহা বিজ্ঞানময় বিধাতা এক বিশেষ উদ্দেশ্যে, সুনিপুণ এক কৌশলে পয়দা করেছেন, আর সব কিছুকে এক নির্দিষ্ট পরিমাপ মতোই সৃষ্টি করেছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'যা কিছু রয়েছে (এ বিশাল সৃষ্টির বুকে) তার মূল ভান্ডার রয়েছে আমার কাছে, আর আমি সব কিছুকে এক নির্দিষ্ট পরিমাপ মতো পাঠাই।'

আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে সকল কিছুর প্রত্যাবর্তনস্থল এবং প্রত্যেকেই দুনিয়ায় বেঁচে আছে এক নির্দিষ্ট ও সুপরিচিত ও সুবিদিত (পূর্ব নির্ধারিত) সময় পর্যন্ত। এরশাদ হচ্ছে,

'আর আমি আল্লাহ তায়ালা, জীবন দেই, মৃত্যু দেই এবং সবশেষে আমিই হবো সবকিছুর মালিক, আর অবশ্যই আমি জানি তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং জানি পরবর্তীদেরকেও আর নিশ্চয়ই তোমার মালিক ওদের সবাইকে একত্রিত করবেন নিশ্চয়ই তিনি মহা বিজ্ঞানময় মহা জ্ঞানবান।'

তৃতীয় অধ্যায়ে মানব জাতির ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে জানানো হয়েছে তাদেরকে সত্যের মূল উৎস সম্পর্কে, তাদের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কে। আরো জানানো হয়েছে সত্যের উৎস মূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া মানুষ এবং অনুসারীদের পরিণতির কথা। এ আলোচনায় জানানো হয়েছে যে, আদম (আ.)-কে তৈরী করা হয়েছিলো পচা মাটিকে শুকিয়ে শক্ত ঠনঠনে বানানোর পর সেই মাটি দিয়ে, তারপর সেই কঠিন মাটির মধ্যে আল্লাহর তৈরী আত্মাগুলোর একটিকে ফুঁক দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এরপর দেখানো হয়েছে ইবলিস কিভাবে তাকে ধোঁকা দিলো, নিজ অহংকারী হওয়ার কারণে কেমন করে পথভ্রষ্টদেরকে পরিচালনা করে তার পথে, নিয়ে গেলো কিন্তু পারলো না আল্লাহর মোখলেস বান্দাদের সাথে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে অতীত জাতির সত্যবিরোধী তৎপরতা সম্পর্কে, বিশেষ করে লূত, শোয়ায়ব ও সালেহ (আ.)-এর জাতিরা যে অহংকার প্রদর্শন করেছিলো তার পরিণতিতে তাদের যে দুরাবস্থা হয়েছিলো সে সম্পর্কে। এসব বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ কথাটি দিয়ে শুরু করেছেন। 'আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও যে আমিই মাফ-করনেওয়ালা মেহেরবান এবং আমার আযাবও বড়ো বেদনাদায়ক।' তারপর দেখুন বিভিন্ন ঘটনাবলীর বর্ণনা এগিয়ে চলেছে, যার মধ্য দিয়ে ইবরাহীম ও লূত (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর রহমতের কথা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে, পাশাপাশি প্রকাশ পেয়েছে লূত, শোয়ায়ব ও সালেহ (আ.)-এর জাতির প্রতি আল্লাহর গযবের কথাও।

পঞ্চম ও শেষ অধ্যায়ের বর্ণনায় প্রকাশিত হয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অস্তিত্ব লুকিয়ে থাকার কথা। এরই মধ্যে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ইংগীতও পাওয়া যায়, তারপর একথাও জানা যায় যে, যে কোনো ভালো কাজের প্রতিদান এবং মন্দ কাজের শাস্তিও অবশ্যম্ভাবী, রসূল (স.)-এর দাওয়াতেও একথাগুলো ছিলো মূখ্য। আর সকল সৃষ্টির শুরু ও শেষের মধ্যে এটাই হচ্ছে সকল সত্যের বড় সত্য।

আলোচ্য অধ্যায়ের মধ্যে এই তিনটি শিক্ষার কথা এক সাথে এসে গেছে। আসুন, আমরা একটু বিস্তারিতভাবে এবার সেগুলো বুঝার চেষ্টা করি।

সূরা আল হেজর

আয়াত ৯৯ রুকু ৬

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

الٓرٰ تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡكِتٰبِ وَقُرۡاٰنٍ مُّبِيۡنٍ ﴿١﴾ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لَوۡ كَانُوۡا مُسۡلِمِيۡنَ ﴿٢﴾ ذَرۡهُمۡ يَاۡكُلُوۡا وَيَتَمَتَّعُوۡا وَيُلۡهِهِمُ الۡاَمَلُ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُوۡنَ ﴿٣﴾ وَمَاۤ اَهۡلَكۡنَا مِنۡ قَرۡيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعۡلُوۡمٌ ﴿٤﴾ مَا تَسۡبِقُ مِنۡ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسۡتَاۡخِرُوۡنَ ﴿٥﴾ وَقَالُوۡا يٰۤاَيُّهَا الَّذِىۡ نُزِّلَ عَلَيۡهِ الذِّكۡرُ اِنَّكَ لَمَجۡنُوۡنٌ ﴿٦﴾ لَوۡ مَا تَاۡتِيۡنَا بِالۡمَلٰۤـئِكَةِ اِنۡ كُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِيۡنَ ﴿٧﴾ مَا نُنَزِّلُ الۡمَلٰۤـئِكَةَ اِلَّا بِالۡحَـقِّ وَمَا كَانُوۡۤا اِذًا مُّنۡظَرِيۡنَ ﴿٨﴾ اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّكۡرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰـفِظُوۡنَ ﴿٩﴾

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. আলিফ লাম-রা। এগুলো হচ্ছে সেই মহান গ্রন্থ ও সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত। ২. (এমন একটি দিন অবশ্যই আসবে যেদিন) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে তারা চাইবে, যদি (সত্যি সত্যিই) তারা মুসলমান হয়ে যেতো! ৩. (হে নবী,) তুমি তাদের (নিজ নিজ অবস্থার ওপর) ছেড়ে দাও, তারা খাওয়া দাওয়া করুক, ভোগ উপভোগ করতে থাকুক, (মিথ্যা) আশা তাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক, অচিরেই তারা জানতে পারবে (কোন্ প্রতারণার জালে তারা আটকে পড়েছিলো)। ৪. যে কেনো জনপদকেই আমি ধ্বংস করি না কেন— তার (ধ্বংসের) জন্যে একটি সুনির্দিষ্ট সময় আগে থেকেই লিপিবদ্ধ থাকে। ৫. কোনো জাতিই তার (ধ্বংসের) কাল (যেমন) ত্বরান্বিত করতে পারে না, (তেমনি) তারা তা বিলম্বিতও করতে পারে না। ৬. তারা বলে, ওহে— যার ওপর কোরআন নাযিল করা হয়েছে— তুমি অবশ্যই একজন উন্মাদ ব্যক্তি। ৭. তুমি সত্যবাদী (নবী) হলে আমাদের সামনে ফেরেশতাদের নিয়ে আসো না কেন! ৮. (হে নবী, তুমি তাদের বলো,) আমি ফেরেশতাদের (কখনো) কোনো সঠিক (কারণ) ছাড়া নাযিল করি না, (তাছাড়া একবার যদি আযাবের আদেশ নিয়ে) ফেরেশতারা এসেই যায়, তবে তো আর তাদের কোনো অবকাশই দেয়া হবে না। ৯. আমিই উপদেশ (সম্বলিত কোরআন) নাযিল করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষণকারী।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٠ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ

اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١١ كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝١٢ لَا

يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ

السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ۝١٤ لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ

قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ۝١٥ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ۝١٦

وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۝١٧ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ

مُّبِيْنٌ ۝١٨ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ

شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ ۝١٩ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ۝٢٠

وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ز وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝٢١

১০. তোমার আগেও পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মাঝে আমি রসূল পাঠিয়েছিলাম। ১১. তাদের কাছে এমন একজন রসূলও আসেনি, যার সাথে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করেনি। ১২. এভাবেই আমি অপরাধীদের অন্তরে (ঠাট্টা বিদ্রূপের) এ (প্রবণতা)-কে সঞ্চার করে দেই, ১৩. এরা কোনো অবস্থায়ই তার ওপর ঈমান আনবে না, (আসলে) এ নিয়ম তো আগের মানুষদের থেকেই চলে এসেছে। ১৪. আমি যদি এদের ওপর আসমানের দরজাও খুলে দেই, অতপর তারা যদি তাতে চড়তেও শুরু করে (তারপরও এরা ঈমান আনবে না), ১৫. বরং বলবে, আমাদের দৃষ্টিই মোহাবিষ্ট হয়ে গেছে, কিংবা আমরা হচ্ছি এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।

রুকু ২

১৬. (তাকিয়ে দেখো, কিভাবে) আমি আকাশে গম্বুজ তৈরী করে রেখেছি, অতপর তাকে দর্শকদের জন্যে (তারকারাজি দ্বারা) সুসজ্জিত করে রেখেছি, ১৭. তাকে আমি প্রতিটি অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাযত করে রেখেছি। ১৮. হাঁ, যদি কেউ চুরি করে (ফেরেশতাদের) কোনো কথা শুনতে চায় তাহলে সাথে সাথেই একটি প্রদীপ্ত উল্কা তার পেছনে ধাওয়া করে। ১৯. আমি যমীনকে বিস্তৃত করে (বিছিয়ে) দিয়েছি, ওতে আমি পর্বতমালাকে (পেরেকের মতো) গেড়ে দিয়েছি, (যেন তা নড়াচড়া করতে না পারে) এবং তাতে প্রতিটি জিনিস আমি সুপরিমিতভাবে উৎপাদন করেছি। ২০. ওতে আমি তোমাদের জন্যে এবং অন্য সব সৃষ্টির জন্যে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি, তোমরা যাদের (কারোই) রেযেকদাতা নও। ২১. কোনো জিনিস এমন নেই যার ভান্ডার আমার হাতে নেই এবং সুনির্দিষ্ট একটি পরিমাণ ছাড়া আমি তা নাযিল করি না।

وَأَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنٰكُمُوهُ ج وَمَا أَنْتُمْ لَهُ
بِخٰزِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا
الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ
يَحْشُرُهُمْ ط إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسٰنَ مِنْ صَلْصٰلٍ مِنْ حَمَإٍ
مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَانَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ
لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي خٰلِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصٰلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سٰجِدِينَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ
أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ ط أَبٰى أَنْ يَكُونَ مَعَ السّٰجِدِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ يٰإِبْلِيسُ
مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السّٰجِدِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ

২২. আমিই বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, তারপর আমিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, অতপর আমিই তোমাদের তা পান করাই, তোমরা নিজেরা তো তার এমন কোনো ভান্ডার জমা করে রাখোনি (যে, সেখান থেকে এসব সরবরাহ আসছে)। ২৩. অবশ্যই আমি (তোমাদের) জীবন দান করি, (আবার) আমিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাই, (সর্বশেষে) আমিই হবো (সব কিছুর নিরংকুশ) মালিক। ২৪. তোমাদের আগে যারা (এ যমীন থেকে) গত হয়ে গেছে তাদের (যেমন) আমি জানি, তেমনি তোমাদের পরবর্তীদেরও আমি (ভালো করে) জানি। ২৫. নিসন্দেহে তোমার মালিক একদিন তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন; তিনি অবশ্যই প্রবল প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

রুকু ৩

২৬. অবশ্যই আমি মানুষকে ছাঁচে ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে পয়দা করেছি, ২৭. আর (হাঁ,) জ্বিন! তাকে আমি আগেই আগুনের উত্তপ্ত শিখা থেকে সৃষ্টি করেছি। ২৮. (স্মরণ করো,) যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আমি (অচিরেই) ছাঁচে ঢালা ঠনঠনে শুকনো মাটি থেকে মানুষ পয়দা করতে যাচ্ছি । ২৯. অতপর যখন আমি তাকে পুরোপুরি সুঠাম করে নেবো এবং আমার রূহ থেকে (কিছু) তাতে ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা সবাই তার সামনে সাজদাবনত হয়ে যাবে,। ৩০. অতপর (আল্লাহর আদেশে) ফেরেশতারা সবাই সাজদা করলো, ৩১. একমাত্র ইবলীস ছাড়া– সে সাজদাকারীদের দলভুক্ত হতে অস্বীকার করলো। ৩২. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তোমার কি হলো, তুমি যে সাজদাকারীদের দলে শামিল হলে না! ৩৩. সে বললো (হে আল্লাহ), আমি কখনো এমন মানুষের জন্যে সাজদা

مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٣٤﴾ وَّاِنَّ
عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿٣٦﴾
قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٣٧﴾ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَاۤ
اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٣٩﴾ اِلَّا عِبَادَكَ
مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٤٠﴾ قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ ﴿٤١﴾ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ
لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿٤٢﴾ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ
اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ﴿٤٤﴾ اِنَّ
الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٤٥﴾ اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٤٦﴾

করতে পারি না– যাকে তুমি ছাঁচে ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে বানিয়েছো। ৩৪. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (তাই যদি বলো) তাহলে তুমি (এক্ষুণি) এখান থেকে বেরিয়ে যাও, কেননা তুমি অভিশপ্ত, ৩৫. হিসাব নিকাশের দিন পর্যন্ত তোমার ওপর অভিশাপ। ৩৬. সে বললো (হে মালিক, তাহলে) তুমিও আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যেদিন তাদের পুনরায় জীবিত করা হবে। ৩৭. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হাঁ যাও), যাদের (এ) অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত (হলে), ৩৮. (এ অবকাশ) সুনির্দিষ্ট সময় আসার দিন পর্যন্ত। ৩৯. সে বললো, হে আমার মালিক, তুমি যেভাবে (আজ) আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিলে (আমিও তোমার শপথ করে বলছি), আমি মানুষদের জন্যে পৃথিবীতে তাদের (গুনাহের কাজসমূহ) শোভন করে তুলবো এবং তাদের সবাইকে আমি পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো, ৪০. তবে তাদের মধ্যে যারা তোমার খাঁটি বান্দা তাদের কথা আলাদা। ৪১. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (আমার নিষ্ঠাবান বান্দাহদের জন্যে মূলত) আমার কাছ পর্যন্ত (পৌঁছানোর) এটাই হচ্ছে সহজ সরল পথ। ৪২. (হাঁ,) এ গোমরাহ মানুষদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ছাড়া অন্যরা অবশ্যই আমার (খাঁটি) বান্দা, তাদের ওপর তোমার কোনো আধিপত্য চলবে না। ৪৩. আর অবশ্যই জাহান্নাম হচ্ছে তাদের সবার প্রতিশ্রুত স্থান, ৪৪. তাতে থাকবে সাতটি (বিশালকায়) দরজা; (আবার) এগুলোর প্রতিটি দরজা (দিয়ে প্রবেশ করা)-এর জন্যে থাকবে এক একটা নির্দিষ্ট অংশ।

রুকু ৪

৪৫. (এর বিপরীত) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে তারা অবশ্যই (সেদিন) জান্নাত ও ঝর্ণাধারায় (বহুমুখী নেয়ামতে) অবস্থান করবে; ৪৬. (এই বলে তাদের অভিবাদন জানানো হবে,) তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে সেখানে প্রবেশ করো।

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾

৪৭. তাদের অন্তরে ঈর্ষা বিদ্বেষ যাই থাক আমি (সেদিন) তা দূর করে দেবো, তারা একে অপরের ভাই হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি সেখানে অবস্থান করবে। ৪৮. সেখানে তাদের কোনোরকম অবসাদ স্পর্শ করবে না, আর তাদের সেখান থেকে কোনো দিন বেরও করে দেয়া হবে না।

তাফসীর

আয়াত–১–৪৮

আলিফ-লাম-মীম, এ আয়াতগুলো হচ্ছে মূল কেতাব (এর অংশ) এবং সুস্পষ্ট কোরআন। অনেক সময়েই.... কোনো জাতি তার জন্যে স্থিরিকৃত সময়ের পূর্বে ধ্বংস হবে না এবং তার ওই নির্দিষ্ট সময়ের পরেও তারা দুনিয়ায় থাকবে না।' *(আয়াত ১-৫)*

'আর ওরা বললো, হে ওই ব্যক্তি, যার কাছে এ উপদেশ বাণী নাযিল হয়েছে, অবশ্যই তুমি একজন বদ্ধ পাগল .... নিশ্চয়ই আমি নাযিল করেছি মহাগ্রন্থ আল কোরআন রূপ–এ মহা উপদেশবাণী, আর আমার ওপরেই রয়েছে এর হেফাযতের দায়িত্ব।' *(আয়াত ৬-৯)*

'অবশ্যই পাঠিয়েছি আমি এ মহা উপদেশ বাণী, তোমার পূর্বে বহু জাতির কাছে.... ওরা সময়ে বলেছে, আমাদের চোখগুলোকে বন্দী করে ফেলা হয়েছে না, বরং আমাদেরকে যাদু করে ফেলা হয়েছে।

দেখুন, বিচ্ছিন্ন তিনটি হরফ আলিফ-লাম-মীম (যার সঠিক অর্থ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল ছাড়া আর কেউ জানে না) এগুলো সুনির্দিষ্ট সেই কেতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে যা সর্বোচ্চ উর্ধলোকের জগতে এক সুবিশাল ফলকে স্থায়ীভাবে খোদাই করা রয়েছে আর তাই হচ্ছে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী আল কোরআন। এই যে আরবী অক্ষরগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো সব সেই মূল কেতাবেরই হরফ, অর্থাৎ মূল কেতাব আরবী ভাষাতে আরশে মোয়াল্লাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং শেষ কেতাব আল কোরআনের মধ্যে অবিকল সেই শব্দাবলীকেই প্রেরণ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে ওই শব্দাবলীর মধ্যে বিধৃত উদ্দেশ্যগুলোকে বিভিন্ন ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। আর অন্যান্য যামানায় অন্যান্য জাতির কাছে আগত কেতাবগুলো যে সব ভাষায় প্রেরিত হয়েছিলো সেগুলো অবিকৃত রূপে আজ বর্তমান না থাকার অন্যান্য কারণের মধ্যে এটাও একটা কারণ যে, সেগুলো আরশে মোয়াল্লায় লিখিত মূল ভাষায় নাযিল হয়নি। এই সমাপ্তিকর কেতাবই এর মূল ভাষায় আগত সেই আসল কেতাব যা আরশে মোয়াল্লার চিরস্থায়ী ফলকে লিখিত রয়েছে, এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা এ কেতাবকে সংরক্ষিত রাখার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। আর এজন্যেই দেখা যায় এ পাক কালামের এক বিশেষ শক্তি রয়েছে যা অন্য কোনো কেতাবের মধ্যে ছিলো না। অবশ্য অবশ্যই একথা সত্য যে, আল কোরআন যখন স্বয়ং রসূল (স.)-এর মুখে উচ্চারিত হয়েছে তখন তার এ অলৌকিক শক্তি প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য নবীদেরকে বিভিন্ন

জিনিস মোজেযাস্বরূপ দেয়া হয়েছে, আর শেষ নবী মোহাম্মদ (স.)-কে মোজেযাস্বরূপ দেয়া হয়েছিলো এই আল কোরআন।

ক্ষণেকের ভোগ বিলাস

সুতরাং, যে সব জনপদ এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কেতাবের আয়াতগুলোকে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করতো, তাদের জীবনে এমনও অনেক সময় এসেছে যখন তারা আফসোস করে বলেছে, হায়! যদি আমরা কোরআনের ওপর ঈমান আনতাম তাহলে কতোই না ভালো হতো! এইভাবে তারা আকাংখা করতে থাকবে এবং অনেক সময়েই সত্য কবুল করে, তার ওপর দৃঢ়তা অবলম্বনের কথা চিন্তা করতে থাকবে, কিন্তু তাদের হঠকারিতার কারণে এ চিন্তাকে তারা বাস্তবায়িত করতে পারবে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অনেক সময় কাফেররা আকাংখা করবে, হায়, যদি তারা মুসলমান হয়ে যেতে পারতো।'

অনেক সময়, হাঁ অনেক সময়েই তাদের মনে আকাংখা জেগেছে, কিন্তু এ আকাংখা তাদের মনের অন্ধকারেই মজে গেছে, এ আকাংখা দিনের আলো দেখতে সক্ষম হয়নি। 'রুবামা' অনেক সময় বা কোনো কোনো সময় এ শব্দটার মধ্যে ক্ষীণ হলেও একটি ধমকের সুর ধ্বনিত হয় এবং একটি বিদ্রুপের ছোঁয়াচও আছে শব্দটির মধ্যে। সাথে সাথে শব্দটির মধ্যে রয়েছে উৎসাহ ব্যঞ্জক এক আহ্বান, যেন সময় থাকতেই মানুষ তার সদ্ব্যবহার করে ও মৃত্যু ঘনিয়ে আসার পূর্বেই ইসলাম রূপ এ মহান নেয়ামত লাভ করে তারা ধন্য হয়। এমন একদিন অবশ্যই আসবে যখন কাফেররা মনে প্রাণে চাইতে থাকবে এবং মনে মনে বলতে থাকবে, হায় যদি ঈমান আনতাম!' কিন্তু আফসোস, সেদিনের সেই আকাংখা দ্বারা কোনো ফায়দাই হবে না!

এরপরের কথাটির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে এক প্রচন্ড ধমকের সুর,

'ছেড়ে দাও ওদেরকে, মনের মতো খেয়ে দেয়ে নিক এবং জীবনকে প্রাণভরে উপভোগ করে নিক, আর গাফেল করে রাখুক ওদেরকে ওদের নানা প্রকার সাধ-অভিলাষ।'

অর্থাৎ, যে অবস্থায় ওরা কালাতিপাত করছে, সেই অবস্থার মধ্যেই ওদেরকে থাকতে দাও, কারণ দুনিয়ার এসব সাধ-আহলাদের জন্যেই তো ওরা সত্যকে দেখেও দেখছে না এবং সত্যের পক্ষে হাজারো যুক্তি প্রমাণ তাদের মনকে সত্যের দিকে এগিয়ে আনতে পারছে না। নিছক নিকৃষ্ট জীব জানোয়ারের মতো এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবনের ভোগ বিলাসে ওদের মজে থাকতে দাও, এ ভোগ বিলাসের মধ্যে ডুবে থাকার কারণে ওদের মনে পরবর্তীকালের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা পয়দা হওয়ার কোনো সুযোগ আসছে না; আসলে দুনিয়ার জীবন নিয়ে ওরা এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করার ক্ষমতাই তারা হারিয়ে ফেলেছে। অতএব, তাদের এই প্রলম্বিত বিলাসী জীবনের মধ্যেই তাদেরকে ডুবে থাকতে দাও। আকাংখা এমনই এক বালাই যা মানুষকে তার দায়িত্ব কর্তব্য থেকে গাফেল করে দেয়। আর লোভ লালসা তাকে এমনভাবে ধোকা দেয় যে, সে প্রকৃত সত্য থেকে অনেক অনেক দূরে সরে চলে যায়। অথচ তাদের বয়স তো এগিয়েই চলেছে, তাদের যৌবনের এই স্বর্ণালী দিনগুলো এক এক করে বে-ফায়দা পার হয়ে যাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে তাদেরকে মৃত্যুর ভয়াল মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ওদেরকে ছেড়ে দাও, অতপর যেন ওই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাওয়া মানুষের ব্যাপারে তোমার মন ব্যাকুল না হয়ে যায়, কারণ তারা তো তাদের সীমাহীন আশা আকাংখার শিকার হয়ে পড়ায় মূল ও সত্য পথের বাইরে চলে গেছে। উপস্থিত লোভ ও লাভের আশা তাদেরকে নগদ

প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে দিচ্ছে এবং পরিণতিতে যে কঠিন অবস্থা আসার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে তার থেকে তাদের নযরকে সরিয়ে রাখছে। তারা ভাবছে যে তাদের মৃত্যু অনেক অনেক দূরে। উপস্থিত যে সব জিনিসের জন্যে তারা লালায়িত রয়েছে, তা তো রয়েছে তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে। তাদের বিশ্বাস এটা থেকে তাদেরকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না, তারা চাইলে এগুলো কেউ তাদের মুঠোর মধ্য থেকে নিয়েও যেতে পারবে না। তাদের হিসাব নেয়ার মতো কেউ নেই এবং যা কিছু এখন তারা পাচ্ছে-এই নগদ-প্রাপ্তিই তাদেরকে পরিশেষে পরবর্তী কষ্ট থেকে মুক্তি দেবে।

মানুষ যতোদিন বেঁচে আছে ততোদিন তাদের মধ্যে সীমাহীন আশা-আকাংখার উদ্রেক হতেই থাকবে, বস্তুতপক্ষে এই আশা–ই তাকে সদা সর্বদা নানা প্রকার স্বপ্ন দেখায়, বিভিন্ন তৎপরতায় উদ্বুদ্ধ করে এবং দুনিয়ার জীবনকে কানায় কানায় ভোগ করার জন্যে উৎসাহিত করে। যদিও আশা আকাংখা মানুষকে কর্মপ্রেরণা যোগায়, কিন্তু লাগাম ছাড়া আশা তার মধ্যে এমন অস্থিরতা পয়দা করে যে তার নির্লিপ্ততা ও নিশ্চিন্ততা দূরীভূত হয়, এমনকি এই সীমাহীন আশা আকাংখা পূরণের জন্যে সার্বক্ষণিক ব্যস্ততা তাকে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা থেকেও গাফেল করে দেয়, ভাগ্য লিখন যে অমোঘ ও অবশ্যম্ভাবী, এ বিশ্বাস থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়। আর দশ জনের মতো নির্ধারিত সময়ে তাকেও যে দুনিয়ার এ জীবন ছেড়ে চলে যেতে হবে তার লাগামছাড়া আকাংখা এ কথা ভুলিয়ে দেয়। এই কারণেই সে তার দায়িত্ব কর্তব্যের কথা ভুলে যায়, ভুলে যায় যে তাকে একদিন সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে হাযির হতে হবে। ভুলে যায় জীবন মৃত্যুর মালিক এবং সকল শক্তির অধিকারী একজন আছেন, মরতে হবে এবং পুনরায় উঠে হিসাব দিতে হবে।

ওদের এই ধরনের লাগামছাড়া ও ধ্বংসাত্মক আশার কারণেই রসূল (স.)-কে আল্লাহ তায়ালা তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেয়ার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি অবশ্যই জানেন, 'শীঘ্রই তারা জেনে নেবে।' কিন্তু জানবে তারা তখন যখন এই জানা তাদের কোনো কাজেই লাগবে না, অর্থাৎ পৃথিবীর এই কর্মজীবন যখন শেষ হয়ে যাবে তখন তারা জানতে পারবে, কিন্তু তখন এ জানা তাদের কোনো উপকারে আসবেনা... এমন একটি বিষয় আয়াতের মধ্যে রয়েছে তাদের জন্যে এক কঠিন তিরষ্কার এবং অত্যন্ত সতর্কবাণী। যেন জীবনের এই মহামূল্যবান সময়কে তারা কাজে লাগায়, লাগাম ছাড়া আশার ধোঁকায় পড়ে তারা তাদের সৎকর্মের সুযোগগুলোকে নষ্ট না করে দেয় এবং তাদের অপরিহার্য ও চূড়ান্ত জীবনের জন্যে সময় থাকতেই যেন তারা যথাযোগ্য প্রস্তুতি নেয়।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার চিরন্তন নিয়মের মধ্যে কোনো পরিববর্তন নেই এবং কোনো জাতির ভাগ্যে কি আছে, তা আমাদের জানা না থাকলেও পূর্ব থেকেই তা নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, কিন্তু এটাও সত্য যে, তার ব্যবহার অনুযায়ী তার ভাগ্য নির্ধারিত হবে। এ প্রশ্নটা একটু জটীল হলেও এটা সত্য যে সকল মানুষকেই শক্তি-সামর্থ ও ইচ্ছা শক্তিতে কিছু স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, সুতরাং ভাগ্যে কী আছে-না আছে সে চিন্তা না করে তার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সময় থাকতেই যেন সঠিকভাবে সে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। কর্ম-সমাপ্তিতে যে ফল সে পাবে তাতেই যেন সে তৃপ্ত হয় এবং যেন বুঝে যে এটাই ছিলো তার তাকদীরের লিখন। তার ভালো নিয়তে পরিচালিত চেষ্টার ফল পাওয়ার চূড়ান্ত স্থান দুনিয়া নয়, আখেরাত প্রাপ্তির মুখ্য উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে যে চেষ্টা মানুষ করবে তার ফল, পরকালীন জীবনে অবশ্যই সে পাবে এ বিষয়ে কোনো ভুল নেই। এরশাদ হচ্ছে,

জাতিসমূহের ধ্বংসপ্রাপ্তির সুনির্দিষ্ট সময়

'আর আমি, যে কোনো জাতিকে ধ্বংস করেছি, তাদের অবশ্যই জানা দরকার যে ধ্বংস হওয়ার পূর্বেই এক নির্দিষ্ট সময়ে তাদের ধ্বংস হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিলো এবং তাদের সুপরিচিত ভাগ্যলিপিতে তা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিলো। ওই নির্ধারিত সময় আসার পূর্বে কখনও কোনো জাতি ধ্বংস হয়নিও হবে না এবং ওই নির্ধারিত সময়ের পরেও তারা ধ্বংস হবে না, অর্থাৎ কখনও ওই সময়কে বিলম্বিত করা হবে না।

সুতরাং, তারা কিছুতেই যেন এ ধোঁকার মধ্যে না থাকে যে নির্ধারিত সময় এসে যাওয়ার পরও তাদের আযাবকে বিলম্বিত করা হবে। আল্লাহর অমোঘ নিয়ম নিজ গতিতে চলবেই চলবে, এটা নতুন কোনো কথা নয়। তাঁর আযাব নাযিল হওয়ার এ ধারা মানুষ দেখে আসছে, কাজেই তাদের জানা রয়েছে যে চিরন্তন এই যে ধারা তা কখনও পরিবর্তন হবার নয়। সুতরাং শীঘ্রই তারা জেনে নেবে এ কথাটা সত্য।

আর এই যে জানা ও সুপরিচিত আল্লাহর কেতাব এবং জীবনাবসানের সুনির্দিষ্ট সময় এটা দুনিয়ার সকল দেশ ও জাতির লোকের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে যাতে করে জীবনের এই অবসরে তাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলো তারা সেরে নিতে পারে। আর এই কাজের বিনিময়েই তারা নির্দিষ্ট সময়ে তাদের প্রতিদান পাবে। সুতরাং, যখন তারা ঈমান আনবে, ভালো হয়ে চলবে, নিজেদেরকে সংশোধন করবে এবং জীবনকে ভারসাম্যপূর্ণভাবে পরিচালনা করবে, তখন খুশী হয়ে আল্লাহ তায়ালা তাদের জীবন কাল বাড়িয়ে দেবেন, অতপর তারা যে সব উত্তম ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে তাদের অসদাচরনের কারণে ওই ভিত্তি তাদের নষ্ট হয়ে যাবে এবং যে আশানুরূপ কল্যাণ তাদের মধ্যে রয়েছে তা দূর হয়ে যাবে, আর ঠিক সেই সময়েই তাদের ওপর সাক্ষাত মৃত্যু হাযির হয়ে যাবে এবং তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এভাবে হয় তারা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে অথবা বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে যাবে অথবা সাময়িকভাবে তাদেরকে ভীষণ দুর্বলতা ও অস্থিরতা পেয়ে বসবে।

অবশ্য, অনেক সময় বলা হয়, বহু জাতি আছে যারা ঈমান আনে না, ভালো কাজ করে না, সংশোধিত হয় না এবং কোনো ইনসাফও করে না-এতদসত্ত্বেও তারা এ দুনিয়ায় বেশ শক্তিশালী ও সম্পদশালী হয়ে আছে; হাঁ, অনেক সময় এটা দেখা যায় সত্য, তবে এটা তাদের বাহ্যিক অবস্থার ওপর গড়ে ওঠা একটি ধারণা মাত্র। সাময়িকভাবে হয়তো তারা উন্নতি করে, প্রভাবশালী হয়, অপর জাতিসমূহের মধ্যে তাদের সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু একদিন তারা ডুবেই যায়।(১) প্রকৃত পক্ষে ভালো ও কল্যাণমুখী জনগণ তারা, যারা অপর মানুষের মধ্যে ভালো মানুষ বলে পরিচিত হয়, পৃথিবীর বুকে কল্যাণকর কিছু গড়ে রেখে যেতে পারে এবং ভালো প্রতিনিধি ছেড়ে যেতে পারে, তাদের সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করে যেতে পারে, সম্পদ ও সম্পত্তি-দ্বারা মানুষের জন্যে কল্যাণকর কিছু গড়ে তুলতে পারে এবং একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত মানুষের মধ্যে সদ্ব্যবহার ও উপকার করার প্রবণতা সৃষ্টি করতে পারে। এভাবে পরবর্তীদের জন্যে রেখে যাওয়া কল্যাণ ব্যবস্থা দ্বারা আসলে তারা তাদের মৃত্যুর পরেও দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকে তারা অগনিত মানুষের স্মৃতিপটে।

---

(১) এর একটি বড়ো উদাহরণ ইউ কে, (ইউনাইটেড কিংডম) ও ইউ. এস. এ. (ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট স্যোশালিষ্ট)।–সম্পাদক

'অবশ্যই আল্লাহর নিয়মের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই। প্রত্যেক জাতির কাজের ওপর একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার উত্থান হয়। এর পূর্বে তারা শেষ হয়ে যায় না এবং ওই নির্দিষ্ট সময় পরেও তাদের ওই অগ্রগতি থাকে না।'

নবী (স.)-এর সাথে অসদাচরণ

বর্তমান আলোচ্য অধ্যায়ের মধ্যে যে সব বর্ণনা এসেছে তার মধ্যে রসূল (স.)-এর সাথে যে প্রচন্ড বে-আদবী করা হয়েছিলো তারও এক জ্বলন্ত ছবি তুলে ধরা হয়েছে, অথচ তাদের কাছে তো এসেছে সেই মূল কেতাব যা সমগ্র মানবমন্ডলীর হেদায়াতের জন্যে আল্লাহ তায়ালা নিজেই রচনা করে সপ্ত আকাশের ওপর চিরস্থায়ী ও সুরক্ষিত এক ফলকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, আর সেই কেতাব, আজ সর্বাধিক ও সার্বক্ষণিকভাবে পঠিতব্য পুস্তক হিসাবে তোমাদের কাছে পেশ করা হচ্ছে এবং মহান আল-আমীন নবীর মুখে উচ্চারিত হচ্ছে। এ মহান বাণী যখন প্রিয় নবী (স.)-এর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় তখন এর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে থাকে এক মুখ থেকে আর এক মুখে, সম্প্রসারিত হতে থাকে হৃদয় থেকে হৃদয়ান্তরে। এ ধ্বনির প্রাণ সঞ্জীবনী সুধা পার্থিব আশা আকাংখায় নিদ্রাভিভূত অসংখ্য হৃদয়কে জাগিয়ে তোলে এবং তাদেরকে আল্লাহর চিরন্তন নিয়ম সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু এসময়ও স্বার্থ পাগল, নেতৃত্বলোভী ও কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারীরা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে এবং চরম নির্লজ্জ ব্যবহার করতে থাকে। ওদের ওই ব্যবহারকে এইভাবে উদ্ধৃত করা হচ্ছে,

'আর তারা বলে হে ওই ব্যক্তি, যার কাছে উপদেশ মালা প্রেরিত হয়েছে, অবশ্যই তুমি একজন বদ্ধপাগল। তুমি যদি প্রকৃতপক্ষে নবীই হয়ে থাকো তাহলে আমাদের কাছে ফেরেশতাদের নিয়ে আসো না কেনো (যারা তোমার নবুওতের সাক্ষ্য দিতে পারে)।

কতো নিষ্ঠুর ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ ছিলো আল-আমীন, সবার নয়ন মনি চির সত্যবাদী ও পরম দরদী মোহাম্মদ (স.)-এর প্রতি তাদের সম্বোধনের এ ভাষাটি। এ আহ্বানের প্রতিটি শব্দ ছিলো উপহাস ও বিদ্রূপে ভরা। 'হে ওই ব্যক্তি যার ওপর নাযিল হয়েছে এই উপদেশ মালা' একথা বলে এবং এইভাবে বিদ্রূপাত্মক ভাষায় ডাক দিয়ে, আসলে ওরা অস্বীকার করছিলো ওহী ও রেসালাত উভয়টিকেই। যে কথাগুলো দ্বারা তারা ডাক দিচ্ছিলো তার দ্বারা, প্রকারান্তরে তারা বিপরীত অর্থই ব্যক্ত করছিলো।

আল আমীন আল্লাহর রসূলকে এভাবে ডাক দেয়ায় তাদের দ্বারা নিকৃষ্টতম বেয়াদবী প্রকাশ পাচ্ছিলো, 'অবশ্যই তুমি একজন বদ্ধ পাগল' এটাই ছিলো কোরআনুল কারীম দ্বারা (তাদেরকে) আহ্বান জানানোর জওয়াবে তাদের পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া। প্রকৃতপক্ষে তারা জেনে-বুঝে, সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে এবং সত্যের বিরোধিতা করতে গিয়েই এইভাবে ঝগড়া করছিলো এবং এই কারণেই তারা ফেরেশতাদের হাযির করার দাবী উত্থাপন করছিলো যেন ফেরেশতারা এসে তাঁর রেসালাতের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। 'কেনো নিয়ে আসছো না তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে একদল ফেরেশতা যদি তোমার রেসালাতের দাবীতে তুমি প্রকৃতপক্ষে সত্যবাদী হয়ে থাকো।'

এ আয়াত এবং আরো অন্যান্য বহু আয়াতে রসূল (স.)-এর কাছে তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে বারবার ফেরেশতা নাযিলের দাবী কোনো নতুন দাবী ছিলো না, বরং অতীতেও আরো বহু নবী রসূলের কাছে এইভাবে ফেরেশতা নাযিলের দাবী করা হয়েছে। এটাই হচ্ছে সেই মানুষের অজ্ঞানতা, মূর্খতা ও হঠকারিতার বিভিন্ন লক্ষণের মধ্যে একটি বড়ো লক্ষণ, যাকে আল্লাহ তায়ালা

সম্মানিত করেছেন এবং তাদের মধ্যেই নবুওত দান করেছেন, দান করেছেন তাদের মধ্যে সেই সব ব্যক্তিকে যাদেরকে তিনি পছন্দ করেছেন।

এই ঘৃণা বিদ্বেষ, উপহাস বিদ্রূপ, লজ্জাকর ব্যবহার ও হঠকারিতাপূর্ণ ব্যবহারের জাবে সেই নিয়মেই কথা বলা হয়েছে যেভাবে অতীতে আম্বিয়া (আ.) বলেছেন, অবশ্যই ফেরেশতারা আসবেন, তবে তখন তাদের আগমন ঘটে যখন জাতির মধ্যে চিহ্ন আরোপকারীও সত্যকে অস্বীকারীদের ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত হয়ে যায় এবং যখন তাদেরকে দেয়া নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হয়ে যায়। তাঁর আযাব একবার এসে গেলে আর কোনো প্রকার ঢিল দেয়া হয় না বা পুনরায় কোনো সময়ও তাদেরকে দেয়া হয় না। এরশাদ হচ্ছে, 'আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ' সত্য সঠিক ফয়সালাকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে (আযাব) পাঠাই না (আর যখন সে ফয়সালা সংঘটিত করার সময় এসে যায়) তখন আর কাউকে সময় দেয়া হয় না .....।

এখন তাদের হিসাব করে দেখা দরকার কী চাইছে তারা এবং কোন জিনিসের দাবী তারা করছে?

এরপর, আলোচনা প্রসংগে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে হেদায়াত ও চিন্তা ভাবনার মূল বিষয়টির দিকে..... ফেরেশতাদেরকে যে একটি মাত্র উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা প্রেরণ করেন তা হচ্ছে সত্য বিষয়, অর্থাৎ নবীদের আগমনের সকল উদ্দেশ্যকে হঠকারীরা যখন ব্যর্থ করে দেয় তখন তাদের ওপর আযাব নাযিল হওয়া অবধারিত হয়ে যায় এবং সেই আযাবকে বাস্তবায়িত করাই হয় ফেরেশতাদের কাজ। এই জন্যেই তাদেরকে পাঠানো হয়, এটাই তাদেরকে প্রেরণের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ বিষয়ের ওপর চিন্তা ভাবনা করার জন্যে ওই হঠকারী জনতাকে আহ্বান করা হচ্ছে। সকল আম্বিয়ায়ে কেরামকে প্রেরণ করা হয়েছে যুক্তি বুদ্ধিপূর্ণ উপদেশ বাণীসহ। তারা মানুষের বিবেক বুদ্ধির কাছে আপীল করে তাদেরকে চিন্তা করার জন্যে আহ্বান করে, যেন তারা সময় থাকতেই তাদের কর্তব্য নির্ধারণ করে নেয়। যারা নিজেদের বিবেক বুদ্ধির সদ্ব্যবহার না করে সত্য বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে গেছে এবং যখন চূড়ান্তভাবে একথা বুঝা গেছে যে তারা কিছুতেই সত্যকে গ্রহণ করবে না তখনই ফেরেশতারা তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে প্রেরিত হয়েছেন, আর সত্যকে অস্বীকার, অগ্রাহ্য ও উৎখাত করার অপচেষ্টার পরিণামই হচ্ছে 'ধ্বংস হয়ে যাওয়া।' তখন তারা এই পরিণামের হকদার হয়ে যায় যখন সত্যের সকল আবেদনকে তারা অগ্রাহ্য করে। আল্লাহ তায়ালা একমাত্র তাদেরই জন্যে কল্যাণ বরাদ্দ করেছেন যারা সত্য পথ অবলম্বনের মাধ্যমে কল্যাণ লাভে ব্রতী হয়েছে অর্থাৎ যে কোনো ব্যক্তি বা জনপদ নিজেরা কল্যাণ লাভ করতে চেয়েছে এবং এজন্যে সত্য পথের অনুসারী হতে চেয়েছে তাদেরকেই আল্লাহ তায়ালা কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং তাদেরকে কল্যাণের দিকে পরিচালনার জন্যে পাঠিয়েছেন তাঁর নিজের পক্ষ থেকে প্রেরিত এমন এক যুক্তিপূর্ণ উপদেশবাণী যাকে তারা গ্রহণ করেছে এবং নিজেদের জীবনে তার প্রয়োগের যৌক্তিকতা বুঝতে চেষ্টা করেছে, যার ফলে তারা চূড়ান্ত সত্যও সঠিক পথ পেয়ে গেছে আর অবশ্যই এ পথে ফেরেশতা প্রেরণের দাবী ও ফেরেশতাদের আগমন থেকে অনেক অনেক ভালো। মহান সেই উপদেশ মালা সম্পর্কে জানানো হচ্ছে,

‘অবশ্যই আমি, এ উপদেশবাণী পাঠিয়েছি, আর অবশ্যই আমি নিজে এ মহান বাণীর হেফাযতের জন্যে দায়িত্বশীল।’

সুতরাং, তাদের জন্যে উত্তম পন্থা হচ্ছে এ হেদায়াতকে কবুল করা। এ মহান হেদয়াতই টিকে থাকবে, সংরক্ষিত থাকবে এ হেদায়াত চির সজীব, চির সুন্দর এবং চির কার্যকর-এটা কখনও পুরাতন বা বাসি পচা হবার নয়, অকেজো বা অকার্যকর হবারও নয় এবং একে পরিবর্তন করারও কোনো প্রয়োজন নেই বিধায় এর মধ্যে কোনো দিন কোনো পরিবর্তন আসবে না। এ হেদায়াত মিথ্যা দ্বারা কখনও ঢাকা পড়বে না, এর শব্দাবলীর মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনতেও কোনো দিন কেউ সক্ষম হবে না, যখন ওরা সত্যকে পেতে চাইবে তখনই সরাসরি আল্লাহর পরিচালনা ও হেদায়াত তাদের জন্যে এই হেদায়াতের কাজে অগ্রসর হবে এবং তাদেরকে ফেরেশতারা অদৃশ্যভাবে দৃঢ়তা দান করতে থাকবেন.... নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা চান না যে তাদের ওপর আল্লাহর আযাবের ফেরেশতা নাযিল হোক, কারণ আল্লাহ তায়ালা তাদের কল্যাণ চান বলেই তো তাদেরকে বুঝানোর জন্যে যুক্তিপূর্ণ ও সুরক্ষিত নানা উপদেশ বাণী নাযিল করেছেন যেন তারা চিন্তা ভাবনা করে এবং সঠিক পথ গ্রহণ করে। কিছুতেই তিনি মানুষের ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াকে পছন্দ করেন না। কাজেই ধ্বংসের ফেরেশতারা নাযিল হোক এটা অবশ্যই তিনি চান না।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর নবী (স.) কে সম্মানিত করেছেন এবং এজন্যে তিনি তাঁকে জানাচ্ছেন যে রসূলদের মধ্যে শুধুমাত্র তাঁর সাথেই যে ঠাট্টা মস্কারি করা হচ্ছে এবং একমাত্র তাঁকেই মিথ্যাবাদী বানানো হচ্ছে তা নয়। সকল সময়েই নবী রসূলদের সাথে এ ধরনের জঘন্য ব্যবহার হয়ে এসেছে। এরশাদ হচ্ছে,

‘আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বেকার জাতিসমূহের মধ্যেও বহু নবী রসূল পাঠিয়েছি আর যতো রসূলই তাদের কাছে এসেছে সবার সাথেই এভাবে ঠাট্টা মস্কারি করা হয়েছে।’

আর ইতিপূর্বে রসূলদের অনুসারীদের সাথেও অস্বীকারকারীরা অনুরূপ ব্যবহার করেছে যেভাবে এই কেতাব সম্পর্কে তোমার অনুসারীদের সাথে আজকের অপরাধী ও অস্বীকারকারীরা ঠাট্টা মস্কারি করছে। আর এইভাবে ওইসব লোকদের মনের মধ্যে আমি আল্লাহ তায়ালা, এক দুরারোগ্য ব্যাধি জারি করে দিয়েছি যারা চিন্তা ভাবনা করে না এবং সত্য সঠিক বিষয়কে আলিংগন করে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

‘এমনি করেই আমি অপরাধী চক্রের অন্তরের মধ্যে এই ভাবধারা চালিয়ে দেই। (যার কারণে) ওরা এ কেতাবকে বিশ্বাস করে না আর অবশ্যই অতিক্রান্ত পূর্ববর্তীদের এই একই প্রকার বদভ্যাস হয়ে গেছে।’

অর্থাৎ, তাদের অন্তরের মধ্যে নবী ও তাঁর কাছে অবতীর্ণ কেতাবকে অস্বীকার করার লক্ষ্যে উপহাস বিদ্রূপ করার মনোভাব আমি পয়দা করে দিয়েছি, কারণ যখনই এসকল ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাত করেছে তখন কোনো ভালো মন নিয়ে তারা সাক্ষাত করেনি। এহেন দুষ্টমতি ও ব্যধিগ্রস্ত হৃদয়ের মানুষ সর্বকালেই বিরাজ করে, আজ যেমন এরা আছে, অতীতেও এই চক্রান্তকারীরা ছিলো। এসকল মিথ্যাবাদী, সত্য অস্বীকারকারী ও সত্যের বাতিকে নিভিয়ে দেয়ার মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ প্রকৃতপক্ষে সবাই একই দল, একই ধাতু দিয়ে তারা তৈরী। ‘পূর্ববতীদের মধ্যেও এই অভ্যাস একইভাবে দেখা গেছে।’

ইসলাম বিদ্বেষীদের মনোভাব

ঈমানের পক্ষে প্রচুর যুক্তি প্রমাণের অভাবই যে তাদেরকে এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে তা নয়, বরং তারা হিংসা বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রকারী, সুতরাং সত্যের পক্ষে তাদের সামনে যতো প্রকার বলিষ্ঠ দলীল প্রমাণই হাযির করা হোক না কেন, তাদের হিংসা বিদ্বেষের মধ্যেই তারা হাবুডুবু খেতে থাকবে এবং তারা হঠকারিতার সাথে নানা প্রকার চক্রান্তের জাল বুনতে থাকবে।

একথার মধ্যে তাদের হীন চক্রান্ত ও জঘন্যতম হিংসা বিদ্বেষের এক জীবন্ত ছবি ফুটে উঠেছে। দেখুন নীচের আয়াতটিতে,

'ওদের সামনে যদি আমি আকাশের কোনো দরজা খুলে দিতাম এবং সেই দরজার মধ্য দিয়ে তারা এগিয়ে যেতে থাকতো তবুও তারা বলতো, 'আমাদেরকে নযরবন্দী করে ফেলা হয়েছে বরং ভীষণ এক যাদু করা হয়েছে আমাদের ওপর, (যার কারণে আমরা এসব অত্যাশ্চর্য জিনিস দেখতে পাচ্ছি)।'

অর্থাৎ, এমন জেদী হঠকারী এসব সত্য বিরোধী চক্র যদি তাদের সামনে আকাশের মধ্যে কোনো দরজা খুলে যেতো এবং সেই দরজা দিয়ে তারা স্বশরীরে উর্ধাকাশের আরো ওপরে উঠে যেতো, তাদের সামনে উন্মুক্ত দরজা দেখতে পেতো, তাদেরকে আরোহণ করার অনুভূতি রোমাঞ্চিত করতো এবং এই আরোহণ করার স্বপক্ষে সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রমাণও হাযির হয়ে যেতো তবুও জেদের কারণে তারা নানা প্রকার অজুহাত খাড়া করতো। বলতো, না, না, এটা সত্য নয়, কেউ আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে অথবা আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে এজন্যে আসলে আমাদের চোখ সঠিকভাবে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, বরং আমরা কল্পনায় এসব দেখছি 'বরং আমরা যাদুস্পৃষ্ট এক জাতিতে পরিণত হয়েছি।' অর্থাৎ, কোনো এক মহা যাদুকর আমাদেরকে ভীষণভাবে যাদু করে ফেলেছে, যার কারণে আমরা এসব অলৌকিক জিনিস দেখতে পাচ্ছি এবং এইভাবে অনুভব করছি।, আর আমরা যে নড়াচড়া করছি এটা আর কিছু নয় এটা নিছক যাদুর স্পর্শের কারণে আমাদের মধ্যে এক কাল্পনিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে! নাউযু বিল্লাহ

আসলে ওদের এসব কল্পনার মধ্য দিয়ে ওদের ঘৃণ্য মনোবৃত্তি, নিকৃষ্ট জেদ এবং সত্য বিদ্বেষ পরিস্ফুট হয়ে উঠছিলো, আর এভাবে এটাও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো যে, ওদের সাথে যুক্তিতর্কে লিপ্ত হয়ে কোনো লাভ নেই এবং এটাও প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিলো যে, তাদের কাছে ঈমানের স্বপক্ষে পেশ করার মতো দলীলের কোনো কমতি ছিলো না। আকাশে আরোহণের উদাহরণ পেশ করাটাকে তাদের হঠকারিতা বুঝানোর জন্যে ফেরেশতা নাযেলের উদাহরণ থেকে আরো বেশী জোরদার উপমা হিসাবে হাযির করা হয়েছে। কিন্তু হলে কি হবে, ওরা তো সেই চরম জেদী ও হঠকারী জাতি, যারা সত্যকে দেখেও দেখে না এবং নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে বলে কোনো যুক্তিই মানতে চায় না। এভাবে সত্যবিরোধী মনোভাব দেখাতে গিয়ে তারা এতোটুকু লজ্জা অনুভব করে না, কোনো যুক্তি প্রমাণ বা কোনো দলীলের পরোয়াই তারা করে না, আর এজন্যেই দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট সত্যের বিরোধিতা করতে তারা কুণ্ঠিত হয় না।

ইসলাম বিদ্বেষীদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী

বর্তমান আলোচনার মধ্যে ওদের হঠকারিতা, জেদ এবং নিজেদের স্বার্থের জন্যে নির্লজ্জ বিরোধিতার যে উপমা তুলে ধরা হয়েছে তা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। এ উদাহরণগুলো পেশ করার পর যে কোনো বিবেকবান মানুষের হৃদয়ে ওদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ঘৃণার সঞ্চার হবে।

ওদের সত্যবিরোধী জেদী মনোভাব বুঝাতে গিয়ে আকাশের দৃশ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, গোটা সৃষ্টিজগতকেই ব্যবহার করা হয়েছে এই সব মানুষকে জ্ঞান দানের পুস্তক হিসাবে এবং এ ব্যাপারে শুরু করা হয়েছে আকাশের রহস্যপূর্ণ দৃশ্যাবলীর উল্লেখ দ্বারা, তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুর নযির তুলে ধরা হয়েছে, যেমন পানি ভর্তি বায়ু, জীবন মৃত্যু, মরণের পর পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠা ও আল্লাহর দরবারে সবার হাযির হওয়া ইত্যাদি, কিন্তু এসব উদাহরণ দ্বারাতেও যাদের বিবেকে সাড়া জাগে না, তাদের হঠকারিতা বুঝানোর জন্যে চূড়ান্ত এই উপমা তুলে ধরা হয়েছে যে তারা এতো বেশী সত্যবিরোধী এবং নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারে এতো বেশী অন্ধ যে তাদের সামনে যদি আকাশে ওঠে যাওয়ার জন্যে কোনো দরজাও খুলে দেয়া হতো এবং আল্লাহর রহস্য ভান্ডার অবলোকন করতে করতে সম্মুখ পানে এগিয়ে গিয়ে তারা আল্লাহর ক্ষমতাসমূহ প্রত্যক্ষ করতো তবুও তারা নবী (স.)-এর কথা ও কোরআনের বাণীকে সত্য বলে মেনে নিতো না। বরং তারা বললো, আমাদেরকে নযরবন্দী করে ফেলা হয়েছে মন্ত্রমুগ্ধ এতেও তৃপ্ত না হয়ে তারা আরো বলে উঠতো, আমরা গোটা জাতি এই মারাত্মক যাদুর স্পর্শে হয়ে গিয়েছি। সে আমাদেরকে যা দেখাচ্ছে ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, বাধ্য হয়ে আমরা তাই দেখছি। এ অবস্থাটাকে তুলে ধরার জন্যে আরো বলা হচ্ছে,

'আর অবশ্যই আমি, বানিয়েছি আকাশের মধ্যে সুউচ্চ গম্বুজ বিশিষ্ট কেল্লাসমূহ .... তাকে তাড়া করে নিয়ে যায় উজ্জল উল্কা পিন্ড।

এটাই হচ্ছে সুপ্রশস্ত ও চিরস্থায়ী সুরক্ষিত ফলকের মধ্যে লিখিত প্রথম অংশ। অবশ্যই এটা মহান আল্লাহর অদৃশ্য হাতের ইশারায় অংকিত রহস্যে ভরা সেই চিরস্থায়ী ফলকের লিখন।

আর আল কোরআন এর ভাষাই এমন এক মোজেযা যা ফেরেশতাদের আগমন থেকেও অনেক বেশী আশ্চর্যজনকভাবে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল সম্পর্কে সাক্ষ্য বহন করছে এবং বিশ্ব সৃষ্টির পরিকল্পনা ও পরিচালনার জটীলতা সম্পর্কেও আমাদেরকে অবহিত করছে এবং এ মহা সৃষ্টির বিশালত্ব সম্পর্কে জানাচ্ছে।

এখানে বুরূজ বা কেল্লাসমূহের যে উল্লেখ হয়েছে তার দ্বারা তারকারাজি ও সুবিশাল ছায়ালোককে বুঝানো হয়েছে। এটাও জানানো হয়েছে যে, এসব গ্রহ-নক্ষত্র এক মুহূর্তের জন্যেও স্থির হয়না, বরং প্রত্যেকটি নিজ নিজ গতিপথে সদা সর্বদা পরিভ্রমণ করছে, কিন্তু গতিহীন বা গতিপূর্ণ যাই হোক না কেন, উভয় অবস্থাতেই এ মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়কর প্রতিটি সৃষ্টি স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে সর্বদাই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালাই এসব কিছুর মধ্যে অপরূপ সৌন্দর্য বিধান করেছেন, যে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলছেন,

'আর অবশ্য অবশ্যই আমি এগুলোকে সুন্দর করেছি দর্শকদের জন্যে'। সৃষ্টির অনুপম সৌন্দর্যের বর্ণনায় এ হচ্ছে একটি চমৎকার ঝলক, বিশেষ করে এর দ্বারা অতি উজ্জ্বল ও চরম সুন্দর উর্ধাকাশের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি লগ্ন থেকেই তাঁর এই প্রিয়তম সৃষ্টিকে সৌন্দর্যমন্ডিত করতে চেয়েছেন এবং সবকিছুকে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের রশিতে আবদ্ধ করেছেন। এসব কিছুর বর্ণনায় দেখা যায় মানুষের দৃষ্টি ও মনমগযে গোটা সৃষ্টি সম্পর্কে বিরাজমান নিয়ম শৃংখলা, এর বিশালত্ব, ব্যাপকত্ব ও সূক্ষ্মতার ধারণা

দেয়ার মাধ্যমে তাদের কাছে এর রূপ মাধুর্য্য ও সৌন্দর্যের দৃশ্যাবলীই তুলে ধরা হয়েছে। আহ্, বিদগ্ধ চিত্তে এই মহা সৃষ্টির রাশি-রাশি সৌন্দর্য যখন দোলা দিতে থাকে তখন খুশীতে সে আত্মহারা হয়ে যায় এবং উদাত্ত কণ্ঠে সে গেয়ে ওঠে পরম করুণাময় আল্লাহর জয়গান। তাই তো দেখা যায় অন্ধকার রাত্রির পর্দাকে ছিন্ন করে আল্লাহর প্রেমিক যখন আরামের বিছানা পরিত্যাগ করে পরম প্রেমময়ের দরবারে হাযির হয়, যখন তার নযর নিবদ্ধ হয় ঘনান্ধকারে ছাওয়া বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে কোটি কোটি প্রদীপ-সাজানো উর্ধাকাশের দিকে, তখন রাশি রাশি ফুল সম ওই গ্রহ-নক্ষত্র তারকারাজি যেন হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে থেকে আরো কাছে টেনে নিতে চায়। তখন এসব কিছুর মধ্যে আল্লাহর নূরের জ্যোতি তাকে মনমুগ্ধ করে ফেলে, আর তখন তার অন্তরাত্মা তার পরম প্রেমময় প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করার জন্যে পাগলপারা হয়ে ওঠে এবং তখন সে যেন আল্লাহর মহব্বত ভরা আহ্বান তার হৃদয়ের গভীরে অনুভব করে। আবার, চাঁদনী রাতের রূপালী-রূপ এমনইভাবে তার হৃদয়কে উদ্বেলিত করে, বিশেষ করে পূর্ণিমা রাতের স্বর্ণালী সন্ধ্যার আগমনে তার হৃদয় যেন ময়ুরের মতো নেচে ওঠে, তারপর রাত যতো গভীর হয়, ধীরে ধীরে জাগ্রত ধরা ঢলে পড়ে নিদ্রার প্রশান্ত কোলের মাঝে তখন আল্লাহপ্রেমিক ব্যক্তিরা যেন পদার্পন করে এক স্বর্নালী রাজ্যে আর তখনই তারা এক অনির্বচনীয় সুখ স্বপ্নে মেতে ওঠে।

এমনই এক মোহময় মুহূর্তে আল্লাহপ্রেমিক হৃদয় গভীরভাবে অনুভব করে মহিমাময় মালিকের প্রাণস্পর্শী ও মধুময় বাণীর তাৎপর্য, আর অবশ্যই আমি বড়ো সুন্দর করে সাজিয়েছি........।

মানবজাতির চিরশত্রু

মনোমুগ্ধকর এ সৌন্দর্যের সাথে মিশে আছে সুরক্ষিত এক মহা পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা, তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আমি আল্লাহ তায়ালা হেফাযত করেছি এ বিশাল ছায়ালোককে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত সকল শয়তান থেকে।'

অর্থাৎ, শয়তান এগুলোর ধারে কাছে ঘেঁসতে পারে না এবং এগুলোকে অপবিত্রও করতে পারে না, পারে না এগুলোর মধ্যে প্রবেশ করে তার বিষাক্ত নিশ্বাস ফেলতে এবং তার কুপ্ররোচণা দ্বারা এসবের নিয়ম শৃংখলার মধ্যে কোনো ব্যঘাত ঘটাতে। অর্থাৎ, মরদূদ শয়তানকে শুধুমাত্র এ পৃথিবীর বুকে যত্রতত্র পরিভ্রমণের ও ভ্রান্ত মানুষকে কুমন্ত্রণা দানের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। মরদূদ অপরদিকে রয়েছে এমহাআকাশ। (সামাউন) এ শব্দটি উচ্চতা, দূরত্ব ও মাহাত্মা বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই মহাকাশে অবস্থিত যে সব আলোকসজ্জা রয়েছে সেগুলো থেকে এমনভাবে ওদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয় যে, এগুলোর ধারে কাছেও সে ঘেঁসতে পারে না যদিও মাঝে মাঝে সে চেষ্টা করতে কসুর করে না এবং তার না-ফরমানী ও অহংকারপূর্ণ আনুগত্যহীনতার বিষ সে পৃথিবীর নিজ জাতি ও মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জিনিসের মধ্যে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয় না। সে নিজে যেমন মালিকের সামনে নিজের বড়ত্ব প্রদর্শন করে এবং তাঁর হুকুম অমান্য করে চিরতরে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত হয়ে গেছে তেমনি করে নিরন্তর উর্ধাকাশের আনুগত্যশীল ও বিশাল বিশ্বের অন্য কারো মধ্যে ওই কদর্য স্বভাবের বিষ প্রবিষ্ট করানোর ক্ষমতা তাকে দেয়া হয়নি। তবে সে চেষ্টা করে এবং যতোবারই সে চেষ্টা করে, ততোবারই তাকে অগ্নি

শিখা বা বিশাল বিশাল আগুনের গোল্লা নিক্ষেপ করে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এরশাদ হচ্ছে,

'তবে, যখনই সে চুরি করে কিছু শুনতে চায়, তখনই তাকে তাড়া করা হয় ভীষণ আগুনের গোল্লা দ্বারা।'

এখন, আসুন আমরা একবার বুঝার চেষ্টা করি শয়তান কী ও কোন বস্তু দ্বারা তার সৃষ্টি? সে চুরি করে কিভাবে শুনতে চায় এবং কী শুনতে চায়? এসবই হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অদৃশ্য ভান্ডারে রক্ষিত রহস্য রাজির বিষয়বস্তু এগুলোর রহস্য ভেদ করার কোনো সাধ্য আমাদের নেই, আল্লাহর কালাম মহাগ্রন্থ আল কোরআন যতোটুকু আমাদেরকে জানাতে চায় একমাত্র ততোটুকুই আমরা জানতে পারি, এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করেও কোনো লাভ নেই, কারণ এর সাথে আমাদের আকীদা বিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং এসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা শুরু করলে শুধু বুদ্ধি বিভ্রম-ছাড়া আর কোনো ফায়দা হয় না, যেহেতু এগুলো মানুষের বোধশক্তির বাইরের জিনিস আর এসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করায় আমাদের জীবনের বাস্তব কাজ কর্মের মধ্যে কোনো পরিবর্তনও আসা সম্ভব নয়। অথবা এসব অদৃশ্য বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোতে আমরা নতুন কোনো চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারবো তাও নয়, তবে এটুকু আমাদের জানা দরকার যে আকাশ রাজ্যের কোথাও শয়তানের কোনো জারি জুরি খাটে না। এ বিশাল সাম্রাজ্যের সব কিছুর সৌন্দর্যরাশিকে বিঘ্নিত করার মতো কেউ নেই। সুউচ্চ আকাশের দিকে যতোই আমরা দৃষ্টিপাত করি না কেন বা যতো ক্ষমতাসম্পন্ন দূরবীন দিয়েই আমরা দেখার চেষ্টা করি না কেন অথবা আগুনের তৈরী জ্বিন জাতি উদ্ভূত শয়তান যদি কোনো মন্দ অভিপ্রায়ে সেগুলোর দিকে তাকাতে চায়, নিজের কলুষিত জীবনের সাথে জড়িয়ে উর্ধ লোকের কোনো কিছুকে কলুষিত করতে চায়, তাতেও সে সক্ষম হবে না। অবশ্য এটা ঠিক, অহংকারী শয়তান চেষ্টা করে এবং যতোবারই সে চেষ্টা করে ততোবারই তেড়ে আসে তার দিকে আগুনের বড় বড় গোল্লা তেড়ে আসে। এজন্যে তার সকল দুরভিসন্ধি তার মনের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যায়, সে জানে না বা বুঝে না যে তার উচ্চাকাংখার একটা সীমা আছে, যার ওপর সে কখনও উঠতে পারে না।

আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না যে শূন্যলোকে পরিভ্রমণরত যতো গ্রহ উপগ্রহ এবং যতো উল্কাপিন্ড রয়েছে সেগুলোর মধ্যে সাধারণভাবে আমাদের কাছে এ পৃথিবীটাকে একটা স্থির বাসস্থান মনে হলেও অন্যান্যদের মতো এরও নিজস্ব একটা গতি আছে, এরই মধ্যে শয়তান চলাফেরা করে, এই পরিমন্ডলের মধ্যে থেকেই সে উর্ধ দিকে ওঠার চেষ্টা করে, এখানেই তার দিকে উল্কা নিক্ষিপ্ত হয় একথাগুলোকে অতি সুন্দর এ মহান কেতাবের মধ্যে বড় চমৎকারভাবে পরিবেশন করা হয়েছে।

সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার সন্ধান

জ্ঞান সাধকদের সামনে পরিব্যাপ্ত, গাছ-পালা, নদী-নালা, সাগর-উপসাগার ও মহা সাগর এবং মরু মরীচিকাসমৃদ্ধ যে বিশাল পৃথিবী বর্তমান রয়েছে তা হচ্ছে তাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের এক মহাগ্রন্থ। এর মধ্যেই পরিভ্রমণরত রয়েছে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নিচয় ও প্রাণী জগত এবং অলৌকিক সত্ত্বাসমুহ, যেমন জ্বিন-জাতি, যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ইবলিস শয়তান। এসবের দিকে ইংগিত করেছে পাক কোরআন,

'আর এই যে পৃথিবী– একে আমি, বিছিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে পাহাড়-পর্বতসমূহ (পেরেকের মতো) গেড়ে দিয়েছি (যেন তা নড়াচড়া করতে না পারে) এবং তাতে প্রতিটি জিনিস আমি সুপরিমিতভাবে উৎপাদন করেছি।

ছোট্ট এই একটি মাত্র আয়াতে বিশাল এই পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত বিপুল ভান্ডারের যে সমারোহ রয়েছে তার দিকে অত্যন্ত অর্থবহ ও সুস্পষ্ট ইংগিত দেয়া হয়েছে। এখান থেকেই ইশারা করা হচ্ছে সুউচ্চ আকাশের মধ্যে অবস্থিত গ্রহরাজির দিকে যা প্রকাশ করা হয়েছে একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ (বুরূজ) দ্বারা। এগুলো হচ্ছে সুদৃঢ় ও সুবিশাল আলোকময় গ্রহরাজি, আরো উল্লেখ করা হয়েছে গতিশীল অগ্নিশিখার কথা যার সম্পর্কে বলা হয়েছে এটা সুস্পষ্টভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, আর উল্লেখিত হয়েছে অরণ্যের গাছ পালা ও তরুলতার কথা, যেগুলোর বিশেষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে এগুলো সবই উৎপন্ন হয়েছে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ ও পরিমাপ মতো। বিশেষভাবে ইশারা করা হয়েছে পৃথিবীর বুকে প্রোথিত পাহাড়-পর্বতগুলোর দিকে বলা হয়েছে, আমি, বিছিয়ে দিয়েছি, পাহাড় পর্বতসমূহকে' গাছপালা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'পরিমাপ মতো'। এই 'মওযুন' শব্দটি বড়ই তাৎপর্যবহ, অর্থাৎ যখন এর অর্থ দাঁড়ায় যে পৃথিবীর বুক থেকে যা কিছু উৎপন্ন হচ্ছে এগুলো প্রাণীজগতের প্রয়োজন মাফিক উৎপন্ন হয় এবং সব কিছু দেয়া হয়েছে হিসাব মতো। নিষ্প্রয়োজন কোনোটাই নয়, তখন এটাও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সৃষ্টির সকল কিছুর জীবিকার ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা হিসাব মতোই করে রেখেছেন এবং সে হিসাবমতোই সকল কিছু উৎপন্ন হয়। কোনো কিছু বেহিসাব এবং এলোমেলোভাবে উৎপন্ন হয় না। কিছুতেই তা নয়-আর এভাবেই আছে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীব ও বস্তুসমূহের ভিতরে ও বাইরে এমন আরো বহু প্রকার জীব যাদেরকে 'তোমরা রেযেক দাও না।'

অর্থাৎ, পৃথিবীর বুকে পরিভ্রমণরত যতোপ্রকার জীব জন্তু আছে সে সবগুলোকেই একথার দ্বারা সংক্ষেপে বুঝানো হয়েছে-সব কিছু এ বিশাল পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত।

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে জানার ও বুঝার জন্যে এখানে যে সব কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে দিগন্ত ব্যাপী প্রাকৃতিক বিষয়াদি থেকে নিয়ে জীবজন্তু সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, এই যে দৃশ্যমান সুপ্রশস্ত পৃথিবী, এর মধ্যে বিরাজমান সমভূমি, পাহাড়-পর্বত, উৎপন্ন দ্রব্যাদি এবং পৃথিবীর বুকে জীবন্ত সকল জীবজন্তু, কীট-পতংগ, বৃক্ষ-গুল্ম, লতাপাতা, আর সব কিছুর জন্যে বরাদ্দকৃত রুযির ভান্ডার সামান্যতম জ্ঞান থাকলে এসব আল্লাহকে জানার ও বুঝার জন্যে যথেষ্ট। অর্থাৎ, পৃথিবীর সকল প্রাণীর জন্যে প্রয়োজনীয় সব কিছুর বিপুল সমারোহ এ পৃথিবীর বুকে রয়েছে, এজন্যে ছাফ-ছাফ বলা হচ্ছে, 'আছে সেখানে আরো অনেকে যাদেরকে তোমরা রেযেক দাও না। ওরা সবাই বেঁচে আছে আল্লাহর দেয়া সেই রেযেকের ওপরে যার ব্যবস্থা তিনি তাদের জন্যে পৃথিবীর বুকে করে রেখেছেন। আরো বলা হচ্ছে, পৃথিবীর বুকে যে অসংখ্য প্রাণী আছে তোমরা তো সেগুলোর মতোই এক শ্রেণীর প্রাণী। তোমরা মনে করো, তোমাদের রুযির ব্যবস্থা তোমরা করো, অথচ প্রকৃত সত্য হচ্ছে তোমাদের এবং অন্যান্য সকল প্রাণীকুলের রুযির ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই করে থাকেন। এরপর তিনিই তাদের সবার ওপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে রেখেছেন, অতপর তোমাদের খেদমতের জন্যেই তাদের সবাইকে নিয়োজিত করে দিয়েছেন, তোমাদের উপকার ও তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে সবার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছেন, সবাইকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণে এনে দিয়েছেন, তারা সবাই আল্লাহর দেয়া রেযেকের ওপর বেঁচে আছে এবং তাদের কারো জন্যে তোমাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়নি।

এসব রুযি রোযগারের ব্যবস্থা সবই অন্যান্য সবকিছুর মতোই আল্লাহর জ্ঞান ভান্ডারের মধ্যে রয়েছে, তাঁরই হুকুমে এবং তাঁরই ইচ্ছায় এসব কিছু পরিচালিত হচ্ছে, এগুলোর ভোগ ব্যবহার তাঁরই ইচ্ছায় এবং তাঁরই মর্জি মোতাবেক হয়ে থাকে। তাঁর নিয়ম অনুযায়ী তিনি যাঁকে যেভাবে

যতোটুকু দিতে চান–সেইভাবে সে ততোটুকু পেয়ে থাকে এবং যতোদিনের জন্যে তিনি বরাদ্দ করেন ততোদিনই তারা পেয়ে থাকে এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হবার নয়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর যা কিছু (পৃথিবীর বুকে ও ঊর্ধলোকে) আছে সব কিছুর ভান্ডার ও চাবিকাঠি আমার কাছেই রয়েছে। আর সব কিছুকেই আমি সুনির্দিষ্ট একটি নিয়ম ছাড়া সরবরাহ করিনা।

কোনো সৃষ্টির পক্ষে নিজ শক্তি ক্ষমতা দ্বারা কোনো কিছু করার যোগ্য হওয়া অথবা কোনো কিছুর মালিক হওয়া সম্ভব নয়। সকল কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তিনিই এসব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর কাছেই এসব কিছু ফিরে যাবে তাঁর মধ্যেই বিলীন হয়ে যাবে সব কিছু, তাঁর সৃষ্ট জগতসমূহে যতোপ্রকার সৃষ্টি আছে তাদের জন্যে খাদ্য-খাবার ও অন্যান্য জীবন সামগ্রী পূর্ব নির্দিষ্ট পরিমাণে নির্ধারণ করা রয়েছে। এলোমেলোভাবে এবং হঠাৎ করে কিছু নাযিল হয়ে যায় না এবং কোনো নিয়ম ছাড়া হঠাৎ করে কিছু শেষও হয়ে যায় না।

আর বাতাস ও পানি আল্লাহর ইচ্ছা ও কুদরতেই পূর্ব নির্ধারিত এক নির্দিষ্ট পরিমাণে বর্ষিত হয়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর আমি পাঠিয়েছি, পানি-ভর্তি বায়ুকে, তারপর বর্ষণ করেছি আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি, অতপর তার থেকে তোমাদেরকে পান করিয়েছি .... তোমাদের নিজেদের তো এমন কোনো ভান্ডার নেই যে, সেখান থেকে এগুলো আসছে

এই যে কথাটা 'আমি পাঠিয়েছি পানি বোঝাই বায়ু[১] তেমনি করে যেমন করে ধারণ করে উটনী তার পেটের মধ্যে ভ্রূনকে', অতপর সেই পানি বহনকারী বায়ুর সাহায্যে আকাশ থেকে বৃষ্টি ধারা, বর্ণনা করেছি যার দ্বারা তোমাদেরকে পান করিয়েছি। অতপর তোমরা জীবন ধারণ করতে পেরেছো, কিন্তু তোমরা সে পানি মজুদ করে রেখেছিলো না অথবা এ কথাটার অর্থ দাঁড়ায় 'তোমরা এই পানি ভান্ডারের অধিকারী নও।' অর্থাৎ, তোমাদের নিজেদের কোনো ভান্ডার থেকে এ পানি আসেনি। এসব নেয়ামত একমাত্র আল্লাহর কাছে রক্ষিত ভান্ডার থেকে এসেছে এবং সুনির্দিষ্ট ও পূর্ব নির্ধারিত পন্থায় তা নেমে এসেছে।

আবার একবার খেয়াল করে দেখুন আসমানী ইচ্ছা ও মহাশূন্যতার নিয়ম পদ্ধতিতেই বায়ু প্রবাহ সৃষ্টি হয় এটা কিছুতেই আর কারো ইচ্ছায় চলে না বা নিয়ম-বহির্ভূত এলোমেলোভাবেও প্রবাহিত হয় না। এভাবে আকাশ থেকে যে বৃষ্টি ধারা নেমে আসে তাও নির্দিষ্ট এক পরিমাপ মতো। এখন চিন্তা করে দেখুন, কে সেই সত্ত্বা যিনি এ সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন? অবশ্য অবশ্যই এসব কিছুকে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা নিয়ন্ত্রণ করছেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন সব কিছুকে এবং যিনি জানেন কার কোন জিনিস কতটুকু প্রয়োজন। তাই এরশাদ হচ্ছে, 'আর যা কিছু আছে এই মহাবিশ্বের মধ্যে, সব কিছুর মূল ভান্ডার রয়েছে একমাত্র আমার কাছেই রয়েছে, আর আমি সুনির্দিষ্ট এক পরিমাপ মতোই সব কিছুকে নাযিল করে থাকি।

একথাগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে সকল কিছুই আল্লাহর কাছ থেকে

(১) 'লাওয়াকেহা' শব্দটির বৈজ্ঞানিক অর্থ বলতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন এটা হচ্ছে, সেই বাতাস যা বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে বৃক্ষ রেনুকে বহন করে নিয়ে যায়, কিন্তু আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বাতাসের মধ্যে বিদ্যমান পানির কথা বলা হয়েছে, অন্য কোনো কিছুর কথা নয়। আবার দেখুন, 'অতপর, আমি, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি এবং তার দ্বারা আমি তোমাদের পান করিয়েছি।' এখানে অংকুর উদগমের অর্থ কোনো ভাবেই আসে না এবং গাছপালার কোনো উল্লেখও এখানে নেই। বস্তুত পক্ষে, আল কোরআনে নিকট ও দূরের সকল ব্যাখ্যাই প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীকে সামনে নিয়েই দান করা হয়েছে।–সম্পাদক

আসে এবং অবশেষে আল্লাহর দিকেই সব কিছু ফিরে যায়, এমন কি যে পানি সে পান করে তাও আসে মহান আল্লাহর কাছ থেকেই শুধু তাই নয়, জীবন ধারণের জন্যে অন্য যতো পানির প্রয়োজন সবই আল্লাহ তায়ালাই সরবরাহ করে থাকেন। বরং এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একথাও আসে যে, প্রাকৃতিক যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ বাস করে তার সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন তা সবই তিনি সরবরাহ করে থাকেন। আর মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন থেকে নিয়ে তার অংগ প্রত্যংগ সঞ্চালন সব কিছু তার মালিকের ইচ্ছা ও ইশারায় সংঘটিত হয়, এমন কি পান করার জন্যে তার মুখের সঞ্চালন ও অন্যান্য অংগ প্রত্যংগের গতিও একমাত্র তাঁরই ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এ পাঠের প্রথম ভাগে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা আরোপকারীদের প্রতি আল্লাহর ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে জানানো হয়েছে। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে জানানো হয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের রীতিনীতি সম্পর্কেও। আরো জানানো হয়েছে যে, বাতাস এবং পানি পান করানো সংক্রান্ত সকল ব্যাপারের জন্যে আল্লাহর বিশেষ এক রীতি রয়েছে যার কোনো ব্যতিক্রম হয়না। এগুলো সবই সেই অমোঘ পদ্ধতি অনুযায়ী এগিয়ে চলেছে যার অধীনে আকাশমন্ডলী, পৃথিবী, মানবজাতি ও গোটা বস্তুজগত একইভাবে চলছে।

পরবর্তী তিনটি আয়াতে জীবন ও মৃত্যু, জীব ও জড় এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সহ যাবতীয় জিনিসের ওপর আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্বের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমিই জীবন দেই, আমিই মৃত্যু দেই এবং (সবশেষে) আমিই হবো সবকিছুর নিরংকুশ মালিক। আর আমি অবশ্যই পুর্ববর্তীদেরকে এবং পরবর্তীদেরকে? তোমার প্রভুই তাদেরকে একত্রিত করবেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাবিজ্ঞানী মহাজ্ঞানী।' (আয়াত ২২, ২৩, ২৪)

এখানে সূরার প্রথম পর্বের সাথে দ্বিতীয় পর্বের বক্তব্যের মিল লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্বে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আমি যখনই কোনো জনপদকে ধ্বংস করতাম, তখন তার জন্যে একটা ভাগ্যলিপি নির্ধারিত থাকতো। কোন জাতি তার নির্দিষ্ট সময়ের আগেও ধ্বংস হয় না, পরেও ধ্বংস হয় না।' আর এখানে ঘোষণা করছেন যে, জীবন ও মৃত্যু আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ এবং জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তায়ালাই উত্তরাধিকারী হন। তিনিই জানেন যে, কার মৃত্যু প্রথমে ও কার মৃত্যু পরে নির্ধারিত রয়েছে এবং সেই অনুসারেই প্রত্যেকে মৃত্যু বরণ করে থাকে। আর তিনিই সকলকে কেয়ামতের ময়দানে সমবেত করবেন এবং তাঁর কাছেই সকলকে ফিরতে হবে। 'তিনি মহাবিজ্ঞানী ও মহাজ্ঞানী'। নিজের বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দ্বারা তিনি প্রত্যেক জাতির আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করে থাকেন। নিজের নির্ভুল জ্ঞান দ্বারা তিনি জানেন, কখন কোন্ জাতি মরবে, কেয়ামতের ময়দানে কখন একত্রিত হবে, এর মধ্যবর্তী সময়ে কী কী ঘটবে।

সূরার এই অধ্যায়টি এবং এর পূর্ববর্তী অধ্যায়টিতে দৃশ্যের স্থানান্তর, কেতাব নাযিল করণ, ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ, শয়তানদেরকে আঘাত করার হাতিয়ার প্রেরণ এবং আকাশ থেকে পানি প্রেরণে একটা সমন্বয় দেখতে পাই। সমন্বয় দেখতে পাই অসংখ্য ঘটনা তত্ত্বের সমাহার এই বিশাল প্রাকৃতিক জগতেও। প্রাকৃতিক জগতের অন্তর্ভুক্ত আকাশ, গ্রহ নক্ষত্র, বজ্র, পৃথিবী, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি, বাতাস ও বৃষ্টি-এ সব জিনিসেও দেখতে পাই চমৎকার সমন্বয় ও সাযুজ্য।.... অতপর আল্লাহ তায়ালা যখন নিজের শ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ দিলেন, তখন পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে উত্থানকে তার আলোচ্য বিষয়ে পরিণত করলেন। এ উত্থান ঘটে আকাশের একটা খোলা দরজা দিয়ে। বস্তুত এ হচ্ছে এই বিস্ময়কর গ্রন্থের দৃশ্য অংকনের এক চমকপ্রদ পদ্ধতি।

মানবজাতির সৃষ্টি ও উত্থান পতনের ইতিবৃত্ত

এরপর এসেছে মানবজাতির আদি সৃষ্টির ঘটনা, তার বিপথগামিতা, হেদায়াত লাভ ও উভয়ের আসল কারণ সম্পর্কে আলোচনা। আদম (আ.)-এর সৃষ্টি, সৃষ্টির উৎস এবং সৃষ্টির সমকালীন ও পরবর্তী ঘটনাবলী নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে, এবার আমরা সেই প্রসংগের অবতারণা করবো।

ইতিপূর্বে আমরা এই কাহিনীর সম্মুখীন হয়েছি দু'বার, একবার সূরা বাকারায়, আর একবার সূরা আ'রাফে। কিন্তু ওই দুবারের প্রতিবার এক একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে এ কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। অবতারণা করা হয়েছে বিশেষ পটভূমিতে ও বিশেষ উদ্দেশ্যে। এজন্যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে এ কাহিনীর অধ্যায় বর্ণনাভংগী, শিক্ষা ও এর মর্মবাণী আলাদা আলাদা ছিলো। তবে ভূমিকায় বলা কিছু কিছু কথা ও উপসংহারে বলা কিছু কিছু মন্তব্যে ঠিক ততোটুকু সাদৃশ্য ছিলো, যতোটুকু উদ্দেশ্যের সাদৃশ্যের আনুপাতিকহারে থাকা প্রয়োজন।

এই ঘটনার পটভূমিকা তিনটি সূরাতেই যেভাবে আলোচিত হয়েছে তাতে অনেকটা পারস্পারিক সাদৃশ্য রয়েছে।

সূরা বাকারায় এ ঘটনার অব্যবহিত পূর্বের আয়াতটা হলো, 'তিনিই সেই সত্ত্বা, যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। বস্তুত তিনিই তৈরী করেছেন সাত আকাশ, আর তিনি সর্ব বিষয়ে অবগত।'

সূরা আরাফে ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে বসবাস করতে দিয়েছি এবং তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি। কিন্তু তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো।'

আর এখানে ঘটনার আগে বলা হয়েছে,

'পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতসমূহ স্থাপন করেছি, তাতে প্রত্যেকটি জিনিস ভারসাম্যপূর্ণভাবে উদগত করেছি এবং তাতে তোমাদের জন্যেও জীবিকার ব্যবস্থা করেছি, আর যাদের জীবিকার ব্যবস্থা তোমরা করতে পারো না, তাদের জন্যেও করেছি।'

তবে প্রত্যেক সূরার যে অংশটিতে ঘটনাটা বর্ণিত হয়েছে, তার উদ্দেশ্যও বিভিন্ন, বর্ণনার ভংগীও বিভিন্ন।

সূরা বাকারায় কেন্দ্রীয় বক্তব্য ছিলো এই যে, আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি করে পাঠানো হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানবজাতির উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন।

'যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি পাঠাবো।'

এ জন্যে এই ঘটনা থেকে বিশেষভাবে এই প্রতিনিধি পাঠানোর সেই গোপন রহস্যটা তুলে ধরা হয়েছে, যার জন্যে তারা আল্লাহর এই সিদ্ধান্তে অবাক হয়েছেন। কেননা তাদের কাছে এই রহস্য ছিলো অজানা। 'আল্লাহ তায়ালা আদমকে যাবতীয় নাম শিখিয়ে দিলেন, তারপর সেগুলোকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে এ জিনিসগুলোর নাম বলতো দেখি।' তারা বললো, সোবহানাল্লাহ, আমাদেরকে আপনি যা কিছু শিখিয়েছেন, তাছাড়া আমরা আর কিছুই জানি না। আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে আদম ওদেরকে এ জিনিসগুলোর নাম জানিয়ে দাও। আদম যখন তাদেরকে নামগুলো বলে দিলো, তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় গুপ্ত তথ্য জানি এবং তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো ও গোপন করো, তাও জানি?' এরপর

ফেরেশতাদের সেজদা করা ও ইবলীসের সেজদা করতে সদম্ভে অস্বীকৃতি, আদম ও তার স্ত্রীর বেহেশতে অবস্থান, শয়তান কর্তৃক তাদের উভয়ের পদস্খলন ঘটানো ও বেহেশত থেকে বহিষ্কার করানো, অতপর তার এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা অর্জন, ক্ষমা প্রার্থনা ও আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক ক্ষমা করার পর তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে পৃথিবীতে নেমে আসার বিশদ ঘটনা বর্ণনা করা হয়। আর এই ঘটনার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বনী ইসরাঈলকে আহ্বান জানানো হয়েছে তাদের ওপর কৃত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করা ও তাদের অংগীকার পালন করার জন্যে। তাদের আদি পিতাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ, তার সাথে করা অংগীকার এবং তাঁর অর্জিত মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার বিবরণ দেয়ার অব্যবহিত পরই বনী ইসরাঈলের প্রতি এ আহ্বান উচ্চারিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে সূরা 'আরাফে' মূখ্য আলোচ্য বিষয় ছিলো বেহেশতের দিকে আদমের দীর্ঘ অভিযাত্রা ও সেখান থেকে বেরিয়ে আসা এবং এই অভিযাত্রার শুরু থেকে শেষ অবধি মানুষের সাথে ইবলিসের শত্রুতা, যতোক্ষণ না মানুষ তার প্রথম আত্মপ্রকাশের স্থানে ফিরে না যায়। তাদের একাংশ যাবে জান্নাতে। কেননা তারা শয়তানের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। অপরাংশ যাবে জাহান্নামে, কেননা তারা তাদের আজন্ম শত্রু শয়তানের অনুসরণ করেছে। এ জন্যেই আয়াতে ফেরেশতাদের সেজদা করা ও ইবলিস কর্তৃক তা সদম্ভে অস্বীকার করার বিষয়টা তুলে ধরেছে। তুলে ধরেছে আল্লাহর কাছে তার এই আবেদনও যে, তাকে কেয়ামত পর্যন্ত সময় দেয়া হোক, যাতে সে আদমের বংশধরকে বিপথগামী করার সুযোগ পায়। কেননা ওই আদমের কারণেই সে বিতাড়িত ও ধিকৃত হয়েছে। তারপর বর্ণনা করা হয়েছে আদম ও তাঁর স্ত্রীর জান্নাতে বসবাস করা এবং সেখানকার একটা গাছ ছাড়া আর সকল গাছের ফলমূল খাওয়ার স্বাধীনতা দানের বিষয়টা। এই নিষিদ্ধ গাছটা হলো সেই সব নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতীক, যা দ্বারা ইচ্ছার স্বাধীনতা ও আনুগত্যের পরীক্ষা হয়ে থাকে। এরপর বিশদ ও বিস্তৃত বিবরণ দেয়া হয়েছে শয়তান কর্তৃক তাদের উভয়কে কুপ্ররোচনা দান, প্ররোচণার প্রভাবে উভয়ের ওই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ, উভয়ের গুপ্তাংগ উভয়ের সামনে প্রকাশিত হওয়া, আল্লাহর পক্ষ হতে আদম ও তার স্ত্রীকে ভর্ৎসনা এবং তাদের সকলকে বৃহত্তর সংগ্রামের ময়দান পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়ার ঘটনাবলীর। 'আল্লাহ তায়ালা বললেন, তোমরা সবাই পরস্পরের শত্রু হয়ে পৃথিবীতে নেমে যাও। .... ' (আয়াত ২৪ ও ২৫) তারপর মানুষের পৃথিবীতে আগমন, অবস্থান ও আখেরাতের জীবনে প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং তাদের কেয়ামতের ময়দানে একত্রিত হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। তারপর এক দলের বেহেশতে ও অপর দলের দোযখে ঠাঁই পাওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। দোযখবাসীরা বেহেশতবাসীদের কাছে মিনতি জানাবে যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে যে পানি ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়েছেন, তা থেকে আমাদেরকে কিছু দাও। তখন বেহেশতবাসী বলবে, এ সব জিনিস আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছেন। অতপর এ দৃশ্যের যবনিকা পতন হয়েছে।

আর এ সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো আদম সৃষ্টির রহস্য, হেদায়াত ও গোমরাহীর রহস্য এবং মানব সত্ত্বার অভ্যন্তরে হেদায়াত ও গোমরাহীর আসল কার্যকারণ বা মৌলিক উপাদানের উপস্থিতি। এ জন্যে এ কাহিনীর শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা আদমকে পঁচা কাঁদা থেকে তৈরী শুকনো মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তার ভেতরে তাঁর উজ্জ্বল মহিমান্বিত আত্মা ফুঁকে দিয়েছেন, আর এর আগে শয়তানকে সৃষ্টি করেছেন অত্যুষ্ণ আগুন থেকে। এরপর বলা হয়েছে যে, আদমকে ফেরেশতারা সেজদা করলো। কিন্তু ইবলীস সেজদা করলো না। কেননা সে মাটির তৈরী মানুষকে সেজদা করাকে মনে করলো অপমানজনক। ফলে সে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত

হলো। তারপর সে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ চাইলো এবং সেটা তাকে দেয়া হলো। আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের ওপর ইবলীসের কোনো কর্তৃত্ব থাকে না। তার কর্তৃত্ব থাকে শুধু যারা তার অনুগত এবং আল্লাহর অনুগত নয় তাদের ওপর। তারপর উভয় পক্ষের পরিণাম বর্ণনার মধ্য দিয়ে এ কাহিনী শেষ হয়েছে এবং এ বিষয়ে কোনো বিশদ আলোচনা হয়নি। তবে তা কোরআনের মূল বক্তব্যের আওতাধীন রয়েছে। আর সেই সাথে দুই শ্রেণীর মানুষ এবং শয়তানের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বর্ণনাও দেয়া হয়েছে।

এবার আসুন কাহিনীর বিভিন্ন দৃশ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক,

'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুকনো ঠনঠনে ছাঁচে ঢালা মাটি থেকে। আর জ্বিনকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি অত্যুষ্ণ আগুন থেকে।' (আয়াত ২৬-২৭)

এই ভূমিকায় দুটো ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। একটা স্বভাবের উৎপত্তি হয়েছে 'সালসাল' থেকে। সালসাল বলা হয় এমন শুকনো মাটিকে যাকে অন্য কোনো শক্ত পদার্থের সাথে আঘাত করলে ঠন্ ঠন্ করে এবং যাকে নরম ভিজে মাটি থেকেই নেয়া হয়। অপরটির উৎপত্তি অত্যুষ্ণ আগুন থেকে। পরবর্তীতে আমরা জানতে পারবো যে, মানুষের স্বভাবের একটা নতুন উপাদান হলো আল্লাহর রূহ থেকে নির্গত ফুৎকার। পক্ষান্তরে শয়তানের স্বভাব অত্যুষ্ণ আগুন থেকে জন্ম নেয়া স্বভাবই রয়ে গেছে।

'আর সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করবো ..... '(আয়াত ২৮-৩৫)

আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে এ কথা কখন, কোথায় ও কিভাবে বলেছিলেন? এ প্রশ্নের জবাব আমি সূরা বাকারার তাফসীরে দিয়ে এসেছি। এর আসল জবাব দেয়ার কোনো উপায় নেই। কেননা আমাদের কাছে ওহীভিত্তিক এমন কোনো উক্তি নেই, যা থেকে এর জবাব পাওয়া যায়। অথচ সেই অদৃশ্য ব্যাপার সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য জানা ওহী ছাড়া সম্ভব নয়। ওহী ছাড়া যাই বলা হবে, তা অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার শামিল।

শুকনো ঠনঠনে ছাঁচে ঢালা মাটি থেকে মানুষের সৃষ্টি এবং তার ভেতরে আল্লাহর রূহ ফুঁকে দেয়ার কাজটা কিভাবে সম্পন্ন হয়েছিলো? এ কাজটার পদ্ধতিও আমাদের অজানা। এ পদ্ধতি নির্ণয় করার কোনোই উপায় নেই।

এ বিষয়ে কোরআনের অন্যান্য উক্তি, বিশেষত 'আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে' (সূরা মোমেনুন, আয়াত ১২) অতপর তিনি মানুষের বংশ বিস্তার করেছেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে' (সূরা সাজদাহ, আয়াত ৮) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়ে থাকে যে, মানুষ ও জীবনের উৎস হলো এই পৃথিবীর মাটি এবং মাটির প্রধান প্রধান উপাদান, যা মানুষের শারীরিক গঠন ও যাবতীয় প্রাণীর গঠনে ভূমিকা পালন করে। আরো বলা হয়ে থাকে, 'নির্যাস' শব্দটা থেকে ধারণা জন্মে যে, মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া কয়েকটা পর্যায়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এটুকুই ওহীর উক্তির তাৎপর্য। এর ওপর আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে যেটুকুই বাড়িয়ে বলা হবে, তা দিয়ে কোরআনের কোনোই প্রয়োজন নেই। বৈজ্ঞানিক গবেষণা তার সহজলভ্য উপায় উপকরণের সাহায্য নিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারে। এতে করে সে অনেক কাল্পনিক তত্ত্ব ও মতবাদের নাগাল পেয়ে যেতে পারে। এ গুলোর মধ্য থেকে সে সেই সব তত্ত্ব ও মতবাদকে বাস্তবায়িত করে, যে গুলোকে সে সহজে ও নিরাপদে বাস্তবায়িত করতে পারে। আর যেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণায় ধোপে টেকেনা তাকে সে এমনভাবে পরিবর্তন করে, যাতে তা কোরআনে বর্ণিত কোনো মৌলিক সত্যের পরিপন্থী

না হয়। এই মৌলিক সত্য এই যে, মানুষের মূল উপাদান মাটি থেকে প্রস্তুত হয়েছে এবং এই উপাদানটি প্রস্তুত করতে তাতে সুনিশ্চিতভাবে পানি ঢোকাতে হয়েছে। সুতরাং কোরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে যে বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে সত্য তা চিরস্থায়ী। আজও পর্যন্ত তার সাথে কোনো মতবাদের সংঘাত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, এই মাটি তার সুবিদিত প্রকৃতিগত জড়ত্ব থেকে প্রথমে জীবত্বে ও পরে মানবীয় জীবত্বে উন্নীত হলো কিভাবে? এখানে সেই দুর্ভেদ্য রহস্য নিহিত, যার ব্যাখ্যা দিতে গোটা মানবজাতি অপারগ। সজীব প্রাণীর প্রথম দেহকোষটিতে কিভাবে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিলো, ক্রম-বিকাশ ও ক্রম-বিবর্তন সংক্রান্ত মতবাদের আলোকে তা আজও রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। কেউ দাবী করতে পারে না যে, সে এ রহস্যে জট খুলতে পেরেছে। আর সমগ্র প্রাণী জগতের ওপর সুনিশ্চিত শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী মানব দেহের কোষে কিভাবে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিলো, সেটাতো এমন রহস্য, যার জট খুলতে সমস্ত মানবীয় মতবাদ নিস্ফল প্রমাণিত হয়েছে। কেননা এখানে একটা নিস্প্রাণ পদার্থ শুধু সজীব প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়নি, বরং অনেক উচ্চতর পর্যায়ের শক্তি, মেধা, মনন, চেতনা ও গুণাবলী সম্বলিত প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই উন্নততম ও শ্রেষ্ঠতম প্রাণী কিভাবে সৃষ্টি হলো, তার সহজ ও সরল ব্যাখ্যা দিয়েছে পবিত্র আল কোরআন, 'যখন আমি তাকে সৃষ্টি করবো এবং তার ভেতরে রূহ ফুঁকে দেবো,...' অর্থাৎ আল্লাহর 'রূহ বা আত্মাই এই নগণ্য সৃষ্টিকে এতো মহৎ ও সেরা সৃষ্টিতে পরিণত করেছে।

আল্লাহ তায়ালা কিভাবে ফুঁকে দিলেন, সে প্রশ্ন তোলা একেবারেই অবান্তর। কেননা, মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা কিভাবে তাঁর সৃজন কার্য সম্পাদন করেন, সেটা বুঝবার সাধ্য মানুষের নেই। এ পর্যন্ত এসেই আমরা সে গন্তব্যে উপনীত হই, যেখানে এসে আমরা নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত মনে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারি।

মানুষের আগে শয়তানকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো। কাজেই বলা যায় যে, সৃষ্টির দিক থেকে সে মানুষের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। আমরা শুধু এতোটুকুই জানি। তবে শয়তান কেমন এবং তার সৃষ্টি কিভাবে সম্পন্ন হয়েছিলো সেটা ভিন্ন ব্যাপার। তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। আমরা বুঝি যে, তার কোনো কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আগুনের বৈশিষ্ট্যেরই অংশ। সে আগুনের সৃষ্টি বিধায় মাটির তৈরী জিনিসে প্রভাব বিস্তার করা তার স্বভাব। আর সে অতুষ্ণ বিষাক্ত আগুনের সৃষ্টি বিধায় সে মাটির তৈরী প্রাণীকে যন্ত্রণা দিতে ও তার কাছে ঘন ঘন এসে প্ররোচণা দিতে সক্ষম। তারপর কাহিনীর আগাগোড়া পর্যালোচনা থেকে আমাদের কাছে এও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অহংকার ও আত্মম্ভরিতাও শয়তানের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আর এটা আগুনের স্বভাবেরই কাছাকাছি।

ঠনঠনে শক্ত মাটিতে রূপান্তরিত নরম ও নমনীয় মাটি থেকেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো। তারপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো আল্লাহর ফুঁক থেকে তথা ফুঁকে দেয়া রূহ থেকে-যা তার ও যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করে এবং তাকে মানবীয় গুণাবলী দান করে। এই গুণাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম গুণটি হলো মনুষ্যত্বের উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত হবার যোগ্যতা।

এই আত্মা তাকে আল্লাহর নিকটতম ফেরেশতাদের ঘনিষ্ঠ করে দেয়, তাকে আল্লাহর সাথে মিলিত হবার যোগ্য বানায়, তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা লাভের উপযুক্ত করে এবং নিছক বস্তুনির্ভর ও দৈহিক-জৈবিক বিষয়সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সে যাতে মন ও আত্মার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো নিয়েও তৎপর হতে পারে, তার ক্ষমতা দান করে। এই আত্মাই তাকে সে গুপ্ত রহস্যের অধিকারী করে যা তাকে সময় ও কালের উর্ধ্বে অবস্থান করার সামর্থ যোগায় এবং তাকে দৈহিক

শক্তির সীমার বাইরে এমন ধ্যান-ধারণা ও চেতনা দান করে, যা তাকে কখনো কখনো পার্থিব ও জাগতিক সীমানার বাইরে নিয়ে যায়।

মাটির স্বাভাবিক ভারত্ব এবং মাটির সাথে সম্পৃক্ত খাদ্য, পানীয়, ঐন্দ্রিক ঝোঁক, ঐন্দ্রিক আবেগ উচ্ছ্বাস জনিত চাহিদাসমূহ, দুর্বলতা ও অক্ষমতা এবং দুর্বলতা ও অক্ষমতাজনিত ধ্যান-ধারণা ঝোঁক-আবেগ ও তৎপরতা তার ভেতরে বিদ্যমান থাকা সত্তেও একমাত্র আত্মার প্রভাবে সে এ সবের আকর্ষণ ও সীমাবদ্ধতার উর্ধে ওঠার ক্ষমতা লাভ করে।

মাটির উপাদান জনিত গুণবৈশিষ্ট্য এবং আধ্যাত্মিক উপাদানজনিত গুণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনই হচ্ছে মানুষের জন্যে নির্ধারিত ও কাংখিত শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ স্তর। মানুষ দুই ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্যের কোনো একটি থেকেও পুরোপুরি বঞ্চিত হয়ে সে পুরোদস্তুর ফেরেশতা কিংবা পুরোদস্তুর পশুতে রূপান্তরিত হোক-এটা কখনো কাম্য নয়। এ দুটোর কোনো একটাকে পুরোপুরিভাবে অর্জন করা মনুষত্বের উচ্চ মার্গে উন্নীত হওয়ার সমার্থক নয়। একারণেই পূর্ণ ভারসাম্যকে ব্যাহত করে এমন মহত্ব মানুষের জন্যে ও তার মৌলিক গুণ বৈশিষ্ট্যের জন্যে ত্রুটি বিশেষ। আর যে মহৎ উদ্দেশ্যে মানুষকে এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে মহৎ উদ্দেশ্যও ব্যাহত হয় তার ওই ভারসাম্যহীনতায়।

যে ব্যক্তি তার দৈহিক জৈবিক শক্তিগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে, সে আধ্যাত্মিক শক্তিগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে যে ব্যক্তি তারই সমকক্ষ। উভয়েই নিজ নিজ জন্মগত স্বভাব প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মহান স্রষ্টা রব্বুল আলামীন আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে যা কামনা করেননি, তারা উভয়ে সেটাই কামনা করে। উভয়ে নিজের আসল সত্তার একাংশকে ধ্বংস করার কারণে আত্মঘাতী হবার অপরাধে অপরাধী এবং এই আত্মঘাতী ভূমিকা সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে বাধ্য।

এ কারণেই যে ব্যক্তি বৈরাগ্য অবলম্বন করতে চেয়ে আর কখনো স্ত্রীলোকের ধারে কাছেও যাবে না বলে সংকল্প প্রকাশ করেছিলো, যে ব্যক্তি একদিনও পানাহার না করে এক নাগাড়ে রোযা রাখতে চেয়েছিলো এবং যে ব্যক্তি একটুও না ঘুমিয়ে সারারাত জেগে নামায পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলো, তাদেরকে রসূল (স.) ধিক্কার দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে এই ধিক্কারের বিবরণসহ রসূল (স.)-এর এই উক্তিও উদ্ধৃত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আমার নীতি পছন্দ করে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

মানুষকে এরূপ স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে এই স্বভাবের ভিত্তিতেই ইসলাম মানুষের জন্যে তার শরীয়তের বিধান প্রবর্তন করেছে। এর ভিত্তিতেই সে মানুষের জন্যে এমন বিধান দিয়েছে, যাতে মানুষের বিভিন্ন যোগ্যতা ক্ষমতার মধ্যেকার কোনো একটি যোগ্যতা ক্ষমতাও ধ্বংস বা নিষ্ক্রিয় হয় না। এ বিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষের সব কটা যোগ্যতা-ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা, যাতে প্রতিটা যোগ্যতা-ক্ষমতা কোনো প্রকার সীমালংঘন কিংবা দুর্বলতা ছাড়াই নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে এবং একটা অপরটার ওপর আগ্রাসন না চালায়। এ ধরনের প্রতিটা আগ্রাসন ও সীমা অতিক্রমের ঘটনা অনিবার্যভাবে নিষ্ক্রিয়তা ও ধ্বংস ডেকে আনে। মানুষকে তার সহজাত স্বভাব ও স্বভাবসুলভ গুণ বৈশিষ্ট্যকে সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং তাঁর জন্যে তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে হবে। ইসলাম মানুষের জন্যে যে আইন বিধান দিয়েছে, তা তার এই গুণ বৈশিষ্ট্যগুলোকে সংরক্ষণ করে, যা আল্লাহ তায়ালা তাকে খামখেয়ালীভাবে নয়, বরং সুপরিকল্পিতভাবে দিয়েছেন। কোরআন মানব সৃষ্টির যে তত্ত্ব ও তথ্য

বর্ণনা করেছে, তার আলোকে যে কথাগুলো স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে, এখানে সেগুলোই উল্লেখ করা হলো।

এরপর আমরা পুনরায় কাহিনীর বিবরণে আসছি। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি শুকনো ঠনঠনে ছাঁচে ঢালা মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করবো। তাকে যখন পুরোপুরিভাবে তৈরী করবো এবং তার ভেতরে আত্মা ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা তাকে সেজদা করো।'

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা যা বলেছিলেন, সেটাই বাস্তবে পরিণত হয়েছিলো। কেননা আল্লাহর কথাই সিদ্ধান্ত, আর সিদ্ধান্ত মানেই তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি। এখানে এরূপ প্রশ্ন করা আমাদের অনধিকার চর্চার শামিল যে, আল্লাহ তায়ালা যেমন অনাদি অনন্ত সত্ত্বা, তেমনি তার প্রতিটা কাজ বা কথাও অনাদি অনন্ত ও চিরস্থায়ী। এরূপ চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব সত্ত্বার কথা ও কাজের সাথে ঠনঠনে শুকনো মাটির ন্যায় একটা নশ্বর পদার্থের সংযোগ কিভাবে ঘটলো? এ ধরনের বিতর্ক তোলা বিবেকের সাথে বিদ্রুপ করার শামিল এবং বিবেককে তার সেই স্বাভাবিক সীমানার বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়ার শামিল। কেননা মানুষের চিন্তা, উপলব্ধি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এ বিষয়ে বিতর্ক তোলার একমাত্র কারণ হলো মানবীয় বিবেকের স্বভাব প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও সীমা সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা এবং তাকে তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রের বাইরে বিচরণে বাধ্য করার অপপ্রয়াস, যাতে আল্লাহর কর্মকান্ডকে মানুষের বোধশক্তির সমপর্যায়ে নামিয়ে আনা যায়। বস্তুত এই প্রয়াস বোধ শক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে চরম নির্বুদ্ধিতা এবং একটা মৌলিক নীতিগত ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। সে প্রশ্ন তোলে যে, নশ্বর ও অবিনশ্বরের মাঝে কিভাবে সংযোগ ঘটে? তার পরে নিজেই এই সংযোগ সম্ভব বা অসম্ভব বলে জবাব দেয় এবং তারপর নিজেই তার কারণ ব্যাখ্যা করে। অথচ মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে আদৌ এই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা ও সিদ্ধান্ত নেয়ার অনুরোধ কিংবা আহ্বান জানানো হয়নি। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন, এ কাজটা সম্পন্ন হয়ে গেছে। কিভাবে হয়েছে তা তিনি বলেন না। সুতরাং ব্যাপারটা প্রতিষ্ঠিত। মানুষের বিবেক একে অস্বীকার করার অধিকার রাখে না। সে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার অধিকারও রাখে না। শুধু আল্লাহর উক্তিকে মেনে নেয়ার ক্ষমতা ও অধিকারটুকুই তার রয়েছে। কেননা সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপায়-উপকরণগুলো তার আয়ত্ত্বাধীন নয়। সে একটা নশ্বর প্রাণী। সে অবিনশ্বর সত্ত্বা সম্পর্কে বা নশ্বরদের সাথে অবিনশ্বরের সংযোগ সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম নয়। অবিনশ্বর খোদা সম্পর্কে কোনো রকমের সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতাই যে নশ্বরের নেই, এই স্বতসিদ্ধ সত্য বা যৌক্তিক সত্য যদি বিবেক শুরুতেই মেনে নেয়, তবে সে নির্বোধের মতো নিজের শক্তিকে তার নিরাপদ কর্মক্ষেত্রের বাইরে প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে পারে।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে আমি এ বিষয়টি নিয়ে বেশ দীর্ঘ আলোচনা করে ফেললাম। এর উদ্দেশ্য ছিলো অদৃশ্য বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও আলোচনা করার জন্যে এমন একটা মূলনীতি বেঁধে দেয়া, যা দ্বারা হৃদয়ের ঈমানী পরিতৃপ্তির ঊর্ধ্বে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিতৃপ্তিও লাভ করা যায়।

ইবলীসের সেজদা ও একটি ভুল ধারণা

এবার আসুন দেখা যাক, কাহিনীর পরবর্তী অংশটা কী ছিলো,

'ফেরেশতারা সকলেই সেজদা করলো। .... '

বস্তুত এটাই ফেরেশতাদের জন্মগত স্বভাব। তারা কোনো বাদ-প্রতিবাদ বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই নিঃশর্ত ও সর্বাত্মক আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে।

'তবে ইবলীস বাদে, সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করলো।'

বস্তুত ইবলীস ফেরেশতাদের থেকে ভিন্ন আর এক সৃষ্টি। ইবলীস আগুনের এবং ফেরেশতারা নূরের সৃষ্টি। ফেরেশতারা আল্লাহর কোনো হুকুম অমান্য করে না, বরং প্রতিটি হুকুম মান্য করে, আর ইবলীস প্রত্যাখ্যান করলো ও বিরুদ্ধাচরণ করলো। সুতরাং সে যে ফেরেশতাদের জাতিভুক্ত নয়, তা সুনিশ্চিত। এমতাবস্থায় প্রশ্ন ওঠে যে, 'সকল ফেরেশতা সেজদা করলো ইবলীস বাদে' এ ধরনের বাক্য ব্যকরণের 'এসতেসনা' (কোনোটাকে বাদ দিয়ে কথা বলা) সংক্রান্ত বিধির সাথে কিভাবে সামঞ্জস্যশীল হয়? এর জবাব এই যে, একই জায়গায় অবস্থান বা একই কাজে সম অংশীদার হওয়ার কারণে বাক্যে ভিন্ন জাতিকেও এক জাতিভুক্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়, 'অমুকের ছেলেরা সবাই উপস্থিত হয়েছে কিন্তু আহমদ আসেনি।' এখানে আহমাদ অন্য ব্যক্তির ছেলে। কিন্তু সে একই স্থানে অবস্থান করতো বা একই আদেশের আওতাধীন ছিলো। পুনরায় প্রশ্ন ওঠে যে, আল্লাহ তায়ালা যখন স্পষ্ট করে বলেছেন যে, 'যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদেরকে বললেন.... ' তখন ইবলীস কিভাবে এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত গন্য হলো? জবাব এই যে, পরবর্তী বক্তব্য 'সে অস্বীকার করলো .... ' দ্বারাই বুঝা যায় যে, সেও এই আদেশের আওতাভুক্ত ছিলো। তা ছাড়া সূরা 'আরাফে' দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা ইবলীসকে বললেন, আমি তোমাকে নির্দেশ দেয়ার পরও সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিলো?' কোরআনের বাচননীতিই এ রকম যে, অনেক ক্ষেত্রে পরবর্তী বাক্যের বক্তব্যই পূর্ববর্তী বাক্যের অস্পষ্টতা দূর করার জন্যে যথেষ্ট হয়ে থাকে। 'তোমাকে আমি নির্দেশ দেয়ার পরও সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিলো' আল্লাহর এই উক্তিই সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, সেজদার আদেশ ইবলীসকেও দেয়া হয়েছিলো।

এই আদেশ অবিকল ফেরেশতাদেরকে দেয়া আদেশই হতে হবে-এমন কোনো কথা নেই। এমনও হতে পারে যে, কোনো এক উপলক্ষে ইবলীস ফেরেশতাদের সাথে থাকার কারণে এ আদেশ তাদের সাথে সাথে তাকেও দেয়া হয়েছিলো। আবার আলাদাভাবে তাকেও এ আদেশ দেয়া হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাকে হেয় করার জন্যে এবং ফেরেশতাদের মর্যাদা বাড়ানোর লক্ষ্যে সেটা উল্লেখ করা হয়নি। তবে আয়াতের সুস্পষ্ট ভাষ্য ও ইবলীসের আচরণ থেকে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, সে ফেরেশতাদের জাতিভুক্ত ছিলো না। এটাই হচ্ছে আমার অভিমত।

যাই হোক, আমরা এখানে কয়েকটা স্বীকৃত অদৃশ্য তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছি। এগুলোর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে ওহীর ভাষায় যতোটুকু বলা হয়েছে, তার চেয়ে বেশী কোনো ধারণা আমাদের নেই। কেননা আমি আগেই বলেছি যে, কোনো অবস্থাতেই এ সম্পর্কে বিশদ তথ্য জানার কোনো সুযোগ আমাদের নেই।

এসব অদৃশ্য বিষয় কোনো পদার্থ হোক আল্লাহর কোনো সৃষ্টির গুণ বৈশিষ্ট্য হোক অথবা নিদর্শন হোক, সীমাবদ্ধ মানবীয় বিবেক-বুদ্ধির কাছে সবই সমান।

'আল্লাহ তায়ালা বললেন, ওহে ইবলীস, তোমার কী হয়েছে যে, তুমি সেজদা করলে না? সে বললো, যে মানুষকে আপনি শুকনো ঠনঠনে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাকে সেজদা করতে আমি প্রস্তুত নই।'

ইবলীসের মধ্যে বিদ্যমান অহংকার আত্মম্ভরিতা ও অবাধ্যতার স্বভাব যে তার সৃষ্টির উপাদান অতুষ্ণ আগুন থেকেই উৎসারিত, সে কথাই এই উক্তির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। ইবলীস মানুষের

সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান শুকনো মাটির কথাই শুধু উল্লেখ করেছিলো, কিন্তু অপর উপাদান আল্লাহর ফুঁকে দেয়া 'রূহের' কথা উল্লেখ করেনি, যা মাটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে চরম দম্ভভরে বললো যে, মাটির তৈরী মানুষকে সেজদা করা তার শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্যের পক্ষে বেমানান।

এর ফল যা হবার তাই হলো। আল্লাহ তায়ালা বললেন, 'বেশ, তাহলে তুমি বেহেশ্ত থেকে বেরিয়ে যাও। কারণ তুমি বিতাড়িত ও ধিকৃত। কেয়ামত পর্যন্ত তোমার ওপর অভিসম্পাত!' এটা ছিলো তার অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যের শাস্তি।

এবারে তার প্রতিহিংসাপরায়নতা ও ঔদ্ধতার স্বভাব নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। 'সে বললো, হে আমার প্রভু, তাহলে আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত সময় দিন। আল্লাহ তায়ালা বললেন, ঠিক আছে, তোমাকে সেই সর্বজনবিদিত দিন পর্যন্ত সময় দেয়া গেলো।'

শয়তান যেভাবে ধোকা দেয়

ইবলীস যে কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ চাইলো, সেটা এ জন্যে নয় যে, সে আল্লাহর সামনে যে অপরাধ করেছে, তার জন্যে অনুশোচনা করবে কিংবা তার করা মহাপাপের জন্যে আল্লাহর কাছে তাওবা করবে, বরং আল্লাহ তায়ালা তাকে অভিশপ্ত করায় এবং তাকে হেদায়াতের পথ থেকে বিতাড়িত করায় আদম ও তার বংশধরের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে। সে তার অভিশপ্ত হওয়ার দায় নিজের জঘন্য খোদাদ্রোহিতার ওপর বর্তানোর পরিবর্তে আদম (আ.)-এর ওপর আরোপ করলো।

'সে বললো, হে আমার প্রভু, তুমি যেহেতু আমাকে বিপথগামী করে দিলে, তাই আমিও তাদের জন্যে পৃথিবীতে গুনাহের কাজ সমুহকে শোভন করে তুলবো এবং তাদের সবাইকে বিপথগামী করবোই। তবে তোমার অনুগত ও একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা আলাদা।'

এ কথাটা দ্বারা ইবলীস তার লড়াইয়ের ময়দানকে চিহ্নিত করে দিলো। ময়দানটা হলো পৃথিবী। সে কোন্ হাতিয়ার দ্বারা লড়বে তাও জানিয়ে দিলো। হাতিয়ারটা হলো তাদের গুনাহের কাজকে মানুষের কাছে শোভনীয় করে তোলা। অর্থাৎ খারাপ কাজকে সুন্দর করে সাজানো এবং সেই কৃত্রিম সৌন্দর্যে মোহিত করার মাধ্যমে তাকে ওই খারাপ কাজ করতে প্ররোচিত করা। সুতরাং মানুষ তখনই পাপ করে, যখন শয়তান তাকে পাপ নয় বরং ভালো ও সৎ কাজের আকারে সাজিয়ে দেখায় এবং কাজটা আসলে যেমন, তার সম্পূর্ণ বিপরীত রূপে তাকে রূপায়িত করে। কাজেই মানুষকে শয়তানের অস্ত্র কী, তা চিনতে ও জানতে হবে। যখনই কোনো জিনিসকে তার ভালো লাগে ও তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, তখন সে সম্পর্কে তাকে সাবধান হতে হবে। কেননা সেখানে শয়তানের উপস্থিত থাকা বিচিত্র নয়। অবশ্য যারা আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখে এবং তার যথোচিতভাবে এবাদাত করে শয়তান নিজেই বলেছে যে, সেই সব একনিষ্ঠ বান্দাদের ওপর তার কোনো কর্তৃত্ব খাটবে না। আল্লাহর যে সব বান্দা নিজেদেরকে আল্লাহর খালেছ বান্দায় পরিণত করে, এবং তার এমন এবাদাত ও আনুগত্য করে যেন তাঁকে তারা সর্বক্ষণ দেখছে, তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা নিজেও খালেছ ও নিবিষ্ট হয়ে যান। এ ধরনের বান্দাদের ওপর শয়তানের জারিজুরি অচল।

অভিশপ্ত ইবলীস এই ব্যতিক্রমের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলো। কেননা সে জানতো যে, এটা অনিবার্য। কারণ এটা আল্লাহর চিরন্তন ও শাশ্বত নীতি যে, যে ব্যক্তি তাঁর জন্যে একনিষ্ঠ হয়ে যায় তিনিও তাঁর আপনজন হয়ে যান এবং তাকে রক্ষা ও তত্ত্বাবধান করেন। এ জন্যেই তিনি জবাব দিলেন,

'এটাই আমার সরল ও সঠিক পথ। আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই। তবে তোমার অনুসারী বিপথগামীদের কথা স্বতন্ত্র।'

বস্তুত এটাই শাশ্বত নীতি। এটাই আল্লাহর নিয়ম। এটাই চিরাচরিত রীতি। আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে এই নীতিটাকেই বেছে নিয়েছে যে, তাঁর একনিষ্ঠ অনুগত বান্দাদের ওপর শয়তানের কোনো প্রভাব খাটবে না, কোনো কর্তৃত্ব চলবে না এবং সে তাদেরকে প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত করতে পারবে না। কেননা তারা শয়তানের নাগালের বাইরে থাকবে, তারা তার স্পর্শ থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে এবং তাদের অন্তরের ভেতরে প্রবেশ করার সকল পথ শয়তানের জন্যে রুদ্ধ থাকবে। কারণ সেসব বান্দাদের দৃষ্টি থাকবে সব সময় আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ, তাদের জন্মগত স্বভাবই তাদেরকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত রাখবে এবং তা দ্বারাই তারা আল্লাহর নীতি উপলব্ধি করবে। শয়তানের কর্তৃত্ব চলবে শুধু তার পদাংক অনুসারী পথভ্রষ্টদের ওপর। তারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের আওতা বহির্ভূত। বাঘ যেমন দলছুট ছাগলকে শিকার করে, শয়তানও তেমনি দলছুট মানুষকে পাকড়াও করে। পক্ষান্তরে একনিষ্ঠ অনুগত বান্দাদেরকে আল্লাহ তায়ালা বিপথগামী হতে দেন না। আল্লাহর বান্দারা যদি সাময়িকভাবে পিছিয়ে পড়ে, তবুও আল্লাহর সর্বব্যাপী রহমত তাদেরকে আপন আশ্রয়ে টেনে নেয় এবং অনতিবিলম্বেই তারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

এই বিপথগামীদের পরিণতি কী? এটা শুরু থেকেই জানিয়ে আসা হচ্ছে। এখানে পুনরায় আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'তাদের সকলের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি। জাহান্নামের রয়েছে সাতটা দরজা। প্রত্যেক দরজার জন্যে তাদের একটা নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে।'

এই সাতটা দরজা নিছক বহুত্ব বোঝানোর জন্যেও হতে পারে, আবার যথার্থ সংখ্যা বুঝানোর জন্যেও হতে পারে। যেটাই হোক, এতে মূল বিষয়ের কোনো পার্থক্য হয় না। বিপথগামীদের যেমন শ্রেণী বিভাগ ও স্তরভেদ থাকে, তেমনি ভ্রষ্টতারও রকমফের থাকে। এই স্তরভেদ ও কৃতকর্মের রকমফের অনুপাতেই প্রত্যেক দরজায় প্রবেশকারীদের শ্রেণী নির্ণিত হবে।

এ পর্যন্ত এসেই কাহিনীর দৃশ্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এখানে এসে কাহিনীর শিক্ষা বর্ণনা করা হয়েছে। কিভাবে শয়তান মানুষের অন্তরে অনুপ্রবেশ করার পথ পেয়ে যায়, কিভাবে মানুষের মাটির উপাদান আত্মার উপাদানের ওপর বিজয়ী হয়, সেটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মযবুত রাখে এবং আল্লাহর রূহ ফুঁকে দেয়ার প্রভাবকে সংরক্ষণ করে, তার ওপর শয়তানের কর্তৃত্ব চলে না।

তারপর বিপথগামীদের পরণতি বর্ণনা প্রসংগে অনুগত বান্দাদের প্রতিদানও তুলে ধরা হয়েছে,

'নিশ্চয়ই মোত্তাকী ও পরহেজগাররা বাগানে ও ঝর্ণাসমূহে অবস্থান করবে। যাও, শান্তির সাথে নিরাপদে তার মধ্যে প্রবেশ করো ....'

মোত্তাকী বলা হয় তাদেরকে, যারা সব সময় আল্লাহর দিকে লক্ষ্য রাখে এবং নিজেদেরকে তার আযাব থেকে ও আযাবের কারণগুলো থেকে মুক্ত রাখে। সম্ভবত বেহেশতের ঝর্ণাগুলোকে এখানে দোযখের দরজাগুলোর বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে। মোত্তাকীরা নিরাপদে ও শান্তির সাথে বেহেশতে এবং না-ফরমানরা ভয় ও ত্রাসের সাথে দোযখে প্রবেশ করবে। আল্লাহ বেহেশতবাসীর মন থেকে সকল হিংসা দ্বেষ দূর করে দেবেন এ কথাটার ঠিক বিপরীতে ইতিপূর্বে দেখানো হয়েছে যে, ইবলীসের মন হিংসায় পরিপূর্ণ। বেহেশতে কোনো দুঃখ-কষ্ট কাউকে স্পর্শ করবে না এবং কেউ সেখান থেকে বহিস্কৃত হবার আশংকাও করবে না। পৃথিবীতে তারা যে আল্লাহকে ভয় করতো এটা তারই প্রতিদান। পৃথিবীতে আল্লাহকে ভয় করে চলার কারণেই আখেরাতে তারা নিশ্চিন্ত, নিরাপদ ও শংকামুক্ত থাকবে এবং আল্লাহর শান্তিময় নৈকট্য লাভ করবে।

نَبِّئْ عِبَادِيٓ أَنِّيٓ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ﴿٥١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَٰمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا بَشَّرْنَٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَٰنِطِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا الضَّآلُّونَ ﴿٥٦﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوٓا إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا امْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَٰبِرِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ

৪৯. (হে নবী,) তুমি আমার বান্দাদের একথা বলে দাও, আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, ৫০. (তাদের আরো বলে দাও) নিসন্দেহে আমার আযাবও হচ্ছে অত্যন্ত কঠোর। ৫১. (হে নবী,) তুমি তাদের ইবরাহীমের মেহমানের কাহিনী থেকে (কিছু কথা) শোনাও। ৫২. যখন তারা তার কাছে হাযির হয়ে বললো, (তোমার ওপর) 'সালাম', তখন সে (তাদের ভাব ভংগি দেখে) বললো, আমরা অবশ্যই তোমাদের ব্যাপারে শংকিত। ৫৩. ওরা বললো, না, তুমি আশংকা করো না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানবান সন্তানের শুভ সংবাদ দিচ্ছি। ৫৪. সে বললো, তোমরা আমার (এমন অবস্থার) ওপর (সন্তানের) সুসংবাদ দিচ্ছো– (যখন) বার্ধক্য (-জনিত অবস্থা) আমাকে স্পর্শ করে ফেলেছে, অতপর (এ অবস্থায়) তোমরা আমাকে কিসের সুসংবাদ দেবে? ৫৫. তারা বললো, হাঁ, আমরা তোমাকে সঠিক সুসংবাদই দিচ্ছি, অতএব তুমি হতাশাগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ো না। ৫৬. সে বললো, গোমরাহ ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহর রহমত থেকে কে নিরাশ হতে পারে? ৫৭. হে (আল্লাহর পাঠানো) ফেরেশতারা, বলো (আমাকে এ সুসংবাদ দেয়া ছাড়া) তোমাদের (সামনে) আর কি (অভিযান) রয়েছে? ৫৮. তারা বললো (হাঁ), আমাদের এক নাফরমান জাতির বিরুদ্ধে (অভিযানে) পাঠানো হয়েছে (যারা অচিরেই বিনাশ হয়ে যাবে)। ৫৯. তবে লূতের আপনজনরা বাদে; আমরা অবশ্যই (আযাবের সময়) তাদের সবাইকে উদ্ধার করবো। ৬০. কিন্তু তার স্ত্রীকে নয় (আল্লাহ তায়ালা তার ব্যাপারে বলেন), আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি, সে (আযাবের সময়) পশ্চাদ্বর্তী দলভুক্ত হয়ে থাকবে।

রুকু ৫

৬১. যখন (সে) ফেরেশতারা লূতের পরিবার পরিজনদের কাছে এসে হাযির হলো, ৬২.

إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٦٢﴾ قَالُوا بَلْ جِئْنَٰكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾
وَأَتَيْنَٰكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ﴿٦٤﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ
أَدْبَٰرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾ وَقَضَيْنَآ
إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾ وَجَآءَ أَهْلُ
الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾ قَالَ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾ قَالُوٓا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَٰلَمِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ هَٰٓؤُلَآءِ
بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ ﴿٧١﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ

(তখন) সে বললো আপনারা তো (দেখছি) অপরিচিত ধরনের লোক। ৬৩. তারা বললো (না আসলে তা নয়), আমরা তো বরং তাদের কাছে সে (আযাবের) বিষয়টাই নিয়ে এসেছি, যার ব্যাপারে তারা ছিলো সন্দিগ্ধ। ৬৪. আমরা (তোমার কাছে) সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং আমরা (হচ্ছি) সত্যবাদী। ৬৫. সুতরাং তুমি রাতের কিছু অংশ থাকতে তোমার লোকজনসহ (এ জনপদ থেকে) বেরিয়ে পড়ো এবং তুমি নিজে তাদের পেছনে পেছনে চলতে থেকো, (সাবধান!) তোমাদের মধ্যে একজনও যেন পেছনে ফিরে না তাকায়, (ঠিক) যেদিকে (যাওয়ার জন্যে) তোমাদের আদেশ করা হবে, সেদিকেই চলতে থাকবে। ৬৬. (ইতিমধ্যে) আমি তার কাছে এ ফয়সালা পাঠিয়ে দিয়েছি যে, এ জনপদের মানুষগুলোকে ভোর হতেই মূলোৎপাটিত করে দেয়া হবে। ৬৭. (ইতিমধ্যে) নগরের অধিবাসীরা উল্লসিত হয়ে (লূতের কাছে এসে) হাযির হলো। ৬৮. (এদের আসতে দেখে) সে বললো (হে আমার দেশবাসী), এরা হচ্ছে আমার মেহমান, (এদের সাথে অশালীন আচরণ করে) তোমরা আমাকে অপমান করো না। ৬৯. তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমাকে (এদের সামনে) হেয় করো না। ৭০. তারা বললো, আমরা কি তোমাকে সৃষ্টিকূলের (মেহমানদারী করা) থেকে নিষেধ করিনি? ৭১. (এদের উক্তি শুনে) সে বললো, (একান্তই) যদি তোমরা কিছু (কামনা বাসনা চরিতার্থ) করতে চাও, তবে এখানে আমার (জাতির) মেয়েরা রয়েছে (এদের বিয়ে করে তোমরা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পারো); ৭২. (আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে নবী,) তোমার জীবনের শপথ (করে বলছি, সেদিন) এরা নিদারুণ এক নেশায় বিভোর হয়ে পড়েছিলো (আল্লাহর গযবের কোনো কথাই এরা বিশ্বাস করলো না)। ৭৩. অতপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই এক মহানাদ (এসে) তাদের ওপর আঘাত হানলো, ৭৪. তারপর আমি তাদের নগরগুলো

حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهَا

لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ

الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ

أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨٢﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ

مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾

উলটিয়ে দিলাম এবং ওদের ওপর পাকানো মাটির পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম; ৭৫. অবশ্যই এ (ঘটনার) মাঝে পর্যবেক্ষণসম্পন্ন মানুষদের জন্যে (শিক্ষার) বহু নিদর্শন রয়েছে। ৭৬. (ধ্বংসস্তূপের নিদর্শন হিসেবে) তা (আজো) রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে (আছে)। ৭৭. অবশ্যই এর মাঝে ঈমানদারদের জন্যে (আল্লাহর) নিদর্শন (মজুদ) রয়েছে; ৭৮. (লূতের জাতির মতো) 'আইকা'র অধিবাসীরাও যালেম ছিলো। ৭৯. অতপর আমি তাদের কাছ থেকেও (তাদের না-ফরমানীর) প্রতিশোধ নিলাম, আর (আজ এ) উভয় (জনপদই আযাবের চিহ্ন বহন করে) প্রকাশ্যে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে;

রুকু ৬

৮০. (একইভাবে) 'হেজর'বাসীরাও নবীদের অস্বীকার করেছিলো, ৮১. আমি আমার নিদর্শনসমূহ তাদের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, অতপর তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো, ৮২. তারা পাহাড় কেটে কেটে নিজেদের জন্যে ঘর বানাতো (এ আশায় যে), তারা (সেখানে) নিশ্চিন্তে জীবন কাটাতে পারবে। ৮৩. অতপর (না-ফরমানীর জন্যে একদিন) প্রত্যুষে তাদের ওপর মহানাদ এসে আঘাত হানলো, ৮৪. সুতরাং তারা (জীবনভর) যা কিছু কামাই করেছে, (আল্লাহর গযবের সামনে) তা কোনোই কাজে আসেনি।

তাফসীর
আয়াত ৪৯-৮৪

সূরার এ অধ্যায়টায় আল্লাহর করুণা কেমন হয়ে থাকে এবং তাঁর শাস্তিই বা কেমন হয়ে থাকে, তার কিছু নমুনা পেশ করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বৃদ্ধ বয়সে একটা জ্ঞানী ছেলে দেয়ার সুসংবাদ, হযরত লুত (আ.)-কে ও তার খোদাদোহী স্ত্রী ছাড়া তার সমগ্র পরিবার পরিজনকে আল্লাহর আযাব থেকে অব্যাহতি দান এবং 'আইকার' অধিবাসী ও হিজরের অধিবাসীদের ওপর আপতিত আযাব সংক্রান্ত ঘটনাবলীতেও ওই নমুনা বিদ্যমান।

'আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমি পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল এবং আমার আযাবও খুবই যন্ত্রণাদায়ক' এই কথাটা ভূমিকার আকারে বলা হয়েছে। তারপরই একে একে এ ঘটনাগুলো

তুলে ধরা হয়েছে। এ ঘটনাগুলোর কোনোটা আল্লাহর দয়ার নমুনা, কোনোটা আযাবের নমুনা। অনুরূপভাবে এ ঘটনাবলী সূরার প্রথম দিককার কিছু কিছু বক্তব্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন সূরার প্রথম দিকে এক জায়গায় হুমকি দেয়া হয়েছে এভাবে,

'ওদেরকে আহার বিহার ও ভোগবিলাসে মত্ত এবং বড় বড় আশার স্বপ্নে বিভোর থাকতে দাও।....' এগুলো হচ্ছে সেই সব জনপদের নমুনা, যেগুলোকে হুঁশিয়ারী দেয়ার পর এবং হুঁশিয়ারীর মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পর ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এ ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে সূরার শুরুতে ফেরেশতাদের সম্পর্কে যে উক্তি করা হযেছে, তাও সমর্থিত হয়েছে। যেমন,

'তারা বললো ওহে কোরআন ব্যক্তি, তুমি তো একটা আস্ত পাগল। তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে ফেরেশতাদেরকে নিয়ে আসোনা কেন? (কিন্তু) আমি তো সত্য প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য ছাড়া ফেরেশতা পাঠাই না, আর তখন তো তাদেরকে আর সময় দেয়া হবে না।'

এভাবে সমগ্র সূরাটা একটা সুসমন্বিত ও সুবিন্যস্ত একক বলেই প্রতীয়মান হয়, যার একাংশ অপরাংশকে সমর্থন করে। এ কথা যদিও সুবিদিত যে, একত্রে সমগ্র সূরা নাযিল হওয়া খুবই বিরল ব্যাপার ছিলো। সূরার আয়াতগুলো যেরূপ ধারাবাহিকভাবে আজ কোরআনে পাওয়া যায়, সেরূপ ধারাবাহিকতার সাথে আয়াতগুলো কিন্তু সেদিন নাযিল হয়নি। কিন্তু সূরাগুলোতে আয়াতগুলোকে যে ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে, সেটাও আল্লাহর আদেশেই করা হয়েছে। তাই এভাবে সাজানোর পেছনে একটা কিছু মহৎ উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা না থেকে পারে না। এই তাফসীরে আমি প্রত্যেক সূরার ভূমিকায় সূরার কাঠামো বিন্যাস, পূর্বাপর সংযোগ এবং ভাব ও বক্তব্যের ঐক্য বিশ্লেষণ সহকারে যে আলোচনা করেছি, তাতে ওই মহৎ উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতার কিছু কিছু দিক স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তবে এসবই আমার নিজস্ব চিন্তাগবেষণার ফসল। এ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। আল্লাহ তায়ালাই নির্ভুল পথে চলার একমাত্র প্রেরণাদাতা।

'আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও যে আমি পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল এবং আমার আযাব ও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক আযাব।' *(আয়াত ৪৯ ও ৫০)*

সূরার পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিপথগামীদের শাস্তি ও সৎলোকদের পুরস্কার বর্ণনা করার পর রসূল (স.)-কে এ আদেশ দেয়া হচ্ছে। এ দুটির মধ্যে সংযোগ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ তায়ালা আযাব সংক্রান্ত হুঁশিয়ারীর আগে ক্ষমার সুসংবাদ দিয়েছেন। কারণ এটাই তাঁর মূল ইচ্ছা। কেননা তিনি দয়া ও করুণাকে নিজের জন্যে অপরিহার্য বিষয় হিসাবে গণ্য করেছেন। অবশ্য মাঝে মাঝে শুধু আযাবের উল্লেখ এবং কখনো বা প্রথমে আযাবের উল্লেখ করেন। সেটা সংশ্লিষ্ট স্থানের বিষয়বস্তুর দাবী বলেই করে থাকেন।

এরপর হযরত লুত (আ.)-এর জাতির কাছে প্রেরিত ফেরেশতা ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যে ঘটনা ঘটে, তার উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পূর্বাপর বক্তব্যের সাথে সংগতি রক্ষা করেই হযরত ইবরাহীম ও হযরত লুত (আ.)-এর কাহিনীর এ অংশটা কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভংগিতে বর্ণনা করা হয়েছে। কোথাও কোথাও হযরত লূত (আ.)-এর কাহিনী এককভাবে

বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা 'আরাফে' হযরত লূত (আ.)-এর এবং সূরা 'হূদে' হযরত লূত ও ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনীর অংশবিশেষ আমরা দেখে এসেছি। প্রথমটায় শুধু নিজ জাতির অশ্লীল কর্মকান্ডের প্রতি হযরত লূত (আ.)-এর ধিক্কার, তার জাতি কর্তৃক তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার হুংকার এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তার স্ত্রী বাদে তাকে ও তার সমগ্র পরিবার পরিজনকে আযাব থেকে অব্যাহতি দানের উল্লেখ রয়েছে। তার স্ত্রী বিপথগামীদের দলভুক্ত থাকার কারণে তাকে ধ্বংস করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু সূরা আরাফে ওই জাতির কাছে ফেরেশতা পাঠানো ও ফেরেশতাদের বিরুদ্ধে ওই জাতির ষড়যন্ত্র পাকানোর উল্লেখ নেই। পক্ষান্তরে সূরা হূদে হযরত লূত ও ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে কিছুটা ভিন্ন ভংগিতে। সেখানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনার খানিকটা বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রীর উপস্থিতিতে তাকে সন্তান লাভের সুসংবাদ দেন। কিন্তু এখানে ওই বিষয়টা আলোচিত হয়নি।

অনুরূপভাবে ওই দুই সূরাতে লূত (আ.)-এর ঘটনার বিভিন্ন অংশের ধারাবাহিকতায়ও কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সূরা হূদে ফেরেশতাদের আসল রূপ কেবল তখনই উম্মোচন করা হয়েছে, যখন তার জাতির দুশ্চরিত্র লোকেরা হযরত লূত (আ.)-এর বাড়ীতে এসে চড়াও হয়। তখন হযরত লূত (আ.) তাদের কাছে মিনতি জানিয়েছিলেন অতিথিদের সামনে তাকে অপমানিত না করতে, কিন্তু তারা তার কোনো কথাই শোনেনি এবং তিনি অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে আফসোস করে বলেছেন যে,

'আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে বা কোনো ক্ষমতাবানের সহায়তা পেলে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম।'

কিন্তু বর্তমান সূরায় ফেরেশতাদের আসল পরিচয় প্রথম বারেই উম্মোচন করা হয়েছে। তার জাতির আচরণ ও হযরত লূত (আ.)-এর অতিথিদের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা পরে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা এখানে নিছক ঘটনা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। আযাবের হুশিয়ারী যে যথার্থ এবং ফেরেশতারা যখন আসেন তখন যে সেই জাতির আত্মশুদ্ধির আর সুযোগ থাকে না সেই কথা বর্ণনা করাই এখানে মূল উদ্দেশ্য।

তাদেরকে ইবরাহীম (আ.)-এর অতিথিদের ঘটনা জানিয়ে দাও। 'যখন তারা তার কাছে এলো এবং সালাম করলো ....' (আয়াত ৫১-৫৬)

এখানে শুধু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর 'আমরা তোমাদেরকে দেখে ভয় পেয়ে গেছি' এই কতোটা উদ্ধৃত করা হয়েছে, কিন্তু কেন ভয় পেলেন তার উল্লেখ নেই। সূরা হূদে সেটা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদেরকে বকরী ভুনা করে খেতে দেয়ার পর তারা যখন তা স্পর্শই করলো না তখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। বর্ণনা ভংগীর এই তারতম্যের কারণ হলো এখানে আল্লাহর সেই দয়া ও করুণার যথার্থতা প্রমাণ করাই আসল উদ্দেশ্য, যা তিনি তাঁর রসূলদের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের কাছে ব্যক্ত করে থাকেন। এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনার খুটিনাটি বর্ণনা করা অভিপ্রেত নয়।

'তারা বললো, আপনি ভয় পাবেন না। আপনি একটা জ্ঞানী ছেলে পাবেন এই মর্মে আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি।'

এভাবে ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে সুসংবাদ দিলেন। এই সূরায়ও সেই সুসংবাদটা খুটিনাটি বাদ দিয়ে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

অনুরূপভাবে, এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জবাবটাই শুধু উদ্ধৃত করা হয়েছে। তার স্ত্রীর বক্তব্যকে এখানে উদ্ধৃত করা হয়নি।

তিনি বললেন, আমি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া সত্তেও কি তোমরা আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছো। তোমরা কিসের ভিত্তিতে এ সুসংবাদ দিচ্ছো?

কেননা, বার্ধক্যে উপনীত হয়েও সন্তান লাভ করবেন এটাকে প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ.) দুঃসাধ্য মনে করেছিলেন। (অন্যত্র বলা হয়েছে যে, এ সময়ে তার স্ত্রীও বার্ধক্য জনিত বন্ধাত্বের স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন।) ফেরেশতারা তাকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে জবাব দিলেন,

'আমরা সত্যের ভিত্তিতেই আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি। কাজেই আপনি হতাশ হবেন না।'

এ কথা শুনে হযরত ইবরাহীম (আ.) তৎক্ষণাত নিজেকে শুধরে নিলেন এবং আল্লাহর রহমত সম্পর্কে নিজের হতাশাকে ঝেড়ে ফেললেন।

'তিনি বললেন, বিপথগামীরা ছাড়া আর কেইবা আল্লাহর রহমত সম্পর্কে হতাশ হয়?'

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তিতে 'রহমত' শব্দটা এসেছে এই অধ্যায়ের ভূমিকার সাথে সমন্বয় ঘটানোর জন্যে। সেই সাথে এই চিরন্তন সত্যটাও প্রকাশিত হয়েছে যে, গোমরাহ লোকেরা ছাড়া কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না। অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথ হারিয়ে ফেলে, আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের আশা যাদের থাকে না, তাঁর দয়া, সহানুভূতি ও করুণা প্রাপ্তির সম্ভাবনা যারা অনুভব করে না, তারাই আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়। পক্ষান্তরে যাদের হৃদয় ঈমানী বলে বলিয়ান এবং যারা পরম করুণাময়ের সাথে সার্বক্ষণিক সম্পর্ক রক্ষা করে, তারা কখনো হতাশাগ্রস্ত হয় না, চাই যতো কঠিন বিপদাপদ তাকে ঘিরে ধরুক না কেন এবং বর্তমানের অন্ধকারে ভবিষ্যতের আশার আলো যতোই হারিয়ে যাকনা কেন মনে রাখতে হবে, আল্লাহর রহমত হেদায়াতপ্রাপ্ত মোমেনদের একান্ত কাছেই অবস্থান করে।

ফেরেশতাদের পরিচয় লাভ এবং পুত্র লাভের সুসংবাদ পেয়ে যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) এবার আশ্বস্ত হলেন, তখন তিনি ফেরেশতাদের আগমনের কারণ জানতে চাইলেন।

'ইবরাহীম বললো, ওহে প্রেরিত দূতরা, তোমাদের বক্তব্য কী? তারা বললো, আমরা একটা অপরাধী জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছি। লূত (আ.)-এর স্ত্রী ছাড়া তাঁর সমস্ত পরিবারকে আমরা রক্ষা করবো। (আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক) আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি, তাঁর স্ত্রী তার পশ্চাদ্ধাবনকারীদের থেকে যাবে।'

কওমে লূতের চারিত্রিক বিকৃতি ও ধ্বংসের ঘটনা

সূরা হুদে হযরত লূত (আ.) ও তার জাতি সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যে তর্কবিতর্ক তুলে ধরা হয়েছে, এখানে তা তুলে ধরা হয়নি। এখানে দেখানো হয়েছে যে, ফেরেশতারাই তাকে সব খবর জানাচ্ছেন। এই খবরের মধ্যে রয়েছে, হযরত লূত (আ.) ও তার পরিবার পরিজনকে আল্লাহ তায়ালা দয়া প্রদর্শন করবে তবে তার স্ত্রী ও জাতিকে শাস্তি দেবেন। এখানেই ফেরেশতাদের সাথে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথাবার্তা শেষ। এরপর ফেরেশতারা হযরত লূত (আ.)-এর জাতির প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করতে চলে যান। এরশাদ হচ্ছে,

'যখন লূতের পরিবারের কাছে দূতরা এলো, তখন লূত বললো, আপনারা তো দেখছি একবারেই অপরিচিত।' *(আয়াত ৬২-৬৬)*

এভাবে আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, ফেরেশতারা নিজেরাই লূত (আ.)-কে জানিয়েছেন যে, তারা ফেরেশতা। তারা সেই আযাব নিয়ে এসেছেন, যা নিয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করতো। তাদের অপকর্মের ফল হিসাবে আল্লাহ তায়ালা যে তাদেরকে আযাব দিতে ও ধ্বংস করে দিতে পারেন, সেটা তারা বিশ্বাস করতো না। তাদের সেই অবিশ্বাস ও সন্দেহ ঘুচিয়ে দিতে এবং আল্লাহর আযাবকে সত্য প্রমাণ করে দিতে ফেরেশতারা এসেছেন। ফেরেশতারা যখন চলে আসে, তখন যে আযাব আসতে আর দেরী থাকে না, এই সত্যটাই এ ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে।

'লূত বললো, আপনারা তো অপরিচিত লোক।'

হযরত লূত (আ.) বিব্রত বোধ করেই কথাটা বলেছেন। কারণ তিনি তার জাতিকে চিনতেন। তারা তাঁর অতিথিদের সাথে কী আচরণ করবে তাও তিনি জানতেন। ওই সমাজে তিনি একেবারেই একাকী ও অসহায়ম, আর ওরা হচ্ছে ভয়ংকর লম্পট ও পাপিষ্ট। তিনি বলছেন যে, এই শহরের অধিবাসীদের চরিত্রের কথা সবাই জানে এবং বহিরাগতদের সাথে তারা কেমন আচরণ করে তাও সুবিদিত। তবুও আপনারা এখানে চলে এলেন!

'তারা বললো, বরঞ্চ আমরা সে জিনিসটা নিয়ে এসেছি, যা নিয়ে তারা সন্দিহান। আমরা আপনার কাছে সত্য নিয়ে এসেছি এবং আমরা সত্যবাদী।'

ফেরেশতাদের এই পুন পুন আশ্বাস থেকে বুঝা যায় যে, হযরত লূত (আ.) কতোদূর বিচলিত, উৎকণ্ঠিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি একদিকে নিজের অতিথিদের প্রতি কর্তব্য পালনের তাগিদ অনুভব করছিলেন, অপরদিকে তার জাতির অসদাচরণ থেকে তাদেরকে রক্ষা করার ব্যাপারে নিজের দুর্বলতাও উপলব্ধি করছিলেন। এজন্যেই ফেরেশতারা তাকে তার করণীয় সম্পর্কে পথনির্দেশ দেয়ার আগে বারবার আশ্বাস দিয়ে তাঁকে চিন্তামুক্ত করতে চাইছিলেন। আশ্বাসবাণীর পর এবার পথনির্দেশ এলো,

'তোমার পরিবার পরিজন নিয়ে শেষ রাতে বিদায় হও.... যেখানে তোমাদেরকে যেতে বলা হয় চলে যাও।'....

'আসরে' ক্রিয়াটা এসেছে 'আস-সারয়ু' থেকে, যার অর্থ নৈশ ভ্রমণ। আর কেতয়ুম 'মিনাল-লাইল' অর্থ রাতের একটা অংশ। লূত (আ.)-কে আদেশ দেয়া হয়েছিলো শেষ রাতে নিজের পরিবার পরিজনকে নিয়ে শহর ছেড়ে চলে যেতে। তাকে সবার পেছনে পেছনে চলতে বলা হয়েছিলো, যাতে কেউ পেছনে থেকে না যায় কিংবা দির্ঘদিনের স্মৃতি বিজড়িত মাতৃভূমি ছেড়ে যাওয়ার সময় যেন ফেলে যাওয়া ঘরবাড়ীর দিকে করুন দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে না যায়। প্রত্যুষেই আল্লাহর আযাব নাযিল হবার কথা ছিলো এবং সে ফায়সালা খুব বেশী দূরে ছিলো না।

'ইতিমধ্যে আমি তার কাছে সেই বিষয়টা পাঠিয়ে দিলাম যে এই জাতির শেষ ব্যক্তিকে ভোর হতে না হতেই সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে।'

অর্থাৎ আমি তাকে এই ভয়াবহ তথ্যটা জানালাম যে, তাদের শেষ ব্যক্তিকে সকাল হতে না হতেই শেষ করে দেয়া হবে, আর শেষ ব্যক্তি শেষ হলে প্রথম ব্যক্তিও স্বতসিদ্ধভাবেই শেষ হবে। এটা একটা বিশেষ ধরনের বাচনভংগী, যা সর্বাত্মক ধ্বংসের সমার্থক, যার কবল থেকে একজন মানুষও রক্ষা পায় না। কাজেই সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে যেন কেউ পেছনে পড়ে না থাকে এবং পেছনের দিকে ফিরেও না তাকায়, যাতে শহরবাসীর ওপর যে আযাব আসছে, তার কবলে সে না পড়ে।

সূরার বিষয়বস্তুর সাথে অধিকতর সংগতিশীল বিধায় ঘটনার এই সর্বশেষ অংশটা প্রথমেই উল্লেখ করা হলো। তারপর লূত (আ.)-এর জাতি ইতিপূর্বে যে কান্ড ঘটিয়েছে, তার উল্লেখ করে ঘটনা পূর্ণাংগ করা হলো।

তারা শুনতে পেলো যে, লূত (আ.)-এর বাড়ীতে কয়েকজন সুদর্শন যুবক এসেছে। এতে তারা আনন্দে নাচতে থাকে যে, শিকারের সন্ধান পাওয়া গেছে। কারো কারো মতে, হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রীই তাদেরকে এই খবর জানিয়েছিলো।

'শহরবাসী আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে এলো।' ....

এই বাক্যটা থেকে বুঝা যায়, জাতিটা বিরল ধরনের বিকৃত ও অশ্লীল কর্মকান্ডের কেমন পাশবিক ও পৈশাচিক পর্যায়ে নেমে গিয়েছিলো! সর্ব সাধারণ শহরবাসীর সামনে প্রকাশ্যে দল বেঁধে আসা এবং যুবকদেরকে নাগালে পাওয়া গেছে এবং প্রকাশ্যে তাদের ওপর চড়াও হওয়া যাবে এই ভেবে আনন্দে আত্মহারা হয়ে হৈ হৈ করতে করতে আসার এক নযীরবিহীন নির্লজ্জ দৃশ্য উন্মোচিত হয় এই বাক্যটিতে। এমনিতেই তা জঘন্য অশ্লীল কাজ, তদুপরি তা প্রকাশ্যে করতে চাওয়া এমন ঘৃণ্য ব্যাপার যে, বাস্তবে না ঘটলে তা বোধ হয় কেউ কল্পনাও করতে পারে না। কোনো বিকারগ্রস্ত অপরাধী ও অস্বাভাবিক অপরাধ করার জন্যে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায় এবং লুকিয়ে লুকিয়ে নোংরা অপকর্মটা করে আনন্দ উপভোগ করে এবং সেটা লোকজনকে জানতে দিতে সে ভীষণ লজ্জা পায়। এমনকি যৌন আনন্দ উপভোগ করাটা যদি স্বাভাবিক ও আইনসংগত পন্থায়ও হয়, তবু সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ তা গোপনেই করতে চায়। মানুষ তো দূরের কথা, কোনো কোনো পশুও এ কাজটা গোপনেই সম্পাদন করে, অথচ সে হতভাগা জাতির লোকগুলো তা প্রকাশ্যেই করতো, প্রকাশ্যেই দল বেধে শিকার খুঁজতো, শিকার পেলে প্রকাশ্যেই হৈ চৈ করে আনন্দ প্রকাশ করতো। বস্তুত নৈতিক অধপতনের এ এক নজীরবিহীন নমুনাই বটে।

পক্ষান্তরে, লূত (আ.) উদ্বেগ ও উৎকন্ঠায় দিশেহারা হয়ে পড়েন। অতিথিদের সম্মান ও নিজের মর্যাদা রক্ষা করতে তৎপর হন। এ জন্যে যদিও তিনি জানতেন যে, তাদের ভেতরে মানবতা ও খোদাভীতির নামগন্ধও নেই এবং তারা এত অধপতিত যে, ওসব জিনিস তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলাও যাবে না। তথাপি চরম বেশামাল অবস্থায় যতোটুকু সাধ্যে কুলায়, তাদেরকে মানবিক সৌজন্যে ও খোদাভীতির দোহাই পেড়ে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন।

'লূত বললো, এরা আমার অতিথি। তোমরা আমাকে (এদের সামনে) অপমান করো না। আল্লাহকে ভয় করো, আমাকে লজ্জা দিও না।'

কিন্তু এই আহ্বান তাদের মধ্যে কোনো লজ্জা শরম বা মানবতাবোধ সৃষ্টির পরিবর্তে আরো ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতা জাগিয়ে তোলে এবং তারা বাড়ীতে পুরুষ অতিথি রাখার জন্যে লূত (আ.)-কে ভর্ৎসনা করে। ভাবখানা এই যে, হযরত লুতই যেন অন্যায় করে ফেলেছেন এবং তাদেরকে অপরাধ করতে প্ররোচিত করেছেন, তাই তারা লূত (আ.)-এর কোনো আপত্তি শুনতে বাধ্য নয়।

'তারা বললো, তোমাকে কি আমরা সারাটা দুনিয়ার মানুষকে আশ্রয় দিতে বারণ করিনি?'

এবার লূত (আ.) তাদেরকে বিপরীত লিংগের প্রতি অর্থাৎ নারী জাতির দিকে মনোযোগী করে তুলতে সচেষ্ট হলেন। কেননা পৃথিবীর জীব জগতের স্বভাবগত যৌন আবেগ চরিতার্থ করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা নারী জাতির সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে একদিকে জীবদের বংশ পরম্পরা অব্যাহত থাকতে পারেল অপরদিকে নারী জাতির সাথে যৌন কামনা চরিতার্থ করলে স্বভাবতই নারী ও

পুরুষ উভয়েই নির্দোষ ও নিষ্কলুষ আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হয়। এভাবে সহজাত ব্যক্তিগত আবেগ ও আকাংখার বলে পৃথিবীতে জীবন প্রবাহ অব্যাহত থাকা নিশ্চিত হয়। হযরত লূত (আ.) তার এই চেষ্টা অব্যাহত রাখলেন এভাবে,

'লূত বললো, এই তো আমার (জাতির) মেয়েরা রয়েছে, যদি তোমাদের করতেই হয় (তাহলে বৈধ উপায়ে এদের সাথে করো)।' এর অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহর নবী হযরত লূত (আ.) ওই লম্পটদের হাতে মেয়েদেরকে ব্যাভিচারের জন্যে তুলে দিতে চেয়েছেন। বরঞ্চ তিনি যৌনাচারের স্বাভাবিক ও নিষ্কলুষ পন্থার দিকে তাদেরকে ইংগিত দিয়েছেন, যাতে তাদের ভেতরকার প্রচ্ছন্ন এই স্বাভাবিক আকাংখা জেগে ওঠে। তিনি জানতেন যে, তারা যদি নারী জাতির দিকে আকৃষ্ট হয়, তা হলে ব্যাভিচারের উদ্দেশ্যে তাদেরকে চাইবে না। এটা ছিলো নিছক পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ স্বাভাবিক যৌন জীবনের পথনির্দেশ। ভেবেছিলেন, হয়তো বা তারা এ যাবত এড়িয়ে যাওয়া সেই স্বাভাবিক জীবনের দিকে ফিরে আসবে।

কিন্তু চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী। হযরত লূত (আ.)-এর সমস্ত সদুপদেশ এবং তাদের সুপ্ত বিবেক ও মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলার জন্যে তার সমস্ত প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিয়ে তারা তাদের বিকৃত যৌন আবেগ চরিতার্থ করার জন্যে তার বাড়ীর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। এই বর্বরোচিত উচ্ছৃংখল আচরণের দৃশ্যটা পরবর্তী আয়াতে আরবদের রীতি মোতাবেক শপথ সহকারে তুলে ধরা হয়েছে।

'তোমার প্রাণের শপথ, (সেদিন) তারা ছিলো তাদের নেশায় বিভোর।' এ আয়াতটার মধ্য দিয়ে তাদের আসল ও চিরাচরিত নৈতিক বিকৃতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যা থেকে তাদের মুক্তি ও সুস্থতা আশা করা যায় না এবং তাদের খোদাভীতি, সততা ও মানবিক সদাচারের পথ অবলম্বন করারও সম্ভাবনা অবশিষ্ট ছিলো না।

এরপরই হযরত লূত (আ.)-এর জাতির পাশবিকতার চির অবসান ঘটে এবং তাদের ওপর আল্লাহর এই উক্তি (যা সূরার প্রথম দিকে বলা হয়েছে) 'আমি ফেরেশতাদেরকে যখনই পাঠাই, সত্য দিয়েই পাঠাই এবং তারপর তাদেরকে আর অবকাশ দেয়া হয় না।' বাস্তব হয়ে দেখা দেয় বস্তুত এই পর্যায়ে আমরা যথার্থই ধ্বংসের বিভীষিকা দেখতে পাই। দেখতে পাই তাদের বিকৃত চরিত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ ভূগর্ভে ধসিয়ে দিয়ে সংঘটিত করা লোমহর্ষক হত্যাযজ্ঞের দৃশ্য।

'ভোর হওয়ার সাথে সাথেই তাদেরকে আক্রমণ করলো এক বিকট চিৎকার। আমি ওই জনপদটাকে উল্টে দিলাম এবং তাদের ওপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম।'

হযরত লূতের জাতিকে এমন এক দুর্যোগ দিয়ে ধ্বংস করা হয়, যা ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সাথে তুলনা করা যায়। কখনো কখনো এ ধরনের দুর্যোগের সাথে যুক্ত হয় ভূমিধ্বস, কাঁদাযুক্ত প্রস্তর বৃষ্টি এবং এর পরিণতিতে কখনো কখনো পুরো এক একটা শহর ভূগর্ভে ধ্বসে যায়। কথিত আছে যে, বর্তমান মৃত সাগর এই ঘটনার পরেই জন্ম লাভ করেছে। 'আমুরা' ও 'সদোম' অঞ্চলটা উল্টে গিয়ে ভূগর্ভে ধ্বসে যাওয়ার পর পানি উঠে এই সাগরের সৃষ্টি হয়েছে।

হেজায ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী একটা ব্যস্ত সড়কের পাশেই এ এলাকা অবস্থিত। অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর ঘটনা থেকে যারা শিক্ষা গ্রহণে অভ্যস্ত, তাদের জন্যে এ এলাকা দর্শনে যথেষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। মুক্ত বিবেক, সচেতন মন ও বিশ্বাসী হৃদয়ের অধিকারী মোমেনরা ছাড়া আর কারো জন্যে এ জাতীয় নিদর্শনাবলী উপকারী নয়।

'এ ঘটনায় শিক্ষা গ্রহণকারীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। আর জায়গাটা এমন এক সড়কের পাশে অবস্থিত, যা এখনো অক্ষতভাবে টিকে আছে। এতে মোমেনদের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।'

এভাবে আল্লাহর হুশিয়ারী সত্যে পরিণত হলো। ফেরেশতাদের নাযিল হওয়াটা ছিলো আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য আযাবের চূড়ান্ত নোটিশ স্বরূপ।

ধ্বংসপ্রাপ্ত দু'টি জাতির ঘটনা

একই ধরনের অবস্থা হয়েছিলো হযরত শোয়ায়বের জাতি আইকা বাসীর ও হযরত সালেহের জাতি হেজর বাসীর।

'আইকাবাসীও অত্যাচারী ছিলো। তাই আমি তাদের কাছ থেকেও প্রতিশোধ নিয়েছিলাম.....। (আয়াত ৭৮-৮৪)

হযরত শোয়ায়বের জাতি আইকাবাসী ও মাদইয়ানবাসী সম্পর্কে কোরআন অন্যান্য জায়গায় বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করেছে। এখানে তাদের অনাচার ও ধ্বংসের বিষয়টা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে আযাব সংক্রান্ত হুশিয়ারী এবং সূরার শুরুতে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে অবাধ্য জাতিগুলোকে ধ্বংস করে দেয়া হয় মর্মে যে তথ্য জানানো হয়েছে, তার বাস্তবতা প্রমাণ করা যায়। মাদইয়ান ও আইকা লূত (আ.)-এর এলাকার কাছেই অবস্থিত।

'ওই দুটো জায়গা প্রকাশ্য সড়কের পাশেই অবস্থিত'

এই উক্তিতে দুটো জায়গা দ্বারা হয়তো আইকা ও মাদইয়ানকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা এই দুটো জায়গাই সুস্পষ্ট ও অক্ষত সড়কের পাশে অবস্থিত। এ দুটো আবার পূর্বোক্ত হযরত লূত (আ.)-এর জনপদ এবং হযরত শোয়ায়বের জনপদও হতে পারে। দুটো হেজায ও সিরিয়াগামী সড়কের পাশে অবস্থিত হওয়ায় দুটোকে এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদগুলো এভাবে ব্যস্ত সড়কের পাশে অবস্থান শিক্ষা লাভের সহায়ক। কেননা ওই জনপদগুলোর ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান। আসা যাওয়ার পথে প্রতিটি মানুষের তা চোখে পড়ে। ওই ধ্বংসাবশেষের চার পাশের জনজীবন স্বাভাবিকভাবেই চলছে। কেবল ওই স্থানগুলো এমনভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে যে, মনে হয় সেখানে কখনো জনবসতি ছিলো না। আজ সেখানে জীবনের গতি স্তব্ধ। অথচ তার পার্শ্ববর্তী সড়কে জীবন গতিশীল রয়েছে।

হেজরবাসী হলো হযরত সালে (আ.)-এর জাতি। হেজর হেজায ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে 'ওয়াদিউল কুরা'-এর দিকে অবস্থিত। এখনো এটা বিদ্যমান। সেই সুদূর অতীতে তারা পাহাড়ের পাথর খোদাই করে নিজেদের বাড়ি ঘর তৈরী করেছিলো। এ থেকে বুঝা যায় তারা কতো শিল্প নৈপুণ্য, শক্তি সামর্থ ও উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিলো। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'হেজরবাসী রসূলদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছিলো।'

হেজরবাসীর কাছে একজন রসূলই এসেছিলেন। তিনি হচ্ছেন হযরত সালেহ (আ.)। তাকেই তারা মিথ্যুক বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। তথাপি আল্লাহ তায়ালা বহুবচন প্রয়োগ করে বলেছেন যে, তারা 'রসূলদেরকে' মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছিলো। কেননা হযরত সালেহ সমস্ত নবী ও রসূলের প্রতিনিধি ছিলেন। তাই তারা তাকে মিথ্যুক আখ্যায়িত করলে বলা হলো, তারা রসূলদেরকে মিথ্যুক আখ্যায়িত করলো। এভাবে স্থান, কাল, ব্যক্তি ও জাতি নির্বিশেষে সকল নবী ও রসূলকে এক দল ভুক্ত এবং সকল প্রত্যাখ্যানকারীকে এক দল ভুক্ত করা হলো।

'তাদেরকে আমি আমার নিদর্শনবালী দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করেনি।'

এখানেও 'নিদর্শনাবলী' বহুবচন যোগে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ হযরত সালেহ শুধু একটাই নিদর্শন সাথে এনেছিলেন। সেটা ছিলো তার উষ্ট্রী, এর কারণ এই যে, বিশ্ব প্রকৃতিতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। মানুষের নিজ সত্ত্বার ভেতরেও রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন। এই সমস্ত নিদর্শনই পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাগবেষণার জন্যে উন্মুক্ত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সালেহ (আ.)-এর জাতিকে নিদর্শন হিসাবে শুধু উষ্ট্রীই দেননি, বরং অসংখ্য প্রাকৃতিক ও তাত্বিক নিদর্শন দিয়েছেন। অথচ এ জাতি সকল নিদর্শনই উপেক্ষা করেছিলো। সব নিদর্শন থেকেই তাদের চোখ, মন, বিবেক ও বুদ্ধিকে বন্ধ করে রেখেছিলো।

'তারা পাহাড় খোদাই করে নিরাপদ বাসস্থান তৈরী করতো। ভোর হতে না হতেই এক বিকট চিৎকার তাদেরকে পাকড়াও করলো, ফলে তাদের উপার্জিত কোনো সম্পত্তিই আযাবের সময় তাদের কাজে লাগলো না।'

পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে বানানো বাসস্থানের নিরাপদ জীবন থেকে শুরু করে সর্ববিধ্বংসী বিকট চিৎকার পর্যন্ত যে দৃশ্যটা চোখে পড়ে, তা মানুষ মাত্রেরই মনকে প্রচন্ডভাবে আলোড়িত করে। কেননা সেই একটা মাত্র বিকট চিৎকারে তাদের সারা জীবনের সঞ্চিত সকল সহায় সম্পদ ও সাজ সরঞ্জাম এবং তাদের যুগ যুগান্তরের নির্মিত সকল স্থাপনা ও ঘরবাড়ী সবই পন্ড ও নস্যাত হয়ে গেলো। এ সবের কোনো কিছুই তাদের আকস্মিক ধ্বংসকে রুখতে পারলো না। বস্তুত মানুষ নিজের জীবনকে পাহাড় পর্বতে খোদাই করে বানানো ঘরবাড়ীর চেয়ে বেশী নিরাপদ আর কোথাও ভাবতে পারে না। আর প্রাতকালে মানুষ যতোখানি নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত বোধ করে, ততোখানি অন্য কোনো সময়ে করে না। অথচ সালেহ (আ.)-এর জাতিকে সকাল বেলাই একটা প্রলয়ংকরী বিকট চিৎকার এসে ধ্বংস করে দিলো। অথচ এ সময় তারা তাদের সুরক্ষিত নিরাপদ পার্বত্য জনপদে বসবাস করছিলো। তাদের সমস্ত রক্ষাব্যুহ ভেংগে চুরমার হয়ে গেলো। সমস্ত নিরাপত্তা প্রাচীর ও সুরক্ষিত দুর্গ বিধস্ত হয়ে গেলো। এগুলো তাদেরকে সেই বিকট শব্দ থেকে বাঁচাতে পারলো না। বাতাস থেকে সৃষ্ট এই বিকট ধ্বনি তাদেরকে তাদের পাহাড়ের অভ্যন্তরের নিরাপদ বাসস্থানের মধ্যেই ধ্বংস করে রেখে গেলো।

এভাবে সূরা আল হেজরের কেসসা কাহিনীগুলো সমাপ্ত হলো। এ দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর রসূলদেরকে মিথ্যুক আখ্যায়িত করে যারা প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্যে নির্ধারিত অবকাশের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করেন। বস্তুত আল্লাহর নীতি কখনো পরিবর্তিত হয় না এবং তা কারো সাথে পক্ষপাতিত্বও করে না, এই বক্তব্যটাকে এখানে সূরার অন্যান্য অংশের একই বক্তব্যের সাথে সুসমন্বিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। (আয়াত ৮৫-৯১)

এটাই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই। এ নিয়ম জীবন ও জগতকে নিয়ন্ত্রণ করে, দল ও গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করে, আদর্শ ও লক্ষ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে, হেদায়াত ও গোমরাহী তথা ন্যায় অন্যায়কেও নিয়ন্ত্রণ করে সর্বশেষে মানুষের শেষ পরিণতি ও হিসাব নিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে। আলোচ্য সূরার প্রতিটি আয়াত এবং প্রতিটি বাক্য উক্ত নিয়মের সত্যতা প্রমাণ করে। শুধু তাই নয়, বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে উক্ত নিয়মের প্রতিফলনের বাস্তব নমুনাও পেশ করে। এই নিয়ম আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টির মাঝে লুকায়িত নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্যের প্রতি ইংগীত করে

এবং সেই চিরন্তন ও শাশ্বত সত্যের সাক্ষ্য বহন করে যার ওপর এই গোটা সৃষ্টি জগতের প্রকৃতি নির্ভরশীল।

এরপর আলোচ্য সূরার শেষের দিকে এসেছে এক মহাসত্যের বর্ণনা, যে মহানসত্য আসমান ও যমীন তথা নিখিল বিশ্বের সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশ পায়, সন্দেহাতীতভাবে আসন্ন কেয়ামতের মাধ্যমে প্রকাশ পায় এবং রসূল (স.)-এর মহান রেসালাতের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এই সব কিছুই সেই মহা সত্যের সাথে সম্পৃক্ত এবং এর পরিচয় বহনকারী এসব কিছুর মাঝেই ওই মহাসত্যের অস্তিত্ব বিকাশমান। এই দৃশ্যমান গোটা জগত একজন বিজ্ঞ ও শক্তিধর স্রষ্টার অস্তিত্ব ঘোষণা করে, আর সেই মহান স্রষ্টা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা।

কাজেই মহাসত্য আপন পথেই চলবে এবং এই সত্যের প্রচারকার্যও আপন পথেই চলবে। এই সত্যের পথে যারা আহ্বান করবে তারা কখনও মোশরেকদের বিদ্রুপ ও হাসি-ঠাট্টাকে আমলে আনবে না, কোনো পারোয়া করবে না।

আল্লাহর চিরন্তন নিয়ম তার নিজস্ব গতি ও পথেই চলছে। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। গোটা সৃষ্টি জগত একজন মহান স্রষ্টারই স্বাক্ষ্য বহন করছে। আলোচ্য সূরাটি এই মহাসত্যটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমাপ্ত হচ্ছে,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ﴿٨٥﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ﴿٨٧﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾ وَقُلْ اِنِّيْٓ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٩﴾ كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ﴿٩٠﴾ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ﴿٩١﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٤﴾ اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴿٩٥﴾ الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾

৮৫. (জেনে রেখো,) আকাশমালা, যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তার কোনোটাই আমি অযথা পয়দা করিনি; অবশ্যই (সব কিছুর শেষে) একদিন কেয়ামত আসবে (এবং এ সৃষ্টিলীলা ধ্বংস হয়ে যাবে), অতএব হে নবী, তুমি পরম ঔদাসীন্যের সাথে (ওদের) উপেক্ষা করো। ৮৬. নিশ্চয়ই তোমার মালিক হচ্ছেন এক মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী। ৮৭. অবশ্যই আমি তোমাকে সাত আয়াত (বিশিষ্ট একটি সূরা) দিয়েছি, যা (নামাযের ভেতর ও বাইরে) বার বার পঠিত হয়– আরো দিয়েছি (জীবন বিধান হিসাবে) মহান (গ্রন্থ) কোরআন। ৮৮. আমি এ (কাফেরদের) মাঝে কিছু লোককে ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনো তোমার দু'চোখ তুলে তাকাবে না, তাদের (অবস্থার) ওপর তুমি কোনো ক্ষোভ করবে না, (ওদের কথা বাদ দিয়ে) বরং তুমি ঈমানদারদের দিকেই ঝুঁকে থেকো। ৮৯. (সবাইকে) বলে দাও, আমি হচ্ছি (জাহান্নামের) সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র, ৯০. যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত তাদের ওপরও আমি এভাবেই (কেতাব) নাযিল করেছিলাম, ৯১. (এরা হচ্ছে সেসব লোক) যারা কোরআনকে টুকরো টুকরো করেছে। ৯২. সুতরাং (হে নবী,) তোমার মালিকের শপথ, ওদের আমি অবশ্যই প্রশ্ন করবো, ৯৩. (প্রশ্ন করবো) সেসব বিষয়ে যা কিছু (আচরণ) তারা (কোরআনের সাথে) করেছে। ৯৪. অতএব তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তুমি খোলাখুলি (জনসমক্ষে) তা বলে দাও এবং (এর পরও) যারা (আল্লাহর সাথে) শরীক করে তাদের তুমি উপেক্ষা করো। ৯৫. বিদ্রূপকারী ব্যক্তিদের মোকাবেলায় আমিই তোমার জন্যে যথেষ্ট, ৯৬. যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে তারা অচিরেই (তাদের পরিণাম) জানতে পারবে।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

৯৭. (হে নবী,) আমি (একথা) ভালো করেই জানি, ওরা যা কিছু বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়, ৯৮. অতএব তুমি তোমার মালিকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং তুমিও সাজদাকারীদের দলে শামিল হয়ে যাও, ৯৯. (হে নবী,) যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাছে নিশ্চিত (মৃত্যুজনিত) ঘটনা না আসবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার মালিকের এবাদাত করতে থাকো।

তাফসীর

আয়াত ৮৫-৯৯

আলোচ্য আয়াতটির বক্তব্য অত্যন্ত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। বিস্ময়কর এর বর্ণনাভংগী। আয়াতটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছে যে, এই গোটা সৃষ্টি জগতের পরিকল্পনা সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ, এর পরিচালনা পদ্ধতি তাৎপর্যপূর্ণ এবং সর্বোপরি এই গোটা বিশ্বের পরিণতি এবং এর মাঝে যা কিছু আছে ও বিচরণ করছে-এ সবের পরিণতির বিষয়টিও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

কোনো সৃষ্টিই অনর্থক নয়

গোটা সৃষ্টি জগতের পরিকল্পনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ তা নিছক এমনিই সৃষ্টি করা হয়নি, অনুমানের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি করা হয়নি এবং এর পরিকল্পনায় সামান্যতম কোনো খুঁত ছিলো না, কোনো খাদ ছিলো না, ছিলো না কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি।

এর গঠন প্রণালী তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ যে জিনিস দ্বারা এর সৃষ্টি সেগুলোর বাস্তব ও কার্যকর উপাদান, কোনোটাই অনর্থক নয়, কোনো কল্পিত বা জালিয়াতপূর্ণ উপাদান নয়। তাছাড়া যে প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতি দ্বারা এসব উপাদান নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত সেগুলোও সত্য ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই নিয়ম-নীতি অনড়, অটল ও অবিচল। এর মাঝে কোনো ব্যতিক্রম নেই, কোনো গোলযোগ নেই এবং কোনো পরিবর্তনও নেই।

এই সৃষ্টি জগতের পরিচালনাও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই পরিচালনার পেছনে সত্য, সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ম নীতি কাজ করছে, মনগড়া কোনো নিয়ম নীতি এখানে নেই।

এই সৃষ্টি জগতের পরিণতিও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এই পরিণতি ও শেষ ফলাফল ওই ভারসাম্যপূর্ণ ও চিরন্তন নিয়ম নীতির অধীনেই ঘটবে। নিখিল বিশ্বে যে পরিবর্তন ঘটছে তা সঠিক ভাবেই ঘটছে এবং যথার্থ নিয়মেই ঘটছে। কাজেই আল্লাহর এক ও অভিন্ন অমোঘ বিধানের অধীনেই প্রতিটি কাজের শেষ ফলাফল নির্ণীত হবে।

যে মহাসত্যের সাথে নিখিল বিশ্বের সৃষ্টির বিষয়টি সম্পৃক্ত, সেই সত্যের সাথেই কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিষয়টিও সম্পৃক্ত। গোটা সৃষ্টি জগত যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই সত্যেরই

একটি অংশ হচ্ছে কেয়ামতের আগমনের বিষয়টি। কাজেই এই কেয়ামত স্বয়ং একটি সন্দেহাতীত বাস্তব বিষয়। এই সত্যকে যারা প্রত্যাখ্যান করছে বা অস্বীকার করছে তাদের আচার আচরণ ও কথাবার্তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করার তোমার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। সত্য চিরকালই সত্য থাকবে। তোমার প্রভুই হচ্ছেন স্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ। তিনি কেবল সৃষ্টিই করেন না, বরং যা সৃষ্টি করেন তার সকল বিষয় সম্পর্কে তিনি পরিপূর্ণ ওয়াকেফহাল। গোটা সৃষ্টি জগত তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্যেরই সাক্ষ্য বহন করে। তিনিই প্রকৃত সত্য। এই সত্য থেকেই সব কিছুর অস্তিত্ব উৎসারিত এবং এই সত্যের মাঝেই সব কিছুর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। তিনি ব্যতীত আর সব কিছুরই অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী মায়া ও কুহেলিকা, কাজেই সেগুলো লয়প্রাপ্ত ও ধ্বংস হতে বাধ্য। কিন্তু গোটা সৃষ্টি জগতের অন্তরালে যে মহাসত্য সদা বিরাজমান, তার কোনো লয় নেই, ক্ষয় নেই, ধ্বংস নেই। সেই মহা সত্যের আলো থাকবে চির ভাস্কর ও অবিনশ্বর।

এই মহা সত্যের সাথেই সম্পৃক্ত সেই চির সত্যবাণী যার বাহক হচ্ছেন নবী রসূলরা। এই চির সত্য বাণীরই অন্যতম হচ্ছে আল কোরআন। তাই বলা হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি তোমাকে সাত আয়াত (বিশিষ্ট একটি সূরা) দিয়েছি, যা (নামাযের ভেতর ও বাইরে) বারবার পঠিত হয়, আরো (দিয়েছি জীবনের বিধান হিসাবে মহাগ্রন্থ) আল কোরআন।' (আয়াত ৮৭)

আলোচ্য আয়াতে 'বার বার পঠিতব্য' বা 'আল মাছানী' বলতে হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী সূরায়ে ফাতেহার সাতটি আয়াতকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ, এই সাতটি আয়াত নামাযের মধ্যে বার বার পড়া হয়। অথবা উক্ত সাতটি আয়াতে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। আর 'মহান আল কোরআন' বলতে গোটা কোরআন শরীফকে বুঝানো হয়েছে।

সৃষ্টি ভোগবিলাস ও ধ্বংস

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, নিখিল বিশ্বের সৃষ্টির সত্যতা এবং কেয়ামতের সত্যতার সাথে পবিত্র কোরআনের প্রসংগটি উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত এর দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, নিখিল বিশ্ব, গোটা সৃষ্টি জগত এবং কেয়ামতের বিষয়টি যে মহা সত্যের সাথে সম্পৃক্ত, তারই সাথে সম্পৃক্ত এই পবিত্র কোরআনও। এই কোরআন স্রষ্টার অমোঘ বিধানের পরিচয় তুলে ধরে, হৃদয়কে এর প্রতি আকৃষ্ট করে, জীবন ও জগতকে কেন্দ্র করে যে অসংখ্য খোদায়ী নিদর্শনাবলী লোক চক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে সেগুলোকে প্রকাশ করে, উন্মোচিত করে এবং সেগুলোর রহস্য ও ভেদ অনুধাবন করার জন্যে মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে আলোড়িত করে। সর্বোপরি ন্যায় ও অন্যায় এবং সত্য ও মিথ্যার ব্যবধান মানুষের সামনে তুলে ধরে। ভালো ও মন্দ এবং মংগল ও অমংগলের পার্থক্য মানুষের সামনে তুলে ধরে। মোট কথা এই পবিত্র কোরআনও সেই মহা সত্য হতেই উৎসারিত যার ইংগীতে গোটা সৃষ্টি জগত অস্তিত্ব লাভ করেছে। গোটা সৃষ্টি জগতের অস্তিত্ব যেমন সত্য, ঠিক তেমনি সত্য এই পবিত্র কোরআনও। চিরন্তন ও শাশ্বত খোদায়ী বিধানের ন্যায়ই চিরন্তন এই কোরআন। এটা ক্ষণস্থায়ী ও বিলীন হয়ে যাওয়ার মতো কোনো বস্তু নয়। এই কোরআন চিরকাল বিদ্যমান থেকে জীবনের দিকনির্দেশনা দিয়ে যাবে, জীবনের গতি ও ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে যাবে। অবিশ্বাসী ও খোদাদ্রোহীদের শত ব্যংগ-বিদ্রূপ, তাদের শত অনীহা অবিশ্বাস এর অস্তিত্ব ও প্রভাবকে খাটো করতে পারবে না। কারণ সে সবের ভিত্তি হচ্ছে মিথ্যার ওপর। আর মিথ্যার কোনো স্থায়িত্ব নেই। গোটা সৃষ্টি জগতে এর অস্তিত্ব হচ্ছে আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী।

কাজেই যিনি মহাসত্য হতে উৎসারিত এই পবিত্র কোরআনের ধারক হবেন, বাহক হবেন এবং যিনি সেই মহাসত্যের সাথে সম্পৃক্ত পবিত্র বাণী তথা কোরআনের প্রচারক ও প্রসারক হবেন তাঁর দৃষ্টি কখনও ক্ষণস্থায়ী কোনো বস্তুর প্রতি নিবদ্ধ থাকতে পারে না, পৃথিবীর মায়াবী কোনো চাকচিক্য তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে না। তাঁর পরিণতি কখনও বাতিলপন্থী ও ভ্রষ্ট লোকদের ন্যায় হতে পারে না। তাঁর চলার পথে কোনো কিছুই বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। বাতিলপন্থীদের কোনো আচরণই তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। তিনি সব কিছুকে উপেক্ষা করে সত্যের পথেই চলতে থাকবেন। এ কথাই নিচের আয়াতে বলা হয়েছে।

'(আর এই কোরআনের শিক্ষা হচ্ছে,) আমি এই (কাফেরদের) মাঝে কিছু লোকদের ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনো তোমার দু চোখ তুলে তাকাবে না, (ঈমান না আনার জন্যে) তাদের ওপর তুমি কোনো ক্ষোভ করবে না, বরং (ওদের কথা বাদ দিয়ে) তুমি ঈমানদারদের দিকেই ঝুঁকে পড়ো।' (আয়াত ৮৮)

অর্থাৎ জাগতিক জীবনে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে অনেককে ভোগ বিলাসিতার যে সব উপায় উপকরণ দান করা হয়েছে সেগুলোর প্রতি তুমি আদৌ দৃষ্টিপাত করবে না। আগ্রহের দৃষ্টি ভোগের দৃষ্টি অথবা কামনার দৃষ্টি কোনো দৃষ্টিই সে দিকে নিক্ষেপ করা যাবে না। কারণ সেগুলো ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা, আর তুমি যার ধারক ও বাহক তা হচ্ছে চিরস্থায়ী ও চির সত্য।

আলোচ্য আয়াতের উক্ত বক্তব্যের অর্থ এটা মোটেও নয় যে, যারা বঞ্চিত তারা বঞ্চনাকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে আর ভোগ বিলাসিতায় লিপ্ত লোকদেরকে ওই অবস্থায়ই ছেড়ে দেয়া হবে। সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে গোটা সমাজ যদি দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে; একটি শ্রেণী মযলুম ও বঞ্চিত আর অপর শ্রেণীটি ভোগবাদী ও বিলাসী, এরূপ পরিস্থিতিকে ইসলাম কখনও মেনে নিতে পারে না। কারণ ইসলামের ভিত্তি হক ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইসলাম চায় যে, এই গোটা সৃষ্টি জগতও হক ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকুক। কাজেই ইসলাম কখনও অন্যায় ও অসাম্যকে মেনে নিতে পারে না।

বরং আলোচ্য আয়াতটিতে একটি বিশেষ বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। বক্তব্যটি এসেছে মূলত দুটো বিষয়ের মধ্যেকার পার্থক্য নির্ণয় করার জন্যে। বিষয় দুটোর একটি হচ্ছে মহাসত্য ও চিরন্তন বাণী সম্বলিত পবিত্র কোরআন যা রসূলকে দান করা হয়েছে। আর অপরটি হচ্ছে তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী জাগতিক জীবনের বিলাস সামগ্রী যা আপাত দৃষ্টিতে চাকচিক্যময় মনে হলেও তা খুবই নগণ্য ও তুচ্ছ। রসূলকে আল্লাহ তায়ালা এসব তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে সত্যের ধারক ও বাহক মোমেন বা আল্লাহর বিশ্বাসী বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বলেছেন। কারণ এই বিশ্বাসী বান্দারাই হচ্ছেন সত্যের অনুসারী, ন্যায়ের অনুসারী। সেই সত্য ও ন্যায় যার ওপর ভিত্তি করে গোটা সৃষ্টি জগত টিকে আছে। আর ওরা হচ্ছে সেই মিথ্যা ও বাতেলের অনুসারী, বিশ্ব চরাচরে যার অস্তিত্ব হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী ও অযাচিত।

ওদের ব্যাপারে তুমি বিচলিত হবে না। আল্লাহর ন্যায় বিচার অনুযায়ী ওরা যে মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হবে সে ব্যাপারে তুমি আদৌ চিন্তিত হবে না। ওদেরকে ওদের প্রাপ্য ও উপযুক্ত পরিণতির হাতেই ছেড়ে দাও। এর পরিবর্তে তুমি

'ঈমানদারদের জন্যে স্বীয় বাহু নত করো'।

কোরআনের বর্ণনাভংগী অনুসারে 'বাহু নত করা' বাক্যাংশ দ্বারা নমনীয়তা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মোমেন বান্দাদের সাথে নরম ব্যবহার, সুন্দর আচরণ ও সৌহার্দপূর্ণ মানসিকতা প্রদর্শন করো। (আয়াত ৮৯)

এটাই হচ্ছে দাওয়াত ও তাবলীগের প্রকৃত পন্থা। এখানে রসূল (স.)-কে কেবল সতর্ককারী বা ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুসংবাদদানকারী গুণটি এখানে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এখানে বক্তব্যটি এসেছে আল্লাহকে অস্বীকারকারী, সত্যের অনুসারীদেরকে উপহাসকারী এবং জাগতিক ভোগ-বিলাসে লিপ্ত একটি জাতিকে কেন্দ্র করে। ওদের ক্ষেত্রে 'ভয় প্রদর্শনকারী বা সতর্ককারী' গুণটি উল্লেখ করাই অধিক সমিচীন ও যুক্তিযুক্ত। কারণ, ওরা পার্থিব আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসিতায় এমনভাবে মত্ত হয়ে পড়েছে যে, সত্যের আহ্বানে সাড়া দেয়ার মতো সুযোগ ওদের নেই, কেয়ামতের ব্যাপারে চিন্তা করার মতো সময় ওদের নেই, যে মহাসত্যের ওপর এই নিখিল বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত সেই সত্যের ব্যাপারে একটু চিন্তা করার মতো ফুরসত ওদের নেই।

রসূল (স.)-কে পবিত্র কোরআন দান করায় বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে পূর্ববর্তী নবী রসূলদেরকে প্রদত্ত ঐশীগ্রন্থ বা আসমানী কেতাব সমূহের ব্যাপারেও কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। ওই প্রসংগে এখানে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী কোনো কোনো নবী রসূলের অনুসারীরা পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে থাকে। তারা কোরআনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে রেখেছে। অর্থাৎ এর যে অংশগুলো তাদের নিজস্ব কেতাবের সাথে সংগতিপূর্ণ সেগুলোকে গ্রহণ করে। আর যে অংশগুলো তাদের কেতাবের অতিরিক্ত অথবা সাংঘর্ষিক ও বিপরীত সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে। অথচ তাদের জানা উচিত ছিলো যে, কোরআন হচ্ছে সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ যা পরিপূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পূর্ববর্তী সকল ধর্ম ও ঐশী গ্রন্থগুলোর পরিপূরক। নিচের আয়াতে ওই শ্রেণীর লোকদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে।

'(হে নবী, তোমার ওপর আমি যেভাবে এটা নাযিল করেছি) সেভাবে.... সে বিষয়ে যা কিছু আচরণ ওরা (কোরআনের সাথে) করেছে।' (আয়াত ৯০, ৯১, ৯২ ও ৯৩)

তোমাকে আমি সাতটি পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কোরআন দান করেছি। তোমার পূর্ববর্তী রসূলদেরকেও আমি ঐশী গ্রন্থ দান করেছি। কাজেই এক্ষেত্রে তুমি অন্যান্য নবী রসূলদের থেকে ভিন্ন কোনো সত্ত্বা নও। তোমার প্রতি প্রেরিত বাণীও আজগুবী কিছু নয়, বরং তা ও পূর্ববর্তী নবী রসূলদের প্রতি প্রেরিত বাণীরই অনুরূপ। কারণ এ সব বাণী মূলত একই সূত্রে গাতা এবং এ সবের উৎসও অভিন্ন, আর ওই অভিন্ন উৎস হচ্ছে স্বয়ং আমি আল্লাহ তায়ালা। স্বয়ং আমিই সকল আসমানী কেতাব নাযিল করেছি। কাজেই আমার নাযিলকৃত ও প্রেরিত কেতাবগুলোর কোনো একটিকে অস্বীকার করা বিশেষ করে তাদের জন্যে আদৌ উচিৎ হবে না-যাদেরকে আমি ইতিপূর্বে কেতাব দান করেছি। যুগের চাহিদা ও মানুষের চাহিদার বিষয়টি আমি ছাড়া আর কে ভালো জানে? আমি যুগ চাহিদার প্রতি লক্ষ্য করেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিধি-বিধান সম্বলিত কেতাব নাযিল করেছি। অথচ যাদেরকে আমি ইতিপূর্বে কেতাব দান করেছি তারা এই বাস্তবতাটুকু উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং কোরআন শরীফকে তারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে। কিছু অংশকে তারা গ্রহণ করেছে আর কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কাজেই এই অপরাধের ব্যাপারে আমি তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করবো। (আয়াত ৯২)

এই জিজ্ঞাসাবাদের পরের পরিণতি কি হবে তা সবারই জানা আছে।

প্রকাশ্য দাওয়াতের আদেশ

প্রসংগ এই পর্যন্ত পৌঁছার পর এখন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং রসূলকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, তিনি যেন নিজের পথেই থাকেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সব নির্দেশ প্রাপ্ত হন তা যেন প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেন। এই ঘোষণা বজ্রকণ্ঠে দিতে হবে, এ ব্যাপারে কোনো কাফের-মোশরেককে তোয়াক্কা করলে চলবে না। কারণ মোশরেকদের ভয়াবহ পরিণতির ব্যাপারটি তারা নিজেরাই পরে জানতে পারবে। এই ঘোষণা দিতে গিয়ে কোনো ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীকে পরোয়া করাও চলবে না। কারণ ওদের জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। তাছাড়া ওদের ওই ঠাট্টা-বিদ্রূপ কখনও দাওয়াতী কাজকে প্রভাবিত করতে পারবে না। এ প্রসংগটিই নিচের আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

'অতএব তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তুমি.... যারা আজ আল্লাহর সাথে অন্যকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে তারা অচিরেই জানতে পারবে (কতো গোমরাহীতে তারা নিমজ্জিত ছিলো)।' (আয়াত ৯৪, ৯৫ ও ৯৬)

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রসূল (স.) একজন মানুষ ছিলেন। দুঃখ-কষ্টে তাঁর মনও ব্যথিত হতো। বিশেষ করে যখন আল্লাহর সাথে প্রকাশ্যে শেরেক করা হতো এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকে উপহাস করা হতো তখন তিনি ব্যথিত ও মর্মাহত না হয়ে পারতেন না। শেরেক ও গোমরাহীপূর্ণ কর্মকান্ড দেখে তিনি মনে আঘাত পেতেন। তাই তাঁকে স্বীয় প্রভুর প্রশংসা ও এবাদাত -বন্দেগীতে মশগুল থাকার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এর ফলে মনের ব্যথা লাঘব হবে, মনের কষ্ট দূর হবে। পরম বিশ্বাস অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত এই এবাদাত-বন্দেগীতে সদা মশগুল থাকতে হবে। এর পর স্বয়ং মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ হবে। এই বিষয়টিই নিচের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

'(হে নবী) আমি (একথা) ভালো করেই জানি যে, ওরা যা কিছু.... এবং তোমার (নিশ্চিত) মৃত্যু আসা পর্যন্ত তুমি তোমার মালিকের এবাদাত করতে থাকো।' (আয়াত ৯৭, ৯৮ ও ৯৯)

আলোচ্য সূরাটি সমাপ্ত হয়েছে দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করে। একটি হচ্ছে কাফের মোশরেকদেরকে এড়িয়ে চলতে হবে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আল্লাহর সান্নিধ্যে আশ্রয় খুঁজতে হবে। নিশ্চয়ই এমন একটি দিন আসবে যেদিন কাফেররা মোমেন মুসলমান হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করবে।

সূরা আন নাহল

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরাটার সূর, তাল ও লয় শান্ত ও স্বাভাবিক। তবে এর আলোচিত বিষয়বস্তু অনেক ও রকমারি। এর প্রেক্ষাপট ব্যাপক ও সুপ্রশস্ত। এর ঝংকার প্রভাবশালী ও বহু সংখ্যক এবং এর ভেতরে উৎসারিত প্রেরণা ও অত্যন্ত গভীর।

রসূল (স.)-এর মক্কী জীবনে নাযিল হওয়া অন্যান্য সূরার মতো এ সূরাটাও আল্লাহর গুণ বৈশিষ্ট্য, ওহী ও পরকাল-এই তিনটি প্রধান বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। তবে এই প্রধান বিষয় কয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু আনুষংগিক বিষয়ও আলোচ্য সূচীর আওতাভুক্ত। যেমন এতে ইবরাহীম (আ.) ও মোহাম্মদ (স.)-এর আনীত খোদায়ী বিধানের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনাকারী তাওহীদ এবং ঈমান, কুফুরী, হেদায়াত ও গোমরাহী সংক্রান্ত মানবীয় ইচ্ছা ও আল্লাহর ফয়সালার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে আলোচিত হয়েছে রসূলের দায়িত্ব, রসূলকে প্রত্যাখ্যানকারীদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি, হালালকে হারাম করা, হারামকে হালাল করা ও এ বিষয়ে পৌত্তলিকদের ধ্যান ধারণা, আল্লাহর পথে হিজরত, মুসলমানদেরকে নির্যাতনের মাধ্যমে ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করা, ঈমানের পর পুনরায় কুফুরী করা আল্লাহর কাছে এ সবের জন্যে নির্ধারিত শাস্তি, পারস্পরিক লেনদেন, ন্যায়-বিচার, পরোপকার, আল্লাহর পথে দান এবং ওয়াদা পালন ইত্যাদিও, যা ওই প্রধান আকীদাভিত্তিক আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট। মোটকথা বহু সংখ্যক আলোচ্য বিষয়ে সুরাটা পরিপূর্ণ।

কিন্তু যে পটভূমিতে এ বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে এবং যে ময়দানে এ ঘটনাগুলো ঘটেছে, তা অত্যন্ত ব্যাপক ও সুপ্রশস্ত। এই পটভূমি ও ময়দানের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আকাশ ও পৃথিবী, আকাশ থেকে নামা বৃষ্টি, ক্রমবর্ধনশীল বৃক্ষ, রাত দিন, চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র, সাগর, পাহাড় পর্বত, নদ নদী ও রাস্তাঘাট। এক কথায় বলা যায়, গোটা মানব জীবন, তার ঘটনাবলী ও পরিণাম, গোটা পরকালীন জীবন, তার মূল্যবোধ ও দৃশ্যাবলী এবং সমগ্র অদৃশ্য জগত, তার বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য, মানব সত্ত্বা ও প্রকৃতির ওপর তার সুগভীর প্রভাব– এ সবকিছু নিয়ে এ সূরার আলোচনা ও পটভূমি গঠিত।

এ বিস্তীর্ণ ময়দানে সূরাটা তার বক্তব্য পেশ করে। এ বক্তব্য যেন পথনির্দেশ দান, মনমগযকে উদ্বুদ্ধকরণ ও বিবেক বুদ্ধিকে অনুপ্রেরণা জোগানোর একটা বিরাট উদ্যোগ ও অভিযান। এ অভিযান খুবই শান্ত ও ধীর লয়ে পরিচালিত। তবে সেখানেও বৈচিত্র্য রয়েছে। রয়েছে একাধিক সুরের ব্যঞ্জনা। তাতে যদিও বজ্রের তুর্যনিনাদ নেই কিংবা সংগীতের মিহি সুর নেই, কিন্তু তা তার সমস্ত মৃদুমন্দতা সত্তেও মানব সত্ত্বার প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রী ও প্রতিটি প্রত্যংগকে সম্বোধন করে এবং তার বিবেক-বুদ্ধি ও ভাবাবেগকে একই সাথে উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করে। সে তার চোখকে দেখতে, কানকে শুনতে, স্নায়ুকে অনুভূতিশীল হতে, আবেগকে সচেতন হতে এবং বিবেক বুদ্ধিকে চিন্তা গবেষণা করতে বলে। সে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিকে তথা আকাশ ও পৃথিবীকে, সূর্য ও চন্দ্রকে, রাত ও দিনকে, পাহাড় ও সাগরকে, নদ নদী ও উপত্যকাকে, ছায়া ও আশ্রয়স্থলকে, উদ্ভিদ ও ফলমূলকে এবং পশু ও পাখীকে একই সমতলে সমবেত করে। একই সমতলে সমবেত করে দুনিয়া ও আখেরাতকে এবং দৃশ্য অদৃশ্য সব কিছুকে। এ সবই মানুষের অংগ প্রত্যংগে, স্নায়ুতন্ত্রীতে এবং

হৃদয় ও বিবেকে অপ্রতিরোধ্য প্রভাব সৃষ্টির হাতিয়ার। একমাত্র নিষ্ক্রীয় বিবেক, মৃত হৃদয় ও বিকৃত চেতনা ছাড়া আর কোনো কিছুই এ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে না।

এই সূরা মানুষকে একদিকে যেমন প্রকৃতিতে বিরাজমান আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও মানুষকে দেয়া আল্লাহর নেয়ামতগুলোর প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করে, তেমনি কেয়ামতের দৃশ্যাবলী, মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার দৃশ্যাবলী এবং অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর ধ্বংসযজ্ঞের চিত্রও তার সামনে তুলে ধরে। সেই সাথে মানুষের সেই সব ভাবাবেগকেও জাগিয়ে তোলে, যা মানব হৃদয়ের সুপ্ত চিন্তা চেতনার সন্ধান দেয়। সন্ধান দেয় মাতৃগর্ভে থাকাকালে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে, বার্ধক্যে, দুর্বল ও শক্তিমান অবস্থায়, স্বচ্ছল ও দারিদ্র অবস্থায় মানুষ কিভাবে জীবন ধারণ করে, তারও। অনুরূপভাবে উদাহরণাবলী ও সহজ সরল ঘটনাবলীর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যাও পেশ করে।

সূরার সবচেয়ে গভীর তাৎপর্যময় অংশ হলো প্রকৃতি সংক্রান্ত আয়াতগুলো যা সৃষ্টির মাহাত্ম্য, সম্পদের বিশালতা এবং জ্ঞান ও কুশলতার বিরাটত্বকে ফুটিয়ে তোলে। এগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং পরস্পরের সাথে যুক্ত। এই বিশাল ও বিস্ময়কর সৃষ্টি জগত, যা মহান স্রষ্টার সীমাহীন জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এমনভাবে সৃজিত ও পরিচালিত, যাতে তা মানুষের সুখ শান্তির উপকরণ হয় এবং তাদের শুধু অপরিহার্য প্রয়োজনই পূরণ করে না, বরং তাদের বিভিন্ন শখও পূরণ করে। একদিকে তা প্রয়োজনও পূরণ করে, অপরদিকে তাকে সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপকরণ হিসাবেও গ্রহণ করা হয়, তা দ্বারা দেহ ও মনের আনন্দ ও পরিতৃপ্তিও সাধিত হয়। মানুষ যাতে আল্লাহর কৃতজ্ঞ হয়, সে জন্যেই এতো সব নেয়ামতের ব্যবস্থা।

এ কারণেই এ সূরায় নেয়ামত ও তার শোকরের বিষয় আলোচিত হয়েছে, এ সবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং এ সব বিষয়ে সূরার বিভিন্ন অংশে মন্তব্য করা হয়েছে, বিভিন্ন উদাহরণ এবং বিভিন্ন নমুনাও পেশ করা হয়েছে। নেয়ামতের শোকর আদায়ের শ্রেষ্ঠতম নমুনা পেশ করেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। বলা হয়েছে, তিনি (হযরত ইবরাহীম) আল্লাহর নেয়ামতের শোকরকারী ছিলেন। তাই আল্লাহ তায়ালা তাকে নির্বাচন করেছিলেন এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলেন।

এ সব আলোচনাই সম্পন্ন হয়েছে পরিপূর্ণ সমন্বয়ের মাধ্যমে। সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আলোচিত দৃশ্যাবলী, বক্তব্যসমূহ ও আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে। তাফসীর আলোচনা করার সময় এ সবের কিছু কিছু নমুনা তুলে ধরবার আশা রাখি।

প্রথমে সূরার প্রথম অধ্যায়টার তাফসীরে মনোনিবেশ করছি। এ অধ্যায়টার আলোচ্য বিষয় হলো তাওহীদ। এ তাওহীদের মাধ্যম হলো সৃষ্টি জগতে বিরাজিত আল্লাহর নিদর্শনাবলী, আল্লাহর নেয়ামতসমূহ, গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়সমূহ এবং দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কে তাঁর সর্বাত্মক জ্ঞান।

সূরা আন নাহল

আয়াত ১২৮ রুকু ১৬

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَتٰىٓ أَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝١ يُنَزِّلُ
الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ أَنْ أَنْذِرُوْٓا أَنَّهٗ لَآ
إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاتَّقُوْنِ ۝٢ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ ۝٣ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝٤ وَالْأَنْعَامَ
خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ۝٥ وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ
تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ۝٦ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. (এ বুঝি) আল্লাহ তায়ালার (আযাবের) আদেশ এসে গেলো! অতপর (হে কাফেররা), এর জন্যে তোমরা (মোটেই) তাড়াহুড়ো করো না; তিনি মহিমান্বিত, এ (যালেম) লোকেরা তাঁর সাথে (অন্যদের) যে (ভাবে) শরীক করে, তিনি তার থেকে অনেক উর্ধ্বে। ২. তিনি ওহী দিয়ে তাঁর আদেশবলে তাঁর যে বান্দার ওপর চান ফেরেশতাদের পাঠান, মানুষদের সতর্ক করে দাও, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, অতএব তোমরা আমাকেই ভয় করো। ৩. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে যথাবিধি তৈরী করেছেন; তারা যাদের (তাঁর সাথে) শরীক করে তিনি তার চাইতে অনেক উর্ধ্বে। ৪. তিনি (ক্ষুদ্র একটি) শুক্রকণা থেকে (যে) মানুষ তৈরী করেছেন– (আশ্চর্যের ব্যাপার!) সে (এখানে এসে স্বয়ং তার স্রষ্টার সাথেই) প্রকাশ্য বিতর্ককারী বনে গেলো! ৫. তিনি চতুষ্পদ জানোয়ার পয়দা করেছেন, তোমাদের জন্যে ওতে শীত বস্ত্রের উপকরণ (সহ) আরো অনেক ধরনের উপকার রয়েছে, (সর্বোপরি) তাদের কিছু অংশ তোমরা তো আহারও করে থাকো, ৬. তোমরা যখন গোধূলিলগ্নে ওদের ঘরে ফিরিয়ে আনো, আবার প্রভাতে যখন ওদের (চারণভূমিতে) নিয়ে যাও, তখন এর মাঝে তোমাদের জন্যে (নয়নাভিরাম) সৌন্দর্য উপকরণ থাকে, ৭. তোমাদের (পণ্য সামগ্রীর) বোঝাও তারা (এমন দূর দূরান্তের) শহরে (বন্দরে) নিয়ে যায়, যেখানে প্রাণান্তকর কষ্ট ব্যতিরেকে তোমরা (কোনোদিনই সেসব পণ্য নিয়ে) পৌঁছুতে

بَلِغِيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝٧ وَالْخَيْلَ

وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٨ وَعَلَى

اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدٰىكُمْ أَجْمَعِينَ ۝٩ هُوَ الَّذِىٓ

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝١٠ يُنْبِتُ

لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۚ

إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝١١ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝١٢ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِى الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوٰنُهُ ۚ إِنَّ فِى ذٰلِكَ

لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ۝١٣

পারতে না; অবশ্যই তোমাদের মালিক তোমাদের ওপর স্নেহপরায়ণ ও পরম দয়ালু, ৮. (তিনি) ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা (সৃষ্টি করেছেন), যাতে তোমরা আরোহণ করো, (এ ছাড়া তাতে) শোভা (বর্ধনের ব্যবস্থাও) রয়েছে; তিনি আরো এমন (অনেক ধরনের জন্তু জানোয়ার) পয়দা করেছেন, যার (পরিমাণ ও উপযোগিতা) সম্পর্কে তোমরা (এখনও পর্যন্ত) কিছুই জানো না। ৯. আল্লাহ তায়ালার ওপরই (নির্ভর করে মানুষদের) সরল পথ নির্দেশ করা, (বিশেষ করে) যেখানে (অন্য পথের মধ্যে) কিছু বাঁকা পথও রয়েছে, তিনি যদি চাইতেন তাহলে তিনি তোমাদের সবাইকেই সরল পথে পরিচালিত করতে পারতেন।

রুকু ২

১০. তিনিই আসমান থেকে তোমাদের জন্যে পানি বর্ষণ করেন, তার কিছু অংশ হচ্ছে পান করার আর (কিছু অংশ এমন, সেখানে) তা দ্বারা গাছপালা (জন্মায়) যাতে তোমরা (জন্তু জানোয়ারদের) প্রতিপালন করো। ১১. সে (পানি) দ্বারা তিনি তোমাদের জন্যে শস্য উৎপাদন করেন– যায়তুন, খেজুর ও আংগুর (সহ) সব ধরনের ফল (জন্মান), অবশ্যই এর মাঝে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে (অনেক) নিদর্শন রয়েছে। ১২. তিনি তোমাদের (সুবিধার) জন্যে রাত, দিন ও চাঁদ সুরুজকে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন; নক্ষত্ররাজিও তাঁর আদেশে নিয়ন্ত্রণাধীন (রয়েছে), অবশ্যই এর মাঝে তাদের জন্যে (প্রচুর) নিদর্শন রয়েছে যারা বোধশক্তিসম্পন্ন, ১৩. রং বে-রংয়ের আরো অনেক বস্তুও (তিনি তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন), যা পৃথিবীর বুকে তিনি তোমাদের জন্যেই সৃষ্টি করে রেখেছেন; অবশ্যই এসব (কিছুর) মাঝে সেসব জাতির জন্যে নিদর্শন রয়েছে যারা (এসব থেকে) নসীহত

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً

تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾ أَفَمَنْ يَخْلُقُ

كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ

إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ

يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ

أَحْيَاءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾

গ্রহণ করে। ১৪. তিনিই সমুদ্রকে (তোমাদের) অধীনস্থ করে দিয়েছেন, যেন তার মধ্য থেকে তোমরা তাজা মাছ খেতে পারো এবং তা থেকে তো তোমরা (মণিমুক্তার) গহনাও আহরণ করো, যা তোমরা পরিধান করো, তোমরা দেখতে পাচ্ছো, কিভাবে ওর বুক চিরে জলযানগুলো এগিয়ে চলে, যেন তোমরা এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ (রেযেক) সন্ধান করতে পারো, (সর্বোপরি) তোমরা যেন তাঁর (নেয়ামতের) কৃতজ্ঞতা আদায় করো। ১৫. তিনিই যমীনের মধ্যে পাহাড়সমূহ রেখে দিয়েছেন, যাতে করে যমীন তোমাদের নিয়ে (এদিক সেদিক) ঢলে না পড়ে, তিনিই নদী ও পথঘাট বানিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা (সব জায়গা দিয়ে নিজেদের) গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে পারো, ১৬. (তিনি তোমাদের জন্যে) বিভিন্ন (ধরণের) চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন, (তা ছাড়া) নক্ষত্রের (অবস্থান) দ্বারাও তারা পথের দিশা পায়। ১৭. অতপর (তোমরাই বলো,) যিনি (এতো কিছু) সৃষ্টি করেন তিনি কি (করে) তার মতো (হবেন) যে কিছু সৃষ্টিই করতে পারে না; তোমরা কি (এ থেকে) কোনো উপদেশ গ্রহণ করবে না? ১৮. তোমরা যদি (তোমাদের ওপর) আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতগুলো গণনা করতে চাও, তাহলে কখনো তা গণনা (করে শেষ) করতে পারবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ১৯. তোমরা যা কিছু গোপন রাখো আর যা কিছু প্রকাশ করো, আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন। ২০. আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এরা কার্যসিদ্ধির জন্যে যাদের ডাকে, তারা তো নিজেরা কিছুই পয়দা করতে পারে না, বরং তাদেরই সৃষ্টি করা হয়; ২১. সেগুলো তো হচ্ছে (কতিপয়) মৃত (বস্তু), জীবিত কিছু নয়, (অথচ) তাদের (এটুকুও) বোধ নেই যে, তাদের কখন আবার উঠিয়ে আনা হবে।

তাফসীর

আয়াত ১-২১

'আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে। কাজেই এর জন্যে তাড়াহুড়ো করো না। ওরা যে সব শরীক সাব্যস্ত করেছে, তিনি তা থেকে পবিত্র।.... (আয়াত ১-৩)

মক্কার মোশরেকরা রসূল (স.)-কে তাড়া দিতো যে, দুনিয়া বা আখেরাতের আযাব দ্রুত নিয়ে এসো। যখনই তাদের অবকাশ বাড়িয়ে দেয়া হতো এবং আযাব আসতো না, তখনই তারা বেশী করে তাড়াহুড়ো করতো। শুধু তাড়াহুড়ো নয়, বেশী করে ঠাট্টা বিদ্রূপও করতো এবং বেশী করে ধৃষ্টতাও দেখাতো। তারা মনে করতো যে, মোহাম্মদ (স.) তাদেরকে এমন সব জিনিসের ভয় দেখায়, যার আদৌ কোনো অস্তিত্ব নেই, যাতে তারা তার ওপর ঈমান আনে ও তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। আল্লাহ তায়ালা যে কী উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবকাশ দেন, তা তারা উপলব্ধিই করতো না। তাঁর প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনাই করতো না এবং কোরআনের আয়াতগুলোও বুঝতে চেষ্টা করতো না। কোরআনের যে সমস্ত আয়াত বিবেক ও মনকে সম্বোধন করে, তা যে কেবল আযাবের হুংকার সম্বলিত কথাবার্তার চেয়ে ভালো, সেটা তারা বুঝতো না। তারা বুঝতো না যে, যে মানুষকে আল্লাহ তায়ালা বিবেকবুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সম্মানিত করেছেন, তাকে কেবল আযাবের হুমকি দেয়ার চেয়ে যুক্তি দিয়ে বুঝানো বেশী সম্মানজনক।

সূরার শুরুতেই চূড়ান্ত ঘোষণা এসেছে, 'আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে।'

অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ জারি হয়েছে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আর এটুকুই যথেষ্ট তা আল্লাহর নির্ধারিত সময়ে কার্যকরী হবার জন্যে। 'কাজেই তোমরা এর জন্যে তাড়াহুড়ো করো না।' কেননা আল্লাহর যে কোনো নিয়ম তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ীই বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। কারো তাড়াহুড়োতে বা অনুরোধে তা আগপাছ হয় না। সুতরাং আযাব কিংবা কেয়ামতের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এখন সে সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন নির্ধারিত সময়েই হবে। তার এক মুহূর্ত আগেও নয়, পরেও নয়।

সুনিশ্চিত অর্থবোধক এই শব্দটা মনের ওপর প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করে, তা সে যতোই অহংকারী বা শান্ত প্রকৃতির মানুষ হোক না কেন। তদুপরি এ শব্দটা যে অর্থ প্রকাশ করছে তা নিরেট বাস্তবও। কেননা আল্লাহর নির্দেশ মাত্রই কার্যকরী হওয়া অবধারিত। এমনকি আল্লাহর পক্ষ থেকে স্রেফ সিদ্ধান্ত গ্রহণই তাঁর বাস্তবায়িত হওয়ার সমার্থক এবং বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধান করে। কাজেই এ শব্দটাতে অতিরঞ্জিত কিছু নেই এবং অবাস্তবও কিছু নেই। উপরন্তু এর আসল উদ্দেশ্য হলো মানুষের চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করা, যা সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছে।

পক্ষান্তরে এক আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করা এবং শেরেক থেকে উদ্ভূত যাবতীয় ধ্যান ধারণা থেকে আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ পবিত্র এ সব ধ্যান ধারণা যে ধরনেরই হোক এবং মানুষের যতো নিম্নস্তরের চিন্তা চেতনা থেকেই তা উৎসারিত হোক না কেন।

সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর

মানুষের যাবতীয় শেরেকজনিত চিন্তাধারা থেকে পবিত্র ও তার উর্ধে অবস্থানকারী মহান আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে। তিনি সেই আল্লাহ তায়ালা, যিনি মানুষকে গোমরাহীর দিকে ডাকেন না, বরং তিনি মানুষের ওপর আকাশ থেকে নাযিল করেন এমন এক জিনিস, যা তাদেরকে যথার্থ জীবনীশক্তি দান করে এবং তাদের মুক্তি নিশ্চিত করে।

'আল্লাহ তায়ালা নিজের আদেশে ফেরেশতাদেরকে দিয়ে সেই বান্দাদের ওপর জীবনীশক্তি নাযিল করেন, যাদেরকে তিনি ইচ্ছা করেন।'

বস্তুত এই জিনিসটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে দেয়া সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ নেয়ামত। আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে শুধু জীবদেহকে রক্ষাকারী ও মাটিকে উর্বরা শক্তি প্রদানকারী পানিই বর্ষণ করেন না-যেমন সামনের এক আয়াতে বলা হয়েছে-'বরং তিনি ফেরেশতাদেরকে দিয়ে নিজের বিধানও পাঠান নিজের নির্বাচিত বান্দাদের কাছে।'

'রূহ' শব্দ দ্বারা এর ফলকেই বুঝানো হয়েছে। রূহ বা প্রাণ হলো জীবন ও জীবনের উৎস। এ দ্বারা শুধু জৈবিক জীবনই নয়, বরং একাধারে জৈবিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকেও বুঝানো হয়েছে। এ জীবন হচ্ছে একাধারে দেহের জীবন, বিবেকের জীবন, বুদ্ধির জীবন, চেতনার জীবন এবং সমাজদেহেরও জীবন-যা সমাজদেহকে ধ্বংস ও বিনাশ থেকে রক্ষা করে। এই সর্বব্যাপী জীবনই আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে আকাশ থেকে সর্ব প্রথম নাযেল করেন এবং এটাই বান্দাদের ওপর নাযেল করা আল্লাহর প্রথম ও প্রধান নেয়ামত। এ নেয়ামতটা নিয়ে আল্লাহর সবচেয়ে পূত পবিত্র ও নিষ্পাপ সৃষ্টি ফেরেশতারা আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের ওপর অর্থাৎ নবীদের ওপর অবতীর্ণ হন, যার সার কথা হলো, 'মানুষকে এই বলে সাবধান করে দাও যে, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করো।'

বস্তুত সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক না করা এবং একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করাই হলো ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের মূল কথা, প্রাণীর জীবনের নিরাপত্তা বিধানকারী এবং জীবন রক্ষক ও জীবন বিধ্বংসী প্রবণতার চূড়ান্ত সীমারেখা। যে হৃদয় এক আল্লাহর এবাদাত করে না, তা সব সময় লক্ষ্যচ্যুত ও দিশেহারা থাকে এবং ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়। বিভিন্ন দিক থেকে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকা হয়। বিভিন্ন অলীক কল্পনা তাকে বিপথগামী করে, পরস্পর বিরোধী মতাদর্শ তার মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করে, নানা রকম কু-প্ররোচণা তাকে পথভ্রষ্ট করার প্রয়াস পায়। ফলে সে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থির থাকতে পারে না।

'রূহ' শব্দটা দ্বারা এই সব কয়টা অর্থই বুঝানো হয়। বিভিন্ন রকমের নেয়ামতের বিবরণ সম্বলিত এ সূরার শুরুতে এই অর্থগুলোর দিকে ইংগিত দেয়া হয়েছে। এ দ্বারা আল্লাহর সব রকম নেয়ামতকে প্রকাশ করা হয়েছে। তন্মধ্যে আল্লাহর নাযেল করা বিধান ইসলাম হলো সবচেয়ে বড় নেয়ামত, যা ছাড়া অন্য সব নেয়ামত মূল্যহীন। ইসলামী আকীদা ও আদর্শ নামক এই নেয়ামত না পেলে মানুষ সারা পৃথিবীতে আর যতো নেয়ামত তথা সম্পদ আছে, তাদ্বারা সঠিকভাবে উপকৃত হতে পারে না।

এখানে অন্যান্য জায়গার মতো সাবধান করা ও সুসংবাদ দান করা এই উভয়টার উল্লেখ নেই, বরং শুধু সাবধান করার উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকা হয়েছে এবং একেই ওহী ও রেসালাতের উদ্দেশ্য হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা সূরার অধিকাংশই ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী, মোশরেক, আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকারকারী, আল্লাহর হালাল করা জিনিসকে হারাম সাব্যস্তকারী, আল্লাহর সাথে করা অংগীকার ভংগকারী এবং ঈমান আনার পর পুনরায় কুফরীর পথে প্রত্যাবর্তনকারী (মোরতাদ)দেরকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এ জন্যেই সাবধানকরণ বা এনযারের উল্লেখ করাই অধিকতর সমীচীন এবং খোদাভীতি, আখেরাতের আযাবভীতি ও গুনাহর কাজ এড়িয়ে চলার আহ্বান জানানোটাই এখানে অধিকতর অগ্রগণ্য।

এরপর একে একে আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সৃষ্টিকর্তার একত্ব প্রমাণকারী সৃষ্টিসংক্রান্ত নিদর্শনাবলী এবং নেয়ামতদাতার একত্ব প্রমাণকারী নেয়ামতসংক্রান্ত নিদর্শনাবলী উভয়ই রয়েছে। উভয় ধরনের নিদর্শনাবলীকে এক একটা শ্রেণী আকারে তুলে ধরা হয়েছে। তন্মধ্যে সূচনা করা হয়েছে আকাশ, পৃথিবী ও মানুষের সৃষ্টি দিয়ে।

'তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে ন্যায়সংগত উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন।.... তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন.... ' (আয়াত ৩-৪)

বস্তুত ন্যায় ও সত্য হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির ভিত্তি, উভয়ের পরিচালনার ভিত্তি ও উভয়ের মধ্যে বিরাজমান সমস্ত প্রাণী ও অপ্রাণীর পরিচালনার মৌল উপাদান। কেননা এর কোনোটাই উদ্দেশ্যহীন নয় এবং বৃথাও নয়। প্রত্যেকটা জিনিস ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত, ন্যায়ের সাথে সর্বক্ষণ সংশ্লিষ্ট, ন্যায় ও সত্যের পথে ধাবিত এবং পরিশেষে ন্যায় ও সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তিত। 'তাদের শেরেক থেকে তিনি পবিত্র।' অর্থাৎ আল্লাহর সাথে তাঁর যে সকল সৃষ্টিকে তারা শরীক করে, তা থেকে তিনি পবিত্র। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনিই একক ও লা-শরীক স্রষ্টা।

'মানুষকে তিনি এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর সহসাই সে তাঁর প্রকাশ্য বিতর্ককারী হয়ে গেলো!' (আয়াত-৪) তাঁর সূচনা ও পরিণতিতে কী বিরাট প্রভেদ! কোথায় সে ছিলো এক ফোঁটা বীর্য, আর কোথায় সে পরিণত হয় এক তার্কিক প্রতিদ্বন্দ্বীতে, যে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে বাকবিতন্ডায় লিপ্ত হয়, তাঁর কুফরী করে, তাঁর অস্তিত্বকে অথবা একত্বকে অস্বীকার করে! আয়াতের ভাষা থেকে যে দৃশ্যটা ফুটে ওঠে, তা থেকে মনে হয়, তার বীর্য থেকে জন্ম গ্রহণ ও প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হওয়ার মাঝখানে কোনো ব্যবধান নেই। এভাবে আয়াতে সূচনা ও শেষ পরিণতির মধ্যবর্তী ব্যবধানটাকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলা হয়েছে, যাতে পার্থক্যটা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায় এবং এক স্তর থেকে অপর স্তরের দূরত্বটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এভাবে মানুষ তার দুটো দৃশ্যের মাঝে এবং দুটো পরস্পরবিরোধী অংগীকারের মাঝে অবস্থান নেয়। একটা হলো তুচ্ছ বীর্যের দৃশ্য, অপরটা প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হঠকারী মানুষের দৃশ্য। আসলে এখানে এরূপ সংক্ষিপ্ত আকারে দেখানোই কাম্য ছিলো।

আর এই যে সুপ্রশস্ত প্রকৃতির-তথা আকাশ ও পৃথিবীর যে উন্মুক্ত প্রান্তরে মানুষের অবস্থান, সেখানেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর সেই সৃষ্টিগুলোর বিবরণ দিচ্ছেন, যেগুলোকে তিনি মানুষের অনুগত করেছেন। প্রথমে পশু দিয়ে শুরু করেছেন-

'পশুগুলোকে তিনি তোমাদের কল্যাণের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। ওগুলোতে তোমাদের জন্যে প্রচুর লাভ ও উপকারিতা রয়েছে ....।' (আয়াত ৫-৮)

যে পরিবেশে সর্বপ্রথম কোরআন নাযেল হয় সে ধরনের পরিবেশে- শুধু তাই নয়, আজও এই পরিবেশে গৃহপালিত পশু যে কতো বড়ো নেয়ামত, তা বুঝতে কোনোই অসুবিধা হয় না। পশু ছাড়া বলতে গেলে মানুষের জীবনই অচল। সে যুগে সাধারণত যে সব পশুর ব্যাপক প্রচলন ছিলো, তা হলো উট, গরু, ভেড়া ও দুম্বা। ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর শুধু বাহন ও বিলাসোপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এগুলো খাওয়া হতো না।(১) এই নেয়ামতটার বর্ণনা দেয়ার সময় কোরআন এ কথাও জানিয়ে দেয় যে, এতে মানুষের প্রয়োজন ও সখ দুটোই পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। পশুর চামড়া, পশম, গোশত, দুধ ও ঘি ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হবার সুযোগ তো রয়েছেই, উপরন্তু দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে মাল পরিবহনের ব্যবস্থাও রয়েছে, যা কিনা মানুষ নিজে বহন করতে কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য হতো। এ সব পশুতে শখ পূরণের ব্যবস্থাও আছে। যেমন সকাল বিকাল এর পিঠে চড়ে ঘোরাফেরা করা যায়। আর ঘোরাফেরার এ দৃশ্যটাও পরম

(১) ঘোড়া খাওয়া যায় কিনা, তা নিয়ে মতভেদ আছে। যেহেতু আলোচ্য আয়াতে ঘোড়াকে শুধু বাহন ও বিলাসোপ-করণ হিসাবে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, তাই এ আয়াত ও অন্য কিছু হাদীস অনুসারে ইমাম আবু হানিফা ঘোড়ার গোস্ত খাওয়াকে হারাম গণ্য করেন। তবে কিছু সহীহ হাদীস ও রসুল (স.)-এর বাস্তব কর্মনীতির আ-লোকে অধিকাংশ ইমামই একে হালাল গন্য করেন।

উপভোগ্য ও মনোরম। এ জিনিসটা শহরবাসীর তুলনায় গ্রামবাসীরাই ভালো উপলব্ধি করে। বস্তুত ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরে পরিবহনের প্রয়োজনটাও যেমন পূরণ হয়, তেমনি সৌন্দর্যের চাহিদাও পূরণ হয়। আল্লাহ তায়ালা এ জন্যেই বলেন, 'যাতে তোমরা এগুলোতে আরোহণ করতে পার এবং তোমাদের সৌন্দর্য চাহিদাও পূরণ হয়।'

মানব জীবন সম্পর্কে কোরআনের দৃষ্টিভংগী

জীবন সম্পর্কে ইসলাম ও কোরআন যে দৃষ্টিভংগি পোষণ করে, তার আলোকে এ বিষয়টি যথেষ্ট মূল্যবান। এ দৃষ্টিভংগিতে সৌন্দর্য একটা মৌলিক উপকরণ। শুধু খাদ্য, পানীয় ও পরিবহনের প্রয়োজন পূরণই নেয়ামত নয়, বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত শখ পূরণও নেয়ামতের অন্তর্ভুক্ত। সৌন্দর্য, বিনোদন এবং পশুর প্রতি আকর্ষণ ও পশু দ্বারা প্রয়োজন পূরণে যে উচ্চতর মানবীয় অনুভূতি তথা আভিজাত্য বোধের স্ফুরণ ঘটে, সে সবও এর আওতাভুক্ত।

'তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি অনুকম্পাশীল।' এ মন্তব্যটার তাৎপর্য এই যে, তোমরা প্রচন্ড শারীরিক পরিশ্রম ছাড়া দূরবর্তী এলাকায় মালপত্র পরিবহন করতে পারতে না। অথচ পশু দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সে প্রয়োজন পূরণ করেছেন। কেননা তিনি তোমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। এভাবে পশুর সৃষ্টিই যে একটা নেয়ামত এবং এ নেয়ামত যে মানুষের ওপর আল্লাহর দয়া ও অনুকম্পার নিদর্শন সে কথাই বুঝানো হয়েছে। 'আর তোমরা জানোনা এমনও অনেক কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন।' খাদ্য, সৌন্দর্য চর্চা ও পরিবহনের সুবিধার জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে পশু সৃষ্টি করেছেন, বিশেষত ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরকে বিনোদন ও পরিবহনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, এ বক্তব্যের ওপর মন্তব্য প্রসংগেই আল্লাহ তায়ালা এ কথা বলেছেন, যাতে মানুষের চিন্তাধারার আওতার মধ্যে সম্ভাব্য নতুন প্রয়োগক্ষেত্র উন্মুক্ত থাকতে পারে এবং পরিবহন, আরোহণ, ও বিনোদনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবিত হতে পারে। সমকালীন পরিবেশ ও রীতি প্রথার বাইরে চিন্তাভাবনা করার পথ ইসলাম রুদ্ধ করতে চায় না। বস্তুত প্রত্যেক যুগের প্রচলিত রীতি প্রথার বাইরেও কিছু রীতি প্রথা থাকতে পারে। আল্লাহ তায়ালা চান মানুষ যেন সে সবের জন্যে অনুসন্ধান চালায় এবং যখন তার সন্ধান পাবে, তখন তার কল্পনাশক্তি ও বোধশক্তি অনেক ব্যাপক ও প্রশস্ত হবে। এভাবে অনুসন্ধান করে যখন নতুন কোনো পন্থা খুঁজে পাবে, তখন মানুষ তাকে গ্রহণ করুক, তার বিরোধিতা না করুক এবং তার ব্যবহার ও তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে গোঁড়ামী অবলম্বন করুক-তা ইসলামের কাছে বাঞ্ছিত নয়। ইসলাম কারো এরূপ কথা বলা পছন্দ করে না যে, 'আমাদের বাপ-দাদা ঘোড়া-গাধা ও খচ্চরের পিঠে চড়তো, আমরাও ওগুলোর ওপরই চড়বো—অন্য কিছুর ওপর চড়বো না, কিংবা কোরআন যেহেতু এই সব পশুর পিঠে চড়ার উল্লেখ করেছে, তাই আমরা এগুলোর পরিবর্তে অন্য কোনো বাহন ব্যবহারই করবো না।

ইসলাম হচ্ছে এমন একটা উন্মুক্ত ও উদার আদর্শের নাম, যা সকল শক্তিকে কাজে লাগানোর যোগ্যতা রাখে এবং জীবনের সকল অবস্থায় সচল থাকে। এ জন্যে কোরআন মানুষের মনমস্তিষ্ককে এমন যাবতীয় জিনিসকে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত করে, যা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত প্রতিভা ও বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ ভবিষ্যতে উদ্ভাবন করবে। এগুলোকে সে উদার ধর্মীয় আবেগ উদ্দীপনা নিয়েই গ্রহণ করবে, যা প্রাকৃতিক জগতের নিত্য নতুন বিস্ময়কর সৃষ্টিকে, বিজ্ঞানের নিত্য নতুন উদ্ভাবনকে এবং জীবনের সকল নব উদঘাটিত রহস্যকে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত থাকে।

পরিবহন, যাতায়াত ও ভ্রমণের এমন বহু নতুন বাহন এ যুগে আবিষ্কৃত হয়েছে, যার কথা সেকালের লোকেরা জানতোই না। আবার ভবিষ্যতেও এমন বহু নতুন উপকরণ উদ্ভাবিত হবে, যা এ কালের লোকদের অজানা। কোরআনে বলা হয়েছে,

'তিনি এমন আরো বহু জিনিস সৃষ্টি করেন, যা তোমরা জানো না। এই কথাটা দ্বারা মন মস্তিষ্ককে সব ধরনের হঠকারিতা ও গোঁড়ামী ঝেড়ে ফেলে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার উদ্ভাবনকে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত করে।

পৃথিবীর প্রকাশ্য ও অনুভবযোগ্য গন্তব্যে যাতায়াতের মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনার সাথে সাথেই প্রসংগত আধ্যাত্মিক গন্তব্যে পৌছার আধ্যাত্মিক পথ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে, এটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে পৌছার পথ। এটা গন্তব্যে উপনীত হওয়ার নির্ভুল ও অব্যর্থ পথ। এ ছাড়া আরো কিছু পথ রয়েছে, যা গন্তব্যে পৌছায় না এবং গন্তব্যের সন্ধানও দেয় না। আল্লাহর কাছে পৌছার সঠিক ও নির্ভুল পথের সন্ধান দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিজেই গ্রহণ করেছেন। এই পথের সন্ধান তিনি প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী ও মানব জাতির কাছে প্রেরিত রসূলদের মাধ্যমে দিয়েছেন।

'সরল ও সঠিক পথ আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে। পথগুলোর মধ্যে কিছু বাঁকা পথও রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন।' (আয়াত ৯)

'কাসদুস্ সাবীল' শব্দটার অর্থ 'আস্-সাবীলুল কাসিদ' বা সঠিক ও সোজা পথ, যা তার গন্তব্য পর্যন্ত সোজাসুজি পৌছে যায়। তাতে কোনো বক্রতা নেই এবং তা থেকে বিপথগামী হবার আশংকা নেই। 'জাএর' শব্দটা দ্বারা বাঁকা ও ভ্রান্ত পথ বুঝানো হয়েছে, যা গন্তব্যে পৌছে না।

'তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন।'

তবে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই মানুষকে সৎ ও অসৎ উভয় ধরনের পথে চলার যোগ্য বানিয়েছেন এবং তাকে সৎ কিংবা অসৎ পথে–এর যে কোনোটা নির্ধারণের স্বাধীনতা দিয়েছেন। কাজেই কেউবা সৎ ও সঠিক পথে চলবে, কেউবা অসৎ ও ভ্রান্ত পথে চলবে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কেউ নয়। কেননা আল্লাহর ইচ্ছাই ছিলো এই যে, মানুষকে নির্বাচনের স্বাধীনতা দেয়া হবে।

চিন্তাশীলদের জন্যে কিছু নিদর্শন

এবার শুরু হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি ও নেয়ামত সংক্রান্ত দ্বিতীয় পর্বের আয়াতসমূহ।

'তিনিই সেই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন........' (আয়াত ১০-১১)

আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয় বিশ্ব প্রকৃতিতে আল্লাহর প্রবর্তিত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে। এই নিয়ম বিশ্ব জগতের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা ও তার ফলাফল তৈরী করে স্বয়ং মহান স্রষ্টার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী। এই পানি এখানে আল্লাহর একটা অন্যতম নেয়ামত হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। 'তা থেকে তোমাদের জন্যে পানীয়' এ বাক্য থেকে বুঝা যায়, 'পানের যোগ্য হওয়া পানির একটা বৈশিষ্ট্য এবং এটা একটা অন্যতম নেয়ামত। আবার পশু পালনের যোগ্য বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করাও পানির একটা বৈশিষ্ট্য এবং এটাও একটা নেয়ামত, 'এবং তা থেকে গাছপালা জন্মায় যা দিয়ে তোমরা জন্তু জানোয়ারদের লালন পালন করো।'

অর্থাৎ পানি দ্বারাই সেই সব চারণভূমি তৈরী হয় যাতে তোমরা পশুদেরকে পালন করে থাকো। এ বিষয়টা এখানে আলোচিত হয়েছে ইতিপূর্বে আলোচিত পশু এবং চারণভূমির মধ্যে বিদ্যমান অভিন্ন পরিবেশকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে। অনুরূপভাবে সে সব কৃষি ফসলেরও উল্লেখ করা হয়েছে যা মানুষ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। এগুলোর মধ্যে খেজুর আংগুর ও যয়তুন প্রভৃতি ফলের গাছও রয়েছে।

'এ সবের মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যেভাবে এই বিশ্ব জগতকে পরিচালনা করছেন এবং প্রাকৃতিক নিয়মাবলীকে যেভাবে মানুষের জীবনের অনুকূল বানিয়েছেন তাতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়ম যদি মানব জীবনের অনুকূল না হতো, তার স্বভাব প্রকৃতির সাথে সামস্যশীল না হতো এবং তার প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ না করতো, তাহলে মানুষ এই গ্রহে বেঁচে থাকতে সক্ষম হতো না। পৃথিবী নামক গ্রহে মানুষের সৃষ্টি, এই গ্রহের সাথে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের বর্তমান সম্পর্ক এবং এখানকার আবহাওয়ার প্রকৃতি মানুষের জীবন ধারণের উপযোগী হওয়া ও মানুষের বেচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল কিছুর বিদ্যমান থাকাটা কোনো কাকতালীয় বা আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং মহান আল্লাহর সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা।

যারা বিশ্ব প্রকৃতিকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তারা উপলব্ধি করে যে নিশ্চয়ই মহাবিশ্ব কোনো প্রাজ্ঞ নীতি কৌশল অনুযায়ী পরিচালিত। তারা বৃষ্টি ও বৃষ্টির পানি পেয়ে বেড়ে ওঠা, বৃক্ষ, ফসল ও ফলের সাথে বিশ্ব প্রকৃতির সঠিক সম্পর্ক কী, তা বোঝে এবং এই গোটাসৃষ্টি জগতই যে শুধু তার স্রষ্টার অস্তিত্ব, একত্ব, আর তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার একত্ব নির্দেশক তা অনুধাবন করে। পক্ষান্তরে যারা উদাসীন তারা এ জাতীয় নিদর্শন সকালে– বিকালে, শীতে ও গ্রীষ্মে প্রতিনিয়ত দেখে, কিন্তু তাতে তাদের কোনো কৌতুহল বা অণুসন্ধিৎসার সৃষ্টি হয় না এবং এই অতুলনীয় বিশ্ব ব্যবস্থার মালিক ও প্রভু সম্পর্কে জানার কোনো ইচ্ছাও তাদের জন্মে না।

এরপর আসছে তৃতীয় পর্বের আয়াত

'আর তিনি তোমাদের উপকারার্থে রাত দিন এবং চন্দ্র সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন .... ' (আয়াত ১২)

বস্তুত সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্র মানুষকে দেয়া আল্লাহর এক চমকপ্রদ নেয়ামত এবং সৃষ্টি জগতকে তিনি কিভাবে পরিচালনা করেন তারই দৃষ্টান্ত। এগুলো পৃথিবীতে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে। এগুলোকে মানবজাতির উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। ভেবে দেখুন তো রাত ও দিন মানুষের জীবনের ওপর কতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রাত ছাড়া দিন ও দিন ছাড়া রাত কেমন হতো এবং ওই অবস্থায় পৃথিবীতে মানুষ, জীবজন্তু ও বৃক্ষলতা কিভাবে বেঁচে থাকতো।

চন্দ্র ও পৃথিবীর সাথে অনুরূপভাবে সূর্যের সাথে উভয়ের সম্পর্ক এবং জীবনের অস্তিত্ব ও বিকাশের সাথে তাদের সম্পর্ক চিন্তা করে দেখার মতো।

'আর নক্ষত্রগুলোকে আল্লাহর নির্দেশেই অনুগত করা হয়েছে।'

অর্থাৎ মানুষের এবং আল্লাহর জানা অন্যান্য সৃষ্টির উপকারার্থেই এগুলো করা হয়েছে।

এগুলো আল্লাহর সৃষ্টি পরিচালনার কৌশলেরই একটা দিক এবং সমগ্র বিশ্বজগতে কার্যকর প্রাকৃতিক নিয়মের সমন্বয়েরই নমুনা। যে সব বুদ্ধিমান লোক চিন্তা গবেষণা করে এবং দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে আল্লাহর যে নিয়ম কানুন চালু রয়েছে, তা উপলব্ধি করে তারা এটাও হৃদয়ংগম করে। তাইতো আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই এগুলোর মাঝে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।' মানুষের জন্যে আল্লাহর সৃষ্টিকৃত নেয়ামতসমূহের চতুর্থ নেয়ামত হলো বিভিন্ন ধরনের রং।

'আর যে বিচিত্র রং বেরংয়ের জিনিসগুলো তিনি পৃথিবীতে তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, তাতেও শিক্ষা গ্রহণকারীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।' (আয়াত ১৩)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে মানব জাতির জন্যে যে রকমারি ধাতব পদার্থ সৃষ্টি ও সঞ্চিত করে রেখেছেন, যা দিয়ে বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের জীবন বাঁচে, তাতে নিদর্শন বা শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। ভূগর্ভে লুকানো এ সব জিনিস মানুষের প্রয়োজনের সময় যাতে কাজে লাগে এবং তারা যাতে পরবর্তীকালে জ্ঞানার্জন করে এগুলো বের করতে পারে, সেজন্যে সেগুলোকে সঞ্চিত করে রেখে দেয়া হয়েছে, যখনই একটা খনিজ সম্পদ ফুরিয়ে যায়, অমনি তার চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণে অপর একটা সম্পদ তার স্থান দখল করে। এভাবে বান্দাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা জীবিকা সঞ্চিত করে রাখেন।

'এতে শিক্ষা গ্রহণকারীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।'

অর্থাৎ যারা এ কথা ভুলে যায় না যে, আল্লাহ তায়ালাই তাদের জন্যে এই সম্পদ লুকিয়ে রেখেছেন।

পানের অযোগ্য লবনাক্ত পানিতে পরিপূর্ণ সাগর মহাসাগরে আল্লাহর যে অসংখ্য সৃষ্টি ও সম্পদ রয়েছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে,

'তিনিই সমুদ্রকে তোমাদের অধিনস্থ করেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মাছ ও তার গোশত খেতে পারো, এবং তা থেকে তোমাদের ব্যবহারের জন্যে রত্ন বের করতে পারো। ওই সমুদ্রে তুমি জাহাজও চলাচল করতে দেখবে। আর তোমরা যাতে সমুদ্র থেকে আল্লাহর অনুগ্রহ অর্জন করতে পারো এবং আল্লাহর শোকর করতে পারো, (সেজন্যে সমুদ্রকে পদানত করেছেন)।'

সমুদ্রের সম্পদরাজি এবং প্রাণীসমূহ মানুষের অসংখ প্রয়োজন ও সখ পূরণ করে থাকে। এ সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাছ, যার তাজা গোশত খাদ্য হিসেবে মানুষের খুবই প্রিয়। তারপর এর আশপাশেই উৎপন্ন হয় মনিমুক্তা ইত্যাদি, যা মানুষ অলংকার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। জাহাজের উল্লেখ দ্বারা শুধু ভ্রমণ ও পরিবহনের দিকটা বুঝানো হয়েছে তা নয়, বরং এ কথার মধ্যে সৃষ্টি সৌন্দর্যের এক শৈল্পিক প্রতিচ্ছবিও অংকন করা হয়েছে।

'তুমি দেখবে সমুদ্রে জাহাজ চলাচল করতে'

এ কথাটির ভেতরে দৃশ্য ও দৃশ্যের সৌন্দর্য উপভোগ করার দিকে সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে। ঢেউয়ের বুক চিরে সাগরের বুকে জাহাজ চলার দৃশ্যটা কতো মনোরম ও উপভোগ্য তা সহজেই বোধগম্য। এখানে আমরা পুনরায় প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের চাহিদা ও প্রয়োজন ছাড়াও তার দৃশ্যের বৈচিত্র্যের প্রতি কোরআনের দৃষ্টি আকর্ষণের মহান উদ্যোগ লক্ষ্য করি। কোরআনের আমাদেরকে এই মর্মে সচেতন করছে যে, প্রকৃতির সম্পদ সম্ভার দ্বারা কেবল নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করেই যেন আমরা ক্ষান্ত না থাকি, বরং এর সৌন্দর্যও যেন উপভোগ করি ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি। একইভাবে কোরআন আমাদেরকে সমুদ্র ও সমুদ্রের বুক চিরে জাহাজ চলাচলের দৃশ্যের প্রেক্ষাপটে এবং সমুদ্রের লোনা অপেয় পানিতে যে খাদ্য, রত্ন ও সৌন্দর্যোপকরণ আমাদের আয়ত্তাধীন করে দেয়া হয়েছে, তার প্রেক্ষাপটে আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান ও তাঁর শোকর করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

সূরার এই পর্বের সর্বশেষ দুটো আয়াতে আরো কিছু নেয়ামত ও সম্পদের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

'তিনিই যমীনের মধ্যে পাহাড়সমূহকে গেড়ে দিয়েছেন, যাতে যমীন তোমাদের নিয়ে এদিক সেদিক ঢলে না পড়ে। তিনিই নদী পথ ঘাট ......।'

বড়ো বড়ো পাহাড় পর্বতগুলোর ব্যাপারে আধুনিক বিজ্ঞান আমাদেরকে তেমন জোরালো ও যুক্তিসংগত তেমন কোনো তথ্য দিতে পারে না। কিছু পরস্পর বিরোধী মতবাদ দ্বারা সে ওগুলোর

যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে। ওইসব মতবাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মতবাদ এই যে, পৃথিবীর উষ্ণ অভ্যন্তর ভাগ যখনই ঠান্ডা হয়, তখনই তা কুঁচকে যায় এবং পৃথিবীর উপরিভাগ সংকীর্ণ হয়ে যায়। এর ফলে পাহাড় পর্বত ও উঁচু নীচুর সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোরআন বলে যে, এই সব পাহাড় পর্বত পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান পাহাড়পর্বতের এই ভূমিকার কথা এখনো বলে না।

পাহাড় পর্বতের পাশাপাশি নদনদী ও রাস্তাঘাটের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। নদ নদীর সাথে রয়েছে পাহাড় পর্বতের প্রাকৃতিক সম্পর্ক, কেননা অধিকাংশ নদ নদীর উৎস থাকে পাহাড় পর্বতে, যেখানে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হয়। পাহাড় পর্বত, নদ নদী এবং যাতায়াত, পরিবহন ও পশুর পরিবেশের সাথে রাস্তা ঘাটের সংযোগ রয়েছে। এরই পাশাপাশি রয়েছে পথনির্দেশক নিদর্শনাবলী, যা দেখে পথিকরা পথের সন্ধান পায়। যমীনে এ সব নিদর্শন হলো পাহাড় পর্বত, মালভূমি ও নিম্নাঞ্চল আর আকাশে নক্ষত্র। নক্ষত্র দেখে জলে ও স্থলে পথের দিকনির্দেশনা লাভ করা যায়।

সকল সৃষ্টিই আল্লাহর একাত্মবাদের সাক্ষ্য দেয়

সৃষ্টি, নেয়ামত ও বিশ্ব পরিচালনার বিবরণ সম্বলিত আয়াতগুলোর পর এগুলোর ওপর মন্তব্য করা হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে এই নেয়ামতসমূহের বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যটাই মন্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে। শেরেক পরিহার ও তাওহীদের অনুসরণের ওপর জোর দেয়াই ছিলো আল্লাহর এসব নেয়ামত ও সৃষ্টির বিবরণ দানের উদ্দেশ্য।

'তবে যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি যারা সৃষ্টি করে না তাদের সমকক্ষ হতে পারে? তোমরা কি স্মরণ করবে না? তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা করো, তবে তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না, তিনি দয়ালু ও ক্ষমাশীল। তোমরা যা কিছু গোপন করো ও যা কিছু প্রকাশ করো, তা আল্লাহ তায়ালা জানেন। আর আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে, তারা তো কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদেরকেই তো সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা মৃত নিষ্প্রাণ। তারা কখন পুনরুত্থিত হবে, তা তারা অনুভবই করে না।'

এটা খুবই সময়োচিত মন্তব্য। 'যিনি সষ্টি করেন, তিনি কি যারা সৃষ্টি করে না তাদের সমান? এ প্রশ্নের জবাবে মানুষ 'না' বলতে বাধ্য। আসলে এর জবাব 'না' ছাড়া আর কিছু হতেও পারে না। কেননা যে সত্ত্বা সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা, কেউ এমন কোনো সত্ত্বাকে তাঁর সমান গণ্য করতে পারে না, যে ছোটো বা বড়ো এমন কি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না।

'তবে কি তোমরা স্মরণ করবে না?'

বস্তুত ব্যাপরটা এতোই স্পষ্ট ও সুনিশ্চিত যে, তা শুধু স্মরণ করাই যথেষ্ট। এর চেয়ে বেশী কোনো যুক্তি প্রমাণ দর্শানো বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার কোনোই প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ তায়ালা বহু রকমের নেয়ামতের বিবরণ দিয়েছেন। অতপর এর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন,

'তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা করো, তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না।'

অর্থাৎ নেয়ামতের শোকর আদায় করা তো দূরের কথা, তা গুণে শেষ করাও অসম্ভব, আর অধিকাংশ নেয়ামত এমন যে, মানুষ তো তা জানে না। কেননা এগুলোর সাথে মানুষের আজন্ম লালিত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই এ সব নেয়ামত যখন খোয়া যায়, ঠিক তখন ছাড়া আর কেউ

এগুলোর খোঁজ রাখে না। এ হচ্ছে মানুষের দেহ কাঠামো ও তার ভূমিকা। যখন তার রোগ ব্যাধির দরুন দেহের কর্মক্ষমতা বিগড়ে যায়, তখন ছাড়া সে কি অনুভব করে যে, এতে কোনো নেয়ামত আছে? এরূপ অবস্থায় তার অক্ষমতার জন্যে আল্লাহর ক্ষমা এবং দুর্বল মানুষের প্রতি আল্লাহর দয়া ছাড়া আর কিছুই চাওয়ার মতো থাকতে পারে না। 'আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।'

স্রষ্টা তাঁর গোপন ও প্রকাশ্য সব সৃষ্টিকেই জানেন।

'তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো ও যা কিছু গোপন করো, তা আল্লাহ তায়ালা জানেন।'

কাজেই যে সমস্ত তথাকথিত উপাস্য কিছুই সৃষ্টি করে না এবং কিছুই জানে না, তাদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ গণ্য করা কিভাবে সমীচীন হতে পারে? আসলে যারা তাদেরকে তারা আল্লাহর সমকক্ষ গণ্য করে, তারা মৃত এবং তাদের বেঁচে থাকার কোনো যোগ্যতাই নেই। তাই তাদের কোনো চেতনাও নেই,

'যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের উপাসনা করে, তারা.... মৃত ও নির্জীব, কখন তারা পুনরুত্থিত হবে, তাও তারা জানে না।....

এখানে কেয়ামত ও তার সময়কালের দিকে ইংগিত দেয়া হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে যে, যিনি স্রষ্টা, তাঁর অবশ্যই তাঁর সৃষ্টির পুনরুত্থানের সময় জানা দরকার। কেননা পুনরুত্থান হচ্ছে সৃষ্টিরই পূর্ণতা। এই পুনরুত্থানের মাধ্যমেই সকল প্রাণী তাদের কর্মফল লাভ করে। সুতরাং যে সকল উপাস্য জানে না কখন তার উপাসকদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে, সে সব উপাস্য উপাসনা লাভেরই অযোগ্য। আসলে তারা উপহাসের পাত্র। কেননা স্রষ্টা তার সৃষ্টিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন। আর তা যখন পারেন, তখন কখন পুনরুজ্জীবিত করবেন, তাও তার অবশ্যই জানা থাকবে।

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٢٢﴾ لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ﴿٢٣﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۭ اَلَا سَاۗءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٢٥﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَاۗءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَاۗقُّوْنَ فِيْهِمْ ۭ قَالَ

রুকু ৩

২২. (হে মানুষ,) তোমাদের মাবুদ তো একজন (তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই), অতপর যারা পরকালের ওপর ঈমান আনে না তাদের অন্তরসমূহ (এমনিই সত্য) অস্বীকারকারী হয়ে পড়ে এবং এরা নিজেরাও হয় (দারুণ) অহংকারী। ২৩. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা জানেন, এরা যা কিছু গোপন করে এবং যা কিছু প্রকাশ করে, তিনি কখনো অহংকারীদের পছন্দ করেন না। ২৪. যখন এদের (এ মর্মে) জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাদের মালিক কি ধরনের জিনিস নাযিল করলেন, তখন তারা বলে, তা তো আগের কালের উপকথা (ছাড়া আর কিছুই নয়)। ২৫. ফলে শেষ বিচারের দিন এরা নিজেদের (পাপের) ভার পূর্ণমাত্রায় বহন করবে, (এরা সেদিন) তাদের (পাপের) বোঝাও (বহন করবে) যাদের এরা জ্ঞান (-ভিত্তিক প্রমাণ) ছাড়া গোমরাহ করে দিয়েছিলো; (সেদিন) ওরা যা বহন করবে তা কতো নিকৃষ্ট!

রুকু ৪

২৬. এর আগেও (অনেক) মানুষ (দ্বীনের বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করেছিলো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের (পরিকল্পনার সমগ্র) ইমারত তার ভিত্তিমূল থেকে নির্মূল করে দিয়েছিলেন, তার পর তাদের (এ চক্রান্তরূপী) ইমারতের ছাদ তাদের ওপরই ধসে পড়লো এবং তাদের ওপর এমন (বহু) দিক থেকেই আযাব এসে আপতিত হলো, যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। ২৭. কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা অতপর ওদের (আরো বেশী পরিমাণে) লাঞ্ছিত করবেন, তিনি (তাদের) জিজ্ঞেস করবেন, কোথায় আমার সেসব শরীক যাদের ব্যাপারে তোমরা মানুষদের সাথে বাকবিতন্ডা করতে? যাদের (সঠিক) জ্ঞান দেয়া

الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٧﴾
الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۪ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ
مِنْ سُوْٓءٍ ۭ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ
جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٢٩﴾ وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا
مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۭ قَالُوْا خَيْرًا ۭ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۭ
وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ۭ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٠﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاۗءُوْنَ ۭ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ
الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣١﴾ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ
ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٢﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ

হয়েছিলো তারা (সেদিন) বলবে, অবশ্যই যাবতীয় অপমান লাঞ্ছনা ও অকল্যাণ (আজ) কাফেরদের ওপরই (আপতিত হবে), ২৮. এরা হচ্ছে তারা, ফেরেশতারা (এমন অবস্থায়) যাদের মৃত্যু ঘটায় যখন তারা নিজেদের ওপর যুলুম করতে থাকে, অতপর তারা আত্মসমর্পণ করে (এবং বলে), আমরা তো কোনো মন্দ কাজ করতাম না; (ফেরেশতারা বলবে) হাঁ, তোমরা যা কিছু করতে আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত রয়েছেন। ২৯. সুতরাং (আজ) জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে তোমরা (আগুনে) প্রবেশ করো, সেখানে তোমরা চিরদিন থাকবে, অহংকারীদের আবাসস্থল কতো নিকৃষ্ট! ৩০. (অপরদিকে) পরহেযগার ব্যক্তিদের বলা হবে, তোমাদের মালিক (তোমাদের জন্যে) কি নাযিল করেছেন; তারা বলবে, (হাঁ, এ তো হচ্ছে) মহাকল্যাণ; যারা নেক কাজ করে তাদের জন্যে এ দুনিয়ায়ও কল্যাণ রয়েছে, আর পরকালের ঘর তো হচ্ছে (আরো) উৎকৃষ্ট কল্যাণ; পরহেযগার ব্যক্তিদের (এ) আবাস কতো সুন্দর! ৩১. চিরস্থায়ী এক জান্নাত- যাতে তারা প্রবেশ করবে, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, (উপরন্তু) সেখানে তারা যা কিছুই কামনা করবে তাই তাদের জন্যে (সরবরাহের ব্যবস্থা) থাকবে; এভাবেই আল্লাহ তায়ালা পরহেযগার ব্যক্তিদের (তাদের নেক কাজের) প্রতিফল দান করেন, ৩২. এরা হচ্ছে তারা, ফেরেশতারা যাদের পবিত্র অবস্থায় মৃত্যু ঘটাবে, তারা (তাদের উদ্দেশে) বলবে, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, (দুনিয়ায়) তোমরা যে আমল করতে তারই কারণে আজ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। ৩৩. (হে নবী, তুমি কি মনে করো,) ওরা (শুধু এ

الْمَلٰئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٣٣﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٦﴾

জন্যেই) অপেক্ষা করছে যে, তাদের কাছে (একদিন) ফেরেশতা নাযিল হবে, কিংবা তোমার মালিকের পক্ষ থেকে কোনো (আযাবের) হুকুম আসবে; এদের আগে যারা এসেছিলো তারা এমনটিই করেছে; (এদের ওপর আযাব পাঠিয়ে) আল্লাহ তায়ালা কোনো যুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে। ৩৪. অতপর তাদের ওপর তাদের (মন্দ) কাজের শাস্তি আপতিত হলো, (এক সময়) সে আযাব তাদের পরিবেষ্টন করে নিলো, যা নিয়ে তারা (হামেশা) ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বেড়াতো।

রুকু ৫

৩৫. মোশরেকরা বলে, যদি আল্লাহ তায়ালা চাইতেন তাহলে আমরা তো তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুর এবাদাত করতাম না– না আমরা, না আমাদের বাপ দাদারা (অন্য কারো এবাদাত করতো), আমরা (তাঁর অনুমতি ছাড়া) কোনো জিনিস হারামও করতাম না; একই ধরনের কাজ তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও করেছে, (আসলে) রসূলদের ওপর সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেয়া ছাড়া আর কোনো (অতিরিক্ত) দায়িত্ব কি আছে? ৩৬. আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছি, যাতে করে (তাদের কাছে সে বলতে পারে,) তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো এবং আল্লাহ তায়ালার বিরোধী শক্তিসমূহকে বর্জন করো, সে জাতির মধ্যে অতপর আল্লাহ তায়ালা কিছু লোককে হেদায়াত দান করেন, আর কতেক লোকের ওপর গোমরাহী চেপে বসে গেলো; অতএব তোমরা (আল্লাহর) যমীনে পরিভ্রমণ করো তারপর দেখো, যারা (রসূলদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের কি (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছিলো!

إِنْ تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ

نَاصِرِينَ ﴿٣٧﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ۚ

بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ

الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾ وَالَّذِينَ

هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ

وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا

أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

৩৭. (হে নবী,) তুমি এদের হেদায়াতের ওপর যতোই আগ্রহ দেখাওনা কেন (এরা কখনো হেদায়াত পাবে না), কেননা আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করে দিয়েছেন তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেন না, আর এমন লোকদের (আযাব থেকে বাঁচানোর) জন্যে কোনো সাহায্যকারীও নেই! ৩৮. এরা আল্লাহ তায়ালার নামে শক্ত (ধরনের) শপথ করে বলে, যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে যায় তাকে আল্লাহ তায়ালা কখনো (দ্বিতীয় বার) উঠিয়ে আনবেন না; (হে নবী, তুমি বলো,) হাঁ, (অবশ্যই এটা) তাঁর সত্য ওয়াদা, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তো জানে না, ৩৯. (এটা তিনি) এ জন্যে (করবেন), যে বিষয়ে এরা মতবিরোধ করতো, (কেয়ামতের দিন) তাদের জন্যে তিনি তা স্পষ্ট করে বলে দেবেন এবং যারা (আজ) অস্বীকার করে তারাও (এ কথাটা) জেনে নেবে, তারা সত্যি সত্যিই ছিলো মিথ্যাবাদী। ৪০. আমি যখনই কোনো কিছু (ঘটাতে) চাই, তখন সে বিষয়ে আমার বলা কেবল এটুকুই হয় যে, 'হও' অতপর তা (সংঘটিত) হয়ে যায়।

রুকু ৬

৪১. (স্মরণ রেখো,) যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে (বিশেষ করে ঈমান আনার কারণে) তাদের ওপর যুলুম হওয়ার পর, আমি অবশ্যই তাদের এ পৃথিবীতেই উত্তম আশ্রয় দেবো; আর আখেরাতের পুরস্কার– তা তো (এর থেকে) অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ। (কতো ভালো হতো) যদি তারা কথাটা জানতো! ৪২. যারা (বিপদে) ধৈর্য ধারণ করে এবং যারা আল্লাহর ওপর নির্ভর করে (তাদের জন্যে আখেরাতে অনেক পুরস্কার রয়েছে)। ৪৩. (হে নবী,) আমি তোমার আগেও (এ) মানুষদের মধ্য থেকেই (কিছু ব্যক্তিকে) রসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছি–যাদের ওপর আমি ওহী পাঠিয়েছি, অতএব, যদি তোমরা না জানো তাহলে কেতাবধারীদের জিজ্ঞেস করো, ৪৪. (এ সব নবীকে) আমি সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ ও কেতাব

الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّاتِ أَنْ يَّخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ ۖ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٧﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دٰخِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَّالْمَلٰئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾

সাজদা

সহকারে পাঠিয়েছি, (একইভাবে আজ) তোমার কাছেও কেতাব নাযিল করেছি, যাতে করে যে (শিক্ষা) মানুষদের জন্যে তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, তুমি তা তাদের সুস্পষ্টভাবে বোঝাতে পারো, যেন তারা (নিজেরাও একটু) চিন্তা ভাবনা করে। ৪৫. যারা (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে হীন চক্রান্ত করে, তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত (ও নিরাপদ) হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তায়ালা (এ জন্যে) তাদের ভূগর্ভে ধসিয়ে দেবেন না, কিংবা এমন কোনো দিক থেকে তাদের ওপর আযাব এসে আপতিত হবে না, যা তারা কখনো চিন্তাও করতে পারেনি! ৪৬. কিংবা তাদের তিনি (এমন সময়) পাকড়াও করবেন, যখন তারা চলাফেরা করতে থাকবে, এরা কখনোই তাঁকে (তাঁর কোনো কাজে) অক্ষম করে দিতে পারবে না, ৪৭. অথবা (এমন হবে যে, প্রথমে) তিনি তাদের (কিছু দূর) চলার (অবকাশ) দেবেন, অতপর পাকড়াও করবেন, অবশ্যই তোমার মালিক একান্ত স্নেহশীল ও পরম দয়ালু। ৪৮. এরা কি আল্লাহ তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তার ছায়া আল্লাহর সামনে সাজদাবনত অবস্থায় (কখনো) ডান দিক থেকে (কখনো) বাঁ দিক থেকে (তাঁরই উদ্দেশে) ঢলে পড়ে, এরা সবাই তাঁর সামনে অক্ষমতা প্রকাশ করে যাচ্ছে। ৪৯. যা কিছু আছে আসমানসমূহে এবং এ যমীনে বিচরণশীল যা কিছু আছে, আছে যতো ফেরেশতাকুল, তারা সবাই আল্লাহকে সাজদা করে যাচ্ছে, এদের কেউই (নিজেদের) বড়াই (যাহির) করে না। ৫০. (উপরন্তু) তারা ভয় করে তাদের মালিককে, যিনি (তাদের ওপর) পরাক্রমশালী, তাঁর পক্ষ থেকে তাদের যা আদেশ করা হয় তা তারা (বিনীতভাবে) পালন করে।

তাফসীর

আয়াত ২২-৫০

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বা পূর্বে আমরা দেখেছি যে স্রষ্টার নিদর্শন হলো তাঁর সৃষ্টি, তাঁর বান্দাদেরকে দেয়া তার নেয়ামতসমূহ এবং গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কে তার যথাযথ জ্ঞান। পক্ষান্তরে মিথ্যা খোদায়ীর দাবীদার যারা, তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্টি। তারা কিছুই জানে না, বরং তারা মৃত ও বেঁচে থাকার অযোগ্য। তারা এও জানে না যে, তাদের উপাসকদেরকে কর্মফল দেয়ার জন্যে কখন পুনরুত্থিত করা হবে। তারা যে উপাসনা পাওয়ার অযোগ্য, এটা তার অকাট্য প্রমাণ। এটা গোটা শেরেক মতবাদের বাতিল হওয়ারও অকাট্য প্রমাণ। এই সূরায় তাওহীদ ও আখেরাত সংক্রান্ত যে আলোচনা রয়েছে, এটা তার প্রথমাংশ।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা যেখানে আলোচনা শেষ করেছি, এখানে সেখান থেকেই তা পুনরায় শুরু করছি। এখানে আমরা একটা নতুন অধ্যায় শুরু করছি, যার প্রথম আলোচ্য সূচী হলো আল্লাহর একত্ব বা তাওহীদ। আখেরাতে যারা বিশ্বাস করে না, এখানে তাদের অবিশ্বাসের কারণ দর্শানো হয়েছে এই যে, তাদের মনই অবিশ্বাস প্রবণ। অবিশ্বাস ও অস্বীকৃতি তাদের একটা মজ্জাগত স্বভাব, যা তাদেরকে আল্লাহর সুস্পষ্ট ও নিদর্শনাবলীকেও মেনে নিতে বাধা দেয়। তাছাড়া তারা অহংকারীও। অহংকার তাদেরকে বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ করা থেকে বিরত রাখে। এ অধ্যায়ের সমাপ্তি টানা হয়েছে একটা উদ্বুদ্ধকর দৃশ্য তুলে ধরার মধ্য দিয়ে। দৃশ্যটা হলো সারা পৃথিবীর সমস্ত ছায়াগুলো, আকাশ ও পৃথিবীর সকল প্রাণী এবং ফেরেশতারা সম্পূর্ণ অহংকারমুক্তভাবে, আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে এবং একেবারেই নির্বিবাদে আল্লাহর আদেশের অনুগত হয়ে সেজদা রত। অধ্যায়ের শেষভাগের এই বিনয়াবনত ও অনুগত দৃশ্যের ঠিক বিপরীতে অবস্থান করছে অধ্যায়ের প্রথমভাগে আলোচিত অহংকারী বেঈমানদের দৃশ্য।

সূচনা ও সমাপ্তির মাঝখানের আয়াতগুলোতে আলোচিত হয়েছে ওহী ও কোরআনকে অস্বীকারকারী ওই সব অহংকারী কাফেরের বক্তব্য। তারা বলতো যে, কোরআন ও ওহী আদিম যুগের মানুষের কল্পকাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করা ও আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেননি তাকে হারাম করার কারণ ব্যাখ্যা করে তারা বলতো যে, তাদের এই সব অন্যায় কাজই আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন। তারা এ কথাও কসম খেয়ে খেয়ে বলতো যে, আল্লাহ তায়ালা কখনো মরা মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। তাদের এসব উক্তির জবাব দেয়া হয়েছে এ অধ্যায়ে। এতে তাদের মত্যুকালীন অবস্থা ও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন পরবর্তী অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যখন তারা নিজেদের উচ্চারিত ভিত্তিহীন কথাগুলো অস্বীকার করবে। এ ছাড়া অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত কাফেরদের কিছু কিছু ঘটনাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, আরবের তৎকালীন মোশরেকদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা অতীতের খোদাদ্রোহীদের মতো তাদেরকেও রাত বা দিনের যে কোনো মুহূর্তে তাদের অজান্তে, দেশে দেশে ভ্রমণ করার সময়, অথবা তাদের আযাবের আশংকা বা অপেক্ষা করার সময়ে আকস্মিকভাবে আযাবে আক্রান্ত করতে পারেন।

এর পাশাপাশি পরহেযগার মোমেনদের উক্তি এবং মৃত্যুকালে ও কেয়ামতের দিন তাদের জন্যে যে উত্তম প্রতিদান নির্ধারিত রয়েছে, তাও আলোচিত হয়েছে, সর্বশেষে দেখানো হয়েছে আকাশ ও পৃথিবীতে ফেরেশতা, ছায়া ও প্রাণীসমূহের সবিনয় সেজদার দৃশ্য।

'তোমাদের ইলাহ একজন ইলাহ। যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের মন অবিশ্বাসী এবং তারা অহংকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব তৎপরতাই জানেন। তিনি অহংকারীদের ভালোবাসেন না।'

এখানে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস ও পরকাল বিশ্বাসকে একত্রিত করা হয়েছে। বরঞ্চ এর একটিকে অপরটির অস্তিত্বের প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। কারণ এক আল্লাহর এবাদত পরকাল বিশ্বাসের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা আখেরাতের নিশ্চয়তা থাকা এক আল্লাহর বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতারই পরিপূর্ণতা নিশ্চিত করে এবং কর্মফল দানের মধ্য দিয়ে তার ন্যায়বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করে।

'তোমাদের ইলাহ একজন ইলাহ মাত্র।' বস্তুত এ সূরায় ইতিপূর্বে আল্লাহর সৃষ্টি, নেয়ামত ও জ্ঞান সংক্রান্ত যতোগুলো আয়াত অতিবাহিত হয়েছে, তার সবই এই মহাসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ প্রাকৃতিক নিয়মকানুন এবং তার পারস্পরিক সমন্বয় ও সহযোগিতার মধ্যে নিহিত রয়েছে, যেমন ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

যারা এই মহাসত্যকে মানে না এবং আল্লাহর একত্ব, বিজ্ঞতা ও সুবিচারে ঈমান না আনার একটা অংশ হিসাবে আখেরাতেও ঈমান আনে না, তাদের কোনো যুক্তি প্রমাণ, সাক্ষ্য ও নিদর্শনের অভাব নেই। এর আসল কারণ তাদের স্বভাব ও সত্ত্বার অভ্যন্তরেই নিহিত। তাদের মনই ঈমান বিমুখ। আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখেও তারা তা স্বীকার করতে চায় না। তারা অহংকারীও। তাই তারা অকাট্য সাক্ষ্য প্রমাণের কাছে নতিস্বীকার করে না এবং আল্লাহ ও রসূলের কাছে আত্মসমর্পণ করে না। কাজেই তাদের ঈমান আনার আসল কারণ তাদের স্বভাবগত ও মজ্জাগত। তাদের ব্যাধি তাদের অন্তরে বদ্ধমূল।

তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা তাদের এই স্বভাব ও ব্যাধির কথা জানেন। তিনি তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই অবগত। তার জ্ঞান সমস্ত সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধে। তিনি তাদের ওই সব কূ-স্বভাব ও ব্যাধি অপছন্দ করেন।

'তিনি অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না।'

কেননা অহংকারী মন কখনো কোনো যুক্তি মানে না এবং আত্মসমর্পণ করে না। কাজেই তাদের অহংকারের কারণেই তারা আল্লাহর কাছে ঘৃণিত। আর এই অহংকারের কথা তিনি জানেন। কারণ তিনি তাদের আসল অবস্থা জানেন। গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন।

'যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমাদের প্রভু কী নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে, আদিম মানুষদের কল্পকথা।... ' (আয়াত ২৬-২৭)

অর্থাৎ ঈমান বিমুখ মনের অধিকারী এসব অহংকারী ব্যক্তি কোনো যুক্তি তো মানেই না, রসূলের দাওয়াতে সাড়া তো দেয়ই না, উপরন্তু অন্য কেউ যখন জিজ্ঞেস করে যে তোমাদের জন্যে কী ওহী নাযিল হয়, তখন স্বাভাবিক ও প্রত্যক্ষ জবাবও দেয় না। স্বাভাবিক ও প্রত্যক্ষ জবাব দিলে তারা কোরআনের কোনো একটা অংশ উদ্ধৃত করে অথবা তার বক্তব্যের সার সংক্ষেপ যথাযথভাবে শুনিয়ে দিতে পারতো। তারা নিজেরা কোরআনে বিশ্বাসী না হয়েও অন্তত অবিকৃতভাবে তা উদ্ধৃত করে সততা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পারতো। বরং তারা আসল জবাব না দিয়ে সত্যকে বিকৃত করে বলে।

'আদিম মানুষদের কল্পকথা।'

'আসাতীর' বলা হয়, ভিত্তিহীন অলীক ও আজগুবী কেচ্ছা-কাহিনীকে। যে কোরআন মানুষের মনমগযকে ব্যাধিমুক্ত ও বিশুদ্ধ করে, যে কোরআন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মানব সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক, আচরণ ও চাল চলনকে পরিশুদ্ধ করে, সেই কোরআনকেই তারা এভাবে বিকৃত করে। প্রাচীন যুগের লোকদের যে ইতিহাস কোরআন তুলে ধরে, তার জন্যে তারা কোরআনকে এভাবে পরিচিত করে। এভাবে তাদের দাম্ভিকতা ও ধৃষ্টতা তাদের ঘাড়ে তাদের নিজেদের পাপের বোঝা তো চাপায়ই, উপরন্তু কোরআনের এরূপ বিকৃত পরিচয় দিয়ে যে নিরীহ অজানা লোকদেরকে কোরআন ও ঈমান থেকে তারা বিপথগামী করে, তাদের পাপেরও একটা অংশ তাদের কাঁধে চাপে। আয়াতে এই পাপরাশিকে ভারী বোঝা আখ্যায়িত করা হয়েছে। আসলে এর চেয়ে নিকৃষ্ট বোঝা আর কিছুই নেই। মালের বোঝা যেমন মানুষের দেহকে ক্লিষ্ট করে, তেমনি এ বোঝা মনকে করে ভারাক্রান্ত। বস্তুগত বোঝা যেমন বহনকারীকে ক্লান্ত ও অবসন্ন করে, এ বোঝাও তেমনি বহনকারীকে করে ক্ষতিগ্রস্ত। বরঞ্চ সত্যি বলতে কি, এ বোঝা আরো ভয়ংকর ও সর্বনাশা।

রসূলের বিরুদ্ধে কোরায়শদের প্রচারাভিযান

সুদ্দী থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন যে, একবার মোহাম্মদ (স.)-এর দাওয়াতী কাজকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যে কোরায়শদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রবীণ ব্যক্তিরা প্রস্তাব রাখে যে, দেখো, মোহাম্মদ এতো মিষ্টভাষী যে কেউ তার সাথে কথা বললেই সে তার মাথা বিগড়ে দেয়। সুতরাং তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে এমন কিছু বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোক নির্বাচন কর, যাদের বংশ পরিচয় সবাই জানে। তাদেরকে প্রতিদিন অথবা একদিন পর একদিন মক্কার প্রত্যেকটা সড়কে দাঁড় করাও। যে কেউ মোহাম্মদ (স.)-এর সাথে দেখা করতে আসবে, তাকে তারা তাঁর সাথে দেখা করতে না দিয়ে ফিরিয়ে দেবে। কথামত প্রত্যেক সড়কে মোড়ে মোড়ে কিছু লোক দাড়া করানো হলো। যখনই কোনো ব্যক্তি কোনো গোত্রের প্রতিনিধি হিসাবে মোহাম্মদ কী বলে, সে খোঁজ নিতে আসে, অমনি তাদের একজন তাকে বলে, 'শুনুন! আমি অমুকের ছেলে অমুক। মোহাম্মদ সম্পর্কে আমি ভালো করে জানি যে, সে একজন মিথ্যাবাদী লোক। তাঁর কথা নির্বোধ, গোলাম ও অপদার্থ লোকেরা ছাড়া আর কেউ শোনে না। তাঁর গোত্রের প্রবীণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও তাকে ত্যাগ করেছে।' এ কথা শুনে আগন্তুক চলে যেতো। এ প্রসংগেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তোমাদের প্রতিপালক কী নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে যে, 'আদিম মানুষদের কল্পকথা।' আগন্তুক যদি এমন নাছোড় বান্দা গোছের লোক, যাকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াতের পথে পরিচালিত করতে চান, তবে সে কোরায়শদের ওই কথা শোনার পর মনে মনে বলে যে, 'আমি যদি একদিনের পথ এসেও মোহাম্মদের সাথে দেখা না করি, সে কী বলে তার খোঁজ না নিয়ে এবং তার দাওয়াতের কোনো বিশদ বিবরণ না নিয়ে গোত্রের কাছে ফিরে যাই, তাহলে আমি আমার গোত্রের অতীব নিকৃষ্ট প্রতিনিধি বলে সাব্যস্ত হবো।' এরপর সে মক্কায় প্রবেশ করতো, মোমেনদের সাথে দেখা করতো এবং তাদের কাছে মোহাম্মদ (স.)-এর বক্তব্য কী তা জানতে চাইতো। তখন মোমেনরা তাঁর সম্পর্কে ভালো কথা বলতো।

এভাবে ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে কোরায়শরা বিভিন্ন ধরনের সুপরিকল্পিত প্রচারাভিযান চালাতো। এ ধরনের প্রচারাভিযান তাদের মতো আরো বহু লোক চালিয়ে থাকে-সর্বযুগে ও সর্বত্র। তারাও এক রকম দাম্ভিক এবং সত্য ও যুক্তির কোনো ধার ধারে না। কোরায়শদের

মধ্যকার দাম্ভিকেরা প্রথম প্রত্যাখ্যানকারীও ছিলো না, প্রথম চক্রান্তকারীও ছিলো না। আয়াতে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের পূর্ববর্তী চক্রান্তকারীদের কেমন পরিণতি হয়েছে, এবং কী পরিণতি কেয়ামতের দিন হবে। এমনকি মৃত্যুর পর থেকে আখেরাতে কর্মফল লাভ পর্যন্ত তাদের কি ধরনের পরিণতি ভোগ করতে হবে। সেটাও জানানো হয়েছে। কোরআনের রীতি মোতাবেক এসব কিছু ছবির আকারে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের পরিণতি

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিলো....... অহংকারীদের আশ্রয়স্থল বড়ই নিকৃষ্ট।' (আয়াত ২৮-৩১)

এখানে পূর্ববর্তীদের চক্রান্তকে এমন একটা ভবনের আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে, যার ভিত্তি আছে, স্তম্ভ আছে এবং ছাঁদও আছে। এভাবে ইংগিত দেয়া হয়েছে যে তাদের চক্রান্ত খুবই নিপুণ, মযবুত, দীর্ঘস্থায়ী ও সুদূর প্রসারী ছিলো। কিন্তু আল্লাহর শক্তি ও কুশলতার সামনে তা টিকে থাকতে পারেনি।

'আল্লাহ তাদের ভিত্তি থেকে স্তম্ভ পর্যন্ত নির্মূল করে দিলেন। ফলে ছাদটা তাদের ওপরেই ধসে পড়লো।'

এটা সর্বাত্মক ধ্বংসের দৃশ্য, যা ওপর ও নীচ-উভয় দিক থেকে কার্যকর হয়েছে। যে স্তম্ভগুলো গোটা কাঠামোকে দাঁড় করিয়ে রাখে, তা নীচ থেকে ধ্বংস করা হয় এবং ওপর থেকে তাদের ওপর ছাদ ধসে পড়ে ও তাদের কবর রচনা করে।

'তাদের অজ্ঞাতসারেই তাদের ওপর আযাব এসে গেলো।'

অর্থাৎ যে ভবনকে তারা মযবুতভাবে বানিয়েছিলো এবং তার মধ্যে সুরক্ষিত থাকবে বলে ভরসা করেছিলো, সহসা তা ওপর ও নীচ থেকে তাদের কবর ও ধ্বংসস্তূপে রূপান্তরিত হলো। যে জিনিসকে তারা আত্মরক্ষার জন্যে তৈরী করেছিলো, তার দিক থেকেই যে তাদের বিপদ আসবে, তা তারা ভাবতেও পারেনি। যে সব কুচক্রী আল্লাহর পথের দাওয়াতকে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হয় এবং মনে করে যে তাদের ষড়যন্ত্র বানচাল করার ক্ষমতা কারো নেই, এখানে তাদের ধ্বংসের ও তাদের চক্রান্ত নস্যাতের পূর্ণাংগ দৃশ্য দেখানো হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে যে কুচক্রীদেরকে আল্লাহ সর্বদিক থেকে ঘেরাও করে রাখেন।

বস্তুত এটা একটা পৌনপুনিক ঘটনা। কোরায়শদের আগেও এরূপ ঘটেছে, পরেও ঘটবে। ষড়যন্ত্রকারীরা যতোই ঠেকাতে চেষ্টা করুক, আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত চলতেই থাকবে। মাঝে মাঝে মানুষকে স্মরণ করতে বলা হয়েছে সেই ভয়ংকর দৃশ্যকে, 'আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্রের ইমারতকে ভিত্তিমুল থেকে নির্মুল করে দিয়েছিলেন, ফলে (এই চক্রান্তরূপী ইমারতের) ছাদ তাদের ওপরই ধ্বসে পড়লো, এবং তাদের অজান্তেই তাদের ওপরই চতুর্দিক থেকে আযাব এসে গেলো।

এতো গেলো ইহকালীন পরিণতির কথা। আর পরকালে? 'আবার কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে অপমানিত করবেন ....'(আয়াত ২৯)

এখানে কেয়ামতের একটা দৃশ্য চিত্রায়িত করা হয়েছে, যা এই দাম্ভিক স্বভাবের কু-চক্রীদেরকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হবে। তখন তাদের দম্ভ ও ষড়যন্ত্রের সময় পার হয়ে গেছে।

তারা মহান স্রষ্টা ও মহাপরাক্রমশালী শাসকের দরবারে উপনীত হবে, যিনি তাদেরকে ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করবেন।

'আমার সেই শরীকরা কোথায়, যাদের জন্যে তোমরা শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছিলে?'

অর্থাৎ যাদের জন্যে রসূল ও মোমেনদের সাথে লড়াই করতে এবং তাওহীদপন্থীদের সাথে তর্কে লিপ্ত হতে?

কাফের ও মোমেনদের বিপরিতমুখী পরিণতি

অপমান ও লাঞ্ছনায় তারা সবাই নীরব ও নিস্তব্ধ হয়ে যাবে। কেবল প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী ফেরেশতা, রসূল ও মোমেনদেরকেও আল্লাহ তায়ালা কথা বলার অনুমতি দেবেন এবং তারা বলবেন, আজকের সমস্ত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা কাফেরদেরই প্রাপ্য।

.... ফেরেশতারা যাদের প্রাণ এমন অবস্থায় সংহার করবে যখন তারা নিজেদের ওপর যুলুম করতে থাকে।

এখানে কেয়ামতের পূর্ববর্তী একটা পরিণতির ধাপের কথা বলা হচ্ছে। তাদের মৃত্যুকালীন অবস্থার দৃশ্য তুলে ধরা হচ্ছে। তারা নিজেদেরকে ঈমান থেকে বঞ্চিত করে নিজেদের ওপর যে যুলুম ও নির্যাতন চালিয়েছে, যে ধ্বংস ও সর্বনাশা পরিণতির দিকে নিজেদেরকে ঠেলে দিয়েছে এবং যে আযাবে নিক্ষেপ করেছে, সেই দৃশ্যটাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

নিকটবর্তী দুনিয়ার জীবনের মৃত্যুকালীন দৃশ্যের চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে। তখন তাদের কোনো মিথ্যাচার, ধোঁকাবাজি বা ছলচাতুরির সুযোগ থাকবে না।

'তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে, আমরা কোনো মন্দ কাজ করতাম না।'

ওই সব অহংকারী তখন আত্মসমর্পণ করবে, কোনো ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হবে না। কিন্তু তারপরও তারা মিথ্যা বলবে। এটা হয়তো তাদের দুনিয়ার ছল-চাতুরীরই অংশবিশেষ। তারা আত্মসমর্পণ করে সবিনয়ে বলবে, 'আমরা কোনো মন্দ কাজ করতাম না।' এটা যে এই সব অহংকারীর জন্যে একটা অবমাননাকর অবস্থান, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরপর সর্বজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা জবাব পাবে,

'অবশ্যই, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত।

অতএব মিথ্যাচার, ছল-চাতুরী ও কারচুপি করার কোনো উপায় থাকবে না।

এরপর সেসব দাম্ভিকদের জন্যে নির্ধারিত আযাবের ফয়সালা শোনানো হবে।

'অতএব, তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করো ....'

অপরদিকে খোদাভীরু সৎলোকদের কর্ম ও কর্মফল–সবই অহংকারী নাফরমান কাফেরদের সম্পূর্ণ বিপরীত।

'যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছিলো, তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হতো, তোমাদের মালিক কী নাযিল করেছেন? তারা বলতো, ভালো জিনিস। .... ' (আয়াত ৩২-৩৪)

আসলে পরহেযগার ও সংযমী লোকেরা বোঝে যে ইসলামের আগাগোড়াই ভালো, মহৎ ও কল্যাণকর। আল্লাহ তায়ালা যতো আদেশ, নিষেধ, উপদেশ বা নির্দেশ দিয়ে থাকুন না কেন, তা সম্পূর্ণই উপকারী। তাই তারা সংক্ষেপে জবাব দিতো যে, 'ভালো জিনিস।' এরপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিধির বিশদ জ্ঞান অর্জন করার পর কোনটা কোন দিক দিয়ে ভালো ও কল্যাণকর তা ব্যাখ্যা করতো।

'যারা দুনিয়ায় সৎকাজ করে, তাদের জন্যে কল্যাণ।'

অর্থাৎ কল্যাণকর জীবন, কল্যাণময় সম্পদ কল্যাণকর অবস্থান।

'আখেরাতের ঘর তো আরো উত্তম।'

অর্থাৎ দুনিয়ার চেয়ে উত্তম। 'মোত্তাকীদের এই আবাস কতোই না সুন্দর।' এরপর এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে,

'চিরস্থায়ী বাগবাগিচা, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা যা চাইবে তাই তাদের জন্যে রয়েছে।'

অতপর আর কোনো বঞ্চনা, কোনো শ্রম এবং জীবিকার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই দুনিয়ার মতো।

'এভাবেই আল্লাহ সংযমীদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকেন।'

ইতিপূর্বে কাফেরদের ব্যাপারে যেমন একধাপ পিছিয়ে এসে মৃত্যুকালীন অবস্থার দৃশ্য দেখানো হয়েছে, তেমনি সৎ ও সংযমী আল্লাহভীরু লোকদের ব্যাপারেও একধাপ পিছিয়ে গিয়ে মৃত্যুকালীন দৃশ্য দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে যে, তারা অত্যন্ত সম্মান ও শান্তির সাথে মৃত্যু বরণ করে থাকে। বলা হয়েছে,

'যাদের প্রাণ ফেরেশতারা প্রশান্ত অবস্থায় সংহার করে,'

অর্থাৎ আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকার কারণে এবং মৃত্যুর আযাব থেকে অব্যাহতি লাভের কারণে তারা প্রশান্ত।

'ফেরেশতারা তাদেরকে বলে, তোমাদের ওপর সালাম, তোমরা যা করেছো তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।'

এভাবে তাদেরকে অগ্রিম সুসংবাদ দিয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করা ও তাদেরকে অভিনন্দন জানানো হয়। এ সময় তারা আখেরাতের দ্বারপ্রান্তে অবস্থান করে। তাদের সৎকর্মের পুরস্কার স্বরূপ এভাবেই ঘোষণাই দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা কারো ওপর অবিচার করেন না

মৃত্যুকালীন অবস্থা ও পরকালীন অবস্থার উল্লেখিত বর্ণনার পটভূমিতে আল্লাহ কোরায়শ মোশরেকদের কাছে প্রশ্ন রাখছেন, তারা কিসের অপেক্ষায় আছে? ফেরেশতারা এসে তাদের প্রাণ সংহার করে নিয়ে যাক এটার অপেক্ষায়, না আল্লাহর হুকুম এসে কেয়ামত সংঘটিত করুক এবং তারা হিসাব নিকাশের জন্যে পুনরুজ্জীবিত হোক, এর অপেক্ষায়? তারা মৃত্যুর অপেক্ষায়ই থাক বা কেয়ামতের অপেক্ষায়ই থাকুক, তাদের পূর্বে যারা ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখান করেছে, তারা কি সেই পরিণতির সম্মুখীন হয়নি? তারা তো এ উভয় পরিণতি দেখেছে এবং তা শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে রয়েছে,

'তারা কি ফেরেশতাদের আগমন অথবা তোমার প্রভুর হুকুমের আগমন ছাড়া আর কিছুর অপেক্ষায় আছে? তাদের পূর্ববর্তীরাও অনুরূপ অপেক্ষায় থাকতো। আল্লাহ তাদের ওপর যুলুম করেননি। বরং তারাই নিজেদের ওপর যুলুম করতো। অবশেষে তাদের অপকর্মগুলো তাদেরকে আক্রান্ত করেছে এবং তারা যে জিনিসকে উপহাস করতো, সেই জিনিসই তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।' (আয়াত ৩৫-৩৬)

মানুষের আচরণ বড়ই বিস্ময়কর। অতীতে যারা তাদেরই মতো আচরণ করেছে। তাদের অশুভ পরিণতি দেখেও তারা অসংযত আচরণ করে যেতে থাকে এবং একথা ভেবেও দেখে না যে, তাদের যে পরিণতি হয়েছে সে ধরনের পরিণতি তাদেরও হতে পারে। তারা বুঝতেই পারে না যে

আল্লাহর পরিচালিত বিশ্ব ব্যবস্থা একটা শাশ্বত প্রাকৃতিক বিধি অনুসারেই চলে, একটা নির্দিষ্ট কর্মকারণের নির্দিষ্ট ফলই দেখা দিয়ে থাকে এবং নির্দিষ্ট কর্মের নির্দিষ্ট কর্মফল অবধারিত। আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধি কখনো তাদের সাথে স্বজন-প্রীতি দেখাবে না এবং কখনো তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে না।

'আল্লাহ তাদের ওপর যুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করতো।' অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে চিন্তাশক্তি, বোধশক্তি ও ভালো-মন্দ বাছ-বিচারের ক্ষমতা দিয়েছেন, তাদের সামনে প্রাকৃতিক জগতের ও তাদের নিজ সত্ত্বার নিদর্শনাবলী তুলে ধরেছেন, তাদেরকে কোন্ কাজের কী পরিণাম তা জানিয়ে দিয়েছেন এবং তাদেরকে তাদের কর্মফল ও প্রচলিত প্রাকৃতিক বিধির হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। তাদের অবধারিত পরিণতির ব্যাপারে আল্লাহ তাদের ওপর যুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই সেই পরিণতি ডেকে আনার ব্যবস্থা করে নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

আল্লাহ তায়ালা তাদের কর্মফল দিয়ে তাদের সাথে কোনো নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেননি। তাদের ওপর যদি নিষ্ঠুরতা দেখানো হয়েই থাকে, তবে তা দেখিয়েছে তাদেরই কূ-কর্মগুলো। কেননা তারা ওই সব অপকর্মেরই স্বাভাবিক ফল ভোগ করেছে।

'অবশেষে তাদের পাপাচার তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে।'

এ ধরনের বক্তব্য গভীর তাৎপর্যবহ। এর মর্ম এই যে তাদের ব্যক্তিগত কাজের ফল ছাড়া অন্য কোনো কারণেই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয় না। তাদের আচরণের স্বয়ংক্রিয় ফলই তারা ভোগ করে-অন্য কিছু নয়। নিজেদের অসৎকর্ম দ্বারা তারা নিজেরাই মানবেতর পর্যায়ে নেমে যায়। তাই মানবেতর পর্যায়ের অবমাননাকর ও কষ্টদায়ক শাস্তিও তাদের প্রাপ্য এবং সেটাই তারা ভোগ করে।

পরবর্তী কটি আয়াতে মোশরেকদের শেরেক ও অন্যান্য অপকর্মের কারণ সম্পর্কে তাদের আরো একটা বক্তব্য উদ্ধৃত করে তার জবাব দেয়া হয়েছে,

'মোশরেকরা বলে, আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছে করলেতো আমরা এবং আমাদের বাপদাদারা তাঁর এবাদাত ছাড়া আর কারো এবাদাত করতাম না এবং আমরা তার (অনুমতি) ছাড়া কোনো জিনিস নিষিদ্ধ করতাম না। তাদের পূর্ববর্তীরাও একই রকম কাজ করতো। আসলে সব কিছু খোলাখুলিভাবে (দ্বীনকে) প্রচার করা ছাড়া রসূলদের কি আর কোনো দায়িত্ব আছে?'....... (আয়াত ৩৭-৩৮)

এই উক্তির মধ্য দিয়ে তারা আসলে নিজেদের সকল অপকর্মের দায়ভার আল্লাহর ওপর চাপাতে চাইছে। তাদের ও তাদের বাপদাদার শেরেক, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের এবাদাত উপাসনা এবং পৌত্তলিক সংস্কৃতির অংশ হিসাবে প্রাণীর গোশত খাওয়াকে ও বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যকে কল্পনা প্রসূত ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে নিজেদের ওপর নিষিদ্ধ করা-এই সমস্ত কর্মকান্ডের জন্যে তারা আল্লাহর ইচ্ছাকেই দায়ী করেছে। তাদের বক্তব্য এই যে আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন যে, তারা এসব কাজ না করুক, তাহলে তিনি তাদেরকে এ সব কাজ করতে দিতেন না।

এটা আসলে আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার জীবনে নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করার জন্যে যে সব ক্ষমতা ও গুণ-বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন, সেগুলোকে এখানে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

ইচ্ছা প্রয়োগের স্বাধীনতা

আল্লাহ তায়ালা কখনো চান না তাঁর বান্দারা তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করুক এবং তাঁর হালাল করা জিনিসকে হারাম বা হারাম করা জিনিসকে হালাল করুক। এটা যে তিনি চান না, সেটা তিনি তাঁর শরীয়ত ও নবীদের মুখ দিয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। রসূলদেরকে তিনি এ কাজেরই দায়িত্ব দিয়েছেন এবং তারা এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন।

'আমি প্রত্যেক জাতির কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদাত করো এবং তাগুতকে এড়িয়ে চলো।'

সুতরাং এটাই আল্লাহর হুকুম এবং এটাই নিজ বান্দাদের সম্পর্কে আল্লাহর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে এমন কোনো হুকুম দিতে পারেন না, যে হুকুম মেনে চলার ক্ষমতা তিনি তাদেরকে সৃষ্টিগতভাবে দেননি, কিংবা তাদেরকে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য করেছেন। আল্লাহ তায়ালা যে তাঁর হুকুম অমান্যকারীদেরকে শাস্তি দিয়েছেন, এটাই প্রমাণ করে যে তিনি তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণে অসন্তুষ্ট হন। ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এ কথাই বলেছেন, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দেখো, আল্লাহর হুকুম অমান্য করার পরিণতি কী হয়েছিলো।

মহাবিজ্ঞানী স্রষ্টার চূড়ান্ত ফয়সালা এটাই ছিলো যে, তিনি মানুষকে সৎকাজ ও অসৎকাজ উভয়টাই করার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করবেন। ও দু'টোর যে কোনোটা বেছে নেয়ার ইচ্ছার স্বাধীনতা তাকে দেবেন এবং তারপর তাকে বিবেক ও বুদ্ধি দান করবেন, যা দ্বারা সে ভালো ও মন্দের যে কোনো একটাকে অগ্রাধিকার দেবে। সেই সাথে তিনি বিশ্ব জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে দেবেন সত্য ও ন্যায়ের পথের সেই সব নিদর্শন, যা মানুষের চোখ, কান, স্নায়ু, মন ও বিবেককে প্রতিটি মুহূর্তে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করতে থাকবে। এখানেই শেষ নয়, এরপর তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর অধিকতর অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্বক, শুধু বিবেকবুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল না রেখে, বিবেকবুদ্ধির জন্যে একটা মানদন্ড দিয়েছেন, যা নবীদের মাধ্যমে আগত শরিয়তে চিরস্থায়ী মূলনীতি হিসাবে বিদ্যমান।

যখনই বিবেক সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাদন্দ্বে ভুগবে, তখনই সে ওই মানদন্ডের কাছ থেকে কোনটা ভুল ও কোনটা ঠিক জেনে নেবে। আল্লাহ তায়ালা তার রসূলদেরকে বলপ্রয়োগকারী করে পাঠাননি যে মানুষকে ঘাড় ধরে ঈমানের পথে ঠেলে দেবেন। তাঁদেরকে পাঠিয়েছেন শুধুমাত্র প্রচারক হিসাবে। প্রচার ছাড়া তাদের আর কোনো করণীয় নেই। একমাত্র আল্লাহর এবাদাত করতে এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর যতো মূর্তি যতো মানবরচিত আইন-কানুন মতবাদ, মনের ঝোঁক, আবেগ ও শক্তি যাই থাকুক, তা প্রত্যাখ্যান করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

'আমি প্রত্যেক জাতির কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাগুতকে পরিহার করো।'

একদল লোক এ নির্দেশ মেনে নিয়েছে,

'তাদের মধ্যে একদলকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত করেছেন।' আর একদল গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে, 'তাদের মধ্যে একদলের ওপর গোমরাহী কার্যকর হয়ে গেছে।'

এই দুই দলের কোনোটাই আল্লাহর ইচ্ছা বা সিদ্ধান্তের আওতা বহির্ভূত নয়। আল্লাহ এদের কাউকেই জোরপূর্বক হেদায়াত বা গোমরাহীর দিকে ঠেলে দেননি। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজ সত্ত্বার ভেতরে এবং বহির্জগতের সর্বত্র তাঁর জন্যে সঠিক পথের নির্দেশনা রেখে দেয়ার পর তাকে ভালো বা মন্দ যে কোনো পথ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন এবং তাঁর ইচ্ছা এই যে, সে

ওই স্বাধীনতা প্রয়োগ করে যে পথ ভালো মনে করে সেই পথে চলুক। সেই স্বাধীনতাকেই সে প্রয়োগ করেছে। এতে সে আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে যায়নি।

কতিপয় ভ্রান্ত ধারণার মুলোৎপাটন

কোরআন মোশরেকদের এই ভ্রান্ত ধারণাও এ আয়াত দ্বারা খণ্ডন করেছে যে, আল্লাহ তায়ালা বলপ্রয়োগ করেই তাদেরকে শেরেকের পথে চালিত করেছেন। বিকারগ্রস্ত ও অবাধ্য লোকদের অনেকেই এই ওজুহাত দিয়ে থাকে। অথচ এ ক্ষেত্রে ইসলামের আকীদা বিশ্বাস একেবারেই স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে ভালো কাজের আদেশ দেন ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেন। আর যারা তাঁর নিষিদ্ধ কাজ করে তাদের কখনো কখনো দুনিয়ায় প্রকাশ্য শাস্তি দেন, যার মধ্য দিয়ে তাদের ওপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি প্রমাণিত হয়। কাজেই এরপর এ কথা বলার অবকাশ থাকে না যে, আল্লাহর ইচ্ছা হস্তক্ষেপ করে বান্দাকে গোমরাহীর দিকে যেতে বাধ্য করে, আবার সে জন্যে তিনি তাকে শাস্তিও দেন। আসলে আল্লাহর ইচ্ছা এতোটুকুই যে, তারা তাদের পথ স্বাধীনভাবে বেছে নিক। আর তারা ভালো বা মন্দ যে কাজই করুক, কিংবা সৎপথ বা অসৎ পথ, যে পথেই চলুক, এই অর্থে আল্লাহর ইচ্ছার আওতার মধ্যেই থাকে।

এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে সম্বোধন করে হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে স্বীয় নীতি ব্যাখ্যা করছেন।

'তুমি যতোই তাদের হেদায়াত কামনা করো, আল্লাহ তায়ালা তো যারা নাফরমানী ও বিদ্রোহের কারণে বিপথগামী হয় তাদেরকে হেদায়াত করেন না এবং তাদের কোনো সাহায্যকারীও নেই।'

সুতরাং হেদায়াত বা গোমরাহী রসূলের পক্ষ থেকে তাদের হেদায়াত কামনা করা বা না করার ফল নয়। রসূলের কাজ প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। হেদায়াত বা গোমরাহী আল্লাহর নীতি অনুসারেই হয়। এ নীতি কখনো লংঘিত হয় না এবং এর ফলাফলও কখনো পরিবর্তিত হয় না। কেউ যদি আল্লাহর ওই নীতি অনুসারে গোমরাহীর যোগ্য হয় এবং সে জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাকে গোমরাহ করে দেন, তবে তাকে তিনি হেদায়াত করেন না। কেননা আল্লাহর এমন কিছু নীতি আছে, যা তার নির্দিষ্ট ফলাফল দিয়ে থাকে। এভাবে সব কিছু চলুক এটাই আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহ তায়ালা নিজের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করবেনই, কিন্তু কাফেরদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী নেই।

মোশরেকদের উক্তি খন্ডন

অহংকারী অবিশ্বাসীদের তৃতীয় বক্তব্যটা হলো,

'তারা কঠিন শপথ করে বলে যে, যে মারা যায়, তাকে আল্লাহ আর পুনরুজ্জীবিত করেন না। (হে নবী তুমি এদের বলে দাও) হাঁ, অবশ্যই করেন। এ ব্যাপারে তিনি পাক্কা ওয়াদা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা।.......' (আয়াত ৩৮-৪০)

বেশীর ভাগ জাতির কাছে পরকাল সংক্রান্ত আকীদাই সব সময় জটিল বিষয় মনে হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যখন থেকে মানুষের কাছে রসূল পাঠাতে শুরু করেছেন এবং তারা মানুষকে আখেরাতের হিসাব নিকাশের ভয় দেখিয়ে সৎকাজের আদেশ দিতে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে থেকেছেন, তখন থেকেই এ সমস্যা জটিল আকার ধারণ করেছে।

কোরায়শ বংশীয় মোশরেকরা কসম খেয়ে বলতো, আল্লাহ তায়ালা মরা মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো। কিন্তু তিনি যে মরা মানুষকে

জীবিত করবেন-সেটা স্বীকার করতো না। মানুষ মরে পচে গলে মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর তাকে আবার জ্যান্ত করা তাদের কাছে কঠিন ব্যাপার বলে মনে হতো।

অথচ মানুষের প্রথম জীবন যে কতো বড়ো অলৌকিক ব্যাপার, তা তারা ভেবে দেখে না। আল্লাহর শক্তি যে সীমাহীন, তাঁর সাথে মানুষের ধ্যান ধারণা ও শক্তির যে কোনো তুলনাই হয় না এবং সেই অকল্পনীয় ক্ষমতার পক্ষে কোনো কিছুকে অস্তিত্ব দান করা যে আদৌ কোনো ব্যাপারই নয়, বরং শুধুমাত্র অমুক জিনিসটা সৃষ্টি হোক এই মর্মে তাঁর ইচ্ছা করা বা সিদ্ধান্ত নেয়াই যে তাঁর অস্তিত্ব লাভের জন্যে যথেষ্ট, সে কথা তারা অনুধাবনই করে না।

মানুষকে পুনরুত্থিত করার পেছনে যে গভীর বিজ্ঞানসম্মত কারণ ও মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে, সে সম্পর্কে তারা সচেতন নয়। পার্থিব জীবনে কোনো জিনিসই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে না এবং পূর্ণতা লাভ করে না। মানুষ যুগ যুগ ব্যাপী হক ও বাতিল, ন্যায় ও অন্যায় এবং হেদায়াত ও গোমরাহীর প্রশ্নে দ্বন্দ্বে লিপ্ত রয়েছে। এ বিষয়টার চূড়ান্ত ফয়সালা পার্থিব জীবনে দেখে যাওয়া অনেকের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। কেননা আল্লাহ তায়ালা অনেককে দীর্ঘ অবকাশ দেয়া এবং দুনিয়ায় আযাব দিয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। এ সব ক্ষেত্রে তিনি শুধু আখেরাতেই কর্মফল দেন এবং সেখানেই চূড়ান্ত ফয়সালা করেন।

এখানে আয়াতে মোশরেকদের ওই অসত্য উক্তি খন্ডন করা হয়েছে এবং তাদের সকল সন্দেহ-সংশয় অপনোদন করে বলা হয়েছে,

'হাঁ, অবশ্যই এ ব্যাপারে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।' এবং আল্লাহ তায়ালা যখনই ওয়াদা করেন, তা কখনো বরখেলাপ করেন না।

'কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।'

অর্থাৎ আল্লাহর ওয়াদা যে অলংঘনীয় তা সে জানে না।

পরকালীন কর্মফলের গভীর তাৎপর্য রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারা যে বিষয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত তার ফয়সালা করা এবং কাফেররা যে মিথ্যুক ছিলো, সেটা তাদেরকে জানতে দেয়াই এর উদ্দেশ্য।' অর্থাৎ তারা যে নিজেদেরকে সঠিক পথে আছে বলে দাবী করতো, রসূল (স.)-কে ও আখেরাতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতো এবং অন্য যে সমস্ত ধ্যান ধারণা পোষণ করতো, তার সবই যে মিথ্যা ও ভ্রান্ত ছিলো, সে কথা তাদেরকে জানিয়ে দেয়াই আখেরাতে পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্য।

এরপর সব কিছুই সহজ হয়ে যায়। 'আমি যখনই কিছু ইচ্ছা করি, তখন আমি শুধু হও বলি অমনি তা হয়ে যায়।'

বস্তুত আখেরাতের জগতটাও এ ধরনের যে আল্লাহ তায়ালা শুধু ইচ্ছা করলেই তা তৎক্ষণাত হয়ে যায়।

হিজরতকারীদের প্রতি আল্লাহর ওয়াদা

এখানে অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে আলোচনার মাঝখানে একনিষ্ঠ মোমেনদের সম্পর্কে একটা কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতে তাদের গভীর বিশ্বাস তাদেরকে ঘর-বাড়ী ও সহায়-সম্পত্তি ত্যাগ করে আল্লাহর জন্যে ও আল্লাহর পথে বিদেশে হিজরত করতে উদ্বুদ্ধ করে।

'যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর পথে হিজরত করে আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তমভাবে পুনর্বাসিত করবো, আর আখেরাতের পুরস্কার আরো বড়, যদি তারা জানে। যারা ধৈর্যধারণ করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে।'

যে সব মুসলমান নিজেদের বাড়ীঘর ও সহায়-সম্পদ ত্যাগ করে হিজরত করেছে, নিজেদের প্রিয় জিনিস থেকে বঞ্চিত হয়েছে, প্রিয় বাড়ী প্রিয় আত্মীয়স্বজন ও প্রিয় স্মৃতি বিসর্জন দিয়েছেন, তারা তাদের হারানো প্রতিটি জিনিসের বিনিময়ে আখেরাতে পুরস্কার লাভ করবে। তারা যুলুমে

আক্রান্ত হয়েছে এবং তা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্যে যুলুম উপদ্রুত স্বদেশভূমি ত্যাগ করেছে। আর স্বদেশভূমি ত্যাগ করেছে বলেই তাদেরকে দুনিয়াতে বিকল্প উত্তম আবাসভূমি প্রদান করবো এবং যে আবাসভূমি তারা হারিয়েছে, তার চেয়ে ভালো আবাসভূমি দান করবো। মানুষ যদি জানতো যে, আখেরাতের প্রতিদানই সর্বোত্তম। তারা যতো কষ্টই ভোগ করুক, 'তাদের প্রতিপালকের ওপর ভরসা করতো' এবং সেই ভরসায় তার সাথে কাউকে শরীক করে না।

রসূল (স.)-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

এরপর পুনরায় রসূলদের দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো শেষ রসূল ও তাঁর কাছে নাযিলকৃত শেষ কেতাবের লক্ষ্য বর্ণনা করা এবং তাকে মিথ্যুক সাব্যস্তকারীদের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেয়া।

'আমি তোমার পূর্বেও মানুষদের মধ্যে থেকেই রসূল পাঠিয়েছি যাদের কাছে ওহী নাযিল করতাম। অতএব, কেতাবধারীদেরকে জিজ্ঞেস করো যদি তোমরা না জানো।..... ' (আয়াত ৪৩-৪৪)

অর্থাৎ আমি ফেরেশতা বা অন্য কোনো সৃষ্টি নয়, মানুষই পাঠাতাম। এমন সব মনোনীত মানুষকে পাঠাতাম, যাদের কাছে তোমার মতোই ওহী পাঠাতাম ও তোমার মতোই প্রচার কার্যের দায়িত্ব অর্পণ করতাম। এ ব্যাপারে তোমাদের যদি কিছু জানা না থাকে, তবে যাদের কাছে ইতিপূর্বে রসূলরা আসতো, সেই সব আহলে কেতাবকে জিজ্ঞেস করো যে তারা মানুষ ছিলো, না ফেরেশতা, না অন্য কোনো সৃষ্টি? আমি তাদেরকে সুস্পষ্ট বর্ণনা ও কেতাব সহকারে পাঠাতাম। 'যুবুর' শব্দের অর্থ হলো, বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট ঐশী পুস্তক।

'আর তোমার কাছে আমি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে মানুষের কাছে যে বিধান নাযিল হয়েছে, তা তুমি তাদেরকে জানিয়ে দিতে পারো'।..........

এই 'মানুষ' কথাটা দ্বারা অতীতের আহলে কেতাবকেও বুঝানো হচ্ছে, যারা তাদের কেতাব নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হয়েছিলো এবং তাদের এই মতভেদ নিরসনের লক্ষ্যে কোরআন নাযিল হয়েছে। এ দ্বারা রসূল (স.)-এর আমলের মানুষকেও বুঝানো হয়েছে, যাদের কাছে কোরআন ও রসূল এসেছিলো নিজের কথা ও কাজ দ্বারা তার ব্যাখ্যা দেয়ার জন্যে।

'আশা করা যায়, তারা চিন্তা করবে।'

অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনাবলী ও কোরআনে উদ্ধৃত আল্লাহর আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে। বস্তুত এই সব নিদর্শন ও আয়াত সর্বক্ষণ চিন্তা-গবেষণা করা ও সচেতন থাকার আহ্বান জানায়।

আল্লাহর আযাব যে কোনো সময় আসতে পারে

অহংকারী ও কুচক্রীদের প্রতি ইংগীত দেয়ার মধ্য দিয়ে সূচিত এই অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে রয়েছে তীব্র চেতনা সঞ্চারকারী দুটো কথা। প্রথমটায় আল্লাহর আকস্মিক আয়াত সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে, যা থেকে দিনে বা রাতে এক মুহূর্তের জন্যেও কারো উদাসীন হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়টায় আল্লাহর এবাদাত ও তাসবীহে সমগ্র সৃষ্টি জগতের অংশ গ্রহণের কথা জানানো হয়েছে। বস্তুত একমাত্র মানুষই দম্ভ ও অহংকারে লিপ্ত হয়ে থাকে এবং চক্রান্ত আঁটে। অথচ তার চারপাশে যতো সৃষ্টি রয়েছে, তারা সর্বক্ষণ আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহে লিপ্ত।

'তবে কি কূ-চক্রীরা মনে করে যে, আল্লাহ কর্তৃক তাদেরকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেয়া অথবা তাদের অজ্ঞাতসারেই তাদের ওপর আযাব চাপিয়ে দেয়ার কোন আশংকা নেই? .... (আয়াত ৪৫-৫০)

মানুষের সবচেয়ে বিস্ময়কর আচরণ এই যে তার চারপাশে প্রতিনিয়ত আল্লাহর হাত সক্রিয় রয়েছে, কিছু কিছু অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দিচ্ছে, সে শাস্তি থেকে তাদের কোনো কৌশল, চালাকি শক্তি, জ্ঞানবিজ্ঞান ও ধন-সম্পদ তাদেরকে রক্ষা করতে পারছে না। অথচ এর পরও কু-চক্রীরা কু-চক্র চালিয়েই যাচ্ছে এবং তাদের মধ্য থেকে যারা শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছে, তারা ভেবেও দেখছে না যে তারাও পূর্বে শাস্তি প্রাপ্তদের মতো শাস্তির কবলে পড়তে পারে, কখনো ভাবে না যে ঘুমন্ত বা নিদ্রিত অবস্থায় তারা যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহর আযাবে আক্রান্ত হতে পারে। কোরআন তাদের বিবেক ও চেতনাকে এই ব্যাপারে সচকিত করছে যাতে সম্ভাব্য আশংকা সম্পর্কে তারা সংবেদনশীল হয়। কেননা সে আযাব থেকে উদাসীন হয়, তাদের কপালে সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু জোটে না।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করছেন, তারা কি নিশ্চিত হয়ে গেছে যে এক দেশ থেকে আর এক দেশে ভ্রমণ বা বাণিজ্যক বা যে কোনো সফরে থাকাকালে তাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসতে পারে? 'সেটা প্রতিরোধের ক্ষমতা তাদের নেই।'

অর্থাৎ আল্লাহর আযাবের বিরুদ্ধে তাদের কোনো প্রতিরোধ চলে না। 'অথবা তারা ভীত ও সতর্ক থাকা অবস্থাতেই তাদেরকে পাকড়াও করতে পারেন, এ সম্পর্কেও কি তারা নিশ্চিন্ত?' কেননা তারা সচেতন ও সতর্ক থাকলে আল্লাহর আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। তারা প্রস্তুত ও সচেতন থাকা অবস্থায় এবং অচেতন ও অসতর্ক উভয় অবস্থায়ই তাদেরকে আযাবে আক্রান্ত করতে পারেন। তবে তিনি স্নেহশীল ও দয়াশীল। কু-চক্রীরা তাদের কু-চক্র অব্যাহত রাখা, গোমরাহীর পথে চলতে থাকা এবং তাকওয়ার পথে ফিরে না আসা সত্তেও কি তারা আশা করে যে তাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসবে না?

অথচ তাদের চারপাশে যে বিশ্ব প্রকৃতি তার বিচিত্র নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য সহকারে বিরাজ করছে, তা ঈমানের ইংগীত দেয় এবং আল্লাহর অনুগত হতে উদ্বুদ্ধ করে। (আয়াত ৪৮)

সকল সৃষ্টিই আল্লাহকে সেজদা করে

৪৮ নং আয়াতে সেজদারত ছায়াসমূহের যে দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, তার আকৃতি কখনো বড় হয়, কখনো ঘুরে ফিরে আগের জায়গায় চলে আসে, কখনো স্থির থাকে আবার কখনো একদিকে নুয়ে থাকে। এ দৃশ্য মুক্ত মন ও সচেতন বিবেকসম্পন্ন মানুষের জন্যে উদ্দীপনাদায়ক এবং তাকে সমগ্র প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল করে দেয়।

কোরআনের এ কটা আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধানের প্রতি সমগ্র সৃষ্টিজগত সেজদার মাধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ করে। কেননা সেজদাই হলো সর্বাধিক আনুগত্যবোধক কাজ। এ আয়াত কটাতে সেই ছায়ার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, যা লম্বা হওয়ার পর আবার ছোট হয়ে ফিরে আসে। এ বিবরণ মানুষের অনুভূতিতে একটা সূক্ষ্ম ও গভীর দোলা দেয়। সেই সাথে সমগ্র সৃষ্টি জগতকে, আকাশ ও পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রাণীকে ও ফেরেশতাদেরকে একই রকম আল্লাহর অনুগত দেখানো হয়েছে। অনুগত, সেজদারত, এবাদাতরত বস্তু, ছায়া, প্রাণী ও ফেরেশতাদের এক বিস্ময়কর সমাবেশের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। তারা কেউ অহংকার করে না। কেউ আল্লাহর হুকুম অমান্য করে না। এই বিস্ময়কর সমাবেশের পাশেই দেখা যায় একমাত্র একশ্রেণীর অহংকারী, দাম্ভিক ও খোদাদ্রোহী মানুষের বিরল দৃশ্য।

এ পর্যন্তই এ অধ্যায়ের সমাপ্তি। এর শুরুতেও আলোচিত হয়েছে অহংকারী ও দাম্ভিক মানুষের কথা। আর এর উপসংহারেও দেখানো হয়েছে যে আল্লাহর একান্ত অনুগত এ গোটা বিশ্বজগতে একমাত্র মানুষই দাম্ভিক ও খোদাদ্রোহী আর কেউ নয়।

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ

فَارْهَبُوْنِ ﴿٥١﴾ وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ؕ اَفَغَيْرَ

اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ

تَجْـَٔرُوْنَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ

يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٤﴾ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوْا ۣ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾

وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ؕ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ

تَفْتَرُوْنَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَاِذَا

بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارٰى مِنَ

রুকু ৭

৫১. (হে মানুষ,) আল্লাহ তায়ালা বলছেন, তোমরা (আনুগত্যের জন্যে) দু'জন মাবুদ গ্রহণ করো না, মাবুদ তো শুধু একজন, সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করো। ৫২. আকাশমন্ডলী ও যমীনের (যেখানে) যা কিছু আছে তা সবই তাঁর জন্যে, জীবন বিধানকে তাঁর অনুগত করে দেয়াই কর্তব্য; (এরপরও কি) তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে। ৫৩. নেয়ামতের যা কিছু তোমাদের কাছে আছে তা তো আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই এসেছে। অতপর তোমাদের যদি কোনো দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন (তা দূর করার জন্যে) তাঁকেই তোমরা বিনীতভাবে ডাকতে শুরু করো, ৫৪. অতপর আল্লাহ তায়ালা যখন তা দূরীভূত করে দেন, তখন তোমাদেরই এক দল লোক তাদের মালিকের সাথে অন্যদের শরীক বানিয়ে নেয়, ৫৫. যাতে করে আমি তাদের যা (নেয়ামত) দান করেছি তারা তা অস্বীকার করতে পারে; সুতরাং (কিছুদিনের জন্যে এ জীবনটা) তোমরা ভোগ করে নাও, অচিরেই তোমরা (এ অকৃতজ্ঞতার পরিণাম) জানতে পারবে। ৫৬. আমি ওদের যা কিছু রেযেক দান করেছি তার একাংশকে ওরা এমন সবার জন্যে নির্ধারণ করে নেয়; যারা (মূলত) জানেও না (রেযেকের উৎসমূল কোথায়?) আল্লাহ তায়ালার শপথ, তোমরা (তাঁর সম্পর্কে) যে মিথ্যা অপবাদ দিতে সে সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদের প্রশ্ন করা হবে! ৫৭. এ (মোশরেক) ব্যক্তিরা কন্যা সন্তানদের আল্লাহর জন্যে নির্ধারণ করে, (অথচ) আল্লাহ তায়ালা এসব (কিছু) থেকে অনেক পবিত্র, মহিমান্বিত, ওরা নিজেদের জন্যে তাই কামনা করে যা তারা পছন্দ করে। ৫৮. অথচ যখন এদের কাউকে কন্যা (জন্ম) হওয়ার সুখবর দেয়া হয়, তখন (দুঃখে ব্যথায়) তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়, ৫৯. যে বিষয়ে তাকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিলো

الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ

اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿۵۹﴾ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ

الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۶۰﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ

بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ

فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿۶۱﴾ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ

مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ؕ لَا جَرَمَ اَنَّ

لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ﴿۶۲﴾ تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ

فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۶۳﴾

তার মনের কষ্টের কারণে সে (তার) জাতির লোকদের কাছ থেকে আত্মগোপন করে থাকতে চায় (ভাবতে থাকে); সে কি এ (সদ্যপ্রসূত কন্যা সন্তান)-কে অপমানের সাথে রাখবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে? ভালোভাবে শুনে রাখো, (আসলে কন্যা সন্তান সম্পর্কে) ওরা যা সিদ্ধান্ত করে তা অতি নিকৃষ্ট! ৬০. (বস্তুত) যারা আখেরাত দিবসের ওপর ঈমান আনে না, তাদের জন্যে এ ধরনের নিকৃষ্ট পরিণামই রয়েছে, আর আল্লাহ তায়ালার জন্যেই সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণাম, তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়।

রুকু ৮

৬১. আল্লাহ তায়ালা মানুষদের তাদের নাফরমানীর জন্যে যদি (সাথে সাথেই) পাকড়াও করতেন, তাহলে এ (যমীনের) বুকে কোনো (একটি বিচরণশীল) জীবকেই তিনি ছেড়ে দিতেন না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের এক বিশেষ সময়সীমা পর্যন্ত অবকাশ দেন, অতপর যখন (অবকাশের) সে সময় তাদের সামনে এসে হাযির হয়, তখন তারা (যেমন) মুহূর্তকালও বিলম্ব করতে পারে না, (তেমন) তাকে তারা একটুখানি এগিয়েও আনতে পারে না। ৬২. এরা আল্লাহ তায়ালার জন্যে সে বিষয়টি প্রস্তাব করে যা স্বয়ং তারা (নিজেদের জন্যেও) পছন্দ করে না, তাদের জিহ্বা তাদের জন্যে মিথ্যা কথা বলে যে, (পরকালে) তাদের জন্যেই সব কল্যাণ রয়েছে; (অথচ) তাদের জন্যে সেখানে থাকবে (জাহান্নামের) আগুন এবং তারাই (সেখানে) সবার আগে নিক্ষিপ্ত হবে। ৬৩. (হে নবী,) আল্লাহর শপথ, তোমার আগেও আমি জাতিসমূহের কাছে নবী পাঠিয়েছিলাম, অতপর শয়তান তাদের (খারাপ) কাজসমূহ তাদের জন্যে শোভনীয় করে দিয়েছিলো, সে (শয়তান) আজো তাদের বন্ধু হিসেবেই (হাযির) আছে, তাদের (সবার) জন্যেই রয়েছে কঠোর আযাব।

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لا وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝٦٤ وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝٦٥ وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهِ مِنْ م بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ۝٦٦ وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝٦٧ وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ۝٦٨ ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ط يَخْرُجُ

৬৪. (হে নবী,) আমি তোমার ওপর (এ) কেতাব এ জন্যেই নাযিল করেছি যেন তুমি তাদের সামনে সে বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট করে পেশ করতে পারো, (যে বিষয়ের মধ্যে) তারা মতবিরোধ করেছে, বস্তুত এ (কেতাব) হচ্ছে ঈমানদার লোকদের জন্যে হেদায়াত ও (আল্লাহ তায়ালার) অনুগ্রহস্বরূপ। ৬৫. আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর (একবার) মুর্দা হয়ে যাওয়ার পর সে পানি দিয়ে তিনি যমীনকে জীবিত করে তোলেন; অবশ্যই এতে (আল্লাহর কুদরতের) বহু নিদর্শন রয়েছে সে জাতির জন্যে, যারা (আল্লাহর কথা কান দিয়ে) শোনে।

রুকু ৯

৬৬. অবশ্যই তোমাদের জন্যে গৃহপালিত জন্তু জানোয়ারের মাঝে (প্রচুর) শিক্ষার বিষয় রয়েছে, তাদের উদরস্থিত (দুর্গন্ধময়) গোবর ও (নাপাক) রক্তের মধ্য থেকে নিসৃত (পানীয়) খাঁটি দুধ আমিই তোমাদের পান করাই, পানকারীদের জন্যে (এটি) বিশুদ্ধ ও সুস্বাদু। ৬৭. খেজুর এবং আংগুর ফলের মধ্যেও (শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে), তা থেকে তোমরা নেশাকর (হারাম) জিনিস যেমন বের করে আনছো, তেমনি (তা থেকে হালাল এবং) উত্তম রেযেকও তোমরা লাভ করছো, নিসন্দেহে এতে (আল্লাহর কুদরতের) অনেক নিদর্শন আছে তাদের জন্যে, যারা জ্ঞানসম্পন্ন সম্প্রদায়ের লোক। ৬৮. তোমার মালিক মৌমাছিকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, পাহাড়ের (গায়ে) গাছে (-র ডালে) এবং (অন্য কিছুর ওপর) যা তোমরা বানাও তার ওপর নিজেদের থাকার ঘর নির্মাণ করো, ৬৯. তারপর প্রত্যেক ফল থেকে (রস আহরণ করে তা) খেতে থাকো, অতপর তোমার মালিকের (নির্ধারিত) পথ ধরে পূর্ণ আনুগত্যের সাথে (সেদিকে) এগিয়ে চলো; (এভাবে) তার পেট

مِنۢ بُطُوۡنِهَا شَرَابٌ مُّخۡتَلِفٌ اَلۡوَانُهٗ فِیۡهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّقَوۡمٍ یَّتَفَكَّرُوۡنَ ﴿۶۹﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمۡ ثُمَّ یَتَوَفّٰىكُمۡ ڗ وَمِنۡكُمۡ مَّنۡ یُّرَدُّ اِلٰۤی اَرۡذَلِ الۡعُمُرِ لِكَیۡ لَا یَعۡلَمَ بَعۡدَ عِلۡمٍ شَیۡـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیۡمٌ قَدِیۡرٌ ﴿۷۰﴾ وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعۡضَكُمۡ عَلٰی بَعۡضٍ فِی الرِّزۡقِ ۚ فَمَا الَّذِیۡنَ فُضِّلُوۡا بِرَآدِّیۡ رِزۡقِهِمۡ عَلٰی مَا مَلَكَتۡ اَیۡمَانُهُمۡ فَهُمۡ فِیۡهِ سَوَآءٌ ؕ اَفَبِنِعۡمَةِ اللّٰهِ یَجۡحَدُوۡنَ ﴿۷۱﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ اَزۡوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمۡ مِّنۡ اَزۡوَاجِكُمۡ بَنِیۡنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمۡ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ؕ اَفَبِالۡبَاطِلِ یُؤۡمِنُوۡنَ وَبِنِعۡمَتِ اللّٰهِ هُمۡ یَكۡفُرُوۡنَ ﴿۷۲﴾ وَیَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مَا لَا یَمۡلِكُ لَهُمۡ رِزۡقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ شَیۡـًٔا وَّلَا یَسۡتَطِیۡعُوۡنَ ﴿۷۳﴾ فَلَا تَضۡرِبُوۡا لِلّٰهِ الۡاَمۡثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

থেকে রং বেরঙের পানীয় (দ্রব্য) বের হয়, যার মধ্যে মানুষদের নিরাময়ের ব্যবস্থা রয়েছে; (অবশ্য) এতেও নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা (আল্লাহর এ সৃষ্টি বৈচিত্র নিয়ে) চিন্তা করে। ৭০. আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেবেন। তোমাদের কোনো ব্যক্তি (এমনও হবে যে, সে) বৃদ্ধ বয়সের দুর্বলতম স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, এতে করে (কৈশোরে এবং যৌবনে কোনো বিষয়ে) জানার পর সে (পুনরায়) অজ্ঞ হয়ে যাবে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সর্বজ্ঞ, (তিনিই) সর্বশক্তিমান।

রুকু ১০

৭১. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাউকে কারো ওপর রেযেকের ব্যাপারে প্রাধান্য দিয়ে রেখেছেন, অতপর যাদের (এ ব্যাপারে) শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা (আবার) তাদের অধীনস্থ দাস দাসীদের নিজেদের সামগ্রী থেকে কিছুই দিতে চায় না, (তাদের আশংকা হচ্ছে, এমনটি করলে) এ ব্যাপারে তারা উভয়েই সমান (পর্যায়ের) হয়ে যাবে; তবে কি এরা আল্লাহর এ নেয়ামত অস্বীকার করে? ৭২. আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড় পয়দা করেছেন এবং তোমাদের এ যুগল (দম্পতি) থেকে তিনি তোমাদের পুত্র পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের উত্তম রেযেক দান করেছেন; তারপরও কি এরা বাতিলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে আর আল্লাহর নেয়ামত অবিশ্বাস করবে? ৭৩. এবং এরা কি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তাদের (বানানো মাবুদদের) গোলামী করবে, যাদের আকাশমন্ডলী ও যমীনের (কোথাও) থেকে কোনো প্রকারের রেযেক সরবরাহ করার কোনো ক্ষমতা নেই। ৭৪. সুতরাং (হে মানুষ,) তোমরা আল্লাহ

يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوٗنَ ۖ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۖ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٦﴾

তায়ালার কোনো সদৃশ দাঁড় করিয়ো না, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন, তোমরা কিছুই জানো না। ৭৫. আল্লাহ তায়ালা (এখানে অপরের) অধিকারভুক্ত একটি দাসের উদাহরণ দিচ্ছেন, যে (নিজে থেকে) কোনো কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না– (উদাহরণ দিচ্ছেন) এমন ব্যক্তির (সাথে), যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে উত্তম রেযেক দান করেছি এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে চলেছে; (তোমরা কি মনে করো) এরা উভয়েই সমান? (না কখনো নয়,) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে; কিন্তু এদের অধিকাংশ মানুষই কিছু জানে না। ৭৬. আল্লাহ তায়ালা আরো দু'জন মানুষের উদাহরণ দিচ্ছেন, তাদের একজন হচ্ছে মূক– সে কোনো কিছুই নিজে থেকে করতে (বা বলতে) পারে না, সে (সব সময়) নিজের মনিবের ওপর বোঝা হয়ে থাকে, যেখানেই তাকে সে পাঠায় না কেন, সে কোনো ভালো কিছু নিয়ে আসতে পারে না; এ (অক্ষম) ব্যক্তিটি কি সমান হতে পারে সে ব্যক্তির, যে (নিজে মূক তো নয় বরং) সে অন্য মানুষদের ন্যায় কাজের আদেশ দিতে সক্ষম, (সর্বোপরি) যে ব্যক্তি সহজ সরল পথের ওপর আছে!

তাফসীর
আয়াত–৫১–৭৬

সর্বশক্তিমান আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিষয়টি নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা শুরু হচ্ছে। সর্বপ্রথম এখানে যে কথাটি বলা হয়েছে তা হচ্ছে জীবন মৃত্যুর মালিক এবং সর্বময় ক্ষমতার মালিক একমাত্র একজনই হতে পারেন, তিনিই আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর ক্ষমতায় ভাগ বসানোর মতো দ্বিতীয় কোনো শক্তি নেই। আলোচ্য অধ্যায়ের মধ্যে পরপর প্রথম তিনটি আয়াতে জানানো হয়েছে যে সকল নেয়ামতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আর এ কথাটি বুঝানোর জন্যে দুটি উহাদরণ দেয়া হয়েছে। একটি হচ্ছে সর্বশক্তিমান মালিক ও রেযেকদাতা এবং দুই-অধীনস্থ অসহায় গোলাম, যার কোনো কর্তৃত্ব নেই কোনো কিছুর ওপর আর কোনো কিছুর ওপর তার মালিকানাও নেই, এই দুই-এর সত্ত্বা কি কখনও সমান হতে পারে? প্রথম চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ

রাব্বুল আলামীন যিনি সকল কিছুর মালিক এবং যিনি সকল প্রাণীর যাবতীয় প্রয়োজন মেটান তিনি এমন কোনো ব্যক্তির সমান বা সমকক্ষ কেমন করে হবেন যে প্রকৃতপক্ষে কোনো কিছুর ওপর মালিক নয় বা কারও কোনো প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতাই যার নাই এবং অপরের ওপর যে নির্ভরশীল? এমন দুই সত্ত্বাকে একইভাবে 'ইলাহ' (সর্বময় ক্ষমতা বা জীবন মৃত্যুর মালিক) শব্দ দ্বারা কেমন ভাবে সম্বোধন করা যায়?

আল্লাহর নেয়ামত অফুরন্ত

এ পরিচ্ছেদে মানুষের কাছে তাদের বোধগম্য এমন উদাহরণ পেশ করা হয়েছে যা বুঝতে কোনো বেগ পেতে হয় না, কারণ দুঃখ বিপদের সময় সৃষ্টজীব এসব মানুষ কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানায় সর্বময় ক্ষমতার মালিক, জীবন মৃত্যু-দানকারী একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শা'নুহুর কাছে। কিন্তু, আফসোস হতভাগা এই মানুষটি যখন বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে যায় তখন সেই মহান আল্লাহর ক্ষমতায় আরো কারো অংশ আছে বলে মনে করে, অথচ তথাকথিত এই বুদ্ধিমানরা (?) একটুও চিন্তা করে না যে, যাদেরকে তারা আল্লাহর শরীক মনে করে তাদের না ছিলো অতীত, না আছে ভবিষ্যৎ, বরং সাময়িকভাবে হয়তো তারা একটু ক্ষমতা লাভ করেছে, কিন্তু তারা এতো অসহায় যে, এই ক্ষমতাকে কোনো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তারা ধরে রাখতে পারবে বলে জোর করে বলতে পারে না।

এসব বিবেক বর্জিত বেওকুফরা তাদের নিজেদের হাতে তৈরী করা পুতুলের সামনে মাথানত করে এবং তাদের কাছে নিজেদের প্রয়োজনের কথা পেশ করে কাকুতি মিনতি করতে থাকে। কেন তারা এসব বাজে আচরণ করে, জিজ্ঞাসা করা হলে কোনো জবাব দিতে না পেরে তারা নির্বাক হয়ে যায় ও উগ্র মূর্তি ধারণ করে। তাদের নির্বুদ্ধিতা এতোদূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে তারা বিশ্বের জীবন-মৃত্যুর মালিকের শক্তি ক্ষমতা অংশীদার বানায়। তারা এমন সব দুর্বল ও অসহায় মেয়েদেরকে আল্লাহর কন্যা আখ্যা দেয় যাদের জন্মকে তারা নিজের কুলক্ষণা ও ভাগ্যহারা হওয়ার লক্ষণ মনে করে এবং তাদেরকে সকল দিক দিয়ে অপদার্থ মনে করে, তাদের জন্মের সাথে সাথে তাদের মুখ কালো হয়ে যায় ও যথাশীঘ্র তাদেরকে জীবন্ত কবর দিয়ে ওই আপদ থেকে তারা রেহাই পেতে চায়। এহেন দুর্লক্ষুণে সৃষ্টিকে তারা আখ্যা দেয় আল্লাহর কন্যা বলে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে আল্লাহ ছাড়া তারা কাউকে সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক মনে করে না, কাউকে জীবন মৃত্যুর মালিক ও সৃষ্টিকর্তাও মনে করে না-আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে তারা এটাও চিন্তা করতে পারেনা যে আল্লাহ তায়ালা যদি কারো মুখাপেক্ষী হন, কারো সাহায্য যদি তাঁর প্রয়োজন হয় বা তাঁর ক্ষমতার কিছু অংশ অন্য কারো হাতে যাওয়ার কারণে যদি সে তাঁর ক্ষমতার অংশীদার হয়ে যায়, তাহলে সর্বময় ক্ষমতার মালিক বলতে আর কেউ থাকতে পারে কিনা। কী আশ্চর্য! যে রেযেক আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দিয়েছেন, সেগুলোর কোনো কোনোটার মালিক তারা অন্য কাউকে মনে করে, অথচ যে সব জিনিস তাদের অধিকারে আছে সেগুলোর কোনো অংশ তাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদেরকে তারা কিছুতেই দিতে চায়না, এরশাদ হচ্ছে,

'আর মেয়েদেরকে দুর্লক্ষুণ মনে করে বলেই তাদেরকে কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার সংবাদ দেয়া হলে তাদের মুখ কালো হয়ে যায় এবং তারা রাগে জ্বলে ওঠে।'

আবার যে সময়ে তারা আল্লাহর জন্যে সেসব জিনিস বানায় যা তারা নিজেরা অপছন্দ করে, সে সময়ে অহংকারের সাথে তারা বলে যে, সকল কল্যাণ ও তাদের জন্যেই বরাদ্দ এবং যে আচরণ তারা করছে অবশ্যই তারা তার ভালো ফলই পাবে! আর যাদের কাছে রসূল (স.)

এসেছেন সেইসব লোক এসব বাজে চিন্তাধারা তাদের পূর্বসুরী মোশরেকদের কাছ থেকেই তো পেয়েছে-এজন্যে বড় করুণা করে আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে শেষবারের মতো নবী মোহাম্মদ (স.)-কে পাঠিয়েছেন যেন তাদেরকে আল কোরআনের মধ্যে বর্ণিত হেদায়াতের পথ সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া যায়। তবে, সত্যকে যারা গ্রহণ করেছে সেই সব মোমেনদের জন্যে রয়েছে এ কেতাবের মধ্যে হেদায়াত ও রহমত।

তারপর আল্লাহর নির্মিত বস্তু সম্ভারের মধ্যে মানুষের জন্যে রাখা হয়েছে বহু নিদর্শন ও উদাহরণ, যদি তাঁরা চিন্তা করে দেখে তাহলে এগুলোর মধ্যে তাদের জন্যে উপদেশ ও শিক্ষা রয়েছে। একটু খেয়াল করে বুঝতে চাইলেই তারা অনুভব করতে পারবে যে, আল্লাহ তায়ালাই সকল কর্তৃত্বের মালিক এবং সব কিছুকে অস্তিত্ব দান করেছেন। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা এসব নিদর্শনই হচ্ছে আল্লাহকে চেনার দলীল। এগুলোকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো কিছু দিয়ে তাঁকে জানা যাবে না। অতএব,দেখুন আল্লাহ তায়ালাই আকাশ থেকে বর্ষণ করেছেন বৃষ্টিধারা, অতপর তার দ্বারা তিনি যমীনকে মরে যাওয়ার পর আবার স্বজীব করে তুলেছেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পানি ছাড়াও আরও অনেক কিছু পান করান, যেমন দুধ যা সহজে গলার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। এ দুধ গবাদি পশুর পেট থেকে পাওয়া যায় এবং তা বেরিয়ে আসে গোবর ও রক্তের মধ্যবর্তী অবস্থিত এক সুন্দর পথ বেয়ে। আবার দেখুন, মানুষের জন্যে খেজুর আংগুর ইত্যাদি ফল পয়দা করেন, যার থেকে বিভিন্ন ধরনের সুন্দর পানীয় পান করার বস্তু প্রস্তুত করা হয়। একইভাবে আল্লাহ তায়ালা মৌমাছিকে হুকুম দিয়েছেন যেন তারা পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা ও যে কোনো উঁচু যায়গায় চাক বাঁধে তারপর সেইচাক থেকে তিনি স্বচ্ছ মধু বের করার ব্যবস্থা করেন যা মানুষের জন্যে ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তারপর আরও দেখুন, আল্লাহ তায়ালাই মানুষকে সৃষ্টি করেন এবং তাদেরকে মৃত্যু দান করেন। এদের মধ্যে কাউকে তিনি বৃদ্ধ বয়স লাভ করার জন্যে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখেন এবং তখন তারা এতোটা বৃদ্ধ হয়ে যায় যে ওই বয়সে এসে জানা অনেক জিনিস তারা ভুলে যায়, আর সে বয়সে তারা এতো বেশী দুর্বল হয়ে যায় যে তাদের স্মৃতিশক্তি অত্যধিক কমে যায়, যার কারণে তাদের আর কিছুই মনে থাকেনা। এর ফলে সারা জীবন ধরে অর্জিত তাদের সকল জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায়। আবারও দেখুন, আল্লাহ তায়ালা তাদের কাউকে কারো ওপর আর্থিক দিক দিয়ে বেশী মর্যাদাবান বানিয়েছেন, এ জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্য সম্ভার লাভ করার ব্যাপারে কোনো কোনো ব্যক্তিকে অপর অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আবার আল্লাহ রব্বুল ইযযত তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের জোড়া জুটিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের মাধ্যমে দান করেছেন তাদের সন্তানাদি পৌত্র-পৌত্রী ও নাতি-নাতনী..... এরপরও তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের দাসত্ব করে এবং বিনা যুক্তিতে অন্য এমন কিছুর অন্ধ আনুগত্য করে যারা তাদের কোনো প্রয়োজনই মেটাতে পারে না এবং আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর কোনো জিনিসের ওপর তাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই, নেই কোনো কিছুকে পরিচালনার ক্ষমতা, এতদসত্তেও তারা আল্লাহর সাথে বিভিন্ন বস্তুর তুলনা করে এবং তাঁকে মনগড়া বিভিন্ন জিনিসের মত কল্পনা করে।

আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এসব ধারণা কল্পনা করতে গিয়ে কখনও তারা তাঁকে কোনো মানুষের মতো করে, তাঁর কাল্পনিক মূর্তি বানায় আবার কখনও তারা তাদের আশেপাশের জীবজন্তু অথবা প্রাকৃতিক কোনো বস্তুর মতোই তাঁকে কল্পনা করে সেইমতো মূর্তি তৈরী করে ও সেগুলোর পূজা করে। আবার কখনো কখনো তারা আল্লাহর সংরক্ষিত ক্ষমতা মানুষের হাতে তুলে দিয়ে

মানুষকেই আল্লাহর আসনে বসিয়ে দেয়। যারা মূর্তিপূজা করে নিজেদের হাতে তৈরী অসহায় মূর্তিদের সামনে তারা পেশ করে নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য-খাবার এবং কল্পনা করতে থাকে যে, সেগুলো ওইসব খাদ্য-খাবারের স্বাদ-গন্ধ পেয়ে তুষ্ট হয়ে যাবে এবং তাদের প্রতি করুণা দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, তাদের জন্যে বরাদ্দ করবে খাদ্য-পানীয় ও জীবন ধারণের অন্যান্য দ্রব্যাদি এবং তাদের আশে-পাশের বস্তু নিচয় থেকে তাদেরকে সরবরাহ করবে তাদের জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সব কিছু। এরপর এ প্রসংগটি সমাপ্ত করা হচ্ছে ওই দুটি উদাহরণ দান করার সাথে যার দিকে একটু আগেই ইংগীত করা হয়েছে, অর্থাৎ সর্বশক্তিমান জীবন মৃত্যুর মালিক মনিব-রেযেকদাতা এবং অসহায় ও অক্ষম গোলাম– এই দুই সত্ত্বা কি কোনো অবস্থাতেই বরাবর হতে পারে। এ উদাহরণ-দ্বারা তাদের জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধির দুয়ারে করাঘাত করা হয়েছে, যাতে করে গভীরভাবে একথাগুলো তাদের হৃদয় পটে রেখাপাত করে, অনুভূতিতে সাড়া জাগায় এবং তাদের ঘুমন্ত বিবেককে ঝাঁকি মেরে জাগিয়ে তোলে।

নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর

'আল্লাহ তায়ালা বললেন, 'তোমরা দু'জনকে ইলাহ (?) হিসাবে গ্রহণ করো না..... দুনিয়ার মজা লুটে নাও অতপর শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।' (৫১-৫৫)

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন মানুষ যেন দুজনকে 'ইলাহে' হিসাবে গ্রহণ না করে। 'ইলাহ' চিরদিনই একজন, তাঁর দ্বিতীয় বলতে কেউ নাই, হতে পারে না, কারণ শক্তি ক্ষমতা একাধিক সত্ত্বার মধ্যে থাকলে কেউই সর্বশক্তিমান হতে পারে না। আবার ক্ষমতার মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে থাকলে একই নিয়মে সারা বিশ্ব চলতে পারতে না। অতএব তিনি একাই, তাঁর দ্বিতীয় কেউ নেই। আরও চিন্তা করে দেখুন সবার স্রষ্টা একমাত্র একজন যার হুকুমে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে চলছে গোটা সৃষ্টির সব কিছু। এখানে বাক্যধারার মধ্যে একটি কথাকে দু'বার বলা হয়েছে ''ইলাহায়নে'-দুজন ইলাহ আবার 'ইসনাইনে'-দুজন এবং না-সূচক কথার পর সংক্ষেপে বলা হয়েছে-ইলাহ মাত্র একজন। আবার না-সূচক কথার পর সংক্ষেপে আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে আবারও সংক্ষেপে বলা হয়েছে 'শুধুমাত্র আমাকে ভয় করো।' অর্থাৎ আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করো না, যেহেতু আমার শক্তি ক্ষমতার সাথে তুলনা করার মতো আর কেউ নেই বা আমার ক্ষমতাকে কোনো দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝানো যাবে না। 'রহবাতুন' শব্দটি 'তাহ্যীর'-থেকে অধিক ভীতি প্রকাশক...... অর্থাৎ সকল কিছু মৌলিকভাবে আকীদার সাথে জড়িত সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি এ বিশ্বাসের সাথে যদি তাঁরই ভয় হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধমুল না হয় তাহলে ঈমান টিকে থাকতে পারে না। আর অন্তরের মধ্যে আল্লাহভীতি যদি স্পষ্টভাবে না থাকে এবং এ ভয়-ভীতির বহিপ্রকাশ যদি না দেখা যায়-অর্থাৎ বাহ্যিক আচরণ দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে যদি কোনো ব্যক্তির মনে আল্লাহর ভয় বর্তমান আছে বলে জানা যায় তাহলেই তার ঈমানের দাবী গ্রাহ্য হবে, নচেৎ নয়। আল্লাহর ভয়ের সাথে অন্তরের মধ্যে অন্য কারো ভয় থাকলে..... আল্লাহর ওপর ঈমান কিছুতেই মযবুত ভিত্তিতে দাঁড়াতে পারবে না।

অবশ্য অবশ্যই তিনিই একমাত্র ইলাহ, সর্বশক্তিমান বা জীবন মৃত্যুর মালিক। তিনিই একমাত্র মালিক, সব কিছুর ওপর বিরাজমান রয়েছে তাঁর আধিপত্য।

'আর আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর মালিক একমাত্র তিনিই।' তিনিই একমাত্র কৃপা প্রদর্শনকারী।

'চিরস্থায়ী ও নিরংকুশ আনুগত্য একমাত্র তাঁর জন্যেই নির্ধারিত।' অর্থাৎ যখনই কেউ দ্বীন ইসলামের সন্ধান পেয়ে যাবে তখন থেকেই আল্লাহর দেয়া এ জীবন ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য পেশ

করতে হবে, যেহেতু আল্লাহর জীবন ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। তিনিই একমাত্র নেয়ামত দানকারী। যতো প্রকার নেয়ামত তোমরা লাভ করেছো তা সবই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছ থেকেই তোমরা পেয়েছো। আর তোমাদের স্বভাব প্রকৃতিই এমন যে, কোনো সংকট সমস্যায় ও কঠিন দিনে তাঁর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে। দুঃখ বেদনা ও বালা মুসীবতের সময় তোমাদের অন্তর প্রাণ মিথ্যা ও কাল্পনিক দেব-দেবীর দিক থেকে সরে এসে পরম করুণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর দিকেই ধাবিত হয় এবং সে সময় তাঁর শক্তি ক্ষমতার সাথে অন্য কারো কোনো অংশ আছে, এ কথা কিছুতেই আর মন মানতে চায় না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর যখন কোনো দুঃখ কষ্ট তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা কাতর কণ্ঠে তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতে শুরু করে দাও।'

অর্থাৎ ওই কঠিন অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে একমাত্র তাঁর কাছেই কাতরভাবে চীৎকার করে ওঠো।

আর এভাবে সার্বভৌমত্ব, বাদশাহী, নিরংকুশ আনুগত্য, নেয়ামত-দান ও মুখাপেক্ষিতা হাসিলের পাত্র একমাত্র তিনি যখন দুঃখ কষ্ট মানুষকে ভেংগে দিতে চায়, জীবনকে বিপন্ন করে নানা প্রকার শেরেকের বিড়ম্বনা আসে তখন মানব প্রকৃতি হঠাৎ করে নিজের অজান্তেই সাক্ষ্য দিয়ে ওঠে যে শক্তি ক্ষমতা, মান সম্মান ও সম্পদের মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ, আবেদন নিবেদন লাভ করার অধিকারী একমাত্র তিনিই। এতদসত্তেও, একদল মানব গোষ্ঠী আল্লাহর একত্ব ও সাবভৌমত্বের সাথে এই উদ্দেশ্যে অন্য অনেককে শরীক করে থাকে যে তারা ওদেরকে কঠিন বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দৈন্য থেকে উদ্ধার করবে। এভাবে তারা আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করে কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অস্বীকার করতে শুরু করে সেইসব নেয়ামতকে যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তাদেরকে দিয়েছেন। সুতরাং সাময়িক সংকীর্ণ সংক্ষিপ্ত ও ক্ষণস্থায়ী এ জীবন শেষে যে চিরস্থায়ী জীবন আসছে সেখানে তাদের কি ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে, অবশ্যই সে বিষয়ে তাদের চিন্তা করা উচিত এজন্যে এরশাদ হচ্ছে, 'আমোদ ফূর্তি করে নাও (এ ক্ষণস্থায়ী জীবন) শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।'

বিপদে এক আল্লাহ কেটে গেলেই শেরেক!

উপরোক্ত তাফসীরে এই ব্যাখ্যাটাই অত্যন্ত জোরদার হয়ে ফুটে উঠেছে যে,

'তারপর যখন কোনো দুঃখ দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁর কাছেই কাকুতি মিনতি করতে শুরু করে দাও, আবার যখন এ দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায় তখন তোমাদের মধ্য থেকে একদল লোক তাদের রবের সাথে অন্য কাউকে শরীক করতে শুরু করো দেয়।'

এ উদাহরণ বারবার পেশ করা হয়েছে, বারবার মানুষের এই অভ্যাসের কথা উল্লেখ করে তাদেরকে সময় থাকতেই সাবধান হতে বলা হয়েছে। প্রতি বারেই দেখা গেছে সংকট সমস্যায় মানুষ যখন জর্জরিত হয়ে যায় তখন তাদের অন্তর আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে যায়, কারণ তখন আপনা থেকেই তাদের মনই বলে ওঠে যে এ কঠিন অবস্থা থেকে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বাচাতে পারবেনা, কিন্তু যখনই সংকট কেটে যায় স্বচ্ছলতা ফিরে আসে পুনরায় আল্লার নেয়ামত লাভ করে তখন পেছনের কথা ভুলে গিয়ে আবার তারা নাফরমানী করতে শুরু করে, বিপদের সময় আল্লাহর সাথে তারা যে অংগীকার করেছিলো তা আবার শিথিল হয়ে যায় তখন কতো প্রকার বাঁকা পথে তারা যে শেরেক করতে শুরু করে দেয় তার ইয়ত্তা নেই, যদিও তার একেবারে প্রকাশ্যভাবে ও খোলাখুলি কথায় আল্লাহর নাম নেয়া পরিত্যাগ করে না।

আবার কখনও এমন হয় যে, কোনো কোনো জাতি সত্য থেকে এতো বেশী দূরে চলে যায় যে তার প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবণতা থেকেও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বিশৃংখলা ও ধ্বংসের পথটাই নিজেদের জন্যে তারা পছন্দ করে নেয়, এমনকি চরম কঠিন অবস্থার মধ্যেও তারা নরম হয় না ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না, এখানে মনে রাখা দরাকার যে সর্বকালেই মানুষ জানে যে আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টিকর্তার সর্বময় ক্ষমতার মালিক, কিন্তু তাঁকে রব প্রতিপালক মনিব ও বাদশাহ বলে মানলে তাঁর আইন কানুন অনুসারে চলতে হবে—এজন্যে পীর পুরোহিতদের কথামত দেব-দেবীর পূজা করলে জীবনের সব ব্যাপারে আল্লাহর বিধান মানা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে—প্রধানত একারণেই তারা ওইসব শেরেকে লিপ্ত হয়ে গেছে। তারা সংক্ষেপে ও বিনা কষ্টে স্বার্থলাভ করার জন্যে আল্লাহর কোনো সৃষ্টিজীবের দাসত্ব করে এবং তাদের কাছে সাহায্যের জন্যে প্রার্থনা জানায়, অবশ্য তাদের সামনে ওরা মাথা নত করে বিপদমুক্তি ও আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হচ্ছে, তারা অবশ্যই আল্লাহর কাছে সম্মানী ও বড় মর্যাদার অধিকারী, আবার কখনও কখনও তারা বিনা যুক্তিতেই ওসব দেবতার পূজা অর্চনা করে ও তাদেরকে সাহায্যের জন্যে ডাকে, যেমন করে রোগ-ব্যাধি, সংকট সমস্যা ও বিপদ আপদের মধ্যে মানুষ বন্ধু বান্ধবকে ডেকে থাকে........ আসলে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার ব্যাপারে জাহেলি যামানার মোশরেকদের তুলনায় এরা আরও অনেক বেশী কঠিন হৃদয়। এদের সম্পর্কেই আল-কোরআন ওপরের ওই উদাহরণটি পেশ করেছে যা আমরা একটু আগে দেখলাম। অথচ তারা এ কথাটি চিন্তা করে না, যাদের ধন সম্পদ ও পদমর্যাদার দিকে তাকিয়ে তাদের কাছে ওরা সাহায্য চায় তারা নিজেদেরকে দুনিয়ার দুর্দিনে এবং পরকালে আল্লাহর আযাব থেকে অন্যদের বাঁচানো দূরের কথা নিজেরা বাঁচবে কিনা তারও ঠিক নেই।

গায়রুল্লাহর নামে দান বা উৎসর্গ হারাম

'আমি ওদের যা কিছু রেযেক দিয়েছি তার একাংশকে ওরা এমন সবার জন্যে বরাদ্দ করে যারা জানেওনা (এই রেযেকের মূল উৎস কোথায়'?) একারণে তারা নিজেদের জন্যে কোনো কোনো জীব-জন্তু (গবাদি পশু) কে হারাম করে নেয়, তার ওপর তারা সওয়ার হয় না এবং তাদের গোশতও তারা খায়না, অথবা সেগুলোকে তারা পুরুষদের জন্যে জায়েয করে নেয় আর মেয়েদের জন্যে করে নেয় না-জায়েয। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে সূরায়ে আল আনয়ামের মধ্যে মানত করা জীবজন্তু সম্পর্কে আলোচনায় আমরা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। অথচ এসব বিষয়ের কোনো জ্ঞান তাদের নাই-অর্থাৎ এধরনের মনগড়া কাজ করার মধ্যে কতোটুক ফায়দা আছে আর কতোটুকু ক্ষতি আছে তার সঠিক কোনো জ্ঞান তাদের নাই। এগুলো প্রাচীন জাহেলী যামানা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কিছু ভিত্তিহীন কাল্পনিক ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত সত্য কথা তো হচ্ছে এই যে, যেসব জিনিসের (জন্তুর) অংশ বিশেষকে, না জেনে তারা কারো জন্যে নির্ধারণ করে নেয় সেগুলোকে তো তাদের রেযেক হিসাবে আল্লাহ তায়ালাই তাদের জন্যে বরাদ্দ করেছেন। অবশ্যই এগুলো, তাদের ওইসব কাল্পনিক মাবুদদের দেয়া কোনো নেয়ামত নয় যে, তাদের দানের কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্যে তাদেরকে এর অংশ দেয়া হবে। এখানেও লক্ষ্য করার বিষয়, যদি ওদের ওই মাবুদদের কাছ থেকে ওইসব পশু এসে থাকে তাহলে তাদের জন্যে সেগুলো ছেড়ে দেয়ার কী অর্থ হতে পারে? প্রকৃতপক্ষে তারা কি ওগুলো ভক্ষণ করবে না, তাদের নামে ওইসব পীর পুরোহিতরা ওগুলো ভক্ষণ করবে, যারা এসব নিয়ম প্রথা চালু করেছে? অবশ্য অবশ্যই এসব পশু তাদের জন্যে একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই বরাদ্দ করা হয়েছে। আল্লাহ

তায়ালা তাদেরকে তাওহীদের (আল্লাহর একত্ব বিশ্বসের) দিকে ডাকছেন, কিন্তু ওরা তাঁকে বাদ দিয়ে আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে অংশীদার কল্পনা করে নিয়ে তাদেরকে পূজা করছে ও তাদের কাছেই নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে আবেদন জানাচ্ছে!

এভাবে ওদের কল্পনা ও বাস্তব কাজের মধ্যে যে পার্থক্য ছিলো তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে গেছে.........রেযেক বা জীবন ধারণ সামগ্রী সবই আল্লাহর কাছ থেকে আসে, এর কোনো একটি অংশও অপর কারো কাছে থেকে আসে না। এজন্যে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন নিরংকুশ ও নিঃশর্ত আনুগত্য তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকেই যেন না দেয়া হয়, কিন্তু এ মোশরেকরা আল্লাহর হুকুম অমান্য করে আরও বহুজনকে উপাস্য বা দেব দেবী হিসাবে গ্রহণ করে থাকে, অথচ তারা একটুও চিন্তা করে না যে, তারা প্রতিনিয়ত একমাত্র আল্লাহর দেয়া রেযেক গ্রহণ করছে এতদসত্তেও কেমন করে তারা তাঁর নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হতে পারে? এইভাবে তারা যে ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য থেকে দূরে থাকছে তা পরিষ্কারভাবে জানা যাচ্ছে। তাদের এ অদ্ভুত আচরণ যে পুরোপুরিই বিবেক বিরোধী এটা তারা জানে এবং এটা বুঝে সুঝেই তারা এসব জঘন্য আচরণ করে চলেছে!

তওহীদ সম্পর্কিত শিক্ষা এসে যাওয়ার পর যখন মানুষ সাধারণভাবে তা গ্রহণ করা শুরু করে দিয়েছে তখন এর সত্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে, এতদসত্তেও হঠকারীতায় অন্ধ, অহংকারী ও জেদী প্রকৃতির একদল লোক আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত রেযেকের কিছু অংশ অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে আসে বলে মনে করে। প্রাচীন জাহেলী যুগের লোকেরাও এইভাবেই অন্যদেরকে রেযেকের কিছু অংশের মালিক মনে করতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ গরুর বাছুরকে মনে করতো কিছু ক্ষমতার মালিক বলে তারা বলতো এ বাছুরটি বেদুইন নেতার-এর বিশেষ কিছু শক্তি ক্ষমতা আছে, সুতরাং একে কেউ বিরক্ত করো না, যেখান থেকে ইচ্ছা সে খেয়ে বেড়াক। খবরদার তাকে কোনো কাজেও কেউ লাগিয়োনা অবশেষে একে সেই বেদুইন-নেতার নামেই যবাই করা হবে-আল্লাহর নামে নয়। এভাবে অতীতে অনেক আল্লাহর পরিবর্তে তাদের পীর দরবেশদের নামে মানত করে কোনো কোনো পশু ছেড়ে দিতো, আল্লাহর নামে ছাড়া অন্য কারো নামে কোনো কিছু মানত করা সম্পূর্ণ হারাম। মুখে মুখে তারা মানতো ও জানতো যে আল্লাহ তায়ালাই সর্বশক্তিমান, কিন্তু বাস্তবে তারা এই আচরণ দ্বারা প্রমাণ করতো যে পীর দরবেশদেরও কিছু ক্ষমতা আছে এবং এইভাবেই তাদেরকে তারা আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার কিছু অংশের মালিক মনে করতো। এহেন মানতের পশুকে আল্লাহর নামে যবাই করলেও প্রকৃতপক্ষে তার গোশত খাওয়া হারাম, এহেন আচরণ সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহর কসম, অবশ্যই তোমরা যে তাঁর নামে মিথ্যা অপবাদ দিতে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

দেখুন কথাটার ওপর অত্যধিক ও প্রবল গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা নিজেই নিজের কসম খাচ্ছেন, কারণ আল্লাহ রব্বুল আলামীন সকল শক্তি ক্ষমতার মালিক, একথা জেনে বুঝে ও স্বীকার করে যদি তাঁর ক্ষমতার অংশ বিশেষের অন্য কাউকে মনে করা হয়, তাহলে কি আল্লাহর সাথে বিদ্রূপ করা হয় না? সচেতনভাবে যারা এ আচরণ করে তারা অবশ্যই আল্লাহ সম্পর্কে মৌলিক আকীদার মূলেই আঘাত হানছে, যেহেতু এভাবে বিশ্বাস করার অর্থ তৌহীদী বিশ্বাসকেই ধ্বংস করে দেয়া।

আল্লাহর ওপর মোশরেকদের নির্লজ্জ অপবাদ

'ওরা আল্লাহর জন্যে কন্যাসন্তান নির্ধারণ করে, অবশ্যই তিনি সন্তান গ্রহণ (করার দুর্বলতা) থেকে পবিত্র, আর তাদের জন্যে তারা গ্রহণ করে তাই যা তাদের মন চায় অর্থাৎ পুত্র সন্তান...... শোনো, কি নিকৃষ্ট সিদ্ধান্তই তারা গ্রহণ করেছে!' (আয়াত ৫৬-৫৯)

মানুষের আসল আকীদা যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন তা কতোদুর খারাপ হতে পারে তার কোনো সীমা থাকে না এবং পরবর্তীতে গৃহীত বিধ্বস্ত আকীদার মধ্যে সঠিক আকীদার নাম গন্ধও থাকে না, বরং এলোমেলোভাবে গৃহীত হয়ে থাকে তার মনগড়া বিভিন্ন বিশ্বাস, যার না থাকে কোনো স্থায়িত্ব আর না থাকে কোনো যৌক্তিকতা তখন প্রধানত সে আবেগ-চালিত হয়ে যায় এবং যুক্তি বুদ্ধিহীনভাবে এবং অন্ধ আবেগের তাড়নে চালিত হয়ে কোনো এক মত বা পথ গ্রহণ করে ইহকাল ও পরকালের ক্ষতির দিকে এগিয়ে যায়। সুস্থ ও সজ্ঞানে গৃহীত সঠিক আকীদাই জীবনের প্রথম ও মূল চালিকা শক্তি তা প্রকাশ পাক বা অন্তরের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করুক। ওই আরব জাহেলরা মনে করতো যে আল্লাহর জন্যে রয়েছে ফেরেশতা-রূপ কন্যা সন্তান, যদিও নিজেদের জন্যে তারা কন্যা সন্তানের জন্ম হওয়াকে দুর্ভাগের লক্ষণ মনে করতো। এখন চিন্তা করে দেখুন, কেমন তাদের বিবেচনা। একদিকে যাঁকে সর্বশক্তিমান,সৃষ্টিকর্তা ও জীবন মৃত্যুর মালিক বলে জানছে ও মানছে তাঁর প্রতি ভক্তি ভালবাসা প্রদর্শন করছে আর তাঁরই জন্যে কন্যা সন্তান আছে বলে কল্পনা করছে এবং নিজেদের জন্যে পছন্দ করছে পুত্র সন্তান। অথচ নিজেদের জন্যে কন্যা সন্তান হওয়াকে তারা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ মনে করে।

আসলে জাহেলী যামানায় সঠিক আকীদা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই তাদের কাছে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া সহজ হয়ে গিয়েছিলো। যদি কাউকে তারা হত্যা না করে বাঁচিয়ে রাখতো তাহলে সেই মেয়েকে চরম হীনমন্যতা ও অপমানের জ্বালা সহ্য করেই বেচে থাকতে হতো। কন্যা সন্তানকে নিয়ে তাদের এই হীনমন্যতার কারণ ছিলো এই যে, কন্যা সন্তানরা তাদের যুদ্ধ বিগ্রহে সাহায্য করার যোগ্য নয়, উপার্জন করার মতো ক্ষমতাও তারা রাখে না বরং যুদ্ধাবস্থায় তাদের নিরাপত্তার চিন্তা তাদের মধ্যে দুর্বলতার অনুভূতি টেনে আনে যে, পরাজিত হলে এসব কন্যাসন্তান শত্রুর হাতে ধরা পড়ে দাসীতে পরিণত হবে, আর বিজয়াবস্থায় তাদেরকে বিয়ে দিয়ে কাউকে জামাই বানাতে হবে আর সেসব জামাইদের দেমাগ হবে সীমাহীন চড়া। তারা যে অসহ্য যন্ত্রণা মেয়েদেরকে দেবে–তা না যাবে সহ্য করা, না যাবে তার কোনো প্রতিকার করা অথবা এই মেয়েরা পরিবারের বোঝা হয়ে দুঃখ দৈন্য ডেকে আনবে-এইসব নানাবিধ দুশ্চিন্তার শিকার হয়েই তারা ওই চরম নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন হত্যাকান্ড ঘটাতো, আর জাহেলী সমাজে এটা কোনো অপমান বলেই গণ্য হতো না।

অপর দিকে, সহীহ ও সঠিক ইসলামী আকীদা এসব কদর্য ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, এ পবিত্র ও সুস্থ আকীদার কারণে মানুষ জানে ও গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে রেযেক একমাত্র আল্লাহরই হাতে, তিনি সবাইকে তাদের জীবন ধারণের উপযোগী যাবতীয় সামগ্রী সরবরাহ করেন, আর আল্লাহ তায়ালা যে সব বিপদ আপদ তাদের তাকদীরের লিখন হিসাবে পূর্ব থেকে নির্ধারণ করে রেখে দিয়েছেন তা ছাড়া অন্য কারো কারণে বা অন্য কোনো ব্যক্তির জন্যে কোনো বিপদ কিছুতেই আসতে পারে না বা আসবে না। সহীহ আকীদার কারণে সে আরো বিশ্বাস করে যে মানুষ সবাই প্রকৃতিগতভাবে পবিত্র এবং নর ও নারী নিয়েই তো মানুষের অস্তিত্ব। নারীকে বাদ দিয়ে পুরুষের জন্ম হবে কেমন করে! এজন্যে যে নারী অবশ্যই মানব সমাজের অর্ধেক, সে নরের জোড়া– তার

সুখ-দুঃখের সাথী, তার অবর্তমানে ও অভাবে পুরুষের জীবন হয়ে যায় মরুভূমির মতো নীরব নিথর ও শুষ্ক। ইসলাম তাকে দিয়েছে মানুষের অবিচ্ছেদ্য অংশের সম্মান।

কন্যা সন্তান হলে অখুশী হওয়া

বর্তমান আলোচ্য প্রসংগে জাহেলিয়াতের ঘৃণ্য অভ্যাস ও জাহেলী সমাজের একটি কুৎসিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যখন তাদেরকে কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার সংবাদ দেয়া হয়, তখন (অপমানের জ্বালায়) তাদের মুখ কালো হয়ে যায়, আর তারা রাগে গরগর করতে থাকে।'

অর্থাৎ, অপমানের গ্লানিতে, অভাবের ভয়ে মুখ তাদের কালো হয়ে যায় এবং এজন্যেই কন্যা-সন্তান জন্ম হওয়ার সংবাদে সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে। সে এর পরেও যদি কন্যা সন্তানকে হত্যা না করে, তার জন্মকে সহ্য করে যায়, সত্যিকারে কি সে মহা এক আপদের আগমন জ্বালা সহ্য করে বড় কষ্টে তার রাগকে সে সংবরণ করে? নবজাত কন্যা শিশুটির কী দোষ, সে তো নিজের ইচ্ছায় দুনিয়ায় আসেনি। ইসলামের সহীহ্ আকীদা মানুষকে অধিকার ও সম্মানের দিক দিয়ে পুরুষের মতোই নারীর অবস্থান ও মর্যাদা দেয়, সে তার জন্যে আল্লাহর এক আশীর্বাদ ও এক মহাদান। মাতৃজঠরে যখন কোনো বাচ্চা পয়দা হয়, তখন পুত্র-কন্যা যাই হোক না কেন এ বিষয়ে মানুষের কোনো হাত নেই, যেহেতু মানুষের ইচ্ছায় পুত্র বা কন্যর জন্ম হয় না, এমনকি মাতৃজঠরে ভ্রূণ থাকার সময় সেটা জীবিত অবস্থায় পয়দা হবে– না মৃত শিশুর জন্ম হবে, সে বিষয়ের ওপরও কারো কোনো হাত নেই। আবার তুচ্ছ একটি কীটের দ্বারা পূর্ণাংগ একটি মানুষের অস্তিত্ব দানের পেছনেও কোনো মানুষের কোনো হাত নেই। চিন্তা করে দেখুন মানুষের সৃষ্টি রহস্যের কথা, অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ এক শুক্র-বিন্দুর ক্রমবিকাশের পরিণতিতে যে সুস্থ সুন্দর ও পূর্ণাংগ মানুষের আগমন ঘটে, তা কার ইচ্ছায়, কার মেহেরবানীতে, কার তত্ত্বাবধানে, কার পরিচর্যায়? অবশ্যই তা করুণাময় ও মহা মহিম এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মেহেরবানীতে। তিনিই কাউকে নর রূপে আবার কাউকে নারী রূপে পৃথিবীতে পাঠিয়ে পিতামাতার খুশীর কারণ ঘটান। কিন্তু আল্লাহর দানকে (পুরুষ বা নারী শিশু যাই হোক না কেন) সে অম্লান বদনে অভ্যর্থনা করতে পারে যে তাঁর ইচ্ছাকেই নিজের ইচ্ছা মনে করে নিয়েছে, তাঁর খুশীতে যে খুশী এবং তাঁর দানকে যে নিজের জন্যে আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে তার মুখ কালো করার কী অধিকার থাকতে পারে। মানুষ না নিজের জন্মের ব্যাপারে কোনো হাত রাখে, না নর নারী শিশুর জন্মের ব্যাপারে তার কোনো ইচ্ছা খাটাতে পারে, না জীবিত বা মৃত হিসাবে ভূমিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে সে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে? জন্ম মৃত্যুর মানবতার ক্রমবর্ধমান বিকাশের পেছনে একমাত্র আল্লাহর কর্তৃত্ব ও কৃতিত্ব সার্বিকভাবে ক্ষমতাবান।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হেকমত ও তাঁর নিয়মের দাবী হচ্ছে পৃথিবীর বুকে তিনি জীবনের স্পন্দন চালু রাখতে চান তবে তা একক কোনো সত্তার মাধ্যমে নয়, বরং দুইয়ের সম্মিলনে ও দুইয়ের সহযোগিতায়, অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে। সুতরাং, সৃষ্টি-ব্যবস্থায় নারী হচ্ছে সেই সম্মানিত ভিত্তি যাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলে। নারী সেখানে নিজের অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং পরবর্তী বংশধরের উন্মেষ ঘটায়। বংশ ধারা প্রসারে নারীর ভূমিকাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু সে-ই সেই আধার যেখানে গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়; সুতরাং এই দুইজনের একজনই তো কন্যা সন্তান-তার আগমনের সংবাদে কোনো ব্যক্তি দুঃখিত হয় কেমন করে এবং এ সংবাদের কারণে-কেমন করে নিজেকে তার জাতির কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার চিন্তা করে? অথচ এই দুই সত্ত্বার উভয়ের সার্বক্ষণিক অস্তিত্ব ছাড়া পৃথিবীতে জীবন ধারা চালু থাকা সম্ভব নয়!

নিশ্চয়ই এ সঠিক আকীদা থেকে মুখ ঘোরানোর অর্থ হচ্ছে সৃষ্টির চাকাকে থামিয়ে দেয়া। এর চিন্তা করা এবং এ উদ্দেশ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সবই সৃষ্টির গতিধারাকে ধ্বংস করার শামিল। তাই এরশাদ হচ্ছে

'শোনো, অতি নিকৃষ্ট ওদের গৃহীত সেই সিদ্ধান্ত যাতে ওরা উপনীত হয়েছে।'

আর বলুন তো এমন কী হলো যার জন্যে তারা এহেন ফয়সালায় পৌঁছলো এবং এমন পদক্ষেপ নেয়া শুরু করলো? আর এভাবেই ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের মূল্য ও তাৎপর্য মানুষের কাছে প্রকাশিত হলো এবং তাদের চিন্তাধারার মধ্যে এলো এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন, যার ফলে সমাজ সংগঠন ও সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সংজোযন হলো, মানুষের পারস্পরিক মেলামেশার মধ্যে সৃষ্টি হলো অভূতপূর্ব এক মাধুর্য। তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও শ্রদ্ধাবোধ এবং সাধারণভাবে নারীর প্রতি যত্মবান হওয়ার ফলশ্রুতিতে সমাজের মধ্যে এক নতুন স্রোত প্রবাহিত হতে শুরু করলো, উন্নত হলো গোটা মানবতা, নারী রইলো না আর ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্রী, তার উপস্থিতি কোনো প্রবঞ্চনার নামান্তর থাকলো না বরং তার উপস্থিতি বয়ে আনতে লাগলো মায়া মমতা ও মাধুর্যের ফলগুধারা। জাহেলী যামানায় যাদেরকে দুর্লক্ষুণে মনে করা হতো তাদের উপস্থিতি বিবেচিত হতে লাগলো অপরিহার্য্য বলে। ইসলামী সভ্যতার বিকাশে এমন নবযুগের সূচনা হলো যে মানুষে মানুষে সম্পর্ক মধুর থেকে মধুরতর হয়ে উঠলো এবং মানবতা খুঁজে পেলো নতুন এক স্বাদ এক নতুন অর্থ। নারীরা বিবেচিত হতে লাগলো মানব অস্তিত্বের অপরিহার্য অংগ, তার প্রতি অবজ্ঞা গোটা মানবতার প্রতি অবজ্ঞা বলে গণ্য হলো এবং কোনো কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবরস্থ করার অর্থ দাঁড়ালো গোটা মানব জাতিকে ধ্বংস করা। জীবনের একটি অংগকে অকেজো করে দেয়া এবং সর্বোপরি এটা সৃষ্টিকর্তার স্থাপিত সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে বানচাল করে দেয়ার শামিল। এটা শুধু মানব জাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং গোটা সৃষ্টির জন্যে এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য—কারণ সবাই তো নর ও নারী নামক জোড়া থেকে সৃষ্টি।

আবার দেখুন, যখনই এই সঠিক আকীদা থেকে মানুষ দূরে সরে গেছে তখনই সমাজের মধ্যে বিরাট এক ধস নেমে এসেছে, সমাজের স্বাভাবিক মেলামেশা বিগড়ে গেছে, সব দিকে সৃষ্টি হয়েছে বিশৃংখলা ও অশান্তি, পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়েছে, আর যুগের পর যুগ ধরে জারি হয়ে গেছে মারামারি হানাহানি ও এক জনকে ধ্বংস করে অপরের উত্থানের প্রতিযোগিতা। আধুনিক সমাজে অতীত জাহেলিয়াত যেন আবার ফিরে এসেছে। ইসলামী চেতনা ও ইসলামী মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে মানুষ পুনরায় ফিরে যেতে শুরু করেছে প্রাচীন জাহেলিয়াতের ভাবধারার দিকে-এর ফলে মানুষের মধ্যে ভালোবাসা হ্রাস পেয়েছে, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার স্রোতধারায় ভাটা পড়ে গেছে— মানুষ এখন এতোটা নীচ ও ইতর হয়ে গেছে যে তারা নারীদের জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করেছে, সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় তাদের অপরিহার্য অবদানকে মূল্যায়ন না করে তাদেরকে বানানো হয়েছে বিজ্ঞাপন খেলনার উপকরণ—তাদের সৃষ্টি যে মানব সভ্যতার বিকাশের জন্যেই একথা যেন আজ উগ্র সভ্যতার ধ্বজাধারীরা মুছে ফেলতে চাইছে। এইভাবে যে জেহালত শুরু হয়েছে তা ক্রমান্বয়ে মানুষকে রসাতলে নিয়ে চলেছে, আর এসবই হচ্ছে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস থেকে দূরে যাওয়ার প্রত্যক্ষ ফল।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আধুনিক সভ্যতার ধারক বাহকরা নারীর সাথে ব্যবহারের ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষা ও সভ্যতাকে ভ্রুকুটি প্রদর্শন করে চলেছে, তাদের প্রগলভতা এতোদূর এগিয়ে

গেছে যে তারা মানব সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতিতে সৃষ্টিকর্তার চিন্তা থেকে নিজেদের চিন্তাকে বড় মনে করা শুরু করে দিয়েছে। এসবই হচ্ছে আধুনিক সভ্যতাগর্বী ব্যক্তিদের ইসলামী বিশ্বাস বর্জিত চিন্তাধারার অবশ্যম্ভাবী ফল, অথচ এসব বুদ্ধিজীবী একবারও ফিরে তাকায় না ইসলামের স্বর্ণযুগে অনুসৃত পদ্ধতিসমূহের দিকে, দেখে না কোন নীতি অবলম্বনে তারা মানব সভ্যতায় শান্তি-সুধার এই অপূর্ব বিপ্লব এনেছিলো। মানুষের জীবনে এনেছিলো পারস্পরিক দরদ ভালোবাসা সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। তাদের মধ্যে গড়ে তুলেছিলো অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তাদেরকে একে অপরের জন্যে ত্যাগী ও সংবেদনশীল করে তুলে তাদেরকে সংকীর্ণতা ও আত্ম কেন্দ্রিকতার ধ্বংসাত্মক গহবর থেকে তুলে মানবতার স্বর্ণ শিখরে তুলেছিলো, সমাধান করেছিলো সকল প্রকার অর্থনৈতিক জটিলতা ও সমস্যার এবং নিষ্পত্তি করেছিলো সকল প্রকার সামাজিক ব্যাধির। এসবই সম্ভব হয়েছিলো সর্বশক্তিমান ও পরম করুণাময় এবং সবার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রব্বুল ইযযতের বিধানকে সর্বাংগীন বিধান হিসাবে নত শিরে মেনে নেয়ার কারণে। আর সর্ববিজয়ী এ ব্যবস্থার অন্তর্গত নারী সংক্রান্ত বিধান ইসলামের অনুসারী প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির হৃদয়কন্দরে সমভাবে গুরুত্ব লাভ করেছিলো। তারা জেনে নিয়েছিলো ও পরম শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করেছিলো যে, নারী গোটা মানব সভ্যতারই অপরিহার্য অর্ধাংশ। সুতরাং আল্লাহর কাছে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই দুই অংশের মধ্যে তারা আর কোনো পার্থক্য রাখেনি আর তারই ফলে তারা সর্বকালের মধ্যে সব থেকে বেশী সমৃদ্ধ ও শান্তির স্বর্ণ যুগ গড়তে পেরেছিলো।

জাহেলী চিন্তাধারার সাথে ইসলামের পার্থক্য

জাহেলী চিন্তাধারা ও ইসলামী চিন্তাধারার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার উদাহরণ হচ্ছে যেমন আখেরাতের প্রতি যারা বিশ্বাস রাখে না তাদের গুণ বৈশিষ্ট্য এবং আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে যেমন পার্থক্য বিদ্যমান, আর আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার উদাহরণই হচ্ছে সর্বোচ্চ। একথাটাই ব্যক্ত হয়েছে নীচের আয়াতে,

'যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখেনা তাদের জন্যেই রয়েছে নিকৃষ্ট উদাহরণ, আর আল্লাহর জন্যে রয়েছে সর্বোচ্চ উদাহরণ এবং তিনিই মহাশক্তিমান মহাবিজ্ঞানময়।'

আর এখানেই শেরেক ও আখেরাতের অস্বীকৃতি-এই বিষয় দুটির মধ্যে বিদ্যমান ঘনিষ্ট সম্পর্ক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ এ দু'টি একই উৎসমূল থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং এদু'টোর মূলে রয়েছে একইভাবে মানুষের অন্তরের মধ্যে অদৃশ্যকে অস্বীকার করার প্রবণতা এবং এর ফলে মানুষের অন্তরে,তার জীবনে, সমাজে ও সামাজিক চরিত্রে প্রতিফলিত হয় এই বিষাক্ত প্রভাব। সুতরাং যখন আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী ওইসব ব্যক্তিদের কোনো উদাহরণ পেশ করা হয় তখন দেখা যায় তারাই হচ্ছে মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম শ্রেণীর মানুষ অর্থাৎ তাদের জীবনে কোনো নিয়ম শৃংখলা, পাস্পরিক দরদ-ভালোবাসা ও সহানুভূতি থাকে না। তাদের জীবন দুনিয়া কেন্দ্রিক হওয়ার কারণে তারা চরম স্বার্থপর হয়, নিকৃষ্ট লোভী কুকুরের মতো তারা দুনিয়ার সবটুকু মজা একাই ভোগ করতে চায়, যদিও এতো বেশী ভোগ করার ক্ষমতা তাদের নেই। শুধু তাই নয়, দুনিয়ার যতো নিকৃষ্ট ও যতো নিষ্ঠুর প্রাণী আছে তাদের স্বভাবটি তাদের অজান্তেই সংক্রামিত হয়ে যায় ওই সব পরকালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে। এই জন্যেই বলা হয়েছে, তাদেরই জন্যে হচ্ছে নিকৃষ্ট উদাহরণ। এই নিকৃষ্টতা কোনো এক জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকেনা অর্থাৎ, মৃত্যুর পর যখন কোনো ব্যক্তির কারো কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি থাকে না তখন এ দুনিয়াতেই তার চাওয়া ও পাওয়া সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, এজন্যে এ পাওয়ার মধ্যে কারো জন্যে কিছু ছাড় দেয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে

ওঠে, আর এরই ফলে তার মন হয়ে যায় ছোট ও সংকীর্ণ তার অনুভূতি অনুদার হয়ে যায় এবং তার সকল কাজ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যায়। এই সংকীর্ণতাই তার ব্যবহারকে বানিয়ে দেয় অমার্জিত। একাই সে সারা পৃথিবীর মালিক হয়ে বসতে চায়। কিন্তু কতো নির্বোধ সে! যখন সে দেখে এতো কিছু ভোগ করার না আছে তার (ক্ষমতা কারণ তার অস্তিত্বের মধ্যে ভোগ করার কতোটা ক্ষমতা আছে তা তোও সে জানেনা) আর না তার সংকীর্ণ বয়সটুকু তাকে এতোসব ভোগ করার অনুমতি দেয়। সাময়িক সুস্থতা ও সবলতা এমনভাবে তাকে উচ্চাকাংখী করে তোলে যে মৃত্যু ও পরকালে বিশ্বাস না থাকায় তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সাধারণ চেতনাটুকু পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়।...........

'আর আল্লাহর জন্যেই রয়েছে সর্বোচ্চ উদাহরণ।'

যার তুলনা কোনো সৃষ্টি জীবের সাথে হতে পারে না-তা সে যেইই হোক না কেন। আর যে পরকালে বিশ্বাস করে না, সে প্রকৃতপক্ষে নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা করতে না পেরে চরম বেওকুফ ও নির্বোধ ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

'আর তিনিই মহা শক্তিমান, মহা বিজ্ঞানময়।'

অর্থাৎ তিনিই যাবতীয় শক্তি ক্ষমতার অধিকারী, সকল বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎস। তিনিই জানেন কোথায় কোন জিনিসকে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং কার সাথে কোন ব্যবহার উপযোগী কোন বস্তুকে কিভাবে এবং কোথায় ব্যবহার করায় কী উপকার হবে এ জ্ঞান তাঁর ছাড়া আর কারো নেই।

আর তিনিই মানুষকে, তার যুলুমের কারণে পাকড়াও করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। মানুষ নিজ বুদ্ধিতে যা করে তার ফলে আসলে সে নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনে; অথচ মহা দয়াময় আল্লাহ তায়ালা তাকে সর্বাধিক কল্যাণের অধিকারী বানাতে চান, কিন্তু না বুঝার কারণে মহান আল্লাহকে সে নিজের দুশমন মনে করে। তবুও পরম করুণাময় পরওয়ারদেগার বুঝার জন্যে, চিন্তা করার ও শোধরানোর জন্যে একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত তাকে সময় দিয়ে রাখেন। তিনিই মহাশক্তিমান মহা বিজ্ঞানময়। তাঁর মেহেরবানীর কথা স্মরণ করাতে গিয়ে তিনি জানাচ্ছেন,

'যদি আল্লাহ তায়ালা মানুষের যুলুমের কারণে তাদেরকে (সংগে সংগে) পাকড়াও করতেন তাহলে তিনি পৃথিবীতে কোনো প্রাণীকেই রেহাই দিতেন না, বরং (তাঁর অপার দয়ার কারণে) তিনি তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখেন; অতপর যখন নির্দিষ্ট সে সময়টি এসে যায় তখন তাদের মৃত্যুকে এক মুহূর্তও বিলম্বিত করেন না এক মুহুর্ত আগেও করেন না।

আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর নেয়ামতসমূহ দ্বারা তাদেরকে ধন্য করেছেন কিন্তু এই মানুষই এমন সত্ত্বা যে পৃথিবীতে অশান্তি ঘটায় এবং যুলুম করার কারণে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায় এবং নানা প্রকার যুলুম করে, সে আল্লাহ তায়ালা থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় এবং শেরেক করে, তারা একে অপরের ওপর বাড়াবাড়ি করে মানুষকে কষ্ট দেয় এবং মানুষ ছাড়া সৃষ্টির আরও অনেককেও কষ্ট দেয়, অথচ এতদসত্তেও আল্লাহ তায়ালা তার এসব অপকর্ম সহ্য করে যান ও তাকে দয়া করতে থাকেন এবং তাকে সময় দিয়ে যান পূর্ব নির্ধারিত বিশেষ সেই দিন পর্যন্ত, যদিও এ সময় পাওয়ার যোগ্যতা তাদের থাকেনা। এ হচ্ছে তাঁর শক্তি ক্ষমতার সাথে অংগাংগিভাবে জড়িত তাঁর বিশেষ কৃপা ও হেকমত-এ হচ্ছে তাঁর বিশেষ রহমত যার সাথে তাঁর সুবিচার বিজড়িত। কিন্তু হলে কি হবে, মানুষ তাঁর দেয়া এ সুযোগের অপব্যবহার করে। ওরা আল্লাহর রহমত ও হেকমত বুঝতে চায়না, যার কারণে অবশেষে তাঁর সুবিচারের দাবী অনুসারে তিনি তাদেরকে পাকড়াও করেন এবং তাঁর শক্তি তাদেরকে বশীভূত করে ফেলে;

তাদেরকে সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তেই পাকড়াও করেন, যা তাঁর হেকমতের দাবী হিসাবে পূর্ব থেকে তিনি নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং তাঁর বিশেষ রহমতের কারণেই তাদেরকে তিনি সময় দিয়ে রেখেছেন

'কিন্তু যখন সুনির্দিষ্ট ওই সময় এসে যাবে তখন তিনি তাদেরকে এক মুহূর্ত বিলম্বিত করবেন না বা এক মুহূর্ত আগেও তাদেরকে মৃত্যু দেবেন না।'(আয়াত ৬১)

আর এ বিষয়ে সব থেকে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে যে মোশরেকরা আল্লাহর জন্যে সন্তান রাখার কথা বলতে গিয়ে এমন কন্যা সন্তানকেই নির্বাচন করে যাদেরকে তারা নিজেরা পছন্দ করে না। কন্যাসন্তান-ছাড়াও তারা আল্লাহর জন্যে আরও এমন কিছু বস্তুকে পছন্দ করে যা তারা নিজেদের জন্যে পছন্দ করে না, আল্লাহর প্রতি তাদের এ কেমন শ্রদ্ধাবোধ? এতদসত্তেও মিথ্যা মিথ্যি তারা মনে করে, যে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তারা যা (ভাল কাজ?) করছে বা (ভাল?) চিন্তা করছে তার বিনিময়ে শীঘ্রই তাঁর কৃপাদৃষ্টি লাভ করবে। আল কোরআনও তাদের জন্যে তাই ঠিক করে রাখার ঘোষণা দিয়েছে যার এন্তেযার তারা করে যাচ্ছে, কিন্তু এর পরিণতি তাই হবে যার কল্পনাও তারা করেনি। ওদের নির্বুদ্ধিতা ও যুক্তিহীনতার আরও উদাহরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে,

'আর আল্লাহর জন্যে ওরা সেই জিনিসটাই পছন্দ করে যা তারা নিজেদের জন্যে পছন্দ করে না এবং তাদের জিহ্বা মিথ্যা কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে বলে যে, তাদেরই জন্যে নির্ধারিত রয়েছে সকল কল্যাণ বরং অবশ্যই তাদের রয়েছে জন্যে আগুন যেহেতু তারা অপরিনামদর্শী ও অপচয়কারী ।' (আয়াত ৬২)

আর জিহ্বাতে যে কথা উচ্চারিত হচ্ছে তাতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, তাদের কথাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং জেনে বুঝেই তারা মিথ্যা কথা বলছে। তাদের কথার ব্যাখ্যায় মিথ্যাটা এমনভাবে বুঝা যাচ্ছে যেন কথাটা মিথ্যার বাস্তব প্রতিমূর্তি হয়ে জিহ্বাতে ফুটে উঠেছে, জিহ্বা-দ্বারা মিথ্যা কথাটা মিথ্যার বাস্তব প্রতিমূর্তি হয়ে ফুটে উঠেছে এবং তার চোখটা শুভ্রতার বর্ণনা দিচ্ছে, কারণ ওই অবয়বটা নিজেই স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতার ব্যাখ্যা হয়ে ফুটে উঠেছে। ঠিক এমনিভাবে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'ওদের জিহ্বাগুলো মিথ্যা বলছে' এভাবে জিহ্বার ওপর মিথ্যা বাস্তব মূর্তি নিয়ে যেন হাযির হয়ে গেছে। অর্থাৎ জেনে বুঝে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে যখন মানুষ মিথ্যা বলে তখন তার জিহ্বা অন্তরের অসদিচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে মিথ্যা উচ্চারণ করে এবং এভাবে সে নিজেই যেন মিথ্যা বলে।

আর ওদের কথা। 'কল্যাণ তাদেরই জন্যে'–একথা বলে তারা আল্লাহর জন্যে সেই জিনিসটাই পছন্দ করছে যা তারা নিজেদের জন্যে অপছন্দ করে এটাই হচ্ছে সেই মিথ্যা যা তাদের জিহ্বা উচ্চারণ করছে এ প্রসংগটি বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথাটিকেই আল কোরআনের আয়াত তুলে ধরেছে। আর সেই শেষ কথাটিই হচ্ছে যে তাদের জন্যে নিঃসন্দেহে নির্ধারিত রয়েছে আগুন, এটারই হকদার তারা এবং এটাই তাদের উপযুক্ত প্রতিদান। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্য অবশ্যই তাদের জন্যেই নির্ধারিত রয়েছে আগুন।'

আর তারা জলদী করেই সেদিকে এগিয়ে যাবে। নির্দিষ্ট সে সময়টি ঘনিয়ে এলে তারা মোটেই বিলম্ব করবে না।

'আর তারা চরমভাবে সীমালংঘনকারী'।

জীবনে তারাতো সীমালংঘন করেছেই, আর সীমালংঘনকারী তো সেই ব্যক্তি যে সীমালংঘন করে কোনো অযৌক্তিক ও অসত্য পদক্ষেপ নেয়; সুতরাং তার জন্যে নির্ধারিত আযাবের নির্দিষ্ট সময় যখন এসে যাবে তখন একটুও বিলম্ব করা হবে না।

যুগে যুগে ইসলামের বিরোধীতা

এরপর বুঝতে হবে যে রসূলুল্লাহ (স.)-এর সময়কার আরব জাতিই যে সর্বপ্রথম সত্যকে অস্বীকার করেছিলো তা নয় এবং এরাই প্রথম অভিশপ্ত হয়নি—এদের পূর্বেও অনেকে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং আরও অনেকে অভিশপ্ত হয়েছে—তাদেরকেও শয়তান ভুল পথে চালিত করেছে এবং সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াকেই শয়তান তাদের সামনে সুন্দর করে তুলে ধরেছে তাদের চিন্তাকে ও তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখিয়েছে অতপর যারা তাদেরকে বিপথগামী করেছিলো তাদের কাছে মন্দ পথকে সুন্দর করে দেখিয়েছিলো এবং কল্যাণের পথ থেকে তাদের সরিয়ে দিয়েছিলো অথচ তাদেরকেই তারা তাদের কল্যাণকারী ও অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছিলো। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালা ওই অন্যায় অসৎ ও অকল্যাণ থেকে উদ্ধার করার জন্যে তাদের কাছে রসূল পাঠালেন। এই রসূলের মাধ্যমে সত্য মিথ্যার পার্থক্য এবং তাঁদের ধর্ম বিশ্বাসসমূহে ও তাদের পূর্বেকার ধর্মীয় পুস্তকগুলোতে যে সব ভ্রান্তি ঢুকে পড়েছিলো সেগুলোকে রসূলের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে তাদের সামনে তুলে ধরার ব্যবস্থা করলেন। আল্লাহ তায়ালা চাইলেন রসূলুল্লাহ (স.) যেন মোমেনদের সামনে হেদায়াত ও রহমতের বাস্তব মূর্তি হয়ে ফুটে ওঠেন। এরশাদ হচ্ছে,

‘আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই তোমার পূর্বেকার জাতিসমূহের কাছে বহু রসূল পাঠিয়েছি, কিন্তু শয়তান তাদের খারাপ কাজগুলোকেই তাদের সামনে সুন্দর করে দেখিয়েছে এবং সে আজও এদের অভিভাবক ও দরদী বন্ধু সেজে তাদেরকে ধোকা দিচ্ছে। সুতরাং তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি, আর তোমার কাছে কেতাব এজন্যেই পাঠিয়েছি যে তুমি তাদের মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলোর মীমাংসা স্পষ্ট করে তাদের সামনে তুলে ধরবে।’

সুতরাং এ শেষ ও সমাপ্তিকর কেতাব ও সর্বশেষ রসূলের মূল দায়িত্ব হচ্ছে পূর্বে অবতীর্ণ আসমানী কেতাবগুলোর শিক্ষার মধ্যে যে পার্থক্য ও মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিলো সেগুলোকে মীমাংসা করে দেয়া এবং বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত জাতিসমূহের মধ্যে সত্যের বাতিকে সমুজ্জল করে তোলা। তাদেরকে তাওহীদের শিক্ষার আলোকে এক জাতিতে পরিণত করা এবং পূর্ববর্তী কেতাবসমূহের মধ্যে (পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও) মূল বিষয় হিসাবে এখনও যে তাওহীদের প্রেরণা পাওয়া যায়, তাকে উজ্জীবিত করে তোলা। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর মাধ্যমে চেয়েছেন, আরব জাতি তথা তৎকালীন জাতিসমূহের মধ্যে নানা প্রকার ভুল ভ্রান্তির অনুপ্রবেশে তাওহীদের শিক্ষা সম্পর্কে যে অস্পষ্টতা ও সন্দেহ এসে গিয়েছিলো, শেরেক ও মূর্তিপূজার যেসব প্রচলন এসে গিয়েছিলো। সে সব ভুলভ্রান্তি দূর করে তাদেরকে সত্যনিষ্ঠ করে তুলতে। শেষ নবী (স.) তাদেরকে একথা বুঝতে আহ্বান জানালেন যে পূর্বেকার কেতাবসমূহের মধ্যে পরিবর্তন এসে যাওয়ার কারণে সেগুলোকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং আরশে মোয়াল্লায় লিখিত মূল কেতাব-এর অবিকল রূপ আল কোরআন, যা সর্বশেষ কেতাব হিসাবে নাযেল হয়েছে—তাকেই মযবুত করে আঁকড়ে ধরতে হবে, তাহলেই যাবতীয় অন্যায় থেকে বাঁচা যাবে এবং সত্য সঠিক পথ পাওয়া সম্ভব হবে। এভাবেই সত্যনিষ্ঠ ও সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিরা ঈমানের স্বচ্ছ সুধা পান করে ধন্য হবে এবং তাদের সামনে ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের সিংহদ্বার খুলে যাবে।

আল্লাহর সার্বভৌমত্বের নিদর্শন

এ পর্যন্ত এসে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত আলোচনা শুরু হয়েছে এবং বিশ্বের বুকে যা তিনি সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে তাঁর ক্ষমতার অজস্র নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে। মানুষকে প্রদত্ত গুণাবলী ও যোগ্যতার সাথে যে নেয়ামত ও মান সম্ভ্রম তিনি তাকে দিয়েছেন-সেসব কিছুর মধ্যেও আল্লাহরই নিরংকুশ শক্তি ক্ষমতার কথা প্রকাশিত হয়েছে। সারা বিশ্বের মধ্যে যা কিছু আছে সে সব কিছুকে সামনে রেখে একথা সুস্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, সব কিছুর ওপর নিরংকুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। ইতিপূর্বে বর্ণিত আয়াতে এ কেতাব আল-কোরআনের অবতরণ সম্পর্কে আলোচনা এসেছে, বলা হয়েছে যে মানব সৃষ্টির সূচনা থেকে এ পর্যন্ত গোটা মানব মন্ডলীর জন্যে যা কিছু নাযেল করা হয়েছে তার মধ্যে এ মহান কেতাবই সর্বোৎকৃষ্ট—সব থেকে নির্ভুল, সব থেকে যুক্তিপূর্ণ এবং এইটিই সেই কেতাব যার মধ্যে মূল কেতাব অবিকল অবস্থায় বর্তমান রয়েছে—এরই মধ্যে রয়েছে আত্মার জীবন সম্পর্কিত কথা—আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা। এ বৃষ্টি-দ্বারা শুষ্ক যমীনকে সজীব করা হয়েছে এবং এই পানির মধ্যেই রয়েছে প্রাণীর জীবন। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন অতপর তার দ্বারা যমীনকে মরে যাওয়ার পর জীবিত করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে (আল্লাহকে জানা ও চেনার জন্যে) এক সুস্পষ্ট নিদর্শন।'

আর এই পানিই তো হচ্ছে প্রতিটি প্রাণীর জীবন। আল্লাহর কেতাবে বলা হয়েছে গোটা পৃথিবীর জীবনই রয়েছে এই পানির মধ্যে, অর্থাৎ এর ওপরে পশু পাখী জীব জন্তু প্রাণী গাছপালা উদ্ভিদ মানুষ অর্থাৎ যতো কিছু আছে সবই এই পানি থেকে সৃষ্টি। যে মহান সত্ত্বা মৃত থেকে জীবনের আগমন ঘটিয়ে থাকেন তিনিই তো ইলাহ হওয়ার যোগ্য, তিনিই জীবন মৃত্যুর মালিক, অতএব সন্দেহাতীতভাবে একথা বুঝা গেলো যে, ইলাহ-এর এক অর্থ হলো জীবন মৃত্যুর মালিক (তিনিই সৃষ্টিকর্তা খালেক);

'নিশ্চয়ই, যে জাতি সত্যিকারে শোনে, (শোনে বাহ্যিকও অন্তরের কান দিয়ে) তার জন্যে রয়েছে একথার মধ্যে সুস্পষ্ট নিদর্শন।'

অতপর এই শোনার পর তারা গভীরভাবে চিন্তা করে। এইটিই বর্তমান পরিচ্ছেদের মূল আলোচ্য বিষয়-আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তার জীবন-মৃত্যুর মালিক হওয়ার বিষয় এবং মৃত্যুর পর আবার জীবিত করার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে 'ইলাহ' শব্দটির প্রামাণ্য দলীল পেশ করা হয়েছে—এই বিষয়টিকেই আল-কোরআন বহু যুক্তির মাধ্যমে পেশ করেছে। অতপর যে ব্যক্তি অন্তরের কান দিয়ে শোনে, বুঝতে চায় এবং চিন্তা-ভাবনা করে, তার জন্যে রয়েছে এই আলোচ্য-বিষয়ের মধ্যে আল্লাহকে চেনার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নিদর্শন।

সকল গৃহ পালিত পশুর মধ্যেও রয়েছে আর একটি শিক্ষা,যা মহান-সৃষ্টিকর্তার বিস্ময়কর সৃষ্টি কৌশলের দিকে ইংগীত করছে এবং এইসব আজব সৃষ্টিনৈপুণ্য মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আমাদেরকে সঠিক চেতনা দান করছে। দেখুন, এ বিষয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই তোমাদের জন্যে জন্তু জানোয়ারের মাঝে (প্রচুর) শিক্ষার বিষয় রয়েছে। তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্যে থেকে নিসৃত খাটি দুধ আমি তোমাদের পান করাই.....'।

এখন চিন্তা করুক, এই সুপেয় দুধ কিভাবে এই পশুগুলোর ওলানের মধ্যে এসে জড় হয়? গোবরের আধার পাকস্থলি এবং এর পাশাপাশি শিরাসমূহের মধ্য দিয়ে প্রবাহমান রক্তের শ্রোতাধারার মধ্যবর্তী এক পথ বেয়ে দুধের প্রশ্রবণ ওলানের মধ্যে গিয়ে জড়ো হয়; আর ঘাস

পাতা হজম হয়ে যাওয়ার পর কোঁচকানো নাড়িভুঁড়ির মধ্যে গিয়ে গোবরে পরিণত হয় এবং এ সব ভুক্তদ্রব্য হজম করার জন্যে পাকস্থলির মধ্যে সংকোচন ও সম্প্রসারণ চলতে থাকে, যার ফলে সেগুলোর এক অংশ রক্তে পরিণত হয়ে, তা প্রবাহিত হয়ে শরীরের সকল কোষের মধ্যে পৌঁছে যায়। তারপর এই রক্ত যখন স্তন বা ওলানের মধ্যে অবস্থিত দুধের নালির মধ্যে প্রবেশ করে তখন আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এক আশ্চর্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই রক্ত দুধে পরিণত হয়ে যায়, কিন্তু কিভাবে এই রূপান্তরের কাজটা সংঘটিত হয় তা একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না।

যে প্রক্রিয়ায় খাদ্যের নির্যাস শরীরের মধ্যে এসে রক্তে রূপান্তরিত হয়, আর এই রক্তের কোষ থেকে যে প্রক্রিয়ায় নির্যাস বের হয়ে দুধে পরিণত হয় তা বড়ই আশ্চর্যজনক। এ প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে যেমন চলতে থাকে অন্ত্রের মধ্যে জ্বালানীর কাজ। আর প্রতিমুহূর্তে এই আশ্চর্য প্রস্তুতি পর্যায়ের কাজ চলতে থাকে। শরীর থেকে রূহ বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত শরীরের অভ্যন্তরে এই ভাংগা-গড়ার কাজ অব্যাহত গতিতে সারাক্ষণই চলছে। মানুষ শুধু সৃষ্টি জগতের নিরন্তর ক্রিয়াশীল এই গতিকে বুঝতে পারে কিন্তু ইচ্ছা করলেও তারা এর কোনো একটিকে থামাতে বা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করাতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে মহান স্রষ্টার আনুগত্য করতে গিয়ে প্রত্যেকটি বস্তু যে নিজ নিজ কাজ করে চলেছে এইটিই তো হচ্ছে তাদের নীরব তাসবীহ জপা। এইভাবে প্রতিটি অনু-পরমাণু চব্বিশ ঘন্টা আল্লাহর তাসবীহ চলেছে সৃষ্টির সেরা মানুষকে তার মালিকের আনুগত্যের কাজে সাহায্য করার জন্যে। এমন অচিন্তনীয়ভাবে এসব কিছু মানুষকে সাহায্য করে চলেছে যা মানুষ ইচ্ছা করলেও বুঝতে পারে না, অর্থাৎ শরীরের প্রতিটি কোষ নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে যে কাজগুলো করে চলেছে তা একমাত্র আল্লাহরই ইচ্ছায় এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণে সম্ভব হচ্ছে। এটা কোনো মানুষ করাতে পারে না। এরকম অসংখ্য কোষ শরীরের মধ্যে কাজ করে চলেছে যার ফলে মানুষ তার প্রয়োজনীয় সব কিছুর সময়মতো সরবরাহ পাচ্ছে।

পাকস্থলির মধ্যে খাদ্য দ্রব্য সম্পর্কিত মানুষের বোধগম্য যে সংকোচন সম্প্রসারণ চলছে বলে মানুষ জানে তার বাইরে আরো এমনও কিছু কাজ চলছে যা মানুষের কল্পনার বাইরে। ওই সব রহস্যপূর্ণ গতিক্রিয়াকে বুঝার চেষ্টা করতে গিয়ে মানুষ হয়রান হয়ে যায় যে এতো সুনিপুণ ও নিয়ম শৃংখলার সাথে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্যে সব কোষগুলো কী চমৎকারভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা করে চলেছে।

পাকস্থলির মধ্যে এসব ক্রিয়া আজও মানুষের কাছে এক কঠিন রহস্য হয়ে রয়ে গেছে। একটু চিন্তা করে দেখুন, চৌদ্দ শত বছর পূর্বে, গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় দুধ তৈরী হওয়ার যে বৈজ্ঞানিক সত্যটি উদ্ঘাটিত হয়েছিলো, তা ইতিপূর্বে কোনো মানুষ জানতো না। এই অতি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার মাধ্যমে স্তনের মধ্যে দুধ তৈরীর যে ব্যবস্থা হয় তা জানা তো দূরের কথা কোরআন নাযেল হওয়ার যুগে একথাগুলোর কল্পনাও কারো মাথায় আসেনি। এ বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করা, যুক্তিতর্ক পেশ করা এবং এ রহস্যটি উদ্ঘাটন করার জন্যে কোনো পরিকল্পনাও কখনও কেউ গ্রহণ করেনি। আসলে শয়তান মানুষকে বর্তমান জীবন ও এর ভোগ বিলাসের মধ্যে এমনভাবে ব্যস্ত রাখে এবং এমনভাবে সর্বক্ষণ ক্ষণস্থায়ী বস্তুগত লাভের জন্যে প্রতিযোগিতা করায় যে সে তার সৃষ্টি রহস্য, দায়িত্ব-কর্তব্য ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করার কোনো অবসরই পায় না। মাঝে মাঝে গ্রীক দার্শনিকরা কিছু কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছে, কিন্তু তাও এমন আন্দায-অনুমান-ভিত্তিক যে তার অধিকাংশই বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।

অতি নিকট অতীত পর্যন্ত ও এই সৃষ্টি রহস্যটা অজানার গহ্বরে লুকিয়ে ছিলো আর আজকে আল কোরআন এই বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো তুলে ধরে পাঠকদের সামনে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করছে যে, মোহাম্মাদ (স.)-এর কাছে আগত ওহী অবশ্যই আল্লাহর পক্ষে থেকে এসেছে। এ ছাড়াও এর আরো যেসব বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলোও তুলনাহীন। অবশ্য এগুলো তারাই বুঝতে পারবে যারা এগুলো জানার ও বুঝার জন্যে চেষ্টা করবে। তারা দেখতে পাবে যে আল কোরআনের সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে এবং এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারীদের জবাব দেয়ার জন্যে এই একটি তথ্যই যথেষ্ট। এ বিষয়ে দেখুন আল কোরআনের ভাষ্য:

'আর খেজুর ও আংগুর গাছ থেকে তোমরা যে ফল পাও তার থেকে তোমরা তৈরী করো।' ....

আকাশ থেকে বর্ষিত পানি থেকে উৎপন্ন এই সব ফলমূলের দিকে একবার গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখুন পৃথিবীর বুকে অবস্থিত প্রাণীকুলের জন্যে এসব উৎপন্ন দ্রব্যাদি কি ভূমিকা পালন করে চলেছে। এগুলোকে আল্লাহর হুকুম মতো ব্যবহার না করে তোমরা এ নেয়ামতের না শোকরী করছো, এগুলো থেকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও সুস্বাদু পানীয় হাসিল না করে তোমরা এসব ফল থেকে মাদকদ্রব্য তৈরী করো আরো তৈরী করো, শরীরের জন্যে গঠন উপাদান সমৃদ্ধ উত্তম শরবত। আল কোরআনের আয়াতে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, 'খামর' অর্থাৎ মাদকদ্রব্য বিশেষ করে আংগুরের তৈরী মাদকদ্রব্য 'রেযকে হাসান' (উত্তম দ্রব্য) নয়। 'খামর' ব্যতীত অন্যান্য পানীয় যাতে মাদকতা আসে না, সেইগুলোই হচ্ছে উত্তম পানীয়। এই আয়াতের মধ্যে ওই নিষিদ্ধ ঘোষণার পূর্বপ্রস্তুতি ব্যক্ত করা হয়েছে যার চূড়ান্ত ঘোষণা পরবর্তীতে এসেছে। যে সময়ে এই আয়াতটি নাযেল হয়েছে সে সময়ে ওই আংগুর ও খেজুর দিয়ে তৈরী মদকে খাম্‌র বলা হতো, আর এই মদের হালাল হওয়া সম্পর্কে কোরআন হাদীসে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং হারাম হওয়া সম্পর্কে কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই এর মধ্যে ওই জাতির জন্যে নিদর্শন রয়েছে যারা বুঝে,......

এতে তারা বুঝতে পারে যে, যিনি এই রেযেকের ভান্ডার প্রস্তুত করছেন তিনিই নিঃশর্ত ও নিরংকুশ আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য, আর তিনিই হলেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা।

মৌমাছিঃ আল্লাহর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি

এরপর কোরআন দৃষ্টি আকর্ষণ করছে আল্লাহর এক বিস্ময়কর সৃষ্টির দিকে। এই সৃষ্টিকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর খলীফা মানবজাতির সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমার রব মৌমাছির কাছে নির্দেশ পাঠালেন, পাহাড় পবর্তসমূহের গায়ে, উঁচু গাছে এবং এমন ....এই মৌমাছির পেট থেকে বের হয় এমন বিভিন্ন রংয়ের শরবত যার মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্যে রোগ নিরাময়কারী ওষুধ। অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে সেই জাতির জন্যে নিদর্শন যারা চিন্তা-ভাবনা করে।'

অর্থাৎ, মৌমাছি সেই গোপন প্রাকৃতিক নির্দেশে চলাচল করে যা মহান সৃষ্টিকর্তা মজ্জাগতভাবে তার প্রকৃতির মধ্যে দান করেছেন। এই এলহাম (গোপন নির্দেশ)-ও এক প্রকার ওহী, যা যে কোনো সময়ে যে কোনো প্রাণীকে আল্লাহ তায়ালা দান করতে পারেন। এ এলহাম এক অত্যাশ্চর্য পন্থায় কাজ করে যা কোনো মানুষের বুদ্ধি বা কোনো ব্যক্তির ধারণা শক্তিতে বুঝে আসে না। তাকিয়ে দেখুন একবার মৌমাছির চাকের প্রতি-এর ঘরের নির্মাণ কৌশল ও মৌমাছির কর্ম বন্টনের দিকে। সেখানে এমন নিপুণতা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে যা মানুষের যে কোনো

নির্মাণ কুশলতা থেকে বেশী নিপুণ। আরো তাকিয়ে দেখুন ফুলে ফুলে ঘুরে ঘুরে গুণ গুণ করে কী চমৎকারভাবে মৌমাছির দল মধু সংগ্রহ করে। এসব কিছুর মধ্যে এমন বিস্ময় বিরাজ করছে যা যে কোনো সচেতন মানুষকে বিমুগ্ধ করে দেয়। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কতো মেহেরবানী যে তিনি এদের দ্বারা মধু সংগ্রহের জন্যে প্রকৃতির বুকে এমন সব ক্ষেত্রও সৃষ্টি করে রেখেছেন যাতে করে তার মধ্যে বিচরণ করে মৌমাছিরা স্বচ্ছ মধু সংগ্রহ করতে পারে। তারা আল্লাহর ইচ্ছাতেই মানুষের খেদমত করে। তারপর আল কোরআন জানাচ্ছে যে, মধুর মধ্যে মানুষের জন্যে রয়েছে আরোগ্য। এই কোরআনী কথার সত্যতা আজকে বহু চিকিৎসাবিদদের জ্ঞান গবেষণাতে ধরা পড়েছে। তাদের মধ্যে জনৈক বিশেষজ্ঞ এর ওপর গবেষণা চালাতে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে যে তথ্যগুলো পেশ করেছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর।(১) এভাবে আল কোরআনের ওপর যতো গবেষণা চালানো হয়েছে মানুষ ততো বেশী মুগ্ধ হয়েছে এবং তারা আল কোরআনে বর্ণিত প্রতিটি কথার সত্যতা মনে প্রাণে উপলব্ধি করতে পেরে ধন্য হয়েছেন। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য জানুক আর না জানুক, বুঝুক আর না বুঝুক আল কোরআনে উল্লেখিত প্রত্যেকটি কথাকে সত্য জেনে তার ওপর গবেষণা করা, যতো বেশী জ্ঞান গবেষণা চালানো হবে ততো বেশী সত্য উদ্ঘাটিত হবে এবং ততো বেশী তার ঈমান মযবুত হতে থাকবে। আল কোরআনের ব্যাখ্যায় বহু হাদীস এসেছে, যার অধ্যয়নেও মোমেনরা নব নব দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে জানা যায়, আবু সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, আমার ভাই এর পাতলা পায়খানা হচ্ছে। তখন রসূলুল্লাহ (স.) তাকে বললেন, ওকে মধু পান করাও। সে ফিরে গিয়ে তাকে মধু পান করালো। তারপর সে ফিরে এসে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ, তাকে মধু পান করিয়েছি, কিন্তু দাস্ত থামেনি, বরং আরো বেড়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (স.) আবার গিয়ে তার ভাইকে মধু পান করাতে বললেন। সে ফিরে গিয়ে আবারও তাকে মধু পান করালো। কিছুক্ষণ পর সে ফিরে এসে বললো ইয়া রসূলাল্লাহ, আবারও পান করিয়েছি, কিন্তু দাস্ত আরো বেড়ে গেছে। তখন রসূলুল্লাহ (স.) তাকে বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা সত্য বলেছেন, কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলেছে। আবারও গিয়ে তোমার ভাইকে মধু পান করাও।' সে গিয়ে আবারও তার ভাইকে মধু পান করালো। তখন সে সুস্থ হয়ে উঠল।

এ ঘটনা থেকে মধুর গুণ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স.)-এর নিশ্চিত বিশ্বাস সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানা গেলো। উল্লেখিত ঘটনার প্রতিবারে মধু পান করানোতে দাস্ত বেড়ে যাওয়া সত্তেও রসূলুল্লাহ (স.)-এর নিশ্চিত বিশ্বাসে কোনো ভাটা পড়েনি, বরং তিনি পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বারবার মধু পান করানোর জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন এবং অবশেষে তাঁর নিশ্চিত জ্ঞান সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। এইভাবে, প্রত্যেক মুসলমানের জানা দরকার যে, আল কোরআনে যেসব বিবরণ এসেছে তা সবই অকাট্য সত্য, যদিও বাহ্যিক অবস্থা সাময়িকভাবে কোনো কোনো সময়ে ব্যতিক্রম হতে পারে, কিন্তু অবশেষে আল কোরআনের কথা সত্যে পরিণত হবেই হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আসুন, আমরা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত এসব নেয়ামতের দিকে আবারও একবার তাকিয়ে দেখি ও চিন্তা করি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করানো, গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে দুধের প্রশ্রবণ বেরিয়ে আসা, আংগুর ও খেজুর থেকে মাদক দ্রব্য এবং সুন্দর পানীয় প্রস্তুত করা এবং মৌমাছির

---

(১) ডঃ আবদুল 'আযীম রচিত আল ইসলাম ওয়াতত্তিব্বুল হাদীস' কেতাবটি দেখুন।

পেট থেকে মধু নির্গত হওয়া.... এসবগুলো তো সবই পবিত্র ও সুপেয় পানীয় যা বিপরীতধর্মী বস্তুসমূহ থেকে নির্গত হয়। পান করার প্রসংগ যখন সামনে আসে তখন আমরা শুধু গৃহ পালিত পশুর কথাটিই চিন্তা করি। যে প্রক্রিয়ায় এসব পশুর পেট থেকে আমরা দুধ পাই সেগুলোর ওপর চিন্তা করলেই বাকি অন্যান্য সবগুলোর মাহাত্ম সহজেই আমাদের নযরে ধরা পড়বে। এর পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাবো এসব থেকে আমরা আরো কতো কি পাই, যেমন পাই ঐসব জীবজন্তু থেকে চামড়া পশম ও চুল। জীব জন্তু থেকে মানুষের প্রয়োজনে এসব জিনিসের ব্যবস্থা করা এটা এমন একটা বিষয় যার দিকে আল কোরআন ইংগিত করে মানুষকে আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন দেখাচ্ছে।

মানুষের অন্তরের গভীরে রেখাপাত করার জন্যে জীবজন্তু, গাছপালা, ফলমূল মৌমাছি এবং স্বচ্ছ ও সুস্বাদু মধুর এসব দৃষ্টান্ত তুলে ধরা সর্বাধিক উপযোগী, কারণ এ বিষয়গুলো গভীরভাবে তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে, তাদের বয়সের সর্বস্তরে এসবের প্রয়োজন, পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়ের সাথে রয়েছে এসবের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তাদের স্ত্রী-পুত্র পৌত্রাদি সবার জন্যে এসব কিছুর প্রয়োজন একথাটা যতো বেশী চিন্তা করা হবে ততোই হৃদয়কে নাড়া দিতে থাকবে। আরো জানানো হচ্ছে,

জীবন মৃত্যু ও ধন সম্পদ নিয়ন্ত্রন প্রক্রিয়া

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর একসময় তোমাদেরকে মৃত্যুও দান করবেন, আর তোমাদের মধ্যে অনেকে আছে যাদেরকে বয়সের নিকৃষ্টতম স্তরে পৌঁছে দেয়া হয়, যাতে করে কোনো কিছুর জ্ঞান অর্জন করার পর আবার সব ভুল হয়ে যায়। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, তিনিই সর্বশক্তিমান।' (আয়াত ৭০)

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাউকে কারো ওপর রেযেকের ব্যাপারে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং ....। তবে কি এরা আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করে?' (আয়াত ৭১)

আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড় পয়দা করেছেন ......তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য এমন ব্যক্তি বা বস্তুর বন্দেগী করে।' (আয়াত ৭২-৭৩)

ওপরের আয়াত দুটিতে প্রথম বুঝবার বিষয় হচ্ছে জীবন ও মৃত্যু, যা প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক প্রাণীর সাথে জড়িত। জীবন সবার কাছেই প্রিয় এবং যে কোনো কঠিন হৃদয়ের মধ্যেও জীবন রক্ষার চিন্তা আসে, আসে জীবন সম্পর্কিত বড় ছোট সব বিষয়েরই চিন্তা। এসবের মধ্যে অনেক বিষয় আছে যা শুধু অনুভবই করা যায়, যার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে একমাত্র আল্লাহরই হাতে, তাঁরই হাতে রয়েছে যাবতীয় নেয়ামতের চাবিকাঠি এবং সকল কুদরতও তাঁরই। এই সকল নেয়ামতই সেই মালিকের কাছে আশ্রয় প্রার্থনার জন্যে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। তারপর প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে বার্ধক্যের অবস্থাটাকে তুলে ধরা হয়েছে। এসময় মানুষ সব থেকে দুর্বল বয়সে পৌঁছে যায়। জীবনে যা কিছু শিখেছিলো এসময় সবই ভুলে যেতে থাকে এবং ছোট বেলায় যেমন দুর্বল, ভুলোমনা এবং অসহায় ছিলো আবার সে সেই অবস্থায় পৌঁছে যায়। জীবন সম্পর্কে মানুষ যখন চিন্তা করে তখন এই পর্যায়গুলো তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে, আর তখনই তার অহংকার কমে যায়, তার শক্তি জ্ঞান ও ক্ষমতার কারণে যে প্রচন্ড আত্মমর্যাদা বোধ গড়ে উঠেছে তা দমে যেতে থাকে এবং অবশেষে অবশ্যম্ভাবী শেষ পরিণামের কথাটা মনে পড়ে যায়, তাই বলা হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জনেন সব কিছু করতে সক্ষম।'

অর্থাৎ, যখনই সে জীবনের শেষ অবস্থাটা চিন্তা করে তখন এ পরম সত্য কথাটা তার বোধগম্য হয় যে অনন্ত অসীম সকল জ্ঞান ভান্ডারের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, আর অসীম শক্তি ক্ষমতার মালিকও একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীন। তিনিই সমস্ত শক্তি ক্ষমতার অধিকারী। মানুষের জ্ঞান ও শক্তি ক্ষমতা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টিকে থাকে, তারপর সব কিছু শেষ হয়ে যায় প্রকৃতপক্ষে সাময়িকভাবে প্রাপ্ত মানুষের ক্ষমতার কোনোই স্থায়িত্ব নেই।

রেযেকের তারতম্য ও তার রহস্য

দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা এসেছে রেযেক সম্পর্কে। রেযেকের ব্যাপারে মানুষে মানুষে যে তারতম্য আছে তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। আল্লাহর কেতাব এ প্রসংগে জানাচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা নিজেই কাউকে কারো ওপর রেযেকের ব্যাপারে প্রাধান্য দিয়েছেন। সুতরাং পৃথিবীতে অর্থনৈতিক তারতম্য থাকা এটা আল্লাহর বিশেষ এক নিয়মের অধীনে হয়ে থাকে। এটা হঠাৎ করে এবং কোনো নিয়ম নীতিবিহীন হয়ে যায় এমন নয়, এ বিশ্বটা কোনো পাগল রাজার রাজত্ব নয় যে অর্থহীনভাবে এবং কোনো নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই সব কিছু চলছে, এর পেছনে খবরদারি করার কেউ নেই। মানুষ চিন্তাশীল হতে পারে, হতে পারে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান, কিন্তু আশানুরূপভাবে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা লাভ করা বা ইচ্ছামতো এর উন্নতি সাধন করা আদৌ সম্ভব নয়। রেযেক কে কতোটা পাবে তা পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, যার জন্যে যা বরাদ্দ হয়ে আছে, তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। এই নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার মাধ্যমে বুঝা যায় এর পেছনে নিশ্চয়ই একজন পরম মহাক্ষমতাবান নিয়ন্ত্রণকারী আছেন, যাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই হতে পারে না। তবে মানুষের চেষ্টা সাধনা বেকার যাবার নয়, তার চেষ্টার ফসল যদি এখানে তাৎক্ষণিকভাবে সে না পায় তাহলে আরো অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে তার আন্তরিক চেষ্টা সাধনার ফল সে অবশ্যই পাবে। বস্তুগত জাগতিক দৃষ্টিতে সে বোকা ও প্রাচীন পন্থী বা সরল সোজা মানুষ বলে ধিকৃত হতে পারে, হতে পারে উপহাস বিদ্রূপের পাত্র, কিন্তু অবশ্যই তার প্রাপ্য আলাদাভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। সেখানে সে তার কৃতকর্মের ফল অবশ্যই পাবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় রাখে এবং সেখানকার পাওয়াকেই সে মোক্ষম পাওয়া বলে বিশ্বাস করে। একারণে নগদ না পাওয়া সত্তেও নির্লিপ্ত ও নিশ্চিন্ত থাকে, সে আশা করে সেখানে অবশ্যই সে তার সকল আমলের প্রতিফল পাবে এবং আরো বাড়তি পাবে। সাধারণভাবে মানুষ নিজেকে দাতা ও বেশ শক্তিশালী বলে ভাবে, এ কারণে সে মনে করে রেযেকের ব্যাপারে তাকদীরের কোনো ভূমিকা নেই, কিন্তু এটা মোটেই ঠিক নয়, বরং জীবনকে তাকদীর এক নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে টেনে নিয়ে যায়–এরই কারণে মানুষ যা চিন্তা ও চেষ্টা করে অনেক সময় তা হয় না। আবার এটাও সত্য কথা যে স্বচ্ছলতা অনেক সময় আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কঠিন পরীক্ষা-স্বরূপ, যেমন সংকট সমস্যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যের পরীক্ষা নেন। যাই হোক, এটা স্বতসিদ্ধ কথা যে, ইচ্ছা করলেই বড়লোক হওয়া যায় না বা ইচ্ছা করলেই স্বচ্ছলতা লাভ করা যায় না বরং আল্লাহর তরফ থেকে তাকদীরে যা লেখা আছে মানুষ তাই পায় দৃষ্টিভংগী পরিশুদ্ধ হয়ে গেলে এটা স্পষ্ট দেখাও যায়। অবশ্য কোনো কোনো সময় এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়, অর্থাৎ অনেক সময় আন্তরিক চেষ্টাও ফলপ্রসূ হয় বলে মনে হয়। কিন্তু মানুষ যতো চেষ্টাই করুক না কেন, অর্থনৈতিকভাবে মানুষে মানুষে তারতম্য আছে ও থাকবে, এটা যে কোনো সমাজের দিকে তাকালে যে কেউ বুঝতে পারবে, তবে এটা তখনই প্রকট সমস্যা হয়ে দেখা দেয় যখন যালেম সমাজের মানুষদের তৈরী কৃত্রিম সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। আর কোরআনে কারীম প্রাথমিক যুগের পৌত্তলিক আরব জাহেলিয়াতের অবস্থার দিকে ইংগিত করছে

এবং তার মহামূল্যবান শিক্ষা দ্বারা আংশিকভাবে হলেও এই তারতম্য ঘুচানোর চেষ্টা করেছে। সে সমাজে মানুষে মানুষে ব্যবধান ছিলো আকাশচুম্বী এবং এর অধিকাংশ ছিলো মানুষের নিজের তৈরী করা সমস্যা। যদিও এটাও সত্য যে কোনো কালেই মানুষে মানুষে সকল ব্যবধান সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হবে না। তবে মানব নির্মিত এই ব্যবধানের অনেকাংশই ইসলাম দূর করেছিলো। ইসলামপূর্ব যুগে ওই জাহেলী সমাজে মানুষের জান মালের কোনোই নিরাপত্তা ছিলো না এবং মানুষকে মানুষের মৌলিক অধিকার না দিয়ে তাদের নিজেদের তৈরী মূর্তিদেরকে 'ভোগ' দেয়া হতো এবং বলা হতো এগুলো দেব-দেবীরা পেলে তারা খুশী হয়ে যাবে এবং তাদের কৃপা দৃষ্টি পেয়ে তারা উপকৃত হবে। বাস্তবে দেব-দেবীদের নামে উৎসর্গকৃত এসব উত্তম খাদ্য খাবার পূজারীরা নিজেরাই ভোগ করতো, যেমন হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মনরা করে থাকে—একেই বলে বাঘের নামে শেয়ালের মড়ী। এজন্যেই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, কি হলো ওদের আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যে রেযেক দিয়েছেন তার অংশ বিশেষ পাওনা ছিলো গরীব মেসকীনদের। তাদের না দিয়ে প্রাণহীন দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করে তাদের কাছে কল্যাণ কামনায় নিমগ্ন হয়। এভাবে তারা কি আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করছে? এভাবে পরম করুণাময় দাতা আল্লাহর শোকরগোযারি করার পরিবর্তে শেরেক করার দ্বারা তারা আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহারই করছিলো।

শেরেকের অসারতা

এ অধ্যায়ের তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, মানুষের নিজেদের অস্তিত্ব, স্ত্রী, সন্তান ও পরবর্তী বংশধরদের আলোচনা। এদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নর ও নারীর মধ্যে যে প্রাণবন্ত সম্পর্ক রয়েছে সে বিষয় দিয়ে শুরু করা হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে, 'আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের নিজেদের মধ্যে জোড়া বানিয়েছেন' অর্থাৎ ওরা তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই পয়দা হয়েছে, তারা তোমাদের অর্ধেক। তারা এমন কোনো অস্পৃশ্য জীব নয়, যাদের পয়দা হওয়ার সংবাদ শুনে মুখ লুকানোর প্রয়োজন হবে অথবা দুঃখিত হতে হবে।

'আর তোমাদের এ(যুগল) দম্পতি থেকে পুত্র ও প্রৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন।' মানুষ তো প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল ও মরণশীল, তার সাহায্য ও বংশ রক্ষার জন্যে তার সন্তানাদি ও পৌত্রাদির প্রয়োজন রয়েছে, সুতরাং একারণে তার অন্তরের মধ্যে এদের সাথে সম্পর্কের গুরুত্ব সর্বাধিক.........এজন্যে আল্লাহর তরফ থেকেও পুত্র কন্যা পৌত্রাদি-শারীরিক ও মানসিক প্রয়োজন মেটানো ও আন্তরিক প্রশান্তির জন্যে, যাতে করে এসবের হিসাব দিতে গিয়ে তাকে এ প্রশ্নের জওয়াব দিতে প্রস্তুত থাকতে হয়,

'ওরা কি তাহলে মিথ্যার ওপর বিশ্বাস রাখবে এবং অস্বীকার করবে আল্লাহর নেয়ামতকে?'

অর্থাৎ এই ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করে কি ওরা শেরেক করবে এবং তাঁর হুকুমের বিরোধিতা করবে? অথচ এসব যতো নেয়ামত আছে সবই তাঁর দান! এগুলো সবই তাঁর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের নিদর্শন। এটি মানব জীবনের এক চরম বাস্তবতা। এগুলো নিয়েই তারা সারাক্ষণ ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। ....

তাহলে ওরা কি মিথ্যার ওপরই বিশ্বাস স্থাপন করবে? অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া যা কিছু আছে সবই তো মিথ্যা, মিথ্যা এসবদেব দেবী যাদের পূজা ওরা করে, বিপদ আপদে যাদের কাছে ওরা কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করে, তাদের এই ভ্রান্ত চিন্তা চেতনা অলীক কল্পনা সবই বাতিল, নির্জলা মিথ্যা, এদের কোনো অস্তিত্ব নেই, কারো ভক্তি শ্রদ্ধা বা পূজা অর্চনা পাওয়ার কোনো অধিকার

তাদের নেই, আসলে ওই মূর্খ নাদানেরা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করে চলেছে। নিশিদিন আল্লাহর যে সব নেয়ামত তারা লাভ করছে, তা তাদের অনুভব করা উচিৎ, যেসব নেয়ামতের মধ্যে তারা ডুবে রয়েছে তা খেয়াল করা দরকার। তাঁর দেয়া সব কিছু সারাক্ষণ তারা ভোগ করা সত্তেও তাকেই তারা অস্বীকার করছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর পূজা অর্চনা করছে, যাদের আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কোথাও থেকে কোনো প্রকার রেযেক সরবরাহের ক্ষমতা নেই।' (আয়াত ৭৩)

এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, ওরা ওদের স্বভাবজাত মানিষকতা থেকে এতো বেশী দূরে সরে গেছে যে, নিজেরা তো সত্যকে স্বীকার করছেই না, বরং মানুষকেও এমন কিছুর অন্ধ আনুগত্য করতে উদ্বুদ্ধ করছে যারা কোনো কিছুরই মালিক নয় এবং কোনো জিনিসের ওপর এক দিনের জন্যেও তারা কোনো কর্তৃত্ব রাখে না অথবা কোনো অবস্থাতেই কোনো কিছু পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখে না-অথচ ওই মুর্খ হঠকারী নাদানেরা স্বীকার করে যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টিকর্তা, রেযেকদাতা এবং তাঁরই নেয়ামত ছড়িয়ে রয়েছে তাদের চোখের সামনে-যার কোনোটাকে তারা তাঁর দেয়া নেয়ামত বলে অস্বীকার করতে পারে না। এরপরও তারা মনে করে আল্লাহর মতো আরো কেউ আছে বা আল্লাহর উদাহরণ দেয়ার ধৃষ্টতা করে।

'অতএব, খবরদার আল্লাহর কোনো সাদৃশ্য পেশ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালাই সবকিছু জানেন, আর তোমরা কিছুই জান না।' (আযাত ৭৪)

অর্থাৎ, কোনো কিছু এমন নেই যার সাথে আল্লাহর তুলনা করা যেতে পারে। যার উদাহরণ দিয়ে আল্লাহকে বুঝানো যেতে পারে, সুতরাং তাঁর জন্যে কোনো উদাহরণ দিয়ো না।

সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক নির্ণয়ে দু'টি উদাহরণ

এরপর ওদের বিবেককে জাগিয়ে তোলার জন্যে এবং ওদের মধ্যে সঠিক চেতনা সৃষ্টি করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা দুটি উদাহরণ পেশ করছেন। এক. একজন হচ্ছে মনিব, বাড়ীর মালিক এবং জীবন যাপন উপযোগী সব কিছু সরবরাহকারী। দুই. অসহায় ও অক্ষম একজন দাস, যার নিজের বলতে কিছু নেই এবং সে এমনই অকেজো ব্যক্তি যে কিছুই রোযগার করার ক্ষমতা রাখে না।

যারা ইচ্ছা করে সত্যকে জানা ও বুঝা থেকে উদাসীন হয়ে রয়েছে, তাদের জন্যে এ হচ্ছে এক মোক্ষম উদাহরণ, তাও যদি তারা না বুঝে বা বুঝতে না চায় তাহলে কীইবা করার আছে। সত্য বলতে কি আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই কিছুতেই তাঁকে কোনো কিছুর উদাহরণ দিয়ে বুঝানো যায় না, আর এই কারণেই যেভাবে তাঁর এবাদাত করা হয় তাঁর হুকুম মানা হয়, এভাবে আর কারো এবাদাত করা যায় না বিনা যুক্তিতে ও বিনা শর্তে আর কারো কথা মানা যায় না, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আর কারো হুকুম মানা যায় না, কারণ যে সব বস্তুর সামনে ওরা মাথা নত করছে, সবাই তো ওদের গোলাম হিসাবে খেদমত করে চলেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা উদাহরণ দিয়েছেন এমন একজন অধীনস্থ গোলামের যার কোনো কিছুর ওপর কোনো ক্ষমতা নেই, আর এক ব্যক্তির উদাহরণ দিচ্ছেন যার সম্পর্কে তিনি বলছেন, আমি তাকে উত্তম রেযেক দিয়েছি, অতপর তার থেকে সে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে। এরা দুজন কি বরাবর হতে পারে? যাবতীয় প্রশংসা ও কৃতিত্ব আল্লাহর), কিন্তু ওদের অধিকাংশ জানেনা।' (আয়াত ৭৫)

'আল্লাহ তায়ালা আরো দু'ব্যক্তির উদাহরণ দিয়েছেন, ওদের একজন বোবা যে কোনো কিছু করতে সক্ষম নয়, সে তার মনিবের ওপর বোঝা হয়ে রয়েছে.........।' (আয়াত ৭৬)

প্রথম উদাহরণটি বাস্তব অবস্থা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, কারণ (যে সময়ে কথাগুলো নাযেল হচ্ছিলো সে সময়ে তাদের অধীনস্থ অনেক দাস দাসী ছিলো, তারা কোনো কিছুর মালিক ছিলো না। ওই সমাজের লোকেরা এসব অক্ষম দাস দাসী ও মনিব শ্রেণীর লোক, যারা দান ধ্যান করতো এদেরকে কখনও সমান মনে করতো না। এমতাবস্থায় সকল দাস দাসীর পরিচালক ও মালিক যিনি, তিনি এবং যা তিনি সৃষ্টি করেছেন সেসব জিনিস ও সেই সব মানুষ কি করে সমান হবে? সকল সৃষ্টিই কি তাঁর বান্দা নয়?

দ্বিতীয় উদাহরণটিতে এমন একজন মুক বধির ব্যক্তির অবস্থার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে সব কিছুর ব্যাপারেই দুর্বল এবং বুদ্ধির দিক দিয়েও সে আশানুরূপ নয়, সে কিছু বুঝে না এবং কিসে যে কল্যাণ তাও জানেনা, ফলে ভালোর দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। অপরদিকে তার পাশেই রয়েছে আর এক ব্যক্তি যে শক্তিশালী বাকপটু এবং সুবিচারের সাথে কর্তৃত্ব করে, কল্যাণের পথে দৃঢ়তার সাথে কাজ করে চলে। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই দুই শ্রেণীর লোককে এক সমান বলবে না, তা হলে ইট পাথরে অথবা মাটি দিয়ে তৈরী মূর্তি এবং পবিত্র আল্লাহ তায়ালা যিনি সব কিছু করতে সক্ষম, সবজান্তা, ভাল কাজের নির্দেশ দানকারী এবং সরল সঠিক ও মযবুত পথে পরিচালনাকারী এই দুই সত্ত্বা কেমন করে এক হবে, কোনো বিবেকবান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই দুই সত্ত্বাকে সমান মনে করবে?

এ দুটি উদাহরণ প্রদানের সাথে আলোচ্য সেই অধ্যায়টি পেশ হচ্ছে যার সূচনা হয়েছিলো আল্লাহর এই নির্দেশ দিয়ে যে, ওরা যেন দুজন ব্যক্তিকে চরম নির্বোধের মতো সর্বশক্তিমান বা জীবন মৃত্যুর মালিক মনে না করে। আর পরিচ্ছেদটি শেষ হচ্ছে একথার ওপর বিস্ময় প্রকাশের সাথে যে, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বা সর্বশক্তিমান দু'জন হয় কেমন করে? ক্ষমতাকেও যদি একটা ইউনিট ধরা হয়, আর এটা যদি দুজনের মধ্যে বিভক্ত থাকে তাকে একজন ৫০% এবং এ অন্যজন বাকি ৫০% এর মালিক অথবা কম বেশী হলে ১০০% ক্ষমতার মালিক কেউ হতে পারছে না। এমতাবস্থায় খন্ডিত ক্ষমতার মালিককে সর্বশক্তিমান বলবে কোন বোকা? যেহেতু 'সর্ব' থেকে কিছু বের হয়ে গেলে 'সর্ব' তো আর থাকে না। এরপর ক্ষমতা বলতেই বুঝায় সর্বময় ক্ষমতা যেমন দেশের ক্ষমতা এখানে একজনই হবে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী-তা না হলে অপর ক্ষমতাবানরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষমতা চালাবার চেষ্টা করবে আর এর ফলে অবশ্যই সৃষ্টি হবে বিশৃংখলা; কিন্তু, মুখে বললেও কোনো ব্যক্তিকেই এরকম একচ্ছত্র ও নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক মানুষ বেশী দিন মেনে নিতে পারে না। এ কারণেই বিদ্রোহ হয়, ক্ষমতাচ্যুত করা হয়, হয় বিশৃংখলা ও খুন খারাবি আসলে এই সার্বভৌম ক্ষমতা বা নিরংকুশ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই হতে পারে। যে দেশের মানুষ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছে এবং একমাত্র তাঁরই আইন বিধানকে চূড়ান্ত হিসাবে গ্রহণ করেছে, তারাই অশান্তি ও খুন খারাবি থেকে বেঁচে গেছে। সেখানে শান্তি এসেছে এজন্যে যে, পরিচালক ও পরিচালিত সবাই একই আইনের আনুসারী। সেখানে কারো মতই চূড়ান্ত নয়।

'আর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অজানা অদেখা ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর আর কেয়ামত সংঘটিত হওয়া সে তো মাত্র চোখের এক পলকের ব্যাপার অথবা তার থেকেও নিকটবর্তী .... তারা আল্লাহর নেয়ামতকে ভালোকরেই চিনে এরপরও তারা তা অস্বীকার করছে আর প্রকৃতপক্ষে ওদের অধিকাংশই কাফের সত্য অস্বীকারকারী।' (আয়াত ৭৭-৮৩)

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَآ أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا ۙ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصٰرَ وَالْأَفْـِٔدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِي جَوِّ السَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۗ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۢ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعٰمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثٰثًا وَمَتٰعًا إِلٰى حِينٍ ﴿٨٠﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنٰنًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرٰبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرٰبِيلَ تَقِيكُم

রুকু ১১

৭৭. আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় গায়ব (সংক্রান্ত জ্ঞান) একমাত্র আল্লাহর জন্যেই (নির্দিষ্ট রয়েছে), কেয়ামতের ব্যাপারটি তো (তাঁর কাছে) চোখের পলকের চাইতে (বেশী) কিছু নয়, বরং তা তার চাইতেও নিকটবর্তী; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সর্ববিষয়ের ওপর শক্তিমান। ৭৮. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মায়ের পেট থেকে (এমন এক অবস্থায়) বের করে এনেছেন যে, তোমরা (তার) কিছুই জানতে না, অতপর তিনি তোমাদের কান, চোখ ও দিল দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা শোকর আদায় করতে পারো। ৭৯. এরা কি পাখীটির দিকে তাকিয়ে দেখে না? যে আকাশের শূন্যগর্ভে (সহজে) বিচরণ করছে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এমন কে আছে যিনি এদের (শূন্যের মাঝে) স্থির করে ধরে রাখেন, অবশ্যই এ (ব্যবস্থাপনার) মাঝে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে। ৮০. আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জন্যে তোমাদের ঘরগুলোকে (শান্তির) নীড় বানিয়েছেন, তিনিই তোমাদের জন্য পশুর চামড়া দিয়ে (তাঁবুর হালকা) ঘর বানাবার ব্যবস্থা করেছেন, যাতে তোমরা ভ্রমণের দিনে তা সহজভাবে (বহন) করে নিতে পারো, আবার কোথাও অবস্থান নেয়ার সময়ও (তা ব্যবহার করতে পারো), ওদের পশম, ওদের লোম, ওদের কেশ থেকে তিনি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে তোমাদের অনেক ব্যবহার (উপযোগী) সামগ্রী বানাবার ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। ৮১. আল্লাহ তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তিনি তোমাদের জন্যে ছায়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তিনিই তোমাদের জন্যে পাহাড়ের মাঝে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, তিনি (আরো) ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের জন্যে পরিধেয় বস্ত্রের, যা তোমাদের (প্রচন্ড) তাপ থেকে রক্ষা করে, (আরো) ব্যবস্থা করেছেন (এমন) পরিধেয়সমূহের যা তোমাদেরকে তোমাদের সমস্যা সংকট থেকে বাঁচিয়ে রাখে; এভাবেই

بَأْسَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا

عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٢﴾ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَأَكْثَرُهُمُ

الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٣﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ

كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ

عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا رَاَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوْا

رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ

الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٨٦﴾ وَأَلْقَوْا إِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ ِ السَّلَمَ وَضَلَّ

عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٨٧﴾ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ

عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ﴿٨٨﴾

তিনি তোমাদের ওপর তাঁর নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করে দেন, যাতে করে তোমরা তাঁর অনুগত (বান্দা) হতে পারো। ৮২. যদি তারা (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (তুমি জেনে রেখো, তাদের কাছে) সুস্পষ্ট বক্তব্য পৌঁছে দেয়াই হচ্ছে তোমার একমাত্র দায়িত্ব। ৮৩. এ (সব) লোকেরা আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত ভালো করেই চেনে, অতপর তারা তা অস্বীকার করে, (আসলে) ওদের অধিকাংশ (মানুষ)-ই হচ্ছে অকৃতজ্ঞ।

রুকু ১২

৮৪. (স্মরণ করো,) যেদিন আমি প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে এক একজন সাক্ষী উঠিয়ে আনবো, অতপর কাফেরদের কোনো রকম (কৈফিয়ত দেয়ার) অনুমতি দেয়া হবে না– না তাদের (সেদিন) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কোনো সুযোগ দেয়া হবে। ৮৫. (সেদিন) যখন যালেমরা আযাব দেখতে পাবে (তখন চীৎকার করে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে), কিন্তু (কোনো চীৎকারেই) তাদের ওপর থেকে শাস্তি লঘু করা হবে না, না (এ ব্যাপারে) তাদের কোনোরকম অবকাশ দেয়া হবে। ৮৬. মোশরেক ব্যক্তিরা যাদের আল্লাহর সাথে শরীক করেছিলো, (সেদিন) যখন তারা সেসব লোকদের দেখবে, তখন বলবে, হে আমাদের মালিক, এরাই তো আমাদের সেসব শরিক লোক– যাদের আমরা তোমার বদলে ডাকতাম, অতপর সে (শরীক কিংবা মোশরেক) ব্যক্তিরা উল্টো তাদের ওপরই অভিযোগ নিক্ষেপ করে বলবে, না, (আসলে) তোমরাই হচ্ছো মিথ্যাবাদী, ৮৭. তখন এ (মোশরেক) ব্যক্তিরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে, যা কিছু কথা তারা উদ্ভাবন করতো (সেদিন) তা নিষ্ফল হয়ে যাবে। ৮৮. যারা কুফরী করেছে এবং (অন্য মানুষদেরও) আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিয়েছে, আমি (সেদিন) তাদের আযাবের ওপর আযাব বৃদ্ধি করবো, এটা হচ্ছে তাদের (সেই) অশান্তি ও ফাসাদের শাস্তি, যা তারা (দুনিয়ায়) করে এসেছে।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

৮৯. (সেদিনের কথাও স্মরণ করো,) যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বয়ং তাদেরই মধ্য থেকে তাদের ওপর একজন সাক্ষী উত্থিত করবো এবং এ লোকদের ওপর আমি তোমাকেও সাক্ষীরূপে নিয়ে আসবো; আমি তোমার ওপর কেতাব নাযিল করেছি, মুসলমানদের জন্যে এ কেতাব হচ্ছে (দ্বীন সম্পর্কিত) সব কিছুর ব্যাখ্যা, (আল্লাহর) হেদায়াত ও মুসলমানদের জন্যে (জান্নাতের) সুসংবাদস্বরূপ।

তাফসীর

আয়াত-৭৭-৮৯

(স্মরণ করো) যেদিন আমি, প্রত্যেক জনপদ থেকে একজনকে সাক্ষী হিসাবে উঠাবো ......আর (সেদিনের কথাও স্মরণ করো) যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বয়ং তাদের থেকেই তাদের ওপর একজন সাক্ষী উত্থিত করবো এবং এ লোকদের ওপর আমি তোমাকেও সাক্ষীরূপে নিয়ে আসবো...........।' *(আয়াত ৮৪-৮৯)*

সূরাটির বর্তমান অধ্যায়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্বকে কেন্দ্র করেই সমস্ত আলোচনা আবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ, সৃষ্টি কাজের বিশালত্ব, সবার প্রতি নেয়ামত বর্ষণ এবং সর্ববিষয়ে জ্ঞান রাখা– আয়াতগুলোতে এই গুণাবলীরই উল্লেখ রয়েছে। এখানে পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে কথা মুখ্যভাবে আসেনি। তবে অদেখা সকল রহস্যের মধ্যে কেয়ামত দিবসের জ্ঞান অন্যতম বিধায় আল্লাহর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে এ বিষয়ের বিবরণও আলোচ্য পরিচ্ছেদে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেহেতু কেয়ামতের জ্ঞান আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো কাছে নেই এজন্যে এটা স্পষ্ট যে কেয়ামত সংঘটিত করার মালিকও একমাত্র তিনি। সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে একাজ অতি সহজ, এরশাদ হচ্ছে,

'কেয়ামতের বিষয়টি মাত্র এক মুহূর্ত বা তার থেকেও কম সময়ের মধ্যে সংঘটিত হওয়ার বিষয়।'

অপরদিকে চিন্তা করুন, মায়ের গর্ভাশয়ে যে ভ্রূণের জন্ম হয় তাও মানুষের জ্ঞান ও দৃষ্টির অন্তরালে, এজন্যে এটাও গায়েবেরই বিষয়, কাজেই এ গঠন প্রক্রিয়া কৌশল ও পদ্ধতি মানুষের কাছে চিরদিন রহস্যাবৃতই থাকবে। এই রহস্য ভেদ করেই আল্লাহর হুকুমে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে এই ভ্রূণ একটি পূর্ণাংগ মানব শিশু আকারে দুনিয়ার আলো বাতাসে আভির্ভূত হয়। যখন এ বাচ্চা দুনিয়ায় আসে তখন পৃথিবীর পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুই তার জানা থাকে না, তারপর মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাকে পর্যায়ক্রমে শোনার শক্তি, দেখার শক্তি ও অন্তর দিয়ে অনুভব করার শক্তি দান করেন, যাতে করে ওই ব্যক্তিরা তাঁর নেয়ামতের শোকরগোযারি করে। সৃষ্টির এই রহস্যাবলীর মধ্যে আরো রয়েছে মহাশূন্যে এক বিশেষ নিয়মের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত থাকা অবস্থায় পাখীর উড্ডয়ন ও মহাশূণ্যে দীর্ঘক্ষণ উড়ে বেড়ানোর ক্ষমতা। একবার খেয়াল করে দেখুন ওই সুদুর মহাশূন্যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কে তাদেরকে ধরে রাখে?

নীচের আলোচনায় আরো দেখা যাবে, মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বস্তুগত যেসব নেয়ামত দিয়েছেন তারও কিছু বিবরণ এখানে এসেছে–এখানেও দেখা যায় অদৃশ্য এক শক্তিশালী হাত মানুষের যাবতীয় জীবন সামগ্রীকে এক বিশেষ নিয়মের অধীনে তার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। যে গৃহে সে বাস করে তার মধ্যে ছায়া লাভ করা, শান্তি-শৃংখলা ও আরাম আয়েশ ভোগ করা এসব তো তাঁরই দান। বাড়িঘরের মধ্যে যেমন রয়েছে মযবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বাড়ী ঘর তেমনি রয়েছে পশুর চামড়ায় তৈরী ভ্রাম্যমাণ অস্থায়ী তাঁবুর ঘর। এসব ঘরকে ভ্রাম্যমাণ বাড়ী হিসাবে যেমন ব্যবহার করা যায় তেমনি দীর্ঘস্থায়ী বাড়ী হিসাবেও অনেক সময়ে এগুলোকে ব্যবহার করা হয়, আবার এরই মধ্যে মানুষ পশম ছোটো চুল ও বড় চুল দ্বারা নানা প্রকার আসবাবপত্র তৈরী করে জীবনের প্রয়োজন মেটায় এবং আরো প্রস্তুত করে নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদের উপকরণাদি। এভাবে সে তপ্ত বালুকাময় মরু ভূমিতেও পায় সুশীতল স্নিগ্ধ ছায়া, আরামদায়ক বাসস্থান ও দেহাবরনের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্ত্র, চাদর ও এমন পোষাক যার দ্বারা গ্রীষ্মের তাপ থেকে সে রক্ষা পায়। যুদ্ধের সময় শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে নানা প্রকর বর্মও সে এইসব উপকরণ দিয়ে তৈরী করে।

এরশাদ হচ্ছে,

এমনি করে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর তাঁর নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করেন, যেন তোমরা তাঁর কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ কর।' ....(৮১)

এরপর বিস্তারিতভাবে আসছে পুনরুত্থান দিবসের বিবরণ, যা মোশরেক ও তাদের দোসরদের কাছে সমভাবে হাযির হচ্ছে, আর রসূলরা এই সব সত্য তথ্য তাদের সামনে হাযির করে তাদের ওপর সত্যের সাক্ষী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন, রসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর জাতির কাছে সত্যের বাস্তব সাক্ষী হিসাবে এসেছিলেন। এইভাবে পুনরুত্থান ও কেয়ামত সম্পর্কিত বর্ণনা এ অধ্যায়ে এখানেই শেষ হচ্ছে।

'আসমানসমূহ ও যমীনের গোপন রহস্য একমাত্র আল্লাহর কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি চোখের একটি পলকের মতো অথবা তার থেকেও নিকটতর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু করতে সক্ষম।'

কেয়ামত খুবই কাছে

মৃত্যুর পর আবার জীবিত হওয়ার বিষয়টি ঈমানের সাথে জড়িত বিষয়গুলোর অন্যতম, যা নিয়ে প্রত্যেক যামানায় কঠিন বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, ঝগড়া লেগেছে এবং প্রত্যেক রসূলকেই এই কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। যে সব বিষয় বিশেষভাবে আল্লাহর জ্ঞান ভান্ডারের মধ্যে রয়েছে, মৃত্যুর পর আবার জীবিত হওয়ার বিষয়টি তার অন্যতম। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য যা কিছু আছে তার মালিক আল্লাহ তায়ালা, পৃথিবীর যতো জ্ঞান যতো সম্পদ ও শক্তির মালিকই মানুষ হোক না কেন কেয়ামতের সেই কঠিন দিনে কতো অক্ষম ও অসহায় অবস্থায় পড়ে যাবে তা কারো বুঝার ক্ষমতা নেই, মানুষের মধ্যে যে যতো জ্ঞানীই হোক না কেন কেয়ামত সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং অসহায়। সে ধারনাও করতে পারবেনা যে একটুপরে তার সাথে কী ব্যবহার করা হবে, তার রূহ যা মৃত্যুর সাথে সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে তা কি কখনও আবার ফিরে আসবে? না, আসবে না এবং তার আশা-আকাংখা চিরদিনের মতো শেষ হয়ে যাবে। তার তাকদীরে কি আছে সবই তো গায়েবের পর্দার আড়ালে গোপন রয়েছে, সে জানে না, কখন হঠাৎ করে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে। তাদের ওপর মৃত্যু হঠাৎ করে এবং কোনো নোটিশ না দিয়েই এসে পড়বে, আর এটা তো

অবশ্যই মানুষের জন্যে আল্লাহর এক রহমত, যে বর্তমান সময়ের পর কী ঘটতে যাচ্ছে তা সে ভুলে থাকে, যাতে করে সে এ জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে, কাজ করতে পারে তার ফল পেতে পারে এবং পৃথিবীতে উন্নত জীবন যাপন করতে পারে। সাথে সাথে যেন তাদের বিরুদ্ধে সাহসের সাথে রূখে দাঁড়াতে পারে যারা পর্দার অন্তরালে থেকে ওদের ভীষণ ক্ষতি করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

আর কেয়ামতও এই গায়েবের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিষয়গুলোর একটি। মানুষ যদি তার পরিণতির কথা জানতো তাহলে তার জীবনের চাকা একেবারেই থেমে যেতো, অথবা সে সম্পূর্ণভাবে কাজ কর্ম করা ছেড়ে দিতো। গায়েবের অবস্থা জানা না থাকায় মানুষ তার শক্তি সামর্থকে কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু জীবন তার সুনির্দিষ্ট ও নির্ধারিত এক বিশেষ গতিতেই চলছে, যা তার তাকদীরে পূর্ব থেকে লেখা রয়েছে। এভাবে মানুষ বছর, দিন, মাস, ঘন্টা ও মুহূর্তগুলো গণনা করতে করতে তার নির্ধারিত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর কেয়ামতের বিষয়টি হচ্ছে একটি মাত্র মুহূর্তের মতো, অথবা তার থেকেও আরো নিকটবর্তী'।

প্রকৃতপক্ষে কেয়ামত খুব কাছেই রয়েছে যদিও আমরা তাকে অনেক অনেক দূরে মনে করি, মানুষের জানা গণনা করা বা হিসাব ক্ষমতার থেকেও কাছে। একারণে তার কাছে কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করার সময় নেই বা থাকবে না, চোখের এক পলকের মধ্যে এটা সংঘটিত হয়ে যাবে। আসলে প্রত্যেকে মৃত্যু আসার সাথে সাথেই কেয়ামতের মজা টের পেয়ে যায়-তখন তার যে অবস্থা হয় সেই অবস্থাটাই তো তার একার জন্যে কেয়ামত। মৃত্যুকালে কেয়ামতের সকল আলামত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে ফুটে ওঠে। এইভাবে প্রতিটি মৃত্যুপথযাত্রীর সামনে কেয়ামতের বিভীষিকা হাযির করে দেয়া আল্লাহর কাছে অতি সহজ কাজ। এজন্যে এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সকল কিছু করতে সক্ষম'।

আর সকল সৃষ্টির মধ্য থেকে ছাঁটাই করে একমাত্র মানবমন্ডলীকে কেয়ামতের দিন মাটির মধ্য থেকে তুলে নেয়া এবং হাশরের মাঠে একত্রিত করা মানুষের কল্পনার বাইরে হলেও আল্লাহর কাছে এটা কোনো ব্যাপারই নয়, এধরনের সর্বপ্রকার অকল্পনীয় সব কিছু তিনি করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। তাঁর হুকুমে কেয়ামত সংঘটিত হবে যার প্রকম্পনে সব কিছুই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং সবাই উর্ধশ্বাসে আদিগন্তব্যাপী হাশরের ময়দানে ছুটোছুটি করতে করতে অবশেষে আল্লাহর দরবারে সমবেত হয়ে যাবে এবং হিসাব নিকাশের পর পুরস্কার অথবা শাস্তির ফয়সালার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকবে। এভাবে সকল কিছু পূর্ব পরিকল্পিত অবস্থায় গায়েবের মধ্যে রয়েছে এবং সব কিছুকে পর্যায়ক্রমে এবং সময় মতো সংঘটিত করা মহা ক্ষমতাবান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে অতি সহজ কাজ। সে সময়ে তিনি শুধু বলবেন, 'হয়ে যাও' অমনি হয়ে যাবে। এভাবে মোমেনদের কাছে কেয়ামতের বিষয়টি অত্যন্ত সহজ বলে মনে হয়, আর যারা মানুষের সংকীর্ণ দৃষ্টিশক্তি ও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ অনুমান ক্ষমতার ভিত্তিতে কেয়ামতকে বুঝতে চায় তাদের কাছেই কেয়ামত সংঘটিত হওয়াটা বড়ই কঠিন ও বড়ই বিস্ময়কর বলে মনে হয়। তারা মানুষের সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে সব কিছু দেখে। মানুষের অতি সীমাবদ্ধ ক্ষমতাকে কেন্দ্র যার যাদের চিন্তা চেতনা আবর্তন করে তাদের এর বাস্তবতা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

আল্লাহকে চিনতে এই উপমাগুলোই যথেষ্ট

মহাগ্রন্থ আল কোরআন মানুষের জীবনের ছোট্ট একটি ঘটনা দিয়ে প্রতিনিয়ত আমাদের সামনে বিরাজমান আল্লাহর অদৃশ্য নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা তাঁর শক্তি ক্ষমতা ও সৃষ্টি জগতের সর্বত্র তার উপস্থিতির বিষয়টি বুঝানোর প্রয়াস পেয়েছে। মানুষ যা কিছু করতে চায়, তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও তা করতে পারে না, এমনকি অনেক বিষয়ে চিন্তা করতেও সে অক্ষম হয়ে যায়। এ অবস্থাটা দিন রাত ঘটছে। সামান্য একটু খেয়াল করলেই একথার যথার্থতা মানুষ বুঝবে। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেটের মধ্য থেকে এমন (অসহায়) অবস্থায় বের করেছেন যে তোমরা কিছুই জানতে না, অতপর তোমাদের জন্যে কান, চোখ ও হৃদয় বানিয়ে দিয়েছেন, যেন তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করো।' (আয়াত ৭৮)

এই যে উদাহরণটি পেশ করা হলো, এটা খুব কাছাকাছির একটি অদেখা বা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কিত উদাহরণ, কিন্তু বিষয়টি বড়োই সুদূরপ্রসারী, অথচ মাতৃগর্ভে ক্রমান্বয়ে ও ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা ভ্রূণের অবস্থা আজকাল মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু এটা কিভাবে পরিপূর্ণ বাচ্চার রূপ নেবে তা সে জানেনা, কারণ এর রহস্যই জীবনের গোপন রহস্য। এই তো হচ্ছে মানুষের জ্ঞান ও বিদ্যার দৌড়, এরপর সে আবার কেয়ামত ও অন্যান্য গায়েবী বিষয় জানতে চায়, দাবী করে তাকে এ বিষয়ে জানানো হোক। বস্তুতপক্ষে, তার জ্ঞান হচ্ছে অতি ক্ষণস্থায়ী এবং বড়ো কষ্ট করেই এই জ্ঞান তাকে অর্জন করতে হয়, অথচ ইচ্ছা করলেও যতোদিন খুশী তা ধরে রাখা যায় না। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে বের করেছেন এমন অসহায় অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানতে না',

অর্থাৎ তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিলো না। প্রকৃতপক্ষে গোটা বিশ্ব জগতই তো মানুষের জন্ম স্থান, অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষই বিশ্বজনীন নাগরিক এবং বিশ্বের সব কিছুই তার বিবেচ্য বিষয়, তবে মাতৃগর্ভ থেকে তার বেরিয়ে আসার বিষয়টি হচ্ছে সব থেকে কাছাকাছির বিষয় এবং সব থেকে কাছের যে জায়গা থেকে সে সরাসরি ভূমিষ্ট হচ্ছে, তা খুবই কাছের এবং তা মানুষের জ্ঞানের আওতাভুক্ত স্থান। সেখান থেকে সে একেবারেই জ্ঞানহীন বা না-দান হিসাবে বেরিয়ে আসছে। এরপর সে যা কিছু (জ্ঞান) অর্জন করছে তা অবশ্যই আল্লাহর দান এবং তার পরিমাপ ততোটুকুই যতোটুক আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার তাকদীরে লিখে রেখেছেন এবং অবশ্যই আল্লাহ তায়ালাই তার জন্যে তা নির্ধারণ করে রেখেছেন, আর তার জীবনকে সৃষ্টি জগতের মধ্যে অবস্থিত এই গ্রহের জন্যেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাই তিনি জানাচ্ছেন, তিনি বানিয়েছেন তোমাদের জন্যে কান, চোখ ও হৃদয় এবং তার বক্ষস্থিত সকল কলকজা।

'যেন তোমরা শোকরগোযারি করো।'

অর্থাৎ, যখন তোমরা দুনিয়ার বুকে আল্লাহর দেয়া এসব নেয়ামতের মূল্য অনুভব করবে, অনুভব করবে যে আল্লাহর মেহেরবানী সদা সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে তোমাদের পরবর্তী জীবনের জন্যে, তখন কৃতজ্ঞতা ভরে তোমাদের দেহ মন ও হৃদয় সব কিছু আল্লাহর দরবারে ঝুঁকে পড়বে; আর শোকরিয়া আদায়ের জন্যে প্রথম কথাই হচ্ছে আল্লাহর ওপর ঈমান আনা, তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার ওপর আস্থা স্থাপন করা, যিনি একমাত্র মাবুদ একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করতে হবে নিরংকুশ ও নিশর্তভাবে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সার্বভৌম ক্ষমতার যেসব বহিপ্রকাশ ও নিদর্শন তাদের চোখের সামনে এবং আশে পাশে নিশিদিন তারা দেখতে পাচ্ছে সেগুলোও তাদের মনের মধ্যে যে এটুকু চিন্তা ভাবনা জাগায় না-এটাও আর একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। এরশাদ হচ্ছে,

'এরা কি সুদূর আকাশের শূণ্যগর্ভে (উড়ন্ত) পাখিটির দিকে তাকিয়ে দেখেনা? এক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এদেরকে শুন্যের মাঝে কে স্থির করে রাখে? অবশ্যই এর মধ্যে ঈমানদার জাতির জন্যে সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে।'

আকাশের ওই মহাশূণ্যতায় পাখীকূলের নিয়ন্ত্রিতভাবে উড়ে বেড়ানো এমন একটি দৃশ্য যা আমাদের নযরে বার বার পড়ে। আশ্চার্যান্বিত হয়ে মানুষ যখন এ চমকপ্রদ দৃশ্য দেখে তখন তার হৃদয়ের এক অভূতপূর্ব আবেগের সৃষ্টি হয়। যখন সে জেগে থাকে তখনই তো তার নযরে এ দৃশ্য পড়ে এবং তার হৃদয়ে এক ভাবের আবেগ সৃষ্টি হয়, বস্তুত সে তখন আনন্দে আত্মহারা এক কবির দৃষ্টি দিয়ে এসব দৃশ্য দেখে ও উপভোগ করে, আর কোনো কবি মুগ্ধ নয়নে যখন এ পাখীর দৃশ্য অবলোকন করে, তখন সে খুশীতে ও ভাবের আবেগে কাব্য রচনায় মগ্ন হয়ে যায়, অতপর চির পুরাতন ও চির নতুন এ দৃশ্য তাকে প্রকম্পিত করতে থাকে....... আবেগের আতিশয্যে তার মুখ দিয়ে নিজের অজান্তেই বেরিয়ে আসে,

'একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া আকাশের ওই মহা শূন্যতায় ওদেরে কেউ ধরে রাখছে না।'

তিনি পাখীর প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি দিয়েছেন এবং সারাবিশ্বের মধ্যে যে নিয়ম চালু রেখেছেন সেই নিয়ম অনুযায়ীই পাখীরা ওই মহাশূন্যে এভাবে উড়তে পারে। তার ওই ক্ষমতার রশিতে বাঁধা থাকার কারণেই ওই মহাশূণ্যলোক ও আশ-পাশের সমস্ত পরিবেশে ওই পাখীগুলোকে মহাকাশে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। আকাশকে পাখীর উড্ডয়নের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান তিনিই ওই পাখীগুলোকে সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত মহাশূন্যে উড়বার এই ক্ষমতা দিয়েছেন এবং তার আশে পাশের পরিবেশকেও পাখীকুলের উড়ে বেড়ানোর জন্যে উপযোগী বানিয়েছেন, তিনিই ওই মহাকাশের শূণ্যতায় পাখীদেরকে ধরে রেখেছেন, তারা এতো দীর্ঘ সময় ধরে উড়তে থাকা সত্তেও ক্লান্ত হয় না এবং নীচের দিকে পড়ে যায় না।

এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই এর মধ্যে ঈমানদার জাতির জন্যে সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে।'

সুতরাং, এটা নিশ্চিত যে প্রত্যেক মোমেনের অন্তর মন হচ্ছে কবিদের আবেগে ভরা মনের মতোই সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখে আবেগে আপ্লুত। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের রূপ মাধুর্যবাহী এ বিশ্ব প্রকৃতিতে ছড়িয়ে রয়েছে যে মাধুরী, দিবানিশি ঝংকৃত হচ্ছে যে সুরলহরী এসব কিছু একজন মোমেনের আবেগকে প্রচন্ডভাবে আন্দোলিত করতে থাকে, তার বিবেককে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তোলে এবং তখন সে তার গভীর বিশ্বাস আনুগত্যবোধ ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে আল্লাহর তাসবীহ জপতে থাকে। এইভাবে সে তার বিমুগ্ধ ও পুলকিত মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে এই মোমেনরা আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্রের সঠিক ব্যাখ্যা বিবরণ জানতে পেরে কৃতার্থ বোধ করে এবং তারা নানা বর্ণের সৃষ্টি বৈচিত্রের মধ্যে নিহিত আল্লাহর ক্ষমতা বর্ণনাকারী কথাগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে। তাই দেখা যায়, মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বর্ণিত সৃষ্টি লীলা সম্পর্কিত কথাগুলো তাকে এতোবেশী আবেগাপ্লুত করতে সক্ষম হয়।

সৃষ্টি রহস্য ও সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নেয়ামতের বহিপ্রকাশ সম্পর্কে প্রসংগক্রমে আরো অনেক কথা এসেছে, ধীরে ধীরে হলেও এসব রহস্য ভান্ডার উন্মুক্ত হচ্ছে। এ

অনুভূতি মানুষকে মুগ্ধ করতে শুরু করেছে যে বিশ্ব প্রকৃতির চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা রাশি রাশি সৌন্দর্য, জীবন ধারণ উপকরণ, সুখে দুঃখে ঠাই নেয়ার ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রদত্ত সকল ব্যবস্থাদি অবশ্যই এসবের মালিক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নয়। এসব বিষয়ের দিকে ইংগিত করে বলা হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জন্যে তোমাদের ঘরগুলোকে শান্তির নীড় বানিয়েছেন ....এভাবে তিনি তার নেয়ামতকে তোমাদের ওপরে পরিপূর্ণ করছেন, যেন তোমরা আত্মসমর্পণ করো।' (আয়াত ৮১)

কিন্তু, বাসোপযোগী গৃহ লাভ করা ও শান্তি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাওয়া যে কতো বড়ো নেয়ামত, তা বাস্তুহারা যাযাবর, যাদের মাথা গুঁজার মতো এতোটুকু ঠাঁই নেই, নেই কোনো স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা, তারা ছাড়া আর কেউ সঠিকভাবে এই নেয়ামতের মাহাত্ম বুঝতে পারবে না। গায়েব সম্পর্কিত বিবরণ দানের পর এসব নিরাপদ বাসস্থান সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে। আর এটাও খেয়াল করার বিষয় যে, শান্তি নিরাপত্তার আধার এসব শান্তিপূর্ণ বাসস্থানের বিষয়টি গায়েবের বিষয় থেকে কোনো অংশে কম বিস্ময়কর নয়,যেহেতু উভয়টি অদৃশ্য মহাশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও বরাদ্দকৃত। উভয়টির মধ্যেই আল্লাহর কুদরতী হাতের অদৃশ্য নিয়ন্ত্রন ও গোপন রহস্য বিদ্যমান আর এই শান্তি পাওয়ার কথাটি উদাসীন চেতনাকেও গভীরভাবে স্পর্শ করে এবং এ মহান নেয়ামত যে, কতো বড়ো ও কতো মূল্যবান তা তাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়।

নীচে বর্ণিত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে, ঘরে বসবাস করার মধ্যে শান্তির বিষয়টা এতো বেশী গুরুত্ব পেয়েছে যে মনে করা হচ্ছে, যেন আমরা ইসলাম থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ঘর ও ঘরের শান্তি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি; দেখুন এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাড়ীগুলোকে শান্তির নিড় বানিয়ে দিয়েছেন।'

একথা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা জানাতে চাচ্ছেন যে প্রত্যেক মানুষের বাস করার জন্যে একটি বাড়ী প্রয়োজন–দয়াময় আল্লাহ তায়ালা চান প্রত্যেক মানুষ মাথা গোজার মতো একটা ঠাঁই পাক, এটা তাঁর পক্ষ থেকে মানুষকে দেয়া এক মৌলিক অধিকার। যদি কেউ এটা না পায় তাহলে বুঝতে হবে, আল্লাহর দেয়া এ অধিকার থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করছে, তাই ইসলাম চায় মানুষের জন্মগত এ অধিকারকে নিশ্চিত করতে, তার অধিকার তার কাছে পৌঁছে দিতে, যেন সে আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসাবে তাঁর রাজ্যে নিরাপত্তা ও শান্তি পেতে পারে, পেতে পারে আরামদায়ক বাসস্থান। মানুষের তৈরী নিয়মে অথবা আল্লাহর নাফরমান কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণীর কোনো ব্যবস্থাপনায় যদি এ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, তাহলে তা হবে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ। এহেন আল্লাহদ্রোহীদেরকে উৎখাত করে আল্লাহর রাজ্যে তাঁর আইন চালু করাই হচ্ছে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধিদের কাজ। এখানে বাসস্থান কথাটার মধ্যে শারীরিক প্রয়োজন ও মানসিক শান্তির প্রয়োজনে বস্তুগত বিষয়সমূহের কথা উল্লেখ হয়েছে। মানব জীবনে এগুলোর প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে এবং এ বিষয়ে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, বৈধ পন্থায় অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশিত পথে এগুলো লাভ করার জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম করা অবশ্যই আল্লাহর ইচ্ছাকেই পূরণ করা, অতএব এগুলোর জন্যে চেষ্টা সাধনা অবশ্যই অন্যান্য এবাদাতের মতো আল্লাহর এবাদাত। এখন, এমন বাড়ী বানাতে হবে যা শান্তি ও নিরাপত্তার

আধার হয়, এখানে এমন কোনো কাজ বা ব্যবহার যেন না হয় যে এ শান্তির নীড় ঝগড়া ফাসাদ ও বিবাদ বিসম্বাদের কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। বিশ্বপালক মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন চান তাঁর বান্দার প্রতিটি বাড়ী ঘর যেন সুন্দর ও আরামদায়ক বাসস্থানে পরিণত হয় যেন তা হয় শান্তির ও নিরাপত্তার কেন্দ্র। বাইরে কাজকর্ম শেষে অথবা ক্লান্তিকর সফর শেষে যখন সে ঘরে পৌঁছবে তখন সে যেন শান্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে সে তার ঘরকে নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে ফিরে পায়। এ প্রয়োজনে এবং এ লক্ষ্য অর্জনে ঘরের বাসিন্দাদের এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে, তাদেরকে উপযোগী শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে।

এ কারণেই ইসলাম প্রতিটি ঘরের মান সম্ভ্রম ও ইযযত আবরু সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেয়, তার জান মালের নিরাপত্তা দেয়, শান্তি ও নিশ্চিন্ততার নিশ্চয়তা দেয়, সেখানে কাউকে প্রবেশ করতে হলে অনুমতি নিয়েই প্রবেশ করতে হবে, শাসন ক্ষমতায় আছে বলে কেউ কারো ঘরে হঠাৎ করে বা জোর করে প্রবেশ করার অধিকার রাখে না এবং কোনো কারণেই ঘরের কোনো বাসিন্দার স্বাতন্ত্র্য ও গোপনীয়তা কেউ নষ্ট করবে না, আর গৃহকর্তার অবর্তমানে বা অনুপস্থিতিতে ঘরের কোনো গোপন তথ্য জানার জন্যে ওঁৎ পেতে থাকা বা গৃহকর্তার অজান্তে গোয়েন্দাগিরি করার কোনো অধিকার কারো নেই, কারণ এতে ঘরের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়, ঘরের বাসিন্দাদের জন্যে ইসলাম প্রদত্ত শান্তি বিধানের প্রতিশ্রুতি বিঘ্নিত হয়। এভাবে ঘর ও ঘরের বাসিন্দাদের সম্পর্কে ওপরে বর্ণিত আয়াতের গভীর ব্যাখ্যা যেন সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত হয়।

আর যেহেতু এখানে ঘরবাড়ী, আশ্রয়স্থল এবং পোশাক আশাকের দৃশ্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এজন্যে এর সাথে জড়িত গৃহপালিত পশুর কথাও জানানো হয়েছে। যেমন-

'আর তিনিই তোমাদের জন্যে গবাদি পশুর চামড়া দ্বারা ঘর দুয়ার বানানোর ব্যবস্থা করেছেন, যাতে তোমরা সফরে (সহজে) বহন করে নিতে পারো, আবার কোথাও বসতি স্থাপন করার দিনেও (তা ব্যবহার করতে পারো) ওদের পশম লোম ও কেশ থেকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে তোমাদের অনেক ব্যাবহার (উপযোগী) সমগ্রী বানাবার ব্যবস্থা করেছেন।'

অর্থাৎ, গৃহপালিত পশুর যে নেয়ামত আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে দিয়েছেন সেগুলোকে তোমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করো, কখনও সেগুলো থেকে জরুরী কাজে খেদমত নাও, আবার কখনও সেগুলো থেকে সখের বস্তুও বানাও। 'মাতা' অর্থাৎ আসবাবপত্র যা দিয়ে কখনও ব্যবসায়ের পণ্য বানাও আবার গৃহের সৌখিন আসবাবপত্র বানাও যা অনেক সময় সম্পদ হিসাবে কাজে লাগে। আসলে 'মাতা' বলতে সফরে ব্যবহৃত গদি, পর্দা, আসবাবপত্র ইত্যাদি সব কিছু বুঝায় আবার এগুলো দিয়ে অনেক সময় সখের জিনিসও বানানো যায়।

বাড়ীতে বসবাস করার সময় মানুষ শান্তিপূর্ণ যে পরিবেশ পায়, যে নিশ্চিন্ততা ও শান্তি পায় সে অবস্থাটাই ওপরের আয়াতাংশে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর দ্বারা ঘরের শান্তিপূর্ণ অবস্থাটাকে তুলে ধরা হয়েছে, যেমন তিনি বানিয়েছেন প্রখর রৌদ্রের সময় ঘরের স্নিগ্ধ ছায়া পাহাড়-পর্বতের মধ্যে ছায়া ঘেরা গুহাসমূহ এবং শীত-গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে বাঁচানোর জন্যে নানা প্রকার আরামদায়ক পোশাক ও যুদ্ধের ময়দানে ব্যবহৃত বর্ম।

নিরাপদ বাসস্থানে থেকে প্রশান্তি লাভ করার লক্ষ্যেই এসব ঘর-বাড়ী তৈরী করা হয়েছিলো একথার দ্বারা ছায়া, পাহাড়ের মধ্যে আশ্রয় এবং বর্মের দিকে ইংগিত করা হয়েছে যার দ্বারা গরম থেকে ও যুদ্ধের সময় শত্রুর অস্ত্র থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, তোমাদের জন্যে পাহাড়-পর্বতের মধ্যে আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন, আর বানিয়েছেন তোমাদের জন্যে এমন পোশাক ও বর্ম, যার দ্বারা তোমরা গরম থেকে ও (শত্রুর ব্যবহৃত যুদ্ধের অস্ত্রের) অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করতে পার'।

মানুষের জন্যে ছায়ার মধ্যে আরাম গ্রহণ ও বাসোপযোগী আশ্রয়স্থল রয়েছে। আরো রয়েছে এসব আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে নিশ্চিন্ততা ও আরামের নিশ্চয়তা। আবার যেসব পোশাক-আশাক বানানোর পদ্ধতি তিনি তোমাদেরকে শিখিয়েছেন সেগুলো দিয়ে মরু অঞ্চলের তাপ দাহ থেকে তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও এবং যুদ্ধে শত্রুর অস্ত্রাঘাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যেও সেগুলোকে বর্ম হিসাবে ব্যবহার করো, এসব কিছুর প্রস্তুতি নিয়ে থাকা শান্তিময় ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে থাকার প্রয়োজনে। অতপর আসছে পরবর্তী কথা,

'এইভাবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর তাঁর নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করেছেন যেন তোমরা (তাঁর কাছে পুরোপুরিভাবে) আত্মসমর্পণ করতে পারো।'

অর্থাৎ, ইসলাম অর্থই হচ্ছে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শান্তি লাভ এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতা।

এভাবে, আল কোরআনে ছবির মতো যে কথাটা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা হচ্ছে, একথা বলা যে, (মরুভূমির কঠিন ও উত্তপ্ত পরিবেশে) ছায়া ঘেরা সুশীতল বাসস্থান লাভ তোমাদের জন্যে আল্লাহর খাস নেয়ামত।

এসব আরামের বাসস্থানে থেকে যদি ওরা ইসলাম গ্রহণ করে এবং আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁর বিধান মতো জীবন যাপন করে তাহলে তারা দো-জাহানের সার্বিক কল্যাণ লাভ করবে। আর তা না করে যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থা থেকে পালিয়ে যেতে চায় সে অবস্থায়, হে রসূল, তোমার কাজ শুধু মাত্র পৌঁছে দেয়া। কিন্তু, আল্লাহর যে নেয়ামতকে তারা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারে না, তা বুঝার পরও যদি ওরা তাঁর নাফরমানী করে ও তাঁর নেয়ামতের নাশোকরি করে তাহলে তারা চরম অকৃতজ্ঞ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যাবে। এরশাদ হচ্ছে,

'অতপর ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, তাহলে (উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই, কেননা) তোমার দায়িত্ব হচ্ছে শুধু পৌঁছে দেয়া। ওরা আল্লাহর নেয়ামতকে জানছে বুঝছে, এরপরও সে নেয়ামতকে অস্বীকার করছে, সত্যি বলতে কি ওদের বেশীর ভাগই হচ্ছে কাফের।'

কেয়ামতের ময়দানে নেতা ও জনগণের ঝগড়া!

এরপর কোরআন আমাদের সামনে কেয়ামতের ময়দানের একটি দৃশ্য চিত্রায়ন করছে। আজকের যারা মূর্তিপূজা কিংবা কাউকে অন্ধ অনুসরণ কিংবা কাউকে অদৃশ্যের বিষয়ে জ্ঞানী কিংবা নিজেদের জন্যে আইন কানুন রচনা করার অধিকার দিয়ে আল্লাহর সাথে শরীক করছে— এইসব মোশরেক এবং শরীকদের মাঝে ঝগড়ার দৃশ্যটি আমাদের সামনে তুলে ধরে

'যে দিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন করে সাক্ষী দাড় করাবো ....যারা অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় আসা থেকে মানুষকে বাধা দিয়েছে, তাদের ওপর আমি আযাবের ওপর আযাব বাড়িয়ে দেব যেসব অশান্তিকর কাজ তারা করতে থেকেছে, তারই প্রতিদান স্বরূপ তাদেরকে দেয়া হবে এ আযাব।' (আয়াত ৮৪-৮৮)

ওপরের আয়াতগুলোতে নবীদের দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সকল নবীই তাদের জাতির মধ্য থেকে এগিয়ে আসা ঈমানদারদেরকে সাথে নিয়ে দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং দুনিয়ার জীবনে নানা প্রকার দুঃখ কষ্টের মধ্যে অব্যাহতভাবে তাবলিগী কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। আয়াতে যারা জেনে বুঝে সত্যকে অস্বীকার করেছিলো তাদের করুণ অবস্থাও ফুটে উঠেছে। যারা সত্যের বিরোধিতা করেছিলো এবং সত্যকে উৎখাত করার জন্যে তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিলো, তাদের সম্পর্কে এ প্রসংগে জানানো হচ্ছে যে, কেয়ামতের দিন আত্মপক্ষ সমর্থন করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে কোনো যুক্তি তর্ক পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে না, তাদের পক্ষে কারো সুপারিশও গ্রহণ করা হবে না এবং সে দিন কোনো কাজ বা কথা দিয়ে তাদের রবের করুণাদৃষ্টি আকর্ষণেরও কোনো সুযোগ দেয়া হবে না। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর সাথে সাথে পরিতাপ করা তওবা করা বা নিজেদেরকে শোধরানোর সকল সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। মৃত্যুর পর শুধু হিসাব নিকাশ হওয়া ও পুরস্কার বা শাস্তি গ্রহণ করা ছাড়া অন্য সকল প্রকার সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যখন যালেমরা আযাব দেখতে শুরু করবে তখন তাদের আযাবকে কোনো প্রকার হালকা করাও হবে না অথবা তাদের অবস্থাকে কোনোভাবেই পুনর্বিবেচনা করা হবে না।'

ওপরের আয়াতগুলোতে এরপর দেখা যায়, বর্ণনা ধারা কেটে গিয়ে আসছে সেসব মোশরেকদের দৃশ্য যারা আল্লাহর ক্ষমতায় অন্যদের অংশীদার করতো এবং তাদের দাসত্ব করতো, তাদের বানিয়ে দেয়া আইন কানুন মানতো। সেসব শরীকদেরকে দেখিয়ে তারা আল্লাহ রব্বুল ইযযতের কাছে আরয করবে, বলবে,

'হে আমাদের রব, ওই হচ্ছে আমাদের সেই সব মাবুদ যাদেরকে আপনার ক্ষমতার অংশীদার বলে মনে করতাম এবং আপনাকে বাদ দিয়ে তাদেরকেই আমরা সাহায্যের জন্যে ডাকতাম।'

রোজ হাশরের দিন ওরা নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিয়েই তারা একথা বলবে, অথচ এর আগে দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে তারা তাদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছিলো। সাধারণ মানুষের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সমাজের নেতারা, নিজ নিজ স্বার্থে জনগণকে এমনভাবে ভেড়া বানিয়ে রাখতো যে স্বাধীনভাবে কোনো চিন্তা করার সুযোগও তাদেরকে দিতো না। নানা প্রকার ভয় দেখিয়ে, অর্থনৈতিক চাপে রেখে ও তাদের মধ্যে বিভিন্ন অন্ধবিশ্বাস সৃষ্টি করে নিজেদের কথা মানতে তাদেরকে বাধ্য করতো এবং বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কৌশলে তারা নিজেদের হাতে কর্তৃত্ব ধরে রাখতো। তাদেরকে বুঝাতো, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর।' নিজেদের স্বার্থে মানুষের ওপর এই যুলুম প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়েছিলো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনকে। আফ্রিকার নিগ্রোদেরকে ধরে এনে যখন আমেরিকার ধনকুবেররা অসহায় দাসে পরিণত করছিলো এবং স্থানীয় নিগ্রোদেরকে যখন তারা অন্যান্য আমেরিকানদের মতো নাগরিক স্বাধীনতা দিচ্ছিলো না তখন আব্রাহাম লিংকন উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, 'Man was born free; but everywhere he is in chains. 'আর কেয়ামতের দিনে ওই দেব দেবীদের সম্পর্কে এই আইন প্রনেতা বিধান দাতা নেতাদের সম্পর্কে ওরা বলবে না যে, ওরা আল্লাহর শরীক, বরং বলবে 'ওরা আমাদের শরীক' অর্থাৎ আমরা আমাদের অন্ধত্বের কারণে ওদেরকে আল্লাহর শরীক বলে মনে করতাম... সে দিন কিন্তু ওইসব শরীকরা অর্থাৎ ওইসব ধর্ম যাজক বা সমাজপতিরা যারা মানুষকে ভুলের মধ্যে রেখে তাদের কাছ থেকে অন্ধভাবে তাদের আনুগত্য করতে বাধ্য করতো এই মারাত্মক ধোঁকাবাজি করার অপরাধে লিপ্ত থাকার কথা স্মরণ করে ভয়ে কাঁপতে থাকবে।

কেয়ামতের ওই কঠিন দিনে তারা মুখোমুখি হবে তাদের ওইসব অন্ধভক্ত দাসদের; যারা সেদিন সকল ভয়ের উর্ধে উঠে যাবে এবং তাদের মুখের ওপর কথা ছুড়ে দিয়ে তারা বলে উঠবে, 'তোমরা, অবশ্যই তোমরা মহামিথ্যাবাদী।'

এসময় তারা আল্লাহর দিকে মুখ করে আত্মসমর্পণ করবে এবং অনুনয় বিনয় করতে থাকবে। এরশাদ হচ্ছে,

'তারা সেদিন আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং তাদের উদ্ভাবিত সকল কথা সেদিন নিষ্ফল হয়ে যাবে।'

অর্থাৎ মোশরেকরা তাদের এইসব মনগড়া কাজ কর্মের কারণে এমন কোনো কিছুর অধিকারী হবে না, যার বিনিময়ে সেই কঠিন দিনে তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে। এরশাদ হচ্ছে,

'সেদিন সে সব কিছু নিষ্ফল হয়ে যাবে যা কিছু মনগড়া ও মিথ্যা তারা তৈরী করে বলতো এবং অনুসরণ করতো। .... এ কথার ওপর এখানে আলোচনা শেষ হচ্ছে যে, কুফরী যারা করেছিলো অপরকে কুফরী করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো এবং মানুষকে সত্যপথ গ্রহণ করায় বাধা দিয়েছিলো তাদেরকে দ্বিগুন আযাব দেয়া হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'যারা কুফুরী করেছিলো আর মানুষকে আল্লাহর পথে আসা থেকে বাধা দিয়েছিলো, উপর্যুপরি আযাব দিয়ে তাদের কষ্ট আরো বাড়িয়ে দেবো, যেহেতু তারা (পৃথিবীর বুকে) বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করতে থেকেছে।'

অর্থাৎ, কুফুরী করা অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাস অথবা তার আইন বাদ দিয়ে নিজেরা আইন তৈরী করে মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া-ই হলো সবচেয়ে বড়ো ফাসাদ বড়ো কুফরী, এই কুফুরীই হলো সকল বিশৃংখলা ও অশান্তির মূল–এ বিষয়ে যে কোনো চিন্তাই একটি বিপর্যয়, আর এহেন বিশ্বাসের গোলমালের কারণে তারা বাস্তবে বহু কুফরী কাজে লিপ্ত রয়েছে, যার ফল শুধু অশান্তিই অশান্তি এবং এটাই এক বিরাট অপরাধ। দ্বিতীয় অপরাধটি হচ্ছে অপরকে হেদায়াতের পথ থেকে সরিয়ে রাখা–এজন্যে তাদেরকে বহুগুণ বেশী আযাব দেয়া হবে। সকল জনপদের জন্যেই এটা সাধারণ অবস্থা। অর্থাৎ, যে কোনো ব্যক্তি ওপরে বর্ণিত মতে অন্যায় কাজ করবে তাদের সবার অবস্থা একই হবে।

তারপর রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে তাঁর জাতির ব্যবহারকে কেন্দ্র করে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো সেই অবস্থাটাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর সেই দিনকে স্মরণ করা দরকার যে দিন আমি, আল্লাহ তায়ালা, প্রত্যেক জাতির মধ্য থেকে একজন সাক্ষ্য দানকারীকে......... রহমত এবং সকল মুসলমানের জন্যে যা সুসংবাদ দানকারী।' (আয়াত ৮৯)

এখানে মোশরেকদের যে পরিণতির কথা উল্লেখিত হয়েছে তার আলোকে এবং কেয়ামতের ওই ভয়ংকর দিনে তখন কাফেররা তাদের অলীক দেব-দেবী বা সমাজ পতিদের কাছ থেকে সকল প্রকার সম্পর্ক মুক্তির ঘোষণা দেবে, সেই অবস্থার প্রেক্ষাপটে এবং যখন ওই সব ব্যক্তিত্ব যাদের আল্লাহর সাথে শরীক করা হতো, তারা যখন এই অপরাধের ব্যাপারে তাদের অজ্ঞতার কথা জানাবে তখনকার করুণ ও অসহায় অবস্থাকে সামনে রেখেই মক্কার কোরায়শদের সাথে রসূলুল্লাহ (স.)-এর অবস্থাকে পরিমাপ করা হয়েছে, যেদিন প্রত্যেক উম্মত থেকেই একজন

সাক্ষ্যদানকারীকে বের করে আনা হবে, অর্থাৎ, সময় মতোই এ অবস্থা তার সকল বিভীষিকা নিয়ে হাযির হয়ে যাবে, আর একই সময়ে

'হে রসূল, তোমাকেও আনা হবে জাতির ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে।'.......

এরপর জানানো হচ্ছে যে, যে কেতাব রসূলের কাছে এসেছে,

'তা সব কিছুর ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যাদানকারী।'.......

অতএব, এ কেতাব নাযেল হওয়ার পর আর কারো কোনো তর্কবিতর্ক করার সুযোগ নেই এবং কোনো ব্যক্তির কোনো ওযর ওজুহাত দেখানোর মতোও কোনো অবকাশ নেই,

কারণ 'মুসলমানদের জন্যে এ কেতাব হেদায়াত ও রহমত' অতএব হেদায়াত ও রহমত যে পেতে চাইবে তার প্রথম কাজ হচ্ছে, ওই কঠিন ও ভয়ংকর দিন আসার পূর্বেই আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে তাঁর হুকুম মতো জীবন যাপন করা।.......

আর এইভাবে কোরআন মজীদে, আলোচ্য বিষয়টিকে যথাযথভাবে হৃদয়গ্রাহী করার জন্যে কেয়ামতের দৃশ্যাবলী তুলে ধরা হচ্ছে, যেন এ দৃশ্যাবলীর বিবরণ বাস্তব ছবির মতো মানুষের অন্তর্দৃষ্টিতে ফুটে উঠে তাকে সত্যের দিকে এগিয়ে দিতে পারে। এরপর আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দেয়া জীবন বিধানের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক কথাগুলোকে সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা হুকুম দিচ্ছেন ন্যায়বিচার ও এহসান করার জন্যে। তিনি আরো হুকুম দিয়েছেন আত্মীয়স্বজনকে দান করার জন্যে। আর নিষেধ করছেন লজ্জাকর, অপ্রিয় এবং বিদ্রোহাত্মক কাজ করতে।....... (সেই দিনের কথা স্মরণ করা দরকার) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি একমাত্র নিজের ব্যাপারেই আবেদন নিবেদন করতে থাকবে। সে দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মেরই ফল যথাযথভাবে দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনো প্রকার যুলুম করা হবে না।' (আয়াত ৯০-১১১)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

রুকু ১৩

৯০. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয় স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎ কাজকর্ম ও সীমালংঘনজনিত সব কাজ থেকে নিষেধ করেন, তিনি তোমাদের (এগুলো মেনে চলার) উপদেশ দেন, যাতে করে তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো। ৯১. যখন তোমরা (নিজেদের মধ্যে) আল্লাহর নামে কোনো অংগীকার করো, তখন তা পূর্ণ করো এবং (একবার) এ (শপথ)-কে পাকাপোক্ত করে নেয়ার পর তা ভংগ করো না, কেননা (এ শপথের জন্যে) তোমরা আল্লাহকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা জানেন তোমরা (কখন কোথায়) কি করো। ৯২. তোমরা কখনো সেই নারীর মতো হয়ো না, যে অনেক পরিশ্রম করে নিজের (জন্যে কিছু) সুতা কাটলো, কিন্তু পরে তা (নিজেই) টুক্‌রো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো; তোমরা তো তোমাদের পারস্পরিক ব্যাপারে (নিজেদের) শপথগুলো ধোকা প্রবঞ্চনার উদ্দেশে ব্যবহার করো, যাতে করে (তোমাদের) এক দল আরেক দল থেকে অগ্রগামী হয়ে যেতে পারে; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়টি দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা নেন মাত্র; (তা ছাড়া) তোমরা যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করছো, কেয়ামতের দিন অবশ্যই তিনি তা (সবার সামনে) প্রকাশ করে দেবেন। ৯৩. আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন তাহলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি বানিয়ে দিতে পারতেন, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে বিভ্রান্ত করেন আবার যাকে ইচ্ছা তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন; তোমরা কি করতে সে সম্পর্কে তোমাদের অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে।

وَلَا تَتَّخِذُوٓا أَيۡمَٰنَكُمۡ دَخَلَۢا بَيۡنَكُمۡ فَتَزِلَّ قَدَمُۢ بَعۡدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۖ وَلَكُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَشۡتَرُوا بِعَهۡدِ ٱللَّهِ ثَمَنٗا قَلِيلًاۚ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٩٥﴾ مَا عِندَكُمۡ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٖۗ وَلَنَجۡزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُوا يَعۡمَلُونَ ﴿٩٦﴾ مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُوا يَعۡمَلُونَ ﴿٩٧﴾ فَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُۥ لَيۡسَ لَهُۥ سُلۡطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلۡطَٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوۡنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشۡرِكُونَ ﴿١٠٠﴾

৯৪. তোমরা তোমাদের শপথগুলো পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার উদ্দেশে গ্রহণ করো না, (এমন করলে মানুষের) পা একবার স্থির হওয়ার পর পুনরায় পিছলে পড়ে যাবে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষদের বাধা দেয়ার কারণে (এ দুনিয়ায়ও) তোমাদের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, আর (আখেরাতেও) তোমাদের জন্যে থাকবে কঠোর আযাব। ৯৫. তোমরা আল্লাহর (নামে) অংগীকারকে (দুনিয়ার) সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়ো না; (সততা ও বিশ্বস্ততার পুরস্কার) যা আল্লাহর কাছে আছে তা তোমাদের জন্যে অনেক উত্তম, যদি তোমরা জানতে! ৯৬. যা কিছু (সহায় সম্পদ) তোমাদের কাছে আছে তা (একদিন) নিশেষ হয়ে যাবে, অপরদিকে আল্লাহর কাছে (এর) যা (বিনিময়) আছে তা (হামেশাই) বাকী থাকবে; (সে আশায়) যারা ধৈর্য ধারণ করেছে এবং (ভালো কাজ) করেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাদের (সেসব) কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেবেন। ৯৭. (তোমাদের) পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যে ব্যক্তিই কোনো নেক কাজ করবে এমতাবস্থায় যে, সে হবে যথার্থ মোমেন, তাহলে অবশ্যই তাকে আমি দুনিয়ার বুকে পবিত্র জীবন যাপন করাবো এবং আখেরাতের জীবনেও তাদের (দুনিয়ার) জীবনের কার্যক্রমের অবশ্যই উত্তম বিনিময় দান করবো। ৯৮. অতপর তোমরা যখন কোরআন পড়তে শুরু করবে তখন বিতাড়িত শয়তানের (ওয়াসওয়াসা) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। ৯৯. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং (যাবতীয় কার্যকলাপে) তাদের মালিকের ওপর ভরসা করে, তাদের ওপর (শয়তানের) কোনোই আধিপত্য নেই। ১০০. তার সব আধিপত্য তো তাদের ওপরই (চলে), যারা তাকে বন্ধু (ও অভিভাবক) হিসেবে গ্রহণ করেছে, (উপরন্তু) যারা তাঁর (আল্লাহর) সাথে শরীক করেছে।

وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۙ وَّاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ

مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (১০১) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ

بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَّبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (১০২) وَلَقَدْ

نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۚ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ

أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ (১০৩) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ اللَّهِ ۙ

لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (১০৪) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ

لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْكَٰذِبُونَ (১০৫) مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنۢ

بَعْدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ

بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (১০৬) ذَٰلِكَ

রুকু ১৪

১০১. (হে নবী,) আমি যখন এক আয়াত পরিবর্তন করে তার জায়গায় আরেক আয়াত নাযিল করি– (অথচ) আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেন তা তিনি ভালো করেই জানেন– তখন তারা বলে, তুমি তো এগুলো এমনিই নিজ থেকে বানিয়ে নিচ্ছো; (আসলে) তাদের অধিকাংশ মানুষই (আল্লাহর সূক্ষ্ম রহস্য) জানে না। ১০২. তুমি তাদের বলো, হাঁ এ (কোরআন)-কে জিবরাঈল (ফেরেশতা) তোমার মালিকের কাছ থেকে ঠিকভাবেই নাযিল করেছে, যাতে করে যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে তাদের তিনি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, (সর্বোপরি) এটা যেন হয় অনুগত বান্দাদের পথনির্দেশ ও (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী। ১০৩. (হে নবী,) আমি ভালো করেই জানি (এরা তোমার ব্যাপারে কি বলে), এরা বলে, এ (কোরআন) তো একজন মানুষ (এসে) এ ব্যক্তিকে পড়িয়ে দিয়ে যায়; (অথচ) যে ব্যক্তিটির দিকে এরা ইংগিত করে তার ভাষা আরবী নয়, আর এ (কোরআন) হচ্ছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষা। ১০৪. (আসল কথা হচ্ছে,) যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তায়ালাও তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না, আর তাদের জন্যেই মর্মান্তিক আযাব রয়েছে। ১০৫. নিজের পক্ষ থেকে কথা বানানো (কখনো নবীর কাজ হতে পারে না, বরং এটা) হচ্ছে তাদের কাজ, যারা আল্লাহর আয়াতের ওপর ঈমান আনে না, (আসলে) এরাই হচ্ছে মিথ্যাবাদী। ১০৬. যে ব্যক্তি একবার ঈমান আনার পর কুফরী করে, যদি তাকে (কুফরী বাক্য উচ্চারণ করতে) বাধ্য করা হয়, অথচ তার অন্তর ঈমানের ওপরই সন্তুষ্ট থাকে (তাহলে আল্লাহ তায়ালা তা হয়তো মাফ করে দেবেন), কিন্তু যে তার অন্তরকে কুফরীর জন্যে (সদা) উন্মুক্ত করে রাখে তাদের ওপর আল্লাহর গযব, তাদের জন্যেই রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ১০৭. এটা এ জন্যে যে, তারা

بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠٧﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٠٨﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٠٩﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْا ۙ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٠﴾ يَوْمَ تَأْتِى كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١١١﴾

দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা কখনো কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না। ১০৮. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের অন্তরে, (যাদের) কানে ও (যাদের) চেখের ওপর আল্লাহ তায়ালা সিল এঁটে দিয়েছেন, (আসলে) এরা সবাই (ভয়াবহ আযাব সম্পর্কে) গাফেল। ১০৯. নিশ্চয়ই ওরা আখেরাতে (ভীষণ) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ১১০. (এর বিপরীত) যারা (ঈমানের পথে) নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, অতপর (আল্লাহর পথে) জেহাদ করে এবং (বিপদে) ধৈর্য ধারণ করে (হে নবী), অবশ্যই তোমার মালিক এ (পরীক্ষা)-র পর তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (হবেন)।

রুকু ১৫

১১১. (স্মরণ করো,) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করতে (এগিয়ে) আসবে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই (কানাকড়ি হিসাব করে) তার কৃতকর্মের প্রতিফল আদায় করে দেয়া হবে এবং তাদের (কারো) ওপর কোনো রকম অবিচার করা হবে না।

তাফসীর

আয়াত-৯০-১১১

পেছনের আলোচনাটি শেষ হলো একথার ওপর যে, 'আমি, নাযেল করেছি তোমার কাছে আল কেতাব (যা লিখিত রয়েছে সপ্ত আকাশের ওপরে চিরস্থায়ী ফলকে) যা সবকিছুর ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত কেতাব (হিসাবে দুনিয়া বিলীন না হওয়া পর্যন্ত চিরদিন অবিকৃত অবস্থায় সুরক্ষিত থাকবে) এবং এ কেতাব হেদায়াত রহমত ও মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ দানকারী।'

আলোচ্য এই অধ্যায়টিতে হেদায়াত রহমত ও সুসংবাদ দিতে গিয়ে যে বিস্তারিত বিবরণ এই আল কেতাবে এসেছে তার কিছু অংশ পেছনের অধ্যায়টিতেও আলোচিত হয়েছে। আর বর্তমান অধ্যায়ে এসেছে কিছু কিছু বিবরণ, হেদায়াত রহমত ও সুসংবাদ সম্পর্কিত কিছু কথা, ন্যায় বিচার, এহসান ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করা সম্পর্কিত নির্দেশ এবং লজ্জাকর কাজ ও ব্যবহার, অপ্রিয়

আচরণ ও বিদ্রোহাত্মক ব্যবহার করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা। এর মধ্যে আরো এসেছে ওয়াদা পূরণ করার নির্দেশ এবং পাকাপাকিভাবে চুক্তি করা হলে তা পূরণ করার হুকুমও এসেছে, আর অবশ্য অবশ্যই এ গুণগুলো সেসব প্রধান ও মৌলিক নীতি যা মানুষের মধ্যে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই আল কেতাব নাযেল হয়েছে।

আর এর মধ্যে রয়েছে চুক্তি ভংগের জন্যে নির্ধারিত শাস্তির বিবরণ ধোকা দেয়া ও বিভ্রান্ত করার জন্যে কসম খাওয়া হলে তার শাস্তির কথা, আর তা হবে অবশ্যই বড় কঠিন শাস্তি। অপরদিকে, যারা বিপদ আপদে সবর করেছে অবিচল থেকেছে এবং সদাসর্বদা আত্মসংযম করেছে তাদের জন্যে রয়েছে মহা সুসংবাদ তাদের কৃতকর্মের উচিত পাওনা থেকেও তাদেরকে অধিক ও উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে।

এরপর এ পবিত্র কেতাব পাঠ করার জন্যে কিছু আদব-কায়দা শেখানো হয়েছে, আর তা হচ্ছে–আল কোরআন যখন পড়া হবে তখন যেন মরদূদ শয়তানের ধোকা থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া হয়, যাতে করে কোরআনুল কারীম যেখানে পাঠ করা হয় সেখানে শয়তান কোনো প্রকার বাঁধা সৃষ্টি করতে না পারে, যেমন এ কেতাব সম্পর্কে কোনো কোনো মোশরেক ব্যক্তি কিছু কিছু বিভ্রান্তিকর উক্তি করেছে। ওদের মধ্যে কেউ কেউ রসূলুল্লাহ (স.) কে দোষারোপ করছে ও এই বলে গালি দিচ্ছে যে, তিনি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মন গড়া কথা বলছেন, অর্থাৎ যা তিনি বলছেন তা আল্লাহর কথা নয়, বরং সেগুলো হচ্ছে তার নিজের মন থেকে বানানো কথা, আবার কেউ কেউ এমন কথাও বলছে যে, একজন অনারব ছেলে তাকে এ কোরআন শিক্ষা দিচ্ছে। এ পাঠের শেষের দিকে যারা ঈমান আনার পর কুফুরী করবে তাদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তবে কোনো ব্যক্তিকে কুফুরী করার জন্যে যদি বাধ্য করা হয় এবং তার অন্তর যদি ঈমানের মহব্বতে পরিপূর্ণ থাকে, অথবা দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করার কারণে যদি কোনো ব্যক্তি নানা প্রকার যুলুম ও বিপদ আপদের সম্মুখীন হয়, আর এ কারণে যদি তারা হিজরত করে ও আল্লাহর পথে টিকে থাকতে গিয়ে তাকে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করতে হয়, তাহলে অবশ্যই তাকে যথাযথ পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। এগুলো সবই দৃষ্টান্ত হেদায়াত, রহমত মুসলমানদের জন্যে এক মহা সুসংবাদ। পরবর্তী অধ্যায়ে এরশাদ হয়েছে,

সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর নির্দেশ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা হুকুম দিচ্ছেন সুবিচার করতে, এহসান করতে এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করতে, আর নিষেধ করছেন লজ্জাকর কাজ করতে, বর্জন করতে সেসব কাজ যা আল্লাহ ও সকল মানুষের কাছে অপ্রিয় এবং নিষেধ করছেন বিদ্রোহাত্মক কাজ করতে....... আর আল্লাহ তায়ালা চাইলে অবশ্যই তোমাদেরকে একটি মাত্র জাতিতে পরিণত করতে পারতেন, কিন্তু (তিনি তা চাননি, বরং) তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি সঠিক পথ দেখান। আর অবশ্যই তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ওই সব বিষয়ে যা তোমরা (পৃথিবীর বুকে) করতে।

অবশ্যই এই মহান কেতাব এক স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত জাতি গড়ে তুলতে চেয়েছে, চেয়েছে একটি সুগঠিত সমাজ গড়তে যাতে শান্তিপূর্ণ এক নতুন জগত এবং অনবদ্য ও সুন্দর এক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় এ পাক কালাম বিশ্বজনীন এক দাওয়াত নিয়ে এসেছে, যেখানে গোত্রে গোত্রে হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না। থাকবে না, অপরকে ছোটো করে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্যে জাতিতে জাতিতে হানাহানি। সঠিক আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে সেখানে গড়ে উঠবে পরিবার, গোত্র, দল ও সমাজ, এ আকীদার কারণেই মানুষে মানুষে সম্পর্ক, জাতীয়তা এবং আত্মীয়তা গড়ে উঠবে।

এই লক্ষ্যেই এমন সব মূলনীতি এসেছে যা দলীয় সংহতি ও সম্প্রীতি নিশ্চিত করেছে এবং এ কেতাবের মাধ্যমেই এক দলের সাথে অপর দলের সহ অবস্থান ও পারস্পরিক হৃদ্যতাপূর্ণ যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে গোত্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লেনদেনের মধ্যে ওয়াদা ও আস্থার বিনিময় হয়েছে।

এ ব্যবস্থা এক 'সুবিচার' ও ভারসাম্যপূর্ণ মূলনীতি নিয়ে এসেছে, যার কারণে ব্যক্তি, গোত্র, দল ও সমাজের মধ্যে এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি সেথায় তার ন্যায্য অধিকার ও স্বাধীনতা পুরোপুরিই ভোগ করে, সেখানে স্বেচ্ছাচারিতা ও কুপ্রবৃত্তির তাড়নে অপরের অধিকার নষ্ট করার মতো কোনো সুযোগ নেই, হিংসা-বিদ্বেষের কারণে বংশীয় সম্প্রীতি ও আত্মীয়তা নষ্ট হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই। আল্লাহর মহব্বতে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের অভিলাসে সেখানে নির্দিষ্ট এক নীতি মেনে চলা হয় এবং মানুষে মানুষে ইনসাফ গড়ে ওঠে।

আবার খেয়াল করে দেখুন, ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহারের সাথে সাথেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে অপরের সাথে এহসানপূর্ণ ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এহসান বলতে বুঝায়, যার যা ন্যায্য পাওনা তাকে সেটা পুরোপুরি বুঝিয়ে দিয়ে মহব্বতের সাথে তাকে আর একটু বেশী দেয়া এবং এতোটা বেশী দেয়া যেন গ্রহীতা দাতার মহানুভবতা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে, এর ফলে গ্রহীতার হৃদয়ে দাতার জন্যে মহব্বতের দীর্ঘস্থায়ী এক ছাপ পড়ে, যা সে সহজে ভুলতে পারে না এবং যে কোনোভাবে এ সদ্ব্যবহার ও সহৃদয়তার কিছু না কিছু বিনিময় দেয়ার জন্যে তার হৃদয় উদগ্রীব হয়ে থাকে, তাই দেখা যায় এহসান মানুষে মানুষে রেষারেষির দ্বার রূদ্ধ করে দেয় এবং শয়তানের প্ররোচণায় পড়ে অপরকে ঠকিয়ে বা অপরকে ছোট করে নিজে বেশী পাওয়া বা নিজের স্থানকে সংহত করার প্রবণতা দমে যেতে বাধ্য হয়, প্রকারান্তরে এহসান অন্তরের ব্যাধির জন্যে এক মিষ্টি দাওয়াই হিসবে কাজ করে। সুতরাং, যে কোনো ব্যক্তি অন্তরের ক্ষত বা রোগ ব্যাধির নিরাময় চায় অথবা মানুষের হৃদয়ের আসনে নিজের আসনকে নিশ্চিত করতে চায় সে অবশ্যই যেন কিছু না কিছু এহসান করে, অর্থাৎ বস্তু বা ব্যবহার দিয়ে মানুষকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় যেন কিছু বেশী দেয়।

অবশ্য ওপরে বর্ণিত অর্থের চাইতে এহসানের অর্থ আরো অনেক ব্যাপক, যেমন প্রতিটি ভাল ও পবিত্র কাজই এহসান (যার দ্বারা মানুষের কিছু না কিছু উপকার হয়) তার এহসানের নির্দেশ দান বলতে প্রত্যেক ওই কাজ ও লেনদেন করার হুকুমকে বুঝায় যা সুদীর্ঘ এ জীবনের সবটুকু অংশের মধ্যে পরম করুণাময় আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ককে ঘনিষ্ট করে তোলে, পরিবারের মধ্যে সম্প্রীতি বাড়ায়, দলীয় জীবনে সংহতি আনে এবং মানব জীবনের বৃহত্তর পরিসরে আনে উদারতা ও মহানুভবতা। (১)

---

(১) কোনো কোনো তাফসীরে বলা হয়েছে, 'আদল' হচ্ছে কর্তব্য পালন, অর্থাৎ যার যা ন্যায্য পাওনা তাকে তা বুঝিয়ে দেয়া এবং নিজের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা, আর এহসান হচ্ছে নফল বা অতিরিক্ত কাজ বা ব্যবহার যা যে কোনো মানুষের হৃদয়কে ও সকল মানুষের যিনি মালিক তাকে সন্তুষ্ট করে। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, যে এ আয়াতটি হচ্ছে মক্কী জীবনে অবতীর্ণ, এসময়ে আইন কানুন সংক্রান্ত কোনো আয়াত বা সূরা নাযেল হয়নি, যেহেতু আইন চালু করার মতো কোনো ক্ষমতা তখন নবী (স.)-এর হাতে আসেনি। অবশ্য 'আদল' এবং এহসান শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় বলে ব্যক্তিগত জীবনের লেনদেন ও ব্যবহার সবই এর দুই শব্দের আওতায় এসে যায় এবং শুধু আইন কানুনের অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না।—সম্পাদক

আর আত্মীয়স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহারও এহসানের আওতাভুক্ত। কিন্তু এখানে পৃথকভাবে আত্মীয়স্বজনদের কথা বলায় আত্মীয়তার বিষয়টি আরো বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, পারিবারিক বন্ধনকে অটুট রাখার জন্যে আত্মীয়তার সম্পর্ককে অবশ্যই টিকিয়ে রাখতে হবে এবং বিপদ-আপদে তাদের প্রতি দানের হাত প্রসারিত করতে হবে। এ আয়াতে এ ইংগিতও দেয়া হয়েছে যে মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব রয়েছে এবং পারিবারিক পরিবেষ্টনী থেকে নিয়ে, ধীরে ধীরে এ দায়িত্ববোধকে সাধারণভাবে সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আর এটাও স্পষ্ট যে ইসলামী সমাজের সকল সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক এ দায়িত্ব বোধ গড়ে তোলার জন্যে এ কথাটা আল কোরআনে নির্দেশ আকারে এসেছে, যেন চিরদিন ইসলামী সমাজে এ মহান ভাবধারা চালু থাকে এবং অবশ্য ও অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে মানুষ এ হুকুমটি পালন করে। বস্তুত এই এহসান হচ্ছে ইসলামী সমাজের সৌন্দর্য ও সংহতি বিকাশে এক রক্ষা করত।(১) (সূরায়ে রা'দ এর ১৯ ও ২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'ঐ ব্যক্তি যে জানে যে তোমার রবের কাছ থেকে যা কিছু নাযেল হয়েছে তা সবই সত্য সেই ব্যক্তি কি কোনো অন্ধ ব্যক্তির মতো, (অর্থাৎ জ্ঞানান্ধ ব্যক্তির সমান) হতে পারে? অবশ্য অবশ্যই সকল বুদ্ধিমানেরাই শিক্ষা গ্রহণ করে যারা আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি পূরণ করে এবং কোনো ওয়াদা ভংগ করে না এবং আল্লাহ তায়ালা পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে যে সম্পর্ক সম্বন্ধে স্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করে ......। (আয়াত ১৯-২০)

লজ্জাকর ও অপ্রিয় কাজের প্রতি নিষেধাজ্ঞা

'আর তিনি নিষেধ করছেন লজ্জাকর কাজ, অপ্রিয় ব্যবহার ও বিদ্রোহাত্মক কাজ করতে।' .... লজ্জাকর কাজ বলতে ওই সকল কাজকে বুঝানো হয়েছে যা মানুষের মনের মধ্যে লজ্জা ও ঘৃণার অনুভূতি জাগায় অথবা যেসব কাজ ও ব্যবহার সীমা অতিক্রম করে। এরমধ্যে সম্ভবত এখানে ঘৃণা করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাকে বুঝানো হয়েছে কারণ মানুষ যখন কাউকে ঘৃণা করতে গিয়ে মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলে অথবা কারো পক্ষ অবলম্বন করতে গিয়ে বা কাউকে ভালবাসতে গিয়ে যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তার ওই কাজ বা ব্যবহারের জন্যে তাকে ভীষণ লজ্জিত হতে হয়। এহেন কাজও ব্যবহারকেই আল কোরআন ফাহেশা বলে অভিহিত করেছে। আর মুনকার হচ্ছে এমন সব আচরণ যাকে মানুষের প্রকৃতি (বিবেক বুদ্ধি) প্রত্যাখ্যান করে, আর এ কারণে ইসলামী শরীয়া (বিধান) ও তাকে ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য বলে বর্জন করেছে,-এখানে সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেলো, প্রত্যেক বিবেক-বিরোধী কাজই শরীয়ত কর্তৃক পরিত্যাক্ত হয়েছে। আর কখনও এমন দেখা যায় যে, শরীয়তের কোনো কোনো বিধানকে যেন সাধারণ মানব প্রকৃতি মেনে নিতে পারে না বলে মনে হয়, সে অবস্থাতেও শরয়ী বিধানকেই দৃঢ়তার সাথে মানতে হবে, তার ফলে দেখা যাবে তথাকথিত প্রকৃতি শরয়ী বিধানের অনুসরণে মানুষের মূল প্রকৃতির দিকে ফিরে যাবে (যা তার অস্থিমজ্জার মধ্যে মিশে আছে)। আর বিদ্রোহ হচ্ছে যুলুম, সত্য ও ন্যায়নীতি বিরুদ্ধ পদক্ষেপ বা তৎপরতা। এমন কোনো সমাজ নেই যা লজ্জাকর কাজ, অন্যায় ও বিদ্রোহাত্মক কাজ বা যুলুম করা সত্তেও মযবুতভাবে গড়ে উঠতে পেরেছে এবং এমন কোনো সমাজ নেই যা নিন্দনীয়, অন্যায় ও যুলুম করার পরও শেষ পর্যন্ত টিকে থেকেছে।

---

(১) দেখুন, 'দেরাসাতুল ইসলামিয়াহ' নামক কেতাবের মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক দায়িত্ববোধ নামক অধ্যায়।

এ ধরনের অন্যায় ও যুলুম চলতে থাকলে নির্দিষ্ট একটি সময়ের পর অবশ্যই এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়, মানব প্রকৃতি এমন প্রশাসন বা যুলুমবাজ মানুষকে আর মেনে নিতে পারে না, বিক্ষোভ দানা বেধে উঠে, আসে গণজাগরণ এবং অন্যায় অবিচার ও যুলুমের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটে। এরকম যুলুম চলতে থাকলে কোনো সাম্রাজ্য বা রাষ্ট্র যত বড়ই হোক না কেন, তা অচিরেই তছনছ হয়ে যায় এবং মানুষের মানসপটে অতীতের স্মৃতি হিসাবে থেকে যায়। সুতরাং, বুঝা যাচ্ছে প্রত্যেক ধ্বংসের জন্যে রয়েছে এমন এক কারণ যা প্রত্যেক জীবন্ত মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করে। এই জন্যে আল্লাহ তায়ালা সুবিচার ও এহসান করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর নিষেধ করেছেন অন্যায় অবিচার ও যুলুম করতে। এই হচ্ছে মানব জীবনের জন্যে সঠিক প্রকৃতি সংগত বিধান, আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে থাকা এই শক্তিকেই শক্তিশালীও চাংগা করে তুলেছেন এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে অন্যায় অবিচার ও যুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শিক্ষা দিয়েছেন। এই কারণেই এরপর বলা হয়েছে,

'তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।' মানুষকে তার কর্তব্য স্মরণ করানোর জন্যে এ উপদেশ, এ উপদেশ এসেছে মানুষের অন্তরের মধ্যে এক প্রকার ওহী আকারে।

ওয়াদা ও চুক্তি রক্ষায় ইসলামের কঠোরতা

এরপর আলোচনা এসেছে চুক্তিরক্ষা ও ওয়াদা পালন প্রসংগে এরশাদ হচ্ছে,

'আর, যখনই আল্লাহর সাথে কেউ কোনো চুক্তি করবে, তা পূরণ করে তা অবশ্যই যেন পূরণ করো এবং পাকাপাকিভাবে কোনো কসম খেলে তা কখনও ভংগ করো না কারণ তোমরা তো আল্লাহকেই তোমাদের পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে গ্রহণ করেছ। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা জানেন যা তোমরা করে চলেছো।'

রসূল (স.)-এর হাতে মুসলমানদের বাইয়াত করা আল্লাহর সাথে করা চুক্তিসমূহের একটি। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা মানুষের ভালোর জন্যে যা কিছু নির্দেশ দিয়েছেন, তা সবই এই চুক্তির অন্তর্গত। মানুষের মধ্যে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এসব বিভিন্ন চুক্তিই মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে। লেনদেনের ক্ষেত্রে এসব বিশ্বস্ততা মানুষের মধ্যে না থাকলে কোনো সমাজই টিকে থাকতে পারতো না এবং কোনো মানুষেরও অস্তিত্ব থাকতো না। আর আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার বাণী কঠিনভাবে ওয়াদাকারীদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছে, যেন পাকাপাকি ওয়াদা করার পর কোনো অবস্থাতেই তা ভংগ না করা হয়, অথচ তারা তো আল্লাহকে তাদের কসমের যামীন হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং তাদের ওয়াদার ব্যাপারে আল্লাহকেই তারা সাক্ষী মেনেছে। তারা ওয়াদা পূরণ করবে বলে আল্লাহকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করেছে। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মৃদুভাবে তিরস্কার করতে গিয়ে বলছেন,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন যা তোমরা করছো।'

ওয়াদা পূরণ করার ব্যাপারে ইসলাম অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেছে, কোনো অবস্থাতেই ইসলাম ওয়াদা ভংগকারীকে ক্ষমা করেনি। কারণ লেনদেনের মূল বুনিয়াদই হচ্ছে এই ওয়াদা। এটাই যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে লেনদেনের বুনিয়াদই ধ্বসে যাবে, যার ফলে মানুষে মানুষে আদান-প্রদানের মনমানসিকতা সম্পূর্ণভাবে বিগড়ে যাবে এবং এরপর ইচ্ছা ও উপায় থাকলেও কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না। এমতাবস্থায়, দলীয় জীবনের বন্ধন শুধু শিথিলই হয়ে যাবে তা নয়, বরং এ বন্ধন সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এ প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে

কোরআনে কারীম ওয়াদা পূরণ করার নির্দেশ দান করছে এবং ওয়াদা খেলাফীকে নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি, এটাকে এক নৈতিক দায়িত্ব হিসাবে চিহ্নিত করেছে, ওয়াদা ভংগকে এক চরম নিন্দনীয় ও কদর্য আচরণ বলে আখ্যা দিয়েছে এবং ঐসব বাজে ওজুহাত পেশ করতে কড়াকড়িভাবে নিষেধ করেছে যা সাধারণভাবে মানুষ পেশ করে থাকে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তোমরা ওই সব মহিলার মতো হয়ো না, যে নিজে হাতে সূতাকাটার পর তা নিজেই ছিঁড়ে ফেলে দেয়',

অর্থাৎ তোমরা ওই মহিলার মতো হয়ো না যে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সারা দিন সুতা কেটেছে, তারপর সে নিজেই তা ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে।

'তোমরা তোমাদের কসমগুলোকে একে অপরকে ধোকা দেয়ার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছো–যেন এক দল অপর দলের ওপর আর্থিক দিক দিযে বেশী লাভবান হতে পারো। অথচ আল্লাহ তায়ালা তো এই ওয়াদা পূরণ করার মাধ্যমে তোমাদের (ঈমান)কে পরীক্ষা করছেন, আর অবশ্যই কেয়ামতের দিন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন সেসব বিষয়ে, যা নিয়ে তোমরা পৃথিবীর বুকে মতভেদ করতে।'

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ওয়াদা ভংগ করে সে হচ্ছে সেই নির্বোধ, অপরিনামদর্শী, দুর্বলচেতা স্ত্রী লোকের মতো, যে বহু পরিশ্রম করে সূতা কাটে, তারপর নিজেই তা ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলে দেয়। এমনভাবে সেগুলোকে সে ছিঁড়ে ফেলে যে তা আর কোনো কাজে লাগে না। এরপর যখন দেখে তার এতো কষ্টলব্ধ সূতাগুলো কোনো কাজেই লাগলো না তখন তার কৃত কর্মকে স্মরণ করে চরমভাবে দুঃখিত হয় এবং আফসোস করতে থাকে, কিন্তু তার কষ্ট বাড়ানো ছাড়া তার এই আফসোস আর কোনো কাজে লাগে না। চিন্তা করে দেখুন অবশ্যই কোনো সুরুচিসম্পন্ন, আত্ম সম্ভ্রমশীল, বুদ্ধিমান ও সময় সচেতন ব্যক্তি ওই অস্থির মতি বেওকুফ স্ত্রীলোকের মতো নিজের সমস্ত শ্রমকে পন্ড করে দিতে পছন্দ করবে না যে সারা জীবন সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে এবং নিজের পরিশ্রমের সঠিক ফল পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে থাকে।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর সময় কোরায়শদের মধ্যে এ ধরনের কিছু লোক ছিলো যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে কৃত চুক্তি ভংগ করা ও ওয়াদা খেলাফী করাকেই বাহাদূরী মনে করতো এবং এমন একটা ধৃষ্টতাপূর্ণ ব্যবহার করতে পেরে মনে করতো তারা বুঝি একটা সাফল্য অর্জন করে ফেলেছে, তারা মনে করতো, মোহাম্মদ ও তার সংগীরা তো দুর্বল, তাদের সাথে কোনো ওয়াদা ভংগ করলে তারা কোনোই ব্যবস্থা নিতে পারবে না। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদেরকে হুঁশিয়ার করতে গিয়ে বলছেন, যে কাউকে ধোকা দেয়ার মধ্যে কোনো বাহাদুরী নেই। তারা মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে ধোকা দেবে এবং এরপরও তাদের সাথে মৈত্রী ও ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইবে–এটা কি কখনও সম্ভব! সে জন্যে পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা তাদের কল্যাণার্থে অত্যন্ত তাদেরকে হুঁশিয়ার করছেন, কড়া ভাষায় ডাক দিয়ে বলছেন,

'খবরদার, তোমাদের কসমগুলোকে তোমরা নিজেদের মধ্যে ধোকা দেয়ার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করোনা এ ধরনের ব্যবহার দ্বারা তোমাদের এক দল অপর দলের ওপর কি প্রাধান্য বিস্তার করতে চাও?'

অর্থাৎ, একদল সংখ্যা ও শক্তিতে অন্য দল থেকে বেশী হওয়ার কারণে তারা মনে করে যে তারা কল্যাণের হকদার বেশী–কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের এই মনে করাটাকে বাস্তবে অপ্রমাণিত করে দিয়েছেন।

এ মহান কেতাবের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা দৃঢ়তার সাথে জানিয়েছেন যে ওয়াদা ও চুক্তি শান্তি ও সংহতি রক্ষায় কতো গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে, অতচ আজকের পৃথিবীতে রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্যে ধোকা দেয়াকে এক অপরিহার্য কৌশল হিসাবে শুধু বৈধই মনে করা হয় না, এটাকে রাষ্ট্রীয় কূটনীতি মনে করা হয়, যার কারণে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পর অবলীলাক্রমে সে এই ওজুহাতে এ চুক্তিকে ভংগ করে যে, সে অপরের থেকে শক্তি, সামর্থ ও সম্পদে বেশী–এটাকে তারা রাষ্ট্রের স্বার্থে যুক্তিসংগত ও বৈধ মনে করে! অপরদিকে ইসলাম কোনো অবস্থাতেই এটাকে রাষ্ট্রের জন্যে কল্যাণকর মনে করে না। ইসলাম এসেছে মানুষের শান্তি ও মংগলের জন্যে। এজন্যে ইসলাম এমন কোনো ব্যবহার বা কাজ করতে পারে না যার দ্বারা কোনো জনপদের অকল্যাণের বিনিময়ে কারো কল্যাণ হবে। ইসলাম ওয়াদা পূরণ ও চুক্তি রক্ষাকে ফরয বলে ঘোষণা দিয়েছে, চুক্তি ভংগ করার মাধ্যমে কাউকে ধোকা দেয়া বা কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করাকে ইসলাম নিষিদ্ধ (হারাম) ঘোষণা করেছে। ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে, 'নেকী (কল্যাণকর কাজ)ও আল্লাহর ভয়ে বাছবিচার করে চলার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো, আর খবরদার অপরাধজনক ও বিদ্রোহাত্মক কোনো কাজে কেউ কারো কোনো সহযোগিতা করো না।' কাউকে ধোকা দেয়াকে এবং কারো দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার ওপর চড়াও হওয়া বা তার কিছু দখল করে নেয়াকে ইসলাম কোনো ভাল কাজ মনে করে না–এ আচরণকে ইসলাম উপরোক্ত আয়াতের খেলাফ বলে বুঝে। এজন্যে, কোনো 'ভালো' বা কোনো কল্যাণের ওজুহাতে কাউকে বা কোনো রাষ্ট্রকে বিপাকে ফেলাকে ইসলাম বৈধ বলে না। নাফরমানী মূলক কাজ বা আচরণ বা কারো কোনো হক নষ্ট করা বা নিজেদের স্বার্থে কোনো ব্যক্তি, জনপদ বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহাত্মক কাজকে অনুমতি দেয় না। .... আর এই মূলনীতির ভিত্তিতেই ইসলামী দল গঠিত হয়েছে, গঠিত হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্র, যার ফলে জগতকে ইসলামী বিধানের সন্ধান দিতে পেরেছে, শান্তিপূর্ণ এবং আস্থাযোগ্য এক সমাজে উন্নতি হতে পেরেছে। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে ও রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও যে কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের এবং আদান প্রদানের এক সুষ্ঠু নীতি–ইসলাম তার সূচনালগ্ন থেকেই এ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

আল কোরআন এসব অজুহাত সৃষ্টিকারীদেরকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে এবং এ ধরনের অবস্থা চালু যাতে না করা হয় তার জন্যে ইসলামী সমাজকে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করছে। এরশাদ হচ্ছে,

'(কসম খেয়ে বা চুক্তি করে তা এই জন্যে ভংগ করা হয়) যেন একদল আর এক দলের ওপর প্রাধান্য লাভ করে বা বেশী ফায়দা হাসিল করে।'

প্রকৃতপক্ষে, কসম খেয়ে তা ভংগ করে লাভবান হওয়ার সুযোগ তখন হয় যখন এক পক্ষ সরল হৃদয়ে আর এক পক্ষকে বিশ্বাস করে এবং তার কসমকে মূল্য দেয়, যার সুযোগ নিয়ে কসম ভাংগা হয় বা ধোকা দেয়া হয়। এক পক্ষের সরলতার সুযোগ তো আল্লাহ তায়ালাই দিয়ে থাকেন এবং তাদের নিয়ত ঈমান ও সততার পরীক্ষার জন্যে এসব সুযোগ দেয়া হয়, এসব সুযোগ সৃষ্টি করা হয় তাদের জন্যে যাতে করে তাদের ওয়াদা পূরণের সততা ও তাদের আত্মসম্ভ্রম-বোধের পরীক্ষা হয়ে যায়। এ আত্মসম্ভ্রমবোধ ও সততা ওয়াদা ভংগের দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং এর দ্বারা তারা নিজেদের কাছেই নিজেরা ছোট হয়ে যায়। তাই বলা হচ্ছে,

'অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এর দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করছেন।'

তারপর বিভিন্ন দল ও জাতির মধ্যে গড়ে উঠা মতভেদের বিষয়গুলোকে কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে পেশ করা হবে এবং তাঁর কাছেই ফয়সালা চাওয়া হবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর অবশ্যই কেয়ামতের দিন তিনি তোমাদেরকে সেসব বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা জানিয়ে দেবেন যা নিয়ে তোমরা পৃথিবীর জীবনে মতভেদ করতে থেকেছ।'

সে দিন আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা পূরণকারী ও ওয়াদা ভংগকারীদের মধ্যে সঠিকভাবে বিচার করে ওয়াদাপূরণকারীকে পুরস্কৃত করবেন এবং ওই সব বেঈমানদের জন্যে শাস্তি-বিধান করবেন, যারা দুনিয়ার জীবনের লোভ-লাভ ও প্রাধান্যকে বড়ো করে দেখেছিলো এবং আখেরাতে তাদের কী পরিণতি হবে তার কোনো পরওয়াই করেনি। এমনকি তারা, তাদের আচরণ দ্বারা তাদের আকীদা বিশ্বাসে প্রমাণও দেয়নি এবং বিভিন্ন পর্যায়ে ভুল মতামত প্রদান করেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন তাহলে সবাইকে একটি মাত্র উম্মতে পরিণত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে পথহারা করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়াত করেন, আর অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে ঐসব বিষয়ে যা তোমরা (দুনিয়ার বুকে) করতে থেকেছো)।'......

আর এটা তো অবশ্যই সত্য কথা যে, আল্লাহ তায়ালা চাইলে সকল মানুষকে একই ধরনের যোগ্যতা দান করতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি না করে তাদেরকে পৃথক পৃথক যোগ্যতা ও গুণাবলীতে ভূষিত করেছেন, কেউ কাউকে পুরোপুরি অনুসরণ করতে পারে না, একই যোগ্যতার সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি হয় না এবং যে গুণাবলী নিয়ে একজন আসে, অবিকল সেই একই গুণাবলী নিয়ে আর কেউ আসে না। তিনি হেদায়াত ও গোমরাহীর বিভিন্ন উদাহরণ দিয়েছেন, সকল মানুষের মধ্যে তাঁরই ইচ্ছা কাজ করে চলেছে এবং প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ কাজ কর্মের জন্যে আল্লাহর কাছে দায়ী হবে কিন্তু ওয়াদা ভংগের ব্যাপারে কারো মধ্যে কোনো আকীদাগত কোনো মতভেদ নেই, অর্থাৎ ওয়াদা ভংগ করা যে একটি সামাজিক অপরাধ—এ বিষয়ে কেউ কোনো দ্বিমত পোষণ করে না। মতভেদ রয়েছে শুধু এ কদর্য অভ্যাসের কারণসমূহ নিয়ে, যার সম্পর্ক রয়েছে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে অর্থাৎ যেসব ওজুহাতের কারণে ওয়াদা ভংগ করা যায় সেগুলো আল্লাহর ইচ্ছাতেই আসে বলে মনে করা হয়। অবশ্যই এটা ঠিক, যার যে বিশ্বাসই থাকুক না কেন, যে কোনো ওয়াদা করা হয় আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে তা এসে যায় এবং তিনি সে ওয়াদার সাক্ষী বা দায়িত্বশীল হয়ে যান, আর মানুষের লেনদেনের ক্ষেত্রে এই ওয়াদাই হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বিষয়, যার ওপর নির্ভর করে সামাজিক শান্তি। আর এই ওয়াদা পূরণের ওপরেই নির্ভর করে দ্বীন ইসলামের সৌন্দর্য ও মর্যাদা, বাস্তব জীবনে ওয়াদা পূরণ করা যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আচরণ এ শিক্ষা একমাত্র আল ইসলামই দিয়েছে যার বিশদ বর্ণনা আল কোরআনের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দেয়া হয়েছে।

ওয়াদা পালনের গুরুত্ব

এভাবে আলোচনা এগিয়ে চলেছে ওয়াদা পূরণ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে, পাশাপাশি নিষেধ করা হয়েছে বা প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে কসম খেয়ে এবং এই নশ্বর দুনিয়ার নগদ ও সাময়িক নিশ্চিয়তা হাসিলের জন্যে আত্ম-নিয়োগ করতে; আরও সতর্ক করা হয়েছে অতীতের বহুজাতির অথবা বহু ব্যক্তির অধপতনের নযিরকে তুলে ধরে, তাদের নড়বড়ে বিশ্বাস, সম্পর্ক স্থাপন ও লেনদেনের মধ্যে গোলমালের পরিণতিতে যে ভোগান্তি হয়েছে সেই সব দৃষ্টান্তকে তুলে

ধরে সময় থাকতেই সাবধান হতে বলা হয়েছে, আর সবশেষে আখেরাতের ভীষণ আযাবের কথা জানিয়ে তাদেরকে এখনই নিজ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে বলা হয়েছে। এ আলোচনায় স্পষ্টভাবে আরও জানা যাচ্ছে যে, ওয়াদা-পূরণে যে সামান্য ক্ষতি স্বীকার করতে হয় তার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা এতো মহামূল্যবান পুরস্কার দেবেন যার কল্পনাও কোনো মানুষ করতে পারে না, আর বলা হচ্ছে যে, তাদের হাতে যা কিছু আছে তা অবশ্যই একদিন শেষ হয়ে যাবে, বাকি থাকবে একমাত্র তাই যা আল্লাহর কাছে আছে, যে ভান্ডার কখনও শেষ হবার নয় এবং যে রেযেক তিনি সবার জন্যে বরাদ্দ করেছেন তা কখনও বন্ধ হবে না। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তোমাদের কসমগুলোকে তোমরা কাউকে ধোকা দেয়ার মাধ্যম বানিয়ে নিয়োনা, যার ফলে তোমাদের কদম জমে যাওয়ার পর পিছলে যাবে.......... আর আমি মহান আল্লাহ, প্রতিদান দেব ওই সব লোকদেরকে যারা সবর করেছে; সমুচিত প্রতিদান দেব তাদের উত্তম কর্মগুলোর যা তারা পৃথিবীর বুকে করেছে।' (আয়াত ৯৬-৯৭)

কাউকে অপদস্ত করার উদ্দেশ্যে বা ধোকা দেয়ার জন্যে যে কসম খাওয়া হয় তার ফলে অন্তরের মধ্যস্থিত আকীদা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় এবং অপরের অন্তরের মধ্যে আকীদার বিকৃত রূপটি ফুটে উঠে। এটা অবশ্যই সত্য কথা, যে ধোকা দেয় সেও জেনে বুঝেই দেয়, কাজেই নিজের বিবেকের কাছে সে ধোকাবাজ বলে পরিচিত হয়ে যায়, সে কিছুতেই তার আকীদার দৃঢ়তাকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না এবং ঈমানী যিন্দেগীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে সে ব্যর্থ হয়-বরং ইসলাম যে মানুষকে সৎ ন্যায়নিষ্ঠ, বিবেচক ও অপরের জন্যে উপকারী বন্ধু বানানোর জন্যে এসেছে–এই ওয়াদা খেলাফ ও ধোকাবাজ ব্যক্তি তার ব্যবহার দ্বারা ইসলাম সম্পর্কে এ মহান ধারণাকে অপ্রমাণিত করে ছাড়ে; প্রকৃতপক্ষে ওয়াদা ভংগের কারণে না নিজে ন্যায় পথে থাকতে পারে, না অপরকে ন্যায়ের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে বরং এ এমন এক সংক্রামক ব্যাধি যা অপরের ন্যায় নিষ্ঠা ও ইসলাম সম্পর্কে উঁচু ধারণাকে ধূলিসাত করে দেয়। শুধু তাই নয়, ওয়াদা-খেলাফকারী এই ব্যক্তি নিজের অপরাধ ঢাকার জন্যে নানা প্রকার বাহানা তালাশ করে এবং মানুষকে ধোকা দিতে থাকে। এর ফলে, তার আনুষ্ঠানিক এবাদাতসমূহের মর্যাদা বিনষ্ট হয়ে যায় ও মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য বুঝা থেকে বহু বহু দূরে চলে যায়–এভাবেই সে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রকারান্তরে আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়নকারীদের ঈমানের ওপর সে মারাত্মক আঘাত হানে।

ইসলামের প্রচার ও প্রসার যেখানে ঘটেছে সেখানে দেখা গেছে জনগণ মুসলমানদের লেনদেনের স্বচ্ছতা চুক্তি রক্ষা ও ওয়াদা পূরণ দেখে মুগ্ধ হয়েছে। তারা মুসলমানদের ঈমানের প্রতি ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা দেখে, তাদের পারস্পরিক অর্থনৈতিক আদান প্রদানের পরিচ্ছন্নতা দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছে গোত্রের পর গোত্র দলে দলে। এর ফলে, দেখা গেছে, ওয়াদা পূরণ করতে গিয়ে তারা সাময়িকভাবে কিছু কষ্ট পেলেও বা কিছু সময়ের জন্যে একটু ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অবশেষে তারাই লাভবান হয়েছে।

পাক পবিত্র এ গ্রন্থ আল কোরআন এবং রসূলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নত মুসলমানদের অন্তরে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং সাধারণভাবে বাস্তব জীবনের লেনদেনের ক্ষেত্রে এ শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে স্বস্তি ও শান্তির নিশ্বাস ফেলার সুযোগ করে দিয়েছে। তাদের লেনদেনের এই পরিচ্ছন্নতা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এনেছে। এ ব্যবস্থা ব্যক্তিগত জীবন

থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। বর্ণিত আছে যে, মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান ও রোমান বাদশার মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত চুক্তি হয়, অতপর এই চুক্তির মেয়াদের শেষের দিকে আমীর মোয়াবিয়া (রা.) রোমান সাম্রাজ্যের দিকে এক সেনাবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন এভাবে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে যখন সে এলাকায় আক্রমণ করে বসেন তখন প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের অজান্তেই আগ্রাসী ভূমিকায় অবতির্ণ হন এসময়, মুয়াবিয়া (রা.)-এর একজন সাথী ওমর এবনে ওৎবা বলে উঠলেন, 'আল্লাহ আকবার, হে মুযাবিয়া, চুক্তির মেয়াদ পূরণ করো, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, আমি রসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি কোনো জাতির সাথে কেউ চুক্তিতে আবদ্ধ হলে তারা চুক্তি ভংগ না করা পর্যন্ত, খবরদার যেন চুক্তি ভংগ না করা হয়।' আমীর মোয়াবিয়া (রা.) এ কথা শোনার সাথে সাথে তাঁর সৈন্য প্রত্যাহার করে ফিরে আসলেন। অবশ্য চুক্তি ভংগ করা সম্পর্কিত বহু মশহুর ও মোতাওয়াতের হাদীসও পাওয়া যায়।

এভাবে আল কোরআনও মানুষের অন্তরের মধ্যে ওয়াদা গুরুত্ব অনুভূত করানোর জন্যে বিভিন্ন প্রসংগে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, কখনও এর গুরুত্ব সম্পর্কে জানিয়ে চুক্তি রক্ষা করতে উৎসাহিত করেছে। কখনও এর কঠিন পরিণতি জানিয়ে ভয় দেখিয়েছে এবং জানিয়েছে যে, যখনই কারো সাথে কোনো চুক্তি করা হয়, প্রকৃতপক্ষে সে চুক্তি করা হয় আল্লাহর সাথে, এ পাক কালাম আরো জানিয়েছে চুক্তিরক্ষার সুফল সম্পর্কে এবং চুক্তিভংগ করলে কি কি ক্ষতি হয় তাও একে একে বর্ণনা করেছে, জানিয়েছে যে আল্লাহর কাছে চুক্তি রক্ষা এক মহা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এরশাদ হচ্ছে,

'খবরদার, আল্লাহর নামে শপথ করে বা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে যখনই কোনো চুক্তি করবে তখন তা অল্প মূল্যে বিক্রি করোনা

'চুক্তি ভংগ করে যে কোনো উদ্দেশ্য হাসিল করার চেষ্টা হবে তা সবই হবে অল্প মূল্যের জিনিস। এরপর, আল কোরআন জানাচ্ছে আল্লাহর কাছে (চুক্তিরক্ষার ফলে) যে প্রতিদান পাওয়া যাবে তাই হবে তোমাদের জন্যে ভাল, (তোমরা বুঝবে) যদি তোমরা তোমাদের জ্ঞানকে কাজে লাগাও।'...

আল কোরআন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে মানুষের কাছে যা কিছু আছে, এমনকি তার গোটা সাম্রাজ্যও যদি হয়—তাও অতি অল্প জিনিস। কারণ এসবই তো একদিন শেষ হয়ে যাবে, অপরদিকে যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে তাই বাকি থাকবে এবং তাই স্থায়ী হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা শেষ হয়ে যাবে, আর আল্লাহর যা আছে তাই-ই অবশিষ্ট থাকবে।'

এভাবে আল কোরআন চুক্তি রক্ষার জন্যে মোমেনদের মনোবল গড়ে তুলছে এবং ওয়াদা পূরণ ও চুক্তি রক্ষার জন্যে যে বেগ পেতে হয় এবং যে সব কঠিন অবস্থা অতিক্রম করতে হয় তাতে সবর করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছে ওয়াদা করছে যে চুক্তি রক্ষার জন্যে রয়েছে মহা প্রতিদান। এরশাদ হচ্ছে, 'আর অবশ্যই আমি সবরকারীদেরকে তাদের সুন্দর কাজের জন্যে মহা প্রতিদান দেবো।' (আয়াত ৯৭) আর এ পর্যন্ত (আল্লাহর হুকুমের বিপরীত) যা কিছু অন্যায় কাজ সংঘটিত হয়েছে আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করে দেবেন, যাতে করে ভাল কাজের পুরস্কার নিশ্চিত হয়ে যায় এবং অন্যায় কাজের দ্বার রুদ্ধ হতে থাকে।

উত্তম কাজের পুরস্কারের ব্যাপারে কোরআনের মূলনীতি

এ পর্যায়ে এসে ভাল কাজ ও তার পরস্কার সম্বন্ধীয় কিছু সাধারণ মূলনীতি পেশ করা হচ্ছে,

'পরুষ বা নারী, যে কেউ কোনো ভাল করবে, যদি সে মোমেন হয়, তাহলে তাকে, আমি, মহান আল্লাহ দান করব এক পবিত্র জীবন এবং যা কিছু ভাল কাজ তারা করবে তার উত্তম প্রতিদান দেব।' এই প্রতিশ্রুতির ফলশ্রুতিতে নীচে বর্ণিত কিছু মূলনীতি নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে,

প্রথম, পুরুষ ও নারী-এই যে দুই মানব শ্রেণী, তারা কাজ ও তার পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারে সমান অধিকারী, তাদের এ নেক কাজের দরুণ আল্লাহর সাথে সমানভাবে তাদের সম্পর্ক স্থাপিত হবে এবং উভয়েই তারা একইভাবে আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করবে। এখানে লক্ষ্যযোগ্য; 'মান' শব্দটি পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে যদি কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে এ শব্দটি দ্বারা কোনো এক শ্রেণীকে চিহ্নিত করা হয়, তবে আলাদা কথা। এরশাদ হচ্ছে,

'পুরুষ নারী যেইই হোক না কেন'-

একথাটি আল্লাহর মূল বিবৃতির মধ্যে একটি অতিরিক্ত সংযোজন, অর্থাৎ মূল বিষয় হচ্ছে চুক্তি রক্ষা, তার সাথে-এই কাজ 'পুরুষ-নারী' যেইই করুক তার জন্যে রয়েছে মহাপ্রতিদান- একথাটা বলা হয়েছে সেই সূরাতে যেখানে জাহেলিয়াতের যামানায় নারীদের সাথে করা দুর্ব্যবহারের বিস্তারিত বিবরণ এসেছে, এসেছে ওই সমাজের সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগীর কথা, আরও এসেছে কন্যা সন্তান জন্মের খবরে আরববাসীর মুখ কালো হয়ে যাওয়ার কথা, আরও এসেছে, ওই জাহেলি সমাজে কন্যা সন্তান জন্মের খবর শোনার সাথে সাথে লজ্জায়, দুঃখ ও আত্ম-গ্লানির কারণে মুখ লুকিয়ে বেড়ানোর কথা।

অবশ্যই উত্তম কাজের জন্যে এমন কিছু মূলনীতি থাকা প্রয়োজন যাকে কেন্দ্র করে মানুষের আচার ব্যাবহার আবর্তিত হতে পারে-এ মূলনীতি হচ্ছে, আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার উপর ঈমান, অর্থাৎ প্রগাঢ় বিশ্বাস ও দৃঢ় আস্থা। এই জন্যে শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে 'অহুয়া মোমেন'-অর্থাৎ যদি সে পুরুষ বা নারী-'মোমেন' হয়, এই মূল নীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে মুসলিম-জীবনের যে প্রাসাদ তা ধ্বংস স্তূপে পরিণত হবে যদি এ মূলনীতি নড়বড়ে হয়ে যায়-বরং আরও স্পষ্ট করে বললে বলা যায়, যদি বিশ্বাসের এই বুনিয়াদ দুর্বল হয়ে যায় তাহলে মুসলিম সমাজের প্রাসাদ কিছুতেই মযবুত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না-ঈমানের এই সম্পর্কের কারণে মুসলিম সমাজের মধ্যে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে যে দৃঢ় সম্বন্ধ গড়ে ওঠে তার কল্পনাও করা যায় না। ঈমানী মযবুতীর অভাবে। ঈমানের দাবী হচ্ছে, আল্লাহ ও রসূলে (স.)-এর পক্ষ থেকে যখন কোনো ফয়সালা এসে যাবে তখন কোনো পুরুষ বা নারী যেইই হোক না কেন, তার স্বাধীন কোনো মতামত বা অধিকার সে খাটাতে পারবে না-নতশীরে সে বলবে 'আ-মান্না ওয়া সাল্লামানা'-বিশ্বাস করলাম ও মেনে নিলাম। আর যেহেতু মুসলিম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি এইভাবে আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মেনে নেবে, এই জন্যে তাদের নিজ নিজ মতামত খাটিয়ে গন্ডগোল বাধানোর সুযোগ কমে যাবে। কাজেই এই বিশ্বাসই এমন এক মযবুত কেন্দ্রবিন্দু বা মধ্য খুঁটি যাকে কেন্দ্র করে মোমেন যিন্দেগীর সকল কাজ ও ব্যবহার আবর্তিত হয়। এই মূলনীতি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত না হলে মুসলিম সমাজের ব্যক্তিদের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্নমুখী চিন্তাধারা তাদেরকে বিছিন্ন করে ফেলবে এবং তাদের পারস্পরিক বন্ধন হয়ে যাবে শিথিল। ঈমানের এই রশিটি দুর্বল হয়ে গেলে তাগূতী শক্তির সামান্য ধাক্কাতেই তারা পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যাবে। সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে এটা প্রমাণিত হলো যে, যে কোনো ভাল কাজের জন্যে এই বিশ্বাসই হচ্ছে মূল

পরিচালিকা শক্তি, যা 'ভাল'কে মূল শিকড়ের সাথে মযবুতভাবে জুড়ে রাখে এই বিশ্বাস এতোটা মযবুত হতে হবে যে মানুষের কুপ্রবৃত্তি বা স্বাধীন ইচ্ছার প্রচন্ড ধাক্কায় এটা যেন নড়বড়ে বা বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। এ বিশ্বাস সাময়িক কোনো আবেগ নয় যে এখন আছে তখন নেই, আজ আছে, কাল শেষ হয়ে যাবে–এই হৃদয়াবেগই হচ্ছে সেই স্থায়ী ও অমোঘ শক্তি যা দুনিয়ার যে কোনো ঝড়-ঝাপটার মোকাবেলায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। বাত্যাতাড়িত হয়ে বেতসী পত্রের ন্যায় এদিকে সেদিকে ঝুঁকে পড়ে না।

আল্লাহর ওপর ঈমান অথবা আল্লাহর অস্তিত্ব, শক্তি ও ক্ষমতার প্রতি দৃঢ় আস্থার সাথে এর পরিচয়বাহী আমলে সালেহ ভালো কাজ যার দ্বারা মানুষের উপকার হয় তা অবশ্যই করতে হবে। আবারও বলছি, এই 'আমলে সালেহ' চায় প্রেরণাদায়ক এক মযবুত পরিচালিকা শক্তি, যাকে কেন্দ্র করে এই আমলে সালেহ চলতে পারে, আবর্তিত হতে পারে ঘুরতে পারে সেই বুনিয়াদী খুঁটিকে কেন্দ্র করে যেমন করে অনুগত পশুরা ফসল মাড়াইয়ের জন্যে মধ্য খুঁটিতে কেন্দ্র করে পরিচালকের ইচ্ছামত ঘুরতে থাকে। এহেন ঈমান বিজড়িত আমালে সালেহ (নেক কাজ)-এর পুরস্কার হচ্ছে পার্থিব সকল প্রকার কলুষতা মুক্ত এক পবিত্র যিন্দেগী। ঈমান সমৃদ্ধ উদ্বেগ মুক্ত পার্থিব এ যিন্দেগীতে দেখা যায় শান্তি-সমৃদ্ধি-সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, দয়া-ভালবাসা সহযোগিতা সহমর্মিতা ও সংবেদনশীলতা। এ যিন্দেগী উন্নীত হয় সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মম্ভরিতা ও নিষ্ঠুরতার উর্ধে। এই ঈমানের অভাবে গোটা জীবনই হয়ে যায় ছাইয়ের মতো ধূলাবালি, যা ঝড়ের দিনে প্রচন্ড বাতাসের তাড়নে অতি সহজেই উড়তে থাকে। মোমেনের জীবনে আকীদা বিশ্বাসই তার জন্যে এক মযবুত লক্ষ্য স্থির করে দেয়, এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে মোমেনের মধ্যে সারাক্ষণ চিন্তা চেষ্টা বিরাজ করতে থাকবে, যা তাকে নিয়ে যায় তার মূল কেন্দ্রের দিকে যেখান থেকে তার জীবনের যাত্রা হয়েছিলো শুরু। তখন এটা স্থায়িত্বহীন কোনো সাময়িক আবেগ থাকে না, যা নফসানিয়াতের যে কোনো দোলায় নুয়ে পড়বে, হারিয়ে ফেলবে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যকে।

ঈমানের সাথে আমলে সালেহ যুক্ত হয়ে বয়ে আনে পবিত্র এক জীবন। এমনই এক যিন্দেগীতে মোমেনরা আখেরাতের উদ্দেশ্যে যে সংযম সাধনা করে, আত্মনিয়ন্ত্রণ করে ও সর্বপ্রকার প্রতিকূল অবস্থায় অবিচল থেকে রসূলুল্লাহ (স.)-এর অনুসরণে সর্বপ্রকার ভাল কাজে আত্মনিয়োগ করে, তাদের জন্যে রয়েছে, দুনিয়ার পবিত্র জীবন শেষে আখেরাতের উত্তম বিনিময়–নেয়ামত ভরা বেহেশত। এসব বলিষ্ঠ ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিরা দুনিয়ায় সুখ সম্পদ কতোটা পেলো তার পরওয়া করে না , তাই বলে তারা যে দুনিয়ায় কিছু পায় না তাও নয়, দুনিয়াতে আল্লাহর ইচ্ছাতে তাঁর বরাদ্দকৃত বস্তুগত নেয়ামতের একটা হিসসা অবশ্যই তারা পায়, কিন্তু এ বস্তুগত নেয়ামত ছাড়া তারা আরো এমন মূল্যবান কিছু পায়, যার কারণে তৃপ্তিতে তাদের হৃদয়মন পুলকিত হয়ে যায়; আর তা হচ্ছে কলুষতা মুক্ত পবিত্র জীবনের এক অনুভূতি: এই অনুভূতির সাথে জড়িয়ে থাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মধুর পরশ, তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার আত্মবিশ্বাস এবং সর্বাবস্থায় তাঁর পরিচালনায়, হেফাযতে ও সন্তুষ্টির মধ্যে থাকতে পারার পরম তৃপ্তি। আরো থাকে আমলে সালেহপূর্ণ জীবনে সঠিক পথে টিকে থাকতে পারার বলিষ্ঠ চেতনা, নিরুদ্বেগ ও শান্ত সৌম্য চালচলন, সন্তুষ্টি ও বরকত প্রাপ্তির নিশ্চিন্ততা, ঘরের শান্তি এবং পারস্পরিক ভালবাসাবাসির পরিবেশ; উপরন্তু ভাল কাজ করতে পারার এক অনাবলি শান্তি ও খুশী এবং এ খুশীর ছাপ গোটা দেহ-মন ও জীবনের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হওয়ায় তারা হয়ে যায় নিশ্চিন্ত, নির্লিপ্ত পরম পরিতৃপ্ত ও

ধন্য। দুনিয়ার জীবনের জন্যে বস্তুগত সম্পদ মানুষের জীবনের চাওয়া-পাওয়ার একটি মাত্র উপকরণ যা তাদের অনন্তজীবনের জন্যে এক নগণ্য ভূমিকা পালন করে–এটা সঠিকভাবে তারা সেই দিন বুঝবে যেদিন তারা মিলিত হবে মহান আল্লাহ রব্বুল ইযযতের সাথে, যে দিন তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে তারা দেখতে পাবে তাদের নেক আমলগুলো বয়ে এনেছে তাদের জন্যে আরো অনেক বড়, আরো পবিত্র এবং আরো স্থায়ী সওগাত।

আর এটাও বিবেচনাযোগ্য যে দুনিয়ার মধ্যে, আমলে সালেহ করার কারণে, এখানে যেমন পাওয়া যাচ্ছে অনাবিল শান্তি, তেমনি আখেরাতের জীবনে পাওনাও তাদের কোনো অংশে কমে যাবে না।

আর আখেরাতের প্রতিদান তো এজন্যেই আসবে যে, দুনিয়ার জীবনে মোমেনরা সর্বোত্তম কাজগুলো করেছে; আরো আশার কথা, ভালো কাজ করতে থাকার প্রবণতা ও প্রচেষ্টার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেবেন বলে এখানে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছেন। এর থেকে উত্তম প্রতিদান আর কি হতে পারে!

শয়তানের প্ররোচণা থেকে আল্লাহর সাহায্য কামনা

এরপর আসছে এ মহান কেতাবের বৈশিষ্ট্যের প্রসংগ, এ কেতাবের প্রতি নানা প্রকার শিষ্টাচার প্রদর্শন (আদব রক্ষা) এবং সঠিকভাবে এ পবিত্র কেতাব পাঠ করার পদ্ধতি বিষয়ক আলোচনা।

পাশাপাশি আসছে এ কেতাব সম্পর্কে মোশরেকদের উক্তিসমূহ ও তার পর্যালোচনা। এরশাদ হচ্ছে,

'অতএব, (হে নবী) যখনই তুমি আল কোরআন পড়বে তখন বিতাড়িত শয়তানের (কুটিল প্ররোচণা ও মন্দ) স্পর্শ থেকে বাঁচার জন্যে অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য চাবে যারা (সত্যিকারে) ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের ওপর ভরসা তাদের ওপর ওর কোনো ক্ষমতা নেই। হাঁ, অবশ্যই তার ক্ষমতা খাটে তাদের ওপর যারা তাকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে এবং যারা মোশরেক।'

আর মরদূদ শয়তান থেকে পানাহ্ চাওয়ার প্রশ্ন সেই সময়ে আসে যখন আল্লাহর কেতাব পড়া হয়। আরও প্রয়োজন হয় তখন যখন শয়তানের ওয়াস ওয়াসা (প্ররোচণা) আসছে বলে মনে হয়, এবং তখনও প্রয়োজন হয় যখন কলুষ কালিমায় ভরা এই পৃথিবীর নানাবিধ ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে কেউ একনিষ্ঠভবে আল্লাহর দিকে রুজু করার ইচ্ছা করে।

দেখুন, আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর দিকে রুজু হওয়ার পদ্ধতি শেখাচ্ছেন..........এ প্রসংঙ্গে তিনি নিশ্চয়তা দিয়ে বলে দিচ্ছেন,

'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে তাদের ওপর ওর কোনোই ক্ষমতা নাই।'

অর্থাৎ যারা একমাত্র আল্লাহর দিকে ঝুঁকে থাকে এবং তাদের অন্তরকে পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর দিকে রুজু করে রাখে, আর সাহায্য সহযোগিতার জন্যে ভরসা করে একমাত্র আল্লাহরই ওপর তাদের ওপর শয়তান কখনও বিজয়ী হতে পারে না, তা সে যতো ওয়াসওয়াসা দিক না কেন–আল্লাহর সাথে তাদের যে সম্পর্কের গভীরতা রয়েছে তাই তাদেরকে শয়তানের খপ্পরে পড়া থেকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং তাঁর কাছে জবাবদিহির জন্যে প্রস্তুত করবে। তাদের কখনও কখনও ভুল হয়ে যেতে পারে, তাই বলে শয়তানের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করবে না; যার ফলে শয়তান তাদের থেকে পালিয়ে যাবে এবং তারা শীঘ্রই তাদের রবের কাছে ফিরে যাবে। এরপর জানানো হচ্ছে যে

'ওর ক্ষমতা খাটবে শুধু তাদের ওপর যারা তাকে বন্ধু বা অভিভাবক-রূপে গ্রহণ করবে?'

অর্থাৎ এরাই হবে সেসব ব্যক্তি যারা তাদের নিজেদের বন্ধু বা অভিভাবক মনে করে কুপ্রবৃত্তির তাড়নে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে অথবা নিজেদের স্বার্থের কারণে শয়তানের ক্রীড়ানক পরিণত হয়। তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক শেরেককারী। তাদের শেরেক করার লক্ষণ এইভাবে প্রকাশ পায় যে, তারা শয়তানের কথায় উঠাবসা করে এবং অন্যায়কারী কোনো ক্ষমতাধরের গোলামী করতে থাকে। এইভাবে যুক্তিহীনভাবে অথবা বিনাশর্তে শয়তানের আনুগত্যের মাধ্যমে, প্রকৃতপক্ষে তারা শেরেকেই লিপ্ত হয়ে পড়ে।

কোরআনের নাসেখ মানসুখ

এখানে মোশরেকদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে কোরআনে কারীমে তাদের সম্পর্কে তাদের এক সাথে উক্তি পেশ করা হচ্ছে,

'আমি, যখন কোনো আয়াতের বদলে অন্য কোনো আয়াত নাযেল করি, আর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন তিনি নাযেল করেন, তখন ওরা বলতে থাকে, তুমি তো নিজে তৈরী করে (মনগড়া) কথা বলছো; ....যারা ঈমান আনে না-মনগড়া কথাত তারাই বলছে যারা আল্লাহর আয়াত সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, আর তারাই মিথ্যাবাদী।' (১০১-১০৫)

আসলে মোশরেকরা জানে না যে এ মহান কেতাবের উদ্দেশ্য কি এবং কোন মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্যে এ কেতাবকে পাঠানো হয়েছে, জানেনা তারা যে এ মহান কেতাব পাঠানো হয়েছে একটি বিশ্বজনীন সমাজ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে, আর তার জন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন একটি আদর্শ দল গড়ে তোলা, যারা ওই বিশ্ব সমাজকে পরিচালনা করবে এবং নবী মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাতই হলো শেষ রেসালাত। অর্থাৎ আল্লাহর বার্তা শেষ বারের মতো নবী মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে নাযেল হয়েছে; এরপর আর কোনো সময়েই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো বার্তা আসবে না, আসবে না কোনো সংশোধনী, আর আল্লাহ তায়ালাই সেই মহান সত্ত্বা যিনি মানবমন্ডলীকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জাননেওয়ালা (সর্ব বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে) তিনিই জানে ইসলামের নিয়ম নীতি ও আইন কানুনের কোন অংশকে কখন কিভাবে শোধরাতে হবে। এমতাবস্থায়, যদি কোনো আয়াতকে পরিবর্তন করে অন্য কোনো আয়াত নাযেল করার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন, যদি তিনি মনে করেন বিশেষ কোনো সময়ের জন্যে কোনো আয়াতের কার্যকরিতা ছিলো, এখন অবস্থার পরিবর্তনের কারণে ওই আয়াতের কার্যকরিতা আর নাই এবং ভবিষ্যতেও ওই আয়াতের ক্ষেত্র আর আসবে না তাহলে তিনি অবশ্যই তা পরিবর্তন করবেন। বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কিছু সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন, আর কারও পক্ষে তা যা জানা সম্ভব নয়। এতে কারও কিছু বলার কি অধিকার থাকতে পারে? বিশ্ব এগিয়ে চলেছে। রসূলুল্লাহ (স.)-এর সময়ে ও তার পরবর্তীতে সামাজিক পরিবর্তন আসবে, উপরের আয়াতাংশে তারই মহড়া হয়ে গেছে এবং অবশেষে বোঝানো হচ্ছে, অবতীর্ণ এই আয়াতের পরিবেশই বিরাজ করবে পরবর্তীকালে—এইজন্যে শেষের দিকে সংশোধিত আয়াতগুলোই চিরদিনের জন্যে প্রযোজ্য—একথা একমাত্র তিনিই জানেন যিনি সকল যুগের সকল পরিস্থিতি জানেন। এরপর কিছু বিষয় মানুষের জ্ঞান-গবেষণার জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে সেসব বিষয়ে সমকালীন পারদর্শী ওলামায়ে কেরামের পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত সমূহ অনুসারে সেই সব বিষয়ে আইন ও বিধান রচিত হতে পারবে, যার উল্লেখ কোরআন হাদীসে নাই, এবং সেসব সিদ্ধান্ত কোরআন হাদীসের অকাট্য নির্দেশাবলীর বিপরীত অবশ্যই হবে না। এসব বিষয়ে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালাই জানেন আর

কেউ জানেনা–এজন্যে বর্তমান প্রসংগে অবতীর্ণ আয়াতে উল্লেখিত মন্তব্য ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্যে ওষুধ স্বরূপ নাযেল হয়েছে। এরপর সাধারণ মানুষের জন্যে নসীহত করা হয়েছে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালাই জানেন কখন কী নাযেল করতে হবে। একথাটা সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য।

কোরআন সম্পর্কে একটি মিথ্যা অপবাদ

মোশরেকরা এসব বিষয়ে কিছুই জানেনা, এজন্যে রসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় তারা কোনো আয়াতের পরিবর্তে অন্য কোনো আয়াত নাযেল হবে তার রহস্য ও তাৎপর্য তাদের পক্ষে কোনো ভাবে বুঝা সম্ভব হয়নি, এজন্যে তারা মনে করেছে বোধ হয় মোহাম্মদ নিজে কথাগুলো বানিয়ে বানিয়ে বলেছেন আর এজন্যেই তাঁর ইচ্ছামত এগুলো তিনি পরিবর্তন করেছেন, অথচ তারা জানে এবং তাদেরই ঘোষণা ছিলো যে তিনি পরম সত্যবাদী বিশ্বস্ত ও আমানতদার, যিনি কোনো সময়েই কোনো মিথ্যা বলেননি। তাই এরশাদ হয়েছে,

'বরং ওদের অধিকাংশ লোকই জানেনা বা তাদের জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করে না।' আরও এরশাদ হচ্ছে,

'বলো (হে রসূল, এ কেতাবকে সঠিকভাবে নিয়ে এসেছেন, তোমার রবের কাছ থেকে মনগড়া হতে পারে না। আর এ কেতাবকে 'রূহুল কুদুস' (পবিত্র আত্মা) জিবরাঈল (আ.) নাযেল করেছেন 'তোমার রবের কাছ থেকে' 'তোমার নিজের কাছ থেকে নয়,' 'সত্য-সহ,' অর্থাৎ সত্য বহনকারী হিসেবে, যার মধ্যে মিথ্যার কোনো নিশান থাকতে পারে না

'যাতে করে, এ কেতাব, ঈমানদারদেরকে দৃঢ়তা দান করে'

অর্থাৎ যেন এসব ঈমানদারদের অন্তর আল্লাহর সাথেই সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এভাবে এই অন্তরগুলো জানতে পারবে যে এ কেতাব আল্লাহর পক্ষ থেকেই নাযেল হয়েছে, এইভাবেই তারা সত্যের ওপর দৃঢ় হয়ে যাবে এবং তাদের অন্তর নিশ্চিন্ততার সাথে সত্যের দিকে ঝুঁকে পড়বে।

'আর এ কেতাব পথ প্রদর্শক ও সুসংবাদ দানকারী মুসলমানদের জন্যে।'

অর্থাৎ, এ কেতাব মানুষকে সরল সঠিক ও মযবুত পথের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং শীঘ্রই আল্লাহর সাহায্য আসবে বলে সুসংবাদ দিচ্ছে এবং আরও জানাচ্ছে যে মুসলমানদের অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা শাসন ক্ষমতা দান করবেন। এরশাদ হচ্ছে,

'আর অবশ্য আমি, মহান আল্লাহ, জানি যে, ওরা (তোমার সম্পর্কে) বলছে, তাকে একজন মানুষ শিক্ষা দেয়, শিক্ষা দেয় এমন এক ব্যক্তি যার কথা ওরা বলছে, তার ভাষা হচ্ছে আজমী (অনারব ভাষা), অথচ (কোরআনের) এ ভাষা তো সুস্পষ্ট আরবী।'

আর একটি জলজ্যান্ত মিথ্যা হলো, এই নির্লজ্জ মোশরেকরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি যে কথাটি আরোপ করতো। এ বেওকুফরা বলতো যে এক আজমী (অনারব) ব্যক্তি তাঁকে কোরআন শেখায়, অথচ এ মহান কেতাব তো বিশুদ্ধ ও এমন সুমহান ভাষায় লেখা যা কোনো অনারব তো দূরের কথা, আরবের শ্রেষ্ঠ কবিরাও যার একটি আয়াতের বা সমকক্ষ কোনো আয়াত বানাতে পারেনি। সে অনারব ব্যক্তি কে ছিলো? এ বিষয়ে নানাজন নানাবিধ নাম উচ্চারণ করেছে, কিন্তু কোনো নামের ওপরেই তারা একমত হতে পারেনি, তবে সবাই ইংগীত করেছে, একজন আজমী ব্যক্তির দিকে যে কোনো কোরায়শ নারীর পেটে জন্ম গ্রহণ করেছিলো, ওই ব্যক্তিটি সাফা পাহাড়ের পদদেশে কিছু বেচাকেনা করতো। কখনও কখনও রসূলুল্লাহ (স.) তার কাছে বসে কিছু কথাবার্তা বলতেন। তার ভাষা তো ছিলো আজমী সে আরবী জানতোনা,তার কাজ চালানোর মতো একান্ত জরুরী কিছু সওয়াল জওয়াব সে শিখে নিয়েছিলো মাত্র।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক তাঁর রচিত রসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবনী 'সীরাতে এবনে হিশাম'-গ্রন্থে বলেন, যতোটা আমি জানি তাতে রসূলুল্লাহ (স.) মারওয়া পাহাড়ের নীচে আরবী বংশোদ্ভুত এক ব্যক্তির কাছে মাঝে মাঝে বসতেন। লোকটি ছিলো জাবর নামক একজন খৃষ্টান ব্যক্তির পুত্র। ওই খৃষ্টানটি এক হাযরামী বংশোদ্ভুত লোকের দাস ছিলো। অতপর আল্লাহ তায়ালা নাযেল করলেন, অবশ্যই আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ জানি যা কিছু ওরা বলাবলি করছে, (ওদের কথামতো) এক ব্যক্তি তাঁকে কোরআন শেখায় তবে যে ব্যক্তি কোরআন শেখায় বলে ওরা বলাবলি করছে (তার কাছে কোরআন শেখা কি করে সম্ভব?)-এটা সম্পূর্ণ একটা অবাস্তব কথা- ও তো একজন আজমী ব্যক্তি, সে কি করে বিশুদ্ধ আরবী ভাষার এই কোরআন তাঁকে শেখাবে?'

আব্দুল্লাহ ইবনে কাসীর ইকরামা ও কাতাদার বরাত দিয়ে বলেন, 'সে ব্যক্তির নাম ছিলো ইয়ায়ীশ।'

ইবনে জারীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে বলেন, মক্কায় বালায়ম নামক একজন ক্রীতদাসকে তিনি জানতেন, তার ভাষা ছিলো আজমী, মোশরেকরা রসূলুল্লাহ (স.) কে তার কাছে যাতায়াত করতে দেখেছে, এ কারণে তারা বলেছে যে তাঁকে বালয়াম এসব শিখিয়েছে, অতপর এ আয়াতটি নাযেল হয়।

যে কথাগুলো দিয়ে কাফেরদের মিথ্যা দাবীকে যেভাবে রদ করা হচ্ছিলো তা ছিলো এতোই অকাট্য যে তার ওপর আর কোনো বিতর্কের সুযোগ থাকে না 'যে ভাষাটির কথা বলে তারা রসূল (স.)-কে অমান্য করছিলো তা তো ছিলো অনারব এক ভাষা, আর (আল-কোরআনের) এ ভাষা হচ্ছে পরিষ্কারভাবে বর্ণনাকারী আরবী ভাষা সুতরাং যার ভাষা আরবী নয়, যে একজন অনারব, নিজের ভাষা ছাড়া যে আরবী জানে না, তারপক্ষে এই মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের কল্পনাতীত সমৃদ্ধশালী ভাষা শেখানো কেমন করে সম্ভব?

আল কোরআনের সার্বজনীনতা

কোরআন সম্পর্কে কাফেরদের এই মন্তব্যের কারণ দুনিয়াবাসীর কাছে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা জেনে বুঝে, নবী (স.)-কে প্রতিহত করার জন্যে, বহু চিন্তা-ভাবনা করে সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে এক মারাত্মক ষড়যন্ত্র করেছিলো। এটা ছিলো তাদের মনগড়া এবং এমন তৈরী করা মিথ্যা যা কোনো যুক্তির ধোপে টেকে না। আসলে সত্যের দাওয়াতকে পর্যুদস্ত করার জন্যে এটা ছিলো গভীর এক চক্রান্ত, তা না হলে তারা কেমন করে এমন নির্জলা মিথ্যা কথা বলতে পারে; যার মিথ্যা হওয়ার মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্যেও কোনো সন্দেহ ছিলো না যেহেতু আল-কোরআনের মর্যাদা, তার ভাষার তেজস্বিনতা, তার অসাধারণ গতিময় ছন্দ এবং তার অভূতপূর্ব অর্থপূর্ণ শব্দ-ভান্ডারের প্রাচুর্যের কথা তাদের থেকে আর কে বেশী জানত। ঠিক ওই মূর্খের গোষ্ঠির প্রতি, এমন নির্লজ্জ মিথ্যা বলায় তারা বিশ্ব-বিবেকের কাছে কতো নিন্দিত-ধিকৃত ও ঘৃণিত হয়ে যাচ্ছিল, শত্রুতার প্রচন্ডতায় এই সহজ কথাটুকু পর্যন্ত বুঝাও তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। তারা বলে, একজন আজমী ব্যক্তি মোহাম্মাদকে এই আল-কেতাব শেখাচ্ছে। অথচ সারা বিশ্বে এর দ্বিতীয় নাই, কোনো দিন ছিলো না আর কোনো দিন হবেও না। এটা হচ্ছে অবিকল সেই মহা-কেতাব যা লিখিত রয়েছে সপ্ত-আকাশের ওপর চির-সুরক্ষিত মহাফলকে-সেই পবিত্র আরবী ভাষায় যে ভাষায় মোহাম্মাদ (স.)-এর কাছে এ কেতাবকে পৌছানো হয়েছে, পুরোপুরি সেই সকল শব্দ বিন্যাসে যা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় জিবরাঈল আল-আমীনের মাধ্যমে মোহাম্মাদ (স.)-এর কাছে নাযেল করা হয়েছে। আর ওই আজমি ব্যক্তিটি যদি মোহাম্মাদ (স.)-কে শেখানোর মতো যোগ্যতার অধিকারী হতো তাহলে তো সে নিজেই এ কাজ করতে পারতো!

আর আজকে এতোগুলো যুগ পর এবং এতোসব বিদগ্ধ ও বিচক্ষণ জ্ঞানী গুনীজনের জ্ঞান-গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এতো উন্নতি হওয়ার পরও আল-কোরআনের কোনো কথাকে কেউ আজ পর্যন্ত অপমাণিত করতে পারেনি। বিশ্বে এ পর্যন্ত কতো উন্নতমানের গ্রন্থ রচিত হয়েছে কতো নিয়ম-শৃংখলা, কতো আইন-কানুন গঠিত হয়েছে, অগ্রগতি হয়েছে কতো সমাজ শৃংখলার, মানব-সমাজের কতো উন্নতি ও সমৃদ্ধি হয়েছে, রচিত হয়েছে কতো সংবিধান, কিন্তু এসবের কোনোটিই কোনো দিক দিয়েই এ মহাগ্রন্থের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারেনি–এ অনবদ্য সৃষ্টি একমাত্র আল্লাহরই, তাই এ গ্রন্থের সমান কোনো গ্রন্থ বা কথা কোনো মানুষ তৈরী করতে পারে না, এটা কোনো মানুষের কাজ হতে পারে না !

এমনকি বস্তুবাদী, নাস্তিক ও সমাজতান্ত্রিক রুশরাও ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যের এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলো যে মহাগ্রন্থ আল-কোরআন মোহাম্মাদ নামক কোনো এক ব্যক্তির পক্ষে রচনা করা সম্ভব হয়নি এবং শুধু যে আরব উপদ্বীপে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাও নয় (এর বিশ্বজনীনতা একথা জানায় যে) এ গ্রন্থের অংশ বিশেষ আরবের বাইরে থেকেও সংগৃহীত হয়েছে!

এ কথা-দ্বারা তারা বুঝাতে চেয়েছে যে এ কেতাব আন্তর্জাতিকভাবে এতো বেশী গ্রহণ যোগ্যতা লাভ করেছে যে কোনো এক ব্যক্তি এটা এনেছে, বা কোনো এক ব্যক্তি কর্তৃক এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে–তা কিছুতেই হতে পারে না, অথবা কোনো একদল লোক বা একটি জাতির সৃষ্টি এ কোরআন তাও সম্ভব নয়, এর ব্যাপকতা, এর সার্বজনীনতা, কালের সীমা ডিংগিয়ে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে এর গ্রহণ যোগ্যতা এবং সকল জনপদের সকল প্রয়োজন ও সমস্যা সমাধান দানে এর উপযোগিতা–সব কিছু মিলে একথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, এ কেতাব নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা কোনো জনগোষ্ঠি দ্বারা রচিত হওয়া সম্ভব নয়!

সে কনফারেন্সে, এ কেতাবের মধ্যে যেসব তত্ত্ব ও তথ্যাদি রয়েছে, যে বিষয়ের আলোচনায় তারা যায়নি, এ কেতাব যে সঠিক ও সত্যনিষ্ঠ মানব-প্রকৃতির কণ্ঠস্বর তাও তারা অনুধাবন করতে পারেনি, এজন্যে তারা বলেনি, বলতে পারেনি যে এ কেতাব আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছ থেকে ওহী স্বরূপ নাযেল হয়েছে। নাযেল হয়েছে তাই যা মানুষের সুস্থ প্রকৃতি চায়, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রেরিত ওহীতে জানানো হয়েছে যে সৃষ্টি জগতের মালিক ও পালন কর্তা মহাশক্তিমান এক সত্ত্বা আছেন একথা অনেকে মানতে চায় না, মানতে চায় না ওহী রসূল ও নবীদের আগমনের কথা

অবশ্য আজ এই শতাব্দীর কিছু সংখ্যক বৈজ্ঞানিকও এমন ধারণা পোষণ করে।

এই ভ্রান্ত ধারণার জওয়াব দিতে গিয়ে আল কোরআন বলছে,

'যে আল্লাহর আয়াত সমূহের ওপর ঈমান আনে না, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা পথ দেখান না, আর তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।'

ওপরের আয়াতের আলোকে বুঝা যাচ্ছে ওই বেঈমানদেরকে এই কেতাবের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা সত্য সঠিক পথ দেখাননি তাদেরকে তিনি সত্যপথ দেখার সুযোগ করে দেননি যেহেতু তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি, শুধু তাই নয়, ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের সত্য থেকে দূরে থাকার কারণে কোনো বিষয়েই এহেন ব্যক্তিরা সঠিক পথ বেছে নিতে পারবে না। সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ায় এবং তাদের হেদায়েতের জন্যে অবতীর্ণ আয়ত সমূহকে অস্বীকার করার শাস্তি হিসাবেই তাদেরকে সঠিক পথে আসার আর কোনো সুযোগ দেয়া হবে না। জীবনের

দীর্ঘস্থায়ী গোমরাহীর পর পরবর্তী জীবনে রয়েছে তাদের জন্যে ভীষণ বেদনা দায়ক শাস্তি। একথাটাই এরশাদ হয়েছে, 'আর তাদের জন্যে রয়েছে বেদনা দায়ক আযাব।'

এরপর জানানো হচ্ছে যে মিথ্যা তৈরী করে বলা, এটা তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, তিনি সর্বশক্তিমান জীবন-মৃত্যুর মালিক ও সকল প্রকার কল্যাণের চাবিকাঠি একমাত্র তাঁরই হাতে–এ কথা তারা মানে না–মানে না যে তিনি সর্বত্র ও সকল সময় উপস্থিত, সবকিছু দেখেন এবং সকল কিছুর ব্যাপারে তারই কাছে হিসাব দিতে হবে। যিনি তাঁরই সরাসরি প্রতিনিধি, যাঁর জীবন, একমাত্র আল্লাহর বার্তা তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজে নিবেদিত, যিনি চির আমানতদার বলে তাদের সবার কাছে স্বীকৃত যিনি সদূকুল আমীন' বলে পরিচিত, যাঁর জীবনটা শুধু মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানোর কাজে নিয়োজিত, সেই মহানবী (স.)-এর পক্ষে মিথ্যা তৈরী করে বলা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'নিসন্দেহে তারাই মিথ্যা তৈরী করে বলে, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে না, আসলে এরাই হচ্ছে মিথ্যাবাদী।'

মিথ্যা হচ্ছে এক নির্লজ্জ অপরাধ, যা কোনো মোমেন ব্যক্তিই বলতে পারে না। রসূলুল্লাহ (স.) মিথ্যা কথা বলার ওপর চূড়ান্তভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। তিনি বলেছেন কোনো মুসলমান অন্য যতো অপরাধই করুক না কেন, সে মিথ্যা কথা বলতে পারে না।

ঈমান আনার পর কুফরীর পরিণতি

এরপর আলোচ্য প্রসংগ পরিবর্তিত হয়ে তাদের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান জানাচ্ছে, যারা ঈমান আনার পর কুফুরী করে; এরশাদ হচ্ছে,

যে ঈমান আনার পর কুফুরী করবে তাদের ওপর নেমে আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে মারাত্মক গযব, তবে কাউকে যদি ঈমান আনার কারণে কষ্ট দেয়া হয় এবং কষ্ট সহ্য করতে না পেরে যদি সে কুফুরী কথা উচ্চারণ করে বা কোনো কুফুরী কাজ করতে বাধ্য হয়, অথচ অন্তর তার সত্যবিশ্বাসে পরিপূর্ণ–ও ঈমানী শাক্তিতে পরিতৃপ্ত তাদের কথা ভিন্ন। কিন্তু যে তার অন্তরকে কুফরীর জন্যে উন্মুক্ত করে রাখে, অন্তরে কুফরীর আগ্রহ থাকে, তাদের ওপর আল্লাহর গযব। তাদের জন্যেই রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

ঈমান আনার কারণে প্রথম দিককার মুসলমানরা বহু কষ্ট পেয়েছেন। আল্লাহর একত্বের প্রতি সাক্ষ্য দেয়ার নিয়ম ছাড়া, এতো কষ্ট করে ঈমানের পথে টিকে থাকা তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। আখেরাতের জীবনকে যারা গুরুত্ব দিয়েছে, তারা এ জীবনে শত কষ্ট সহ্য করেও ঈমানের পথে দৃঢ় হয়ে থেকেছে। তারা কুফুরী ও গোমরাহীর দিকে ফিরে যাওয়ার থেকে দুনিয়ার কষ্ট পাওয়াকে শ্রেয় মনে করেছে।

বর্তমান আয়াতগুলোতে জানা যাচ্ছে ঈমান আনার পর কুফুরী যিন্দেগীতে ফিরে যাওয়াটা আরও বড় অপরাধ, কারণ ঈমান যখন সে এনেছে, অবশ্য বুঝে সুঝে এবং সত্যের পরশ পেয়েই এনেছে। ঈমান আনার অর্থ বাপ-দাদার প্রচলিত ব্যবস্থাকে ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর মোহব্বতে ও সত্যকে চিনতে পারার কারনেই ঈমান আনা, এরপর কুফুরীর পথে ফিরে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনটাকেই বড় মনে করা এবং আখেরাতের অনন্ত শান্তিপূর্ণ যিন্দেগীর তূলনায় দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী যিন্দেগীর আরাম-আয়েশকে প্রাধান্য দান–এইভাবে ঈমান আনার পর কুফুরী করে, নিজেদেরকে আল্লাহর আক্রোশের দিকে নিক্ষেপ করা হয়, এগিয়ে

দেয়া হয় নিজেদেরকে চিরন্তন ও মহা আযাবের দিকে এবং হারাম করে নেয়া হয় নিজেদের ওপর হেদায়াতকে এ নশ্বর দুনিয়ার জীবনের জন্যে নিজেদের সোপর্দ করা হয় এবং কান-চোখ ও অন্তরের ওপর কালিমা লেপে দেয়া হয়। এমন ব্যক্তিদের জন্যে অবশ্যই আখেরাতের শাস্তির ফয়সালা হয়ে আছে এবং তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একথা চূড়ান্তভাবে সত্য যে, যখন কোনো অন্তর আল্লাহর ওপর ঈমান আনে তখন তার ওপর এ জগতের কোনো কিছুর প্রভাব পড়া না জায়েয হয়ে যায়। অবশ্যই পৃথিবীর জীবনের একটা মূল্য আছে, তেমনি মুল্য আছে আখেরাতের যিন্দেগীর। এই উভয় জীবনের মূল্য একটা আর একটার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না; অর্থাৎ যে যেটাকে প্রাধান্য দেয়, তাকে সেটা নিয়েই থাকতে হয়। দুনিয়ার জীবনকে যে মূখ্য মনে করে তার জন্যে আখেরাতে কিছুই থাকে না। আখেরাতকে যে মূখ্য বানায়, দুনিয়ায় তাকে অবশ্যই কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, জীবন হয়ে যায় তার জন্যে অনেক সময় কষ্টকর, কিন্তু দুনিয়ার জীবনে সে একবারে কিছু পায় না এটা ঠিক নয়। (এ বিষয়ে সূরায়ে শূরা-তে বলা হয়েছে, 'যে প্রধানত আখেরাতের ফসল চায়, আমি মহান আল্লাহ তার ফসলকে আরও বাড়িয়ে দেব, আর যে প্রধানত দুনিয়ার ফসল চায় আমি তাকে এর থেকে কিছু দেব; কিন্তু আখেরাতে তার জন্যে কোনো অংশই থাকবে না)।' আকীদা কোনো খেলার বস্তু নয়, নয় এটা কোনো তুচ্ছ সওদা–যে ইচ্ছা হল গ্রহণ করলাম, আর ইচ্ছা হল ত্যাগ করলাম–এই গ্রহণ বর্জনের সাধারণ নিয়ম ও সাধারণ চিন্তা থেকে এ বিষয়টি আরও বহু বহু উর্ধের মর্যাদা পাওয়ার দাবীদার। এই কারণেই এ বিষয়ে সঠিক ফয়সালা নিতে না পারার অপরাধ বড়, তেমনি এর শাস্তিও অত্যন্ত কঠিন

বর্ণিত বিধানের আওতা থেকে কেবল তাদেরকে বাদ দেয়া হয়েছে যাদেরকে কুফুরী কালাম মুখে উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হলেও তাদের অন্তর কখনও তাতে সায় দেয় না, বরং তাদের মন আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান ও বিশ্বাসের ওপরই অটল থাকে। ধ্বংস বা মৃত্যুর হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কখনও মৌখিকভাবে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করলেও তাদের মন কিন্তু ঈমানের ওপরই অবিচল থাকে এবং সন্তুষ্ট থাকে। আলোচ্য আয়াতটি বিশিষ্ট সাহাবী আম্মার ইবনে ইয়াসেরের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

ঈমান রক্ষায় সাহাবায়ে কেরামদের আত্মত্যাগ

ইবনে জারীর নিজস্ব সূত্রের বরাত দিয়ে আবু উবাইদা মোহাম্মদ বিন আম্মার বিন ইয়াসের থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একবার মোশরেকরা আম্মার ইবনে ইয়াসেরকে পাকড়াও করে নিয়ে গিয়ে তার ওপর কঠিন নির্যাতন চালাতে থাকলে এক পর্যায়ে এসে আম্মার ইবনে ইয়াসের ওই মোশরেকদের কথা মতো কাজ করতে রাযী হয়ে যান। তিনি ঘটনাটি রসূল (স.)-কে জানান। রসূল (স.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার মনের অবস্থা কী?' তিনি উত্তরে বললেন, 'ঈমানের ওপর অটল আছে' এর পর রসূল (স.) তাঁকে বললেন, 'তারা যদি পুনরায় তোমার ওপর আক্রমণ করে তাহলে তুমি তাদের কথা মতো কাজ করবে।' অর্থাৎ এ ধরনের পরিস্থিতিতে কুফুরী কালাম মৌখিকভাবে উচ্চারণ করার অনুমতি আছে।

কিন্তু অনেক মোমেন বান্দা এমনও আছে যারা জীবন দিতে রাযী, কিন্তু কখনও কুফুরী কালাম মুখে আনতে রাযী নয়। এর নযীর বিশিষ্ট মহিলা সাহাবী হযরত সুমাইয়া। তাকে তার লজ্জাস্থানে বর্ষার আঘাত করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু তবুও তিনি আল্লাহর সাথে কুফরী করতে রাযী হননি। ঠিক এরূপ ঘটনাই বিশিষ্ট সাহাবী ইয়াসের (রা.)-এর সাথেও ঘটেছে।

হযরত বেলাল (রা.)-এর নির্যাতনের লোমহর্ষক ঘটনা সকলেরই জানা আছে। তাকে উত্তপ্ত বালুর ওপর ফেলে রেখে তাঁর বুকের ওপর বড় বড় পাথর চাপা দেয়া হতো এবং তাকে আল্লাহর সাথে শেরেক করতে বলা হতো। কিন্তু তিনি মোশরেকদের নির্দেশ অমান্য করে বলতে থাকতেন, 'আহাদ, আহাদ' অর্থাৎ লা শরীক আল্লাহ, লা শরীক আল্লাহ।' তিনি আরও বলতেন, 'তোমাদের মনে হিংসার আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার মতো এর চেয়েও যদি মারাত্মক কোনো শব্দ আমার জানা থাকতো সেটাও আমি এই মুহূর্তে উচ্চারণ করতাম।'

হযরত হুবায়র ইবনে যায়েদ আল্ আনসারীর সাথেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিলো। ভন্ড নবী মুসায়লামা আল কায্যাব তাকে বলেছিলো, মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল-এ কথা কি তুমি বিশ্বাস করো? তিনি বললেন, হাঁ। তারপর সে পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি যে, আল্লাহর রসূল এ কথা কি তুমি বিশ্বাস করো? উত্তরে তিনি বললেন, আমি শুনতে পাচ্ছি না। এই কথা শুনার পর ওই ভন্ড ও মিথ্যুক তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললো। কিন্তু তা সত্তেও তিনি ওকে নবী বলে স্বীকার করেননি।

বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ এবনে আসাকের হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযায়ফা আস্-সাহমী (রা.)-এর জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা প্রসংগে লিখেছেন যে, এক বার তাঁকে রোমান সৈন্যরা পাকড়াও করে তাদের বাদশার কাছে উপস্থিত করলো। বাদশা তাঁকে বললো, তুমি যদি খৃষ্টান হয়ে যাও তাহলে তোমাকে আমি আমার রাজত্বে অংশীদার করবো এবং আমার কন্যাকে তোমার সাথে বিবাহ দিয়ে দেবো। তিনি উত্তরে বললেন, তুমি যদি তোমার গোটা রাজত্ব, এমন কি গোটা আরববাসীদের সম্পদও দান করো এবং বিনিময়ে আমাকে ক্ষণিকের জন্যে মোহাম্মদ (স.)-এর ধর্ম থেকে সরে আসতে বলো, তাহলেও আমি এমন কাজ কখনও করবো না। এর পর বাদশা তাঁকে বললো, তাহলে তো আমি তোমাকে হত্যা করবো। উত্তরে তিনি বললেন, সেটা তোমার ইচ্ছা। এ কথা শুনে অত্যাচারী বাদশাহ তাকে শূলীতে উঠানোর নির্দেশ দিলো এবং কাছে থেকে তাঁর হাতে ও পায়ে তীরের আঘাত করতে বললো। যখন তাঁকে তীরের আঘাত করা হচ্ছিলো তখনও তিনি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করছিলেন। এর পর তাঁকে শূলী থেকে নিচে নামিয়ে তাঁর সামনে একটি ডেকচী, অন্য বর্ণনায় পিতলের একটি গাভী, রাখা হলো এবং সেটাতে আগুন রেখে উত্তপ্ত করা হলো। মুসলমান কয়েদীদেরকে একজন একজন করে তাঁর চোখের সামনেই নিক্ষেপ করা হচ্ছিল। উত্তপ্ত লোহার তাপে তাদের দেহ জ্বলন্ত হাড়ে রূপান্তরিত হচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁকে পুনরায় একই প্রস্তাব করা হলে তিনি তা অস্বীকার করেন। এর পর তাঁকে ওই উত্তপ্ত ডেকচীতে ফেলে দিতে নির্দেশ দেয়া হলো। যখন তাঁকে ডেকচীর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। বাদশা মনে মনে ভাবলো এই বার বুঝি কাজ হবে। তাই তাঁকে কাছে ডাকলো। তিনি বাদশাহকে বললেন, আমি কাঁদছি এ জন্যে যে, আমার মাত্র একটাই প্রাণ। আর একটা প্রাণই ঘন্টা খানেকের জন্যে আল্লাহর জন্যে শাস্তি ভোগ করবে। আমার ইচ্ছা হয় যদি আমার দেহের প্রতিটি লোমে একটি করে প্রাণ থাকতো এবং এই সব কটি আল্লাহর জন্যে শাস্তি ভোগ করতো।

অন্য বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত সাহাবীকে জেলে আটক করে তাঁকে কয়েক দিন পর্যন্ত অভুক্ত রাখা হয়েছিলো। এরপর তাঁর কাছে মদ ও শুকরের মাংস পাঠানো হলো। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। এরপর তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি খাচ্ছো না কেন? তিনি উত্তরে বললেন, প্রাণ রক্ষার জন্যে ওগুলো খাওয়া আমার জন্যে বৈধ ছিলো। কিন্তু আমি চাই না যে, এর

ফলে আমার প্রতি করুণা প্রদর্শনের একটা সুযোগ আপনার ঘটুক। বাদশা তাকে বললো, ঠিক আছে তুমি আমার মাথায় চুমো খাও, তাহলে তোমাকে আমি ছেড়ে দেবো। তিনি বললেন, আমি চুমু খাবো যদি আমার সাথে সাথে সকল মুসলমান বন্দীদেরকে আপনি ছেড়ে দেন। বাদশাহ বললো, ঠিক আছে। তিনি তার মাথায় চুমু খেলেন। ফলে বাদশা তাকে এবং তাঁর সাথে সাথে অন্যান্য সকল বন্দীদেরকেও মুক্ত করে দিলো। তিনি যখন ফিরে আসলেন তখন আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.) বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে হোযায়ফার মাথায় চুমু খাওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে উচিত। আমিই এ কাজটি প্রথমে করছি। এরপর তিনি নিজের আসন থেকে উঠে গিয়ে তার মাথায় চুমু খেলেন।

এর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। এখানে আপোষের কোনো সুযোগ নেই, শৈথিল্যের কোনো সুযোগ নেই। এই আকীদা-বিশ্বাসকে রক্ষা করতে গিয়ে চড়া মূল্য দিতে হয়। তা সত্তেও মোমেনের এর স্থান অনেক বড়, আল্লাহর কাছেও এর প্রতিদান অনেক বড়, এই আকীদা-বিশ্বাস হচ্ছে একটা পবিত্র আমানত। এই আমানত কেবল সেই মহাপ্রাণ ব্যক্তিরাই রক্ষা করতে পারে যারা জীবন উৎসর্গ করতে রাযী, যাদের কাছে ওই আমানতের তুলনায় তাদের জীবন-যৌবন ও আরাম-আয়েশের সকল সামগ্রীই তুচ্ছ এবং নগণ্য। (আয়াত ১১০-১১১)

আলোচ্য আয়াতে দুর্বলচিত্ত মক্কাবাসীদের কথা বলা হয়েছে যাদেরকে যুলুম-অত্যাচার ও শাস্তির মাধ্যমে মোশরেকরা ইসলাম ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে এরা সুযোগ বুঝে দেশ ত্যাগ করে যথার্থ রূপে ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত হয় এবং পরম ধৈর্য-সহ্য ও ত্যাগ তিতীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে শরীক হয়। ফলে আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন বলে সুসংবাদ দান করে বলেন,

'এ সবের পরও তোমার প্রভু নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'

যে কঠিন ও ভয়াবহ দিনটিতে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে সেদিন প্রত্যেকই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। অন্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করার মতো অবকাশও থাকবে না। প্রত্যেকেরই চেষ্টা থাকবে নিজেকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে কিভাবে মুক্ত রাখা যায়। এ জন্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ পক্ষে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে, যুক্তি-প্রমাণ পেশ করবে। কিন্তু এসবে আদৌ কোনো লাভ হবে না। কারণ প্রত্যেকেই সেদিন স্ব স্ব কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে। কারো প্রতি আদৌ কোনো অন্যায় ও অবিচার করা হবে না। (আয়াত ১১২-১২৮)

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ
مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا
كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ
وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١١٣﴾ فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ص وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ
اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١١٤﴾ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ
وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ج فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ
فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٥﴾ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا
حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ
عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿١١٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ص وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١٧﴾

১১২. আল্লাহ তায়ালা এমন একটি জনপদের উদাহরণ (তোমাদের সামনে) উপস্থাপন করছেন, যা ছিলো নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, (সেখানে) চারদিক থেকে তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণ রেযেক আসতো, অতপর (এক পর্যায়ে) তারা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করলো, ফলে তারা যে আচরণ করে বেড়াতো তার শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক পরিয়ে শাস্তি দিলেন। ১১৩. অবশ্যই তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল এসেছিলো, অতপর তারা তাকে অস্বীকার করলো, (পরিশেষে আল্লাহর) আযাব তাদের যুলুম করা অবস্থায় পাকড়াও করলো! ১১৪. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যা কিছু পবিত্র ও হালাল রেযেক দিয়েছেন তোমরা তা আহার করো, যদি তোমরা একান্তভাবে তাঁরই গোলামী করো, তাহলে (এ জন্যে) আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। ১১৫. তিনি তো তোমাদের ওপর (শুধু) মৃত (জন্তু), রক্ত এবং শুয়োরের গোশতই হারাম করেছেন, (আরো হারাম করেছেন) এমন জানোয়ার যার ওপর (যবাই করার সময়) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে, কিন্তু যদি কাউকে (এর কোনো একটার জন্যে) বাধ্য করা হয়– সে যদি বিদ্রোহী কিংবা সীমালংঘনকারী না হয়, তাহলে (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ১১৬. তোমাদের জিহ্বা আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে বলেই কখনো একথা বলো না যে, এটা হালাল ও এটা হারাম, (জেনে রেখো,) যারাই আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তারা কখনোই সাফল্য লাভ করতে পারবে না। ১১৭. (তাদের জন্যে এটা পার্থিব জীবনের) সামান্য কিছু সামগ্রী (মাত্র, পরকালে) তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ
وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ
بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿١١٩﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾
وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾ ثُمَّ
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾
إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ

১১৮. (হে নবী,) ইহুদীদের ওপর আমি সেসব কিছু হারাম করেছি যা ইতিপূর্বে আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি, (এগুলো হারাম করে) আমি তাদের ওপর কোনো অবিচার করিনি, বরং তারা (আমার আদেশ না মেনে) নিজেরাই নিজেদের ওপর অবিচার করেছে। ১১৯. অতপর অবশ্যই তোমার মালিক (তাদের ওপর দয়া করেছেন) যারা অজ্ঞতাবশত কোনো গুনাহের কাজ করলো, অতপর (অন্যায় বুঝতে পেরে) তাওবা করলো এবং (সে অনুযায়ী) নিজেদের সংশোধনও করে নিলো (হে নবী,) তোমার মালিক অবশ্যই এরপর তাদের জন্যে (হবেন) ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

রুকু ১৬

১২০. নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলো একটি উম্মত (-এর সমমর্যাদাবান, সে ছিলো) আল্লাহর একান্ত অনুগত ও একনিষ্ঠ (বান্দা), সে কখনো মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না, ১২১. (সে ছিলো) আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তায়ালা তাকে (নবুওতের জন্যে) বাছাই করেছেন এবং তাকে তিনি সরল পথে পরিচালিত করেছেন। ১২২. আমি তাকে দুনিয়াতেও (প্রচুর) কল্যাণ দান করেছি, আর পরকালেও সে নিসন্দেহে নেক মানুষদের অন্তর্ভুক্ত (হবে); ১২৩. অতপর (হে নবী,) আমি তোমার ওপর ওহী পাঠালাম যে, তুমি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করো; আর সে কখনো মোশরেকদের দলভুক্ত ছিলো না। ১২৪. শনিবার (পালন করা) তো কেবল তাদের জন্যেই (বাধ্যতামূলক) করা হয়েছিলো, যারা এ (বিষয়টি) নিয়ে (অযথা) মতবিরোধ করেছে; অবশ্যই তোমার মালিক কেয়ামতের দিন তাদের মাঝে সে সব বিষয়ে মীমাংসা করে দেবেন, যেসব বিষয়ে সেখানে তারা মতবিরোধ করতো। ১২৫. (হে নবী,) তুমি তোমার

بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

মালিকের পথে (মানুষদের) প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান করো, (কখনো তর্কে যেতে হলে) তুমি এমন এক পদ্ধতিতে যুক্তিতর্ক করো যা সবচাইতে উৎকৃষ্ট পন্থা; তোমার মালিক (এটা) ভালো করেই জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিপথগামী হয়ে গেছে, (আবার) যে ব্যক্তি (হেদায়াতের) পথে রয়েছে তিনি তার সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত আছেন। ১২৬. যদি তোমরা কাউকে শাস্তি দাও তাহলে ঠিক ততোটুকু শাস্তিই দেবে যতোটুকু (অন্যায়) তোমাদের সাথে করা হয়েছে; অবশ্য যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো তাহলে (জেনে রেখো,) ধৈর্যশীলদের জন্যে তাই হচ্ছে উত্তম। ১২৭. (হে নবী,) তুমি (নির্যাতন নিপীড়নে) ধৈর্য ধারণ করো, তোমার ধৈর্য (সম্ভব হবে) শুধু আল্লাহ তায়ালার সাহায্য দিয়েই, এদের (আচরণের) ওপর দুঃখ করো না, এরা যে সব ষড়যন্ত্র করে চলেছে তাতে তুমি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না। ১২৮. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে রয়েছেন যারা (জীবনের সর্বত্র) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলে, (সর্বোপরি) তারা হবে সৎকর্মশীল।

তাফসীর

আয়াত-১১২-১২৮

ইতিপূর্বে আলোচ্য সূরায় আকীদা সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার রূপে বুঝানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক দুটো দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। এখানে মক্কাবাসীদের অবস্থা ব্যক্ত করার জন্যে আরও একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হচ্ছে। এই মক্কাবাসীরা ছিলো মোশরেক। তারা আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করেও বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে, বেঈমানী করেছে। তাই তাদেরকে কঠিন ও ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখী হতে হয়েছে। বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে।

দৃষ্টান্তের শুরুতেই আল্লাহর নেয়ামতের বিষয়টি এসেছে। এ নেয়ামত ছিলো পর্যাপ্ত পরিমাণে। এ সব নেয়ামত তারা পরম শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ভোগ করতো। অসংখ্য হালাল ও পবিত্র নেয়ামত তাদেরকে দান করা হয়েছিলো। কিন্তু ওরা নিজেরাই বিভিন্ন কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে এ গুলোকে নিজেদের জন্যে নিষিদ্ধ করে নিয়েছে। অথচ আল্লাহ পাক সেগুলো তাদের জন্যে বৈধ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বরং তিনি হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তুগুলোর বর্ণনা বিশদভাবে তুলে ধরেছেন

যার আওতায় ওই হালাল ও পবিত্র নেয়ামতগুলো পড়ে না। তা সত্ত্বেও তারা সেগুলোকে নিজেদের জন্যে নিষিদ্ধ বানিয়ে নেয়। এটা আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করারই নামান্তর এবং এক ধরনের অকৃতজ্ঞতাও বটে। কাজেই এই অপরাধের জন্যে তাদেরকে অবশ্যই মর্মান্তিক ও বেদনা দায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। কারণ, এই অপকর্মের মাধ্যমে তারা অহেতুক আল্লাহর প্রতি একটা অপবাদ আরোপ করেছে।

আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের জন্যে নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর বর্ণনা প্রসংগে ইহুদী সম্প্রদায়ের জন্যে যে সব পবিত্র ও হালাল বস্তু ওদের বাড়াবাড়ি ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে হারাম করা হয়েছে সে গুলোর প্রতিও ইংগীত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যুগে এসব জিনিস হারাম ছিলো না। কারণ তিনি ও তাঁর সন্তানরা ছিলেন সত্যের অনুসারী ও হকপন্থী। শেরেক ও কুফুরী কাজ থেকে তারা ছিলেন মুক্ত। তাঁরা আল্লাহর শোকর গোযার ও কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলেন। কাজেই ওই সব নেয়ামত তাদের জন্যে হালাল ছিলো, বৈধ ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে পড়লো এবং বিভিন্ন পাপাচারে গা ভাসিয়ে দিতে লাগলো, তখন শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ পাক ঐসব হালাল ও পবিত্র নেয়ামতগুলো তাদের জন্যে হারাম করে দিলেন। তবে যারা তওবা করে পুনরায় সৎপথে ফিরে আসবে, তাদের প্রতি আল্লাহ পাক অবশ্যই দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন করবেন।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিধানের ধারাবাহিকতায় ও অনুসরণে হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর বিধানের আগমন ঘটে। ফলে সেই নিষিদ্ধ বস্তু গুলোকে পুনরায় হালাল বা বৈধ করা হয়। ঠিক তেমনি শনিবারের বিষয়টিরও মীমাংসা করা হয়। এই দিনে ইহুদী সম্প্রদায়ের জন্যে মৎস শিকারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিলো। কিন্তু এদের এক দল এই নিষেধাজ্ঞার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে মৎস শিকার থেকে বিরত ছিলো, পক্ষান্তরে অপর এক দল এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মৎস শিকারে লিপ্ত হয়েছিলো। ফলে আল্লাহ পাক তাদের চেহারা বিকৃত করে তাদেরকে মনুষত্যের স্তর থেকে নিচে নামিয়ে এনেছিলেন।

আলোচ্য সূরায় শেষের দিকে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (স.)-কে সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং বিচক্ষণতার সাথে দ্বীনের পথে মানুষকে আহ্বান করবে নির্দেশ প্রদান করবে। প্রয়োজন হলে তাদের সাথে সঠিক ও সুন্দর পন্থায় যুক্তি-তর্কেরও নির্দেশ দিয়েছেন। তবে ভিন্নমতাবলম্বীদের সাথে সব সময়ই ন্যায় ও ইনসাফ এবং উদারতা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে। সাথে সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, চরম ফলাফল ও শেষ পরিণতি সত্যের অনুসারী আল্লাহভীরু লোকদের পক্ষেই থাকবে। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ পাক তাদের সমর্থক, তাদের সহায়ক, তাদের রক্ষক এবং মঙ্গল ও কল্যাণের পথে তাদের দিশারী। (আয়াত ১১২-১১৩)

আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

আলোচ্য আয়াতে তৎকালীন মক্কার অবস্থাই দৃষ্টান্তের সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে। এই মক্কায়ই আল্লাহর ঘর স্থাপন করা হয়েছে। এটাকে নিরাপদ নগরী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ নগরে যে প্রবেশ করবে সে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে। সে হত্যাকারী হলেও তাকে কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। কেউ তার ক্ষতি করার সাহস পাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর পবিত্র ঘরের সান্নিধ্যে থাকবে। কাবা ঘরের আশে-পাশে লোকজনকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো, তাদেরকে অপহরণ করা হতো। কিন্তু মক্কার বাসিন্দারা ওই পবিত্র ঘরের স্যান্নিধ্যে বসবাস করার কারণে তারা নিরাপদ ছিলো, সুখে-শান্তিতে ছিলো। বিভিন্ন কাফেলা ও বহিরাগত হজ্জযাত্রীদের মাধ্যমে তাদের

কাছে প্রচুর ও পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী আসতো পৃথিবীর আনাচে-কানাচে থেকে। তারা যে বেলাভূমিতে বাস করতো তা ছিলো অত্যন্ত শুষ্ক ও অনুর্বর। সেখানে কোনো শস্যই উৎপন্ন হতো না। তাই তাদের কাছে জীবিকা স্বরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে ফলমূল আসতো প্রচুর পরিমাণে। শুধু তাই নয়, তারা তাদের আদি পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার বরকতে অত্যন্ত সুখ-শান্তিতে বসবাস করছিলো, আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করছিলো।

পরবর্তীতে তাদেরই বংশ থেকে একজন সত্য ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে নবী হিসাবে পাঠানো হয়। তারা তাঁকে ভাল করেই চিনতো ও জানতো। তাঁর চরিত্রে কোনো দোষ তারা খুঁজে পায়নি। তাঁকে তাদের জন্যে এবং গোটা বিশ্বের জন্যে রহমত স্বরূপ পাঠানো হয়েছিলো। তাঁর প্রচারিত মতবাদ ইবরাহীম (আ.)-এর মতবাদেরই অনুরূপ ছিলো। সেই ইবরাহীম (আ.) যিনি কাবা ঘরে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং যে পবিত্র ঘরের সান্নিধ্যে ও ছায়াতলে বসবাস করার কারণে তারা সুখে-শান্তিতে ছিলো, আরাম-আয়েশের মধ্যে দিন গোযরান করছিলো। অথচ তারাই ওই সত্য নবীকে অস্বীকার করে বসলো, তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধ ছড়াতে লাগলো, তাঁর ওপর এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর যুলুম-অত্যাচার চালাতে লাগলো। যালিম ও অত্যাচারী না হলে এ ধরনের আচরণ তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না।

যে দৃষ্টান্তটি আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করছেন সেটা পরিপূর্ণভাবে তাদের অবস্থার সাথে মিলে যাচ্ছে। এমনকি দৃষ্টান্তে যে করুণ পরিণতির কথা বলা হয়েছে, সেটাও তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে। তাদের অবস্থা সেই গ্রামের বাসিন্দাদের অবস্থার ন্যায় যারা ছিলো নিরাপদ। তাদের কাছে সকল স্থান থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী আসতো। কিন্তু তারা আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করলো, তাঁর প্রেরিত রসূলকে অস্বীকার করলো। ফলে তাদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ গ্রহণ করালেন।

আলোচ্য আয়াতে ক্ষুধা ও ভীতিকে মূর্ত করে তুলে ধরার জন্যে পোশাক এর আকৃতিতে চিত্রায়িত করা হয়েছে। এই পোশাকের স্বাদ যখন তারা গ্রহণ করবে তখন এর প্রভাব হবে গভীর যা অনুভূতির প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তৃত হবে এবং হৃদয়ের গভীরে রেখাপাত করবে। কারণ, ত্বকের সাথে পোশাকের স্পর্শ দ্বারা যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়, আস্বাদনের অনুভূতি তার তুলনায় অনেক গভীর ও প্রভাব সৃষ্টিকারী। ফলে এই ভয়াবহ পরিণতির ঘটনা জেনে ওরা যেন সতর্ক হয়ে যায়। জীবিকা ও নেয়ামতের বর্ণনা এবং একই সাথে নিষেধাজ্ঞা ও বঞ্চনার বর্ণনা প্রদানের পর আল্লাহ পাক তাদেরকে লক্ষ্য করে একটা নির্দেশ দিচ্ছেন। এতে বলা হচ্ছে যে, তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকো, এই বিশ্বাসের ওপর অটল ও দৃঢ় থাকতে চাও, একান্তভাবে কেবল আল্লাহরই আনুগত্য ও দাসত্ব করতে চাও এবং সকল প্রকার শেরেকী ও কুফুরী কাজ কর্ম থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে চাও, তাহলে আল্লাহ যে সব পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্যে জীবিকা হিসাবে হালাল করেছেন সেগুলো গ্রহণ করো এবং এই নেয়ামতের শোকর আদায় করো। আয়াতে বলা হচ্ছে,

'তিনিই সমুদ্রকে (তোমাদের) অনুগত করে দিয়েছেন-যেন তার মধ্য থেকে তোমরা তাজা (মাছও তার) গোস্ত খেতে পারো এবং তা থেকে (মনিমুক্তার) গহনা আহরণ করো যা দিয়ে তোমরা অলংকৃত হতে পারো। তোমরা দেখতে পাচ্ছো, কিভাবে ওর বুক চিরে জলযানগুলো এগিয়ে চলে এবং (তা একারণে যে) তোমরা এর মাধ্যমে আল্লাহর (রেযেকের) অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারবে (সবচাইতে বড়ো কথা) তোমরা যেন তার (এসব নেয়ামতের) কৃতজ্ঞতা আদায় করো।' (আয়াত ১১৪)

হালাল হারামের সীমা

এরপর যে সব বস্তু তাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে সেগুলোর একটা বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এর বাইরে আর কোনো কিছুই হারাম বলে গণ্য করা যাবে না–ঐ কথাটি তাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়া। আয়াতে বলা হচ্ছে,

'তিনিই যমীনের মধ্যে সুদৃঢ় পাহাড় সমূহকে রেখে দিয়েছেন, যাতে করে (যমীন) তোমাদের নিয়ে (এদিকে সেদিক) ঢলে না পড়ে, তিনিই নদী (প্রবাহিত করেছেন) পথঘাট (বানিয়ে দিয়েছেন) যাতে করে তোমরা (জলে স্থলের সব জায়গা দিয়ে) গন্তব্যস্থলে পৌছুতে পারো।' (আয়াত ১১৫)

মৃত জানোয়ার, রক্ত, শুকরের মাংস এবং গায়রুল্লাহর নামে জবাইকৃত পশুর মাংসকে হারাম করা হয়েছে। কারণ এগুলো হয় দেহের জন্যে ও মনের জন্যে ক্ষতিকর অথবা আকীদা-বিশ্বাসের জন্যে ক্ষতিকর। মৃত পশু, রক্ত এবং শুকরের মাংস দেহ ও মনের জন্যে ক্ষতিকর, আর গারুল্লাহর নামে জবাইকৃত পশুর মাংস আকীদা-বিশ্বাসের জন্যে ক্ষতিকর। তাই এগুলোকে হারাম করা হয়েছে। তবে কেউ যদি কেবল জীবন রক্ষার খাতিরেই সেগুলো গ্রহণ করে তাহলে আল্লাহ পাক তাদেরকে পাকড়াও করবে না, বরং তাদের এই বিষয়টিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। কারণ, তিনি তো দয়ালু ও ক্ষমাশীল। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, এই ধর্ম কত সহজ ও বাস্তবধর্মী। তবে এসব হারাম বস্তু গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এবং মূলনীতির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা চলবে না এবং প্রয়োজনের অতিরিক্তও গ্রহণ করা যাবে না। এ বিষয়ে ইসলামী আইন বিশারদের মাঝে কিছুটা মতপার্থক্য আছে যার বর্ণনা ইতিপূর্বে এসেছে।

খাদ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে হালাল ও হারামের সীমারেখা ওই পর্যন্ত বিস্তৃত। এর বাইরে আর কোনো হালাল হারামের বিধান নেই। কাজেই শেরেকী মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই সীমারেখা লঙ্ঘন করবে না এবং হালালকে হারাম বলতে যাবে না। কারণ, হালাল-হারাম ও বৈধ-অবৈধের চূড়ান্ত মীমাংসা আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকে। এটা একটা বিধি-বিধানের বিষয়। আর এই বিষয়টি নিধারণের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত। যারা এই কর্তৃত্বের অধিকারী বলে দাবী করে অথচ এই দাবীর পেছনে আল্লাহর কোনো সমর্থন নেই, কোনো নির্দেশ নেই তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী। তারা আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে বেড়ায়। এই শ্রেণীর লোকেরা কখনও স্বীয় উদ্দেশ্যে সফলকাম ও কামিয়াব হতে পারবে না। এ কথাই এই আয়াতটিতে বলা হচ্ছে।

'(তিনি যমীনে তোমাদের জন্যে দিক নির্ণায়ক) চিহ্নসমূহ (সৃষ্টি করেছেন, তাছাড়া) নক্ষত্রের (অবস্থানের) দ্বারাও মানুষ পথের দিশা পায়।' (আয়াত ১১৬)

অর্থাৎ নিজেরা পরস্পর যেমন মিথ্যা কথা বলে থাকো, সে ধরনের মিথ্যা কথা দিয়ে বলে বেড়িয়োনা যে, এটা হালাল আর ওটা হারাম। কারণ, আল্লাহর সুস্পষ্ট বিধান ব্যতীত কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম বলে আখ্যায়িত করা জঘন্য মিথ্যাচার বৈ আর কিছু নয়। আর এ ধরনের মিথ্যাচার স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধে বলেই গণ্য হবে। সুতরাং যারা স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যাচারে লিপ্ত হবে তাদের ভাগ্যে এই ক্ষণস্থায়ী স্বল্প পার্থিব আরাম-আয়েশ ব্যতীত আর কিছুই জুটবে না। এর পর তো তাদের ভাগ্যে মর্মান্তিক শাস্তি, ব্যর্থতা ও দুর্দশাই জুটবে।

এর পরও মানুষ আল্লাহর নির্দেশ ও বিধানের আশ্রয় ছাড়াই আইন-কানুন রচনা করে চলছে আর আশা করছে এর মাধ্যমে তারা ইহকালে ও পরকালে পুরস্কৃত হবে, সফলকাম হবে!

সূরায়ে আনয়ামের ১৪৬ নং আয়াতে ইহুদী সম্প্রদায়ের জন্যে যে সব জীব-জন্তু ও দ্রব্যাদি হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলো মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য হবে না। কারণ, আল্লাহ পাক ইহুদী জাতিকে শায়েস্তা করার জন্যেই এসব বস্তু তাদের জন্যে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। এ কথাই পুনরায় এই আয়াতটিতে ব্যক্ত করা হয়েছে। (আয়াত ১১৮-১১৯)

আল্লাহ পাক পবিত্র ও হালাল বস্তুগুলো হারাম করে দিয়ে ইহুদী জাতিকে যে শাস্তি দিয়েছেন, তা ওদের জন্যে একটা উপযুক্ত শাস্তিই বটে। কারণ, ওরা সীমালঙ্ঘন করেছিলো, আল্লাহর সুস্পষ্ট বিধানের পরিপন্থী কাজে লিপ্ত ছিলো। কাজেই ওরা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে; আল্লাহ পাক তাদের ওপর যুলুম করেননি। তবে অজ্ঞতা বশত এই অপকর্মের জন্যে যারা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করবে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আর এ ধরনের কোনো অপকর্মে লিপ্ত হবে না, বরং নিজেকে পরিপূর্ণরূপে সংশোধন করে নেবে এবং সদা সৎকাজে লিপ্ত থাকবে, তারা আল্লাহর ক্ষমা, দয়া ও সুদৃষ্টি লাভে সক্ষম হবে। এখানে কেবল ইহুদী গোনাহগারদের কথাই বলা হয়নি বরং কেয়ামত পর্যন্ত সকল গোনাহগার বান্দাদের কথাও এতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তওবা ও সৎকাজের মাধ্যমে সকলেই আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভে সক্ষম হবে।

ইহুদী জাতির জন্যে হারাম ঘোষিত বিষয়াদি বর্ণনা করতে গিয়ে এবং কোরায়শ বংশীয় মোশরেকদের পক্ষ থেকে 'ইবরাহীমের আদর্শের' অনুসারী বলে দাবী করার বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক স্বয়ং ইবরাহীম (আ.)-এর আদর্শ ও বিধানের স্বরূপও বর্ণনা করছেন। এর মাধ্যমে তাঁর ধর্মের আসল চিত্রটি ধরা পড়বে এবং এই ধর্মের সাথে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর ধর্মের কি মিল ও সাজুস্য রয়েছে, সেটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে। সাথে সাথে এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, ইহুদীরা যা কিছু নিজেদের জন্যে হারাম করে নিয়েছে সেগুলো ইবরাহীম (আ.)-এর আমলে হারাম ছিলো না। নিচের আয়াতে এ প্রসংগেই আলোচনা করা হয়েছে।

'আল্লাহকে বাদ দিয়ে এরা (কার্যসিদ্ধির জন্যে) যাদের......যখন এদের (কোরআন সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করা হয় তোমাদের মালিক কি ধরনের জিনিস নাযিল করলেন তখন তারা বলে, এটা তো সেকালের উপকথা (ছাড়া আর কিছুই নয়)।' (আয়াত ১২০-১২৪)

হযরত ইবরাহীমের বিশেষ মর্যাদা

পবিত্র কোরআনে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে সত্যের অনুসারী, অনুগত, কৃতজ্ঞ এবং আল্লাহমুখী একজন আদর্শ মানব রূপে পেশ করে। তাঁর সম্বন্ধে এখানে ওই ভাবে বর্ণনা দিয়ে বলা হচ্ছে যে, তিনি একটা 'জাতি' ছিলেন। 'জাতি' শব্দ প্রয়োগ করে সম্ভবত এ কথা বলা হচ্ছে যে, একটি গোটা জাতির মাঝে যে পরিমাণ মঙ্গল, আনুগত্য ও বরকত থাকতে পারে তাঁর একার মাঝেই তা বিদ্যমান ছিলো। সুতরাং এদিক থেকে তিনি একটা পূর্ণাংগ জাতির সমপর্যায়ের। অথবা 'উম্মত' শব্দ দ্বারা 'ইমাম' বা নেতা বুঝানো হয়েছে যাকে মানুষ, সৎ, মঙ্গল ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে অনুসরণ করে হাদীস নির্ভর তাফসীরে এই উভয় অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। দুটো অর্থই কাছাকাছি। কারণ যে ধর্মীয় নেতা মানুষকে সত্যের সন্ধান দেন, ন্যায়ের পথে তাদেরকে পরিচালিত করেন তিনি নিজেও ওই সব লোকদের ন্যায় সওয়াবের ভাগী হবেন। অর্থাৎ গোটা উম্মত তাঁর মাধ্যমে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে যে সব সৎকাজ করবে তাদের সকলের সওয়াব একত্রে তিনি একাই পাবেন। এই হিসাবে তিনি অবশ্যই একটি উম্মত বা জাতির সমতুল্য, কোনো একক ব্যক্তির সমতুল্য নন। তিনি ছিলেন আল্লাহর একান্ত অনুগত, ভক্ত ও অনুরক্ত। তিনি ছিলেন সত্যের অনুসারী, সত্যের সমর্থক। তিনি আদৌ মোশরেকদের দলে ছিলেন না। কাজেই তাঁর সাথে

মোশরেকদের কোনোই সম্পর্ক নেই। তিনি তো কথায় ও কাজে আল্লাহর প্রতি সদা কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি সেই সব মোশরেকদের মতো নন যারা কথার দ্বারা আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করে, কার্জেও আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের ক্ষেত্রে শেরেক ও কুফুরীমূলক আচরণ করে। কুসংস্কার ও নিজেদের খেয়াল-খুশীর বশবর্তী হয়ে হালালকে হারাম করে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাকে খাঁটি ও নির্ভেজাল তাওহিদের পথে পরিচালনা করার জন্যে নির্বাচিত করেছেন। কাজেই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই ভিন্ন।

এই হচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঠিক পরিচয় যাঁর সাথে সম্পর্ক রয়েছে বলে ইহুদীরা দাবী করে থাকে এবং যাঁর দোহাই দিয়ে মোশরেকরা নিজেদের অপকর্ম চালিয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (স.)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে। (আয়াত ১২৩)

এই নির্দেশের মাধ্যমে বিপন্ন তাওহিদী মতবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। সাথে সাথে পুনরায় ঘোষণা করা হচ্ছে যে, ইবরাহীম (আ.) শেরেকবাদীদের দলে ছিলেন না। কাজেই তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কেবল একটাই পথ। আর সেটা হলো খাঁটি ইসলামের পথ। তার সাথে শেষ নবীর সম্পর্কও এই ইসলামের মাধ্যমে। তবে শনিবার সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারটা ইবরাহীম (আ.)-এর যুগের সাথে নয় বরং ইহুদী সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কিত কাজেই ইবরাহীমের আদর্শে অনুপ্রাণিত মোহাম্মদ (স.)-এর ধর্মে তার কোনো প্রভাব নেই। এ প্রসংগেই ওপরে বলা হচ্ছে, (আয়াত ১২৪)

'ওদের বিচারের ভার আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত।'

দাওয়াতের উত্তম কৌশল

পূর্বের আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তাওহিদী মতবাদ এবং ইহুদী ও মোশরেক সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ও বিকৃত মতবাদের মাঝে সন্দেহের যে ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হয়েছিলো সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য এসেছে। তাতে বলা হয়েছে যে, উভয় মতবাদের মাঝে বিস্তর তফাৎ রয়েছে। এর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (স.)-কে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং তাঁকে বলা হচ্ছে, তিনি যেন তাওহিদ বা একত্ববাদের প্রতি, আল্লাহর দেখানো সঠিক পথের প্রতি হেকমত, বিচক্ষণতা এবং সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে আহ্বান করেন। প্রয়োজন হলে সেই মতবাদের পক্ষে সঠিক ও সুন্দর পদ্ধতিতে তর্ক বিতর্কেও লিপ্ত হন। যদি বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর ওপর এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর আক্রমণ করে বসে তাহলে ওদেরকে প্রতিহত করবেন, তাঁদের সমুচিত জবাব দেবেন। তবে শক্তি-সামর্থ থাকা সত্তেও ওদেরকে ক্ষমা করে দিলে সেটা হবে একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত। এক্ষেত্রে মনে মনে আক্ষেপ করার কিছুই নেই। ওরা সত্যের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে না বলে দুঃখ করার কিছুই নেই। মোমেনদের বিরুদ্ধে ওদের ষড়যন্ত্র ও কূট কৌশলের কারণে বিচলিত হওয়ারও কিছু নেই। কারণ, উত্তম পরিণতি কেবল মোমেন-মোত্তাকীন তথা সত্যের অনুসারী ও ধারক-বাহকদের জন্যেই নির্ধারিত। এই বাস্তব কথাটাই নিচের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

'(এসব কথার) ফলে শেষ বিচারের দিন এরা নিজেদের.......ফেরেশতারা যাদের মৃত্যু ঘটায়, (তা ঘটায় এমন অবস্থায়) যখন তারা নিজেদের ওপর যুলুম করতে থাকে, অতপর তারা (উপায়ন্তর না দেখে) আত্মসমর্পণ করবে এবং বলবে আমরা তো (আমাদের জানা মতে) কোনো মন্দ কাজ করতাম না, (ফেরেস্তারা বলবে) হাঁ তোমরা যা কিছু করতে আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত রয়েছেন।' (আয়াত ১২৫-১২৮)

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের নীতি ও পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। এই দাওয়াতের উপায় উপকরণ কি হবে, কোন নীতি ও পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে রসূলুল্লাহ (স.) এবং পরবর্তীতে তাঁর উম্মতের মোবাল্লেগরা দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করবেন তার রূপরেখাও উক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই আমাদের সকলেরই উচিত, দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন করার পূর্বে আমরা যেন পবিত্র কোরআনে বর্ণিত এই মূলনীতিগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করি।

দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা; স্বয়ং মোবাল্লেগের প্রতি বা তার জাতির প্রতি আহ্বান করা নয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একজন মোবাল্লেগ তাঁর দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যই পালন করছেন। এটা কেবলই একটা দায়িত্ব ও কর্তব্য। কাজেই এই দায়িত্ব পালন করার দ্বারা কোনো মোবাল্লেগ কারও প্রতি কোনো দয়া বা করুণা করছে না, খোদ দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতিও নয় এবং যারা তার মাধ্যমে হেদায়াত প্রাপ্ত হচ্ছে-তাদের প্রতিও নয়। তবে এই মহান কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্যে সে আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান পাবে।

আলোচ্য আয়াতে বিচক্ষণতার সাথে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, যাদের সামনে দাওয়াত পেশ করা হবে তাদের অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। কতোটুকু বক্তব্য তাদের সামনে উপস্থাপন করলে তারা -বিরক্ত হবে না সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মানসিক প্রস্তুতির পূর্বেই তাদেরকে যেন কোনো ধর্মীয় বিধান পালনে বাধ্য করা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কোন্ পদ্ধতিতে বক্তব্য পেশ করলে অধিক ফলপ্রসূ হবে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সর্বোপরি শ্রোতাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্যের ধরন-ধারণের বৈচিত্র আনতে হবে। সাথে সাথে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বক্তব্যের মাধ্যমে অহেতুক উত্তেজনা, অনাকাংখিত চাঞ্চল্য এবং ধর্মীয় উগ্রতা সৃষ্টি না হয়। অন্যথায় দাওয়াত ও তাবলীগের আসল উদ্দেশ্যেই ব্যহত হবে যা হেকমত ও বিচক্ষণতার পরিপন্থী।

আলোচ্য আয়াতে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আঞ্জাম দিতে বলা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, নরম ও সুন্দর ভাষায় কথা বলতে হবে যেন তা মানুষের মনের গভীরে রেখাপাত করে এবং তাদের অনুভূতিকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। অহেতুক সুরে এবং চিৎকার করে বক্তব্য প্রদান করা উচিত নয়। তদ্রূপ কারও কোনো দোষ-ত্রুটি নিয়ে প্রকাশ্য মজলিসে আলোচনা করাও উচিত নয়। মনে রাখতে হবে নরম ও মার্জিত ভাষায় উপদেশ প্রদান করলে তা অনেক সময় কঠিন হৃদয়কেও নাড়া দেয়, ধর্ম বিমুখ লোকদের মনেও সাড়া জাগায় এবং এসব লোকদেরকে সত্যের পথে পরিচালিত হতে উদ্বুদ্ধ করে। নরম ও সুন্দর উপদেশ যতটুকু মঙ্গল বয়ে আনে ততোটুকু ধমক, উত্তেজনাকর বক্তব্য এবং ভর্ৎসনা-গঞ্জনা দ্বারা তা কখনোই সম্ভব হয় না।

প্রয়োজন হলে সুন্দর ও সঠিক পদ্ধতিতে তর্ক-বিতর্কেও লিপ্ত হতে হবে। তবে তর্ক করতে গিয়ে কখনও বিপক্ষের লোকদেরকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমন করে তদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা যাবে না। তারা যেন উপলব্ধি করতে পারে যে, এই তর্ক-বিতর্কের উদ্দেশ্য কেবল প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করাই নয়, বরং তাকে সন্তুষ্ট চিত্তে সত্য ও বাস্তবতাকে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা। কারণ প্রত্যেকের মনেই কিছুটা অহমিকা ও আত্মম্ভরিতা থাকে। ফলে মানুষ সহজেই অন্যের মতামতকে

বিনা বাক্যে মেনে নিতে চায় না। তবে ভদ্রতা ও নম্রতার সাথে বুঝালে মানুষ বুঝতে চেষ্টা করে এবং অন্যের মতামত গ্রহণ করতেও প্রস্তুত হয়। কারণ এক্ষেত্রে পরাজয়ের কোনো মনোভাব তার মাঝে সৃষ্টি হয় না। মানুষের সামনে যখন কোনো ভিন্ন মত ও বক্তব্য পেশ করা হয় তখন সে চিন্তা করে দেখে যে, মানুষের কাছে এর মূল্য কি। যখন সে বুঝতে পারে যে, নিজস্ব মতামত ত্যাগ করে ভিন্ন কোনো মত ও রায়কে মেনে নেয়া এক ধরনের পরাজয় তখন সে ওই ভিন্ন মত গ্রহণ করাকে নিজের ব্যক্তিত্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মান-সম্মানের জন্যে ক্ষতিকর মনে করে। তবে মার্জিত ভাষায়, ভদ্র ও নম্র ভাষায় তর্কের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করলে প্রতিপক্ষের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়। সে তখন বুঝতে পারে যে, তর্কের উদ্দেশ্য তার ব্যক্তিগত মান-মর্যাদাকে খাটো করা নয়। বরং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সত্য বিষয়কে প্রমাণিত করা এবং সেটাকে গ্রহণ করা। সে তখন আরও বুঝতে পারে যে, এই তর্কের উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর দ্বীন। ওই তার্কিক মোবাল্লেগের ব্যক্তিগত মতামতকে প্রাধান্য দেয়া নয় এবং তার ব্যক্তিগত জয়-পরাজয়ও নয়।

মোবাল্লেগ বা দাওয়াতী কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা যেন অহেতুক উত্তেজনা ও অতি উৎসাহের বশবর্তী না হয়ে পড়ে সে জন্যে আল্লাহ পাক স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন যে, কে পথহারা এবং কে সত্য পথের অনুসারী তা একমাত্র তিনিই ভালোভাবে অবগত আছেন। কাজেই প্রতিপক্ষের সাথে তর্ক করতে গিয়ে অহেতুক ঝগড়াঝাটি বা বাদানুবাদের প্রয়োজন নেই। বরং সত্যকে সঠিক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা ও প্রমাণিত করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। চূড়ান্ত ফলাফল আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত। মৌখিক দাওয়াত এবং যুক্তির মাধ্যমে তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে সঠিক পদ্ধতি ও নিয়ম-নীতি। তবে দাওয়াতী কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ওপর আক্রমন হলে তখন নীতি পাল্টে যাবে এবং পন্থা ও পদ্ধতিও পাল্টে যাবে। কারণ আক্রমন হচ্ছে একটি ব্যবহারিক কর্মকান্ড। তাই সত্যের মর্যাদা রক্ষার খাতিরেই এবং বাতিলের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে অনুরূপ পন্থা ও পদ্ধতিই গ্রহণ করতে হবে। তবে বাতিলের মোকাবেলা করতে গিয়ে যাতে সীমালংঘন না হয়ে যায়, বাড়াবাড়ির পর্যায় গিয়ে না পৌঁছে-সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ, ইসলাম হচ্ছে একটি ন্যায়ভিত্তিক ধর্ম, ভারসাম্যপূর্ণ ধর্ম, শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। কাজেই এই ধর্মে যুলুম-অত্যাচার থেকে নিজেকে এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকে রক্ষা করার অনুমতি আছে। তবে যুলুম-অত্যাচার করার অনুমতি নেই। এই জন্যেই বলা হয়েছে,

‘তবে যদি তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হয় তাহলে তোমরাও তাদের শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততোটুকু– যতোটুকু তোমাদের দেয়া হয়েছে, আর যদি তোমরা ধৈর্য্য ....

এমনটি করা দাওয়াত ও তাবলীগের আদর্শ মূলনীতির পরিপন্থী নয়; বরং এর একটা অংশ। ন্যায় ও সাম্যের চৌহদ্দির ভেতরে থেকে দাওয়াতী কাজকে রক্ষা করা হলে এর মান-মর্যাদা রক্ষা পাবে। মানুষের মনে এর স্থান তুচ্ছ ও নগণ্য বলে বিবেচিত হবে না। মনে রাখতে হবে, মানুষ কখনও তুচ্ছ ও মর্যাদাহীন কোনো আদর্শের আহ্বানে সাড়া দেয় না। তারা এটাকে আল্লাহর দাওয়াত বলেও বিশ্বাস করে না। কারণ, আল্লাহর দাওয়াত কোনো হেলা-খেলার বস্তু নয় যে, তা পদদলিত হতে থাকবে আর তাকে রক্ষা করার মতো কেউ থাকবে না। তদ্রুপ যারা মহান আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী তারা বিনা বাক্যে অন্যায় অবিচারকে মেনে নেবে, এমনটি নয়। কারণ, তারা আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়েই তারা এই পৃথিবীর বুকে সত্যের প্রতিষ্ঠায় মানব সমাজে ন্যায় নীতির প্রতিষ্ঠায় এবং মানবতাকে সত্যের পথে পরিচালনায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছে। যদি তারা কেবলই অত্যাচারিত হতে থাকে, নির্যাতিত হতে

থাকে আর এর প্রতিকারের ক্ষমতা তাদের না থাকে-তাহলে এসব গুরু দায়িত্ব পালন করা তাদের পক্ষে কিভাবে সম্ভব হবে?

যদিও ইসলাম ধর্মে সমতার ভিত্তিতে প্রতিশোধ গ্রহণ করার নীতি স্বীকৃত, তা সত্তেও পবিত্র কোরআন ধৈর্য ও ক্ষমার আদর্শেই মনুষকে অনুপ্রাণিত করে। বিশেষ করে অন্যায় ও অবিচারকে প্রতিহত করার মতো ক্ষমতা ও শক্তি মুসলমানদের থাকা সত্তেও এই ক্ষমা ও ধৈর্যের নীতিই গ্রহণ করার জন্যে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে যদি এর দ্বারা ভাল ফল লাভ হয় এবং দাওয়াতী কাজে এর প্রভাব ইতিবাচক হয়। যদি দাওয়াত ও আদর্শের স্বার্থে এই ক্ষমা আর সহিষ্ণুতাই ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত হয়, তাহলে এক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থ আদৌ কোনো বিবেচ্য বিষয় বলে গণ্য হবে না। আর যদি ক্ষমা ও ধৈর্য প্রদর্শনের ফলে আদর্শের মর্যাদাহানী ঘটে, আদর্শকে মানুষের চোখে হাল্কা করে ফেলে তাহলে প্রতিশোধের নীতি গ্রহণ করাই উত্তম।

ধৈর্যের জন্যে প্রয়োজন উত্তেজনাকে প্রতিহত করা, আবেগ-অনুভূতিকে দমন করা এবং একটি স্বভাবজাত প্রবৃত্তিকে দমন করা। কাজেই পবিত্র কোরআন এই কঠিন কাজটিকে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট করে এর শুভ পরিণতির বার্তা শুনাচ্ছে। (আয়াত ১২৬-১২৭)

অর্থাৎ আল্লাহর মেহেরবানী ও নেক দৃষ্টির বদৌলতেই মানুষের পক্ষে ধৈর্য ও আত্মসংযম প্রদর্শন করা সম্ভব হয়। কারণ তিনিই মানুষের মন থেকে প্রতিহিংসা ও জিঘাংসার মতো স্বভাবজাত প্রবৃত্তিকে মিটিয়ে দেন এবং ক্ষমা প্রদর্শনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন।

এখানে পবিত্র কোরআন রসূলুল্লাহ (স.)-কে একটি উপদেশ দিচ্ছে। উপদেশটি কেবল তাঁর জন্যেই নয়। বরং তাঁর উম্মতের সকল মোবাল্লেগদের জন্যেই প্রযোজ্য। আর সেটা হলো এই যে, মানুষ যদি তাদের আহ্বানে সাড়া না দেয় এবং তারা যদি সত্য পথের অনুসারী না হয় তাহলে এর কারণে যেন তারা মনক্ষুন্ন না হয়। কারণ তাদের দায়িত্ব কেবল মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করা। আর হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে ন্যস্ত। কারা হেদায়াত প্রাপ্ত হবে আর কারা হবে না-এসব বিষয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নির্ধারিত বিধান মতেই হয়ে থাকে। এখানে মানুষের কোনো হাত নেই। কাজেই এর কারণে মন খারাপ করার কিছুই নেই। একজন মোবাল্লেগ আল্লাহর পথের দিশারী, কাজেই আল্লাহই তাকে সব ধরনের অনিষ্ট ও অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করবেন। সে যদি প্রকৃত মোবাল্লেগ হয়, নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত প্রাণ মোবাল্লেগ হয় তাহলে ষড়যন্ত্রকারীদের কোনো ষড়যন্ত্রই তার এতোটুকুও ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা সর্বদা তার সহায়ক ও রক্ষক থাকবেন।

হয়তো কখনও তাকে পরীক্ষা করার জন্যে বিপদের সম্মুখীন করা হবে। আল্লাহর প্রতি তার কতোটুকু আস্থা আছে-তা পরখ করার জন্যে আল্লাহর কাংখিত সাহায্য ও মদদ বিলম্বিতও হতে পারে। কিন্তু শেষ পরিণতি কি হবে, এবং কার স্বার্থে যাবে, এটা চূড়ান্ত ও নির্ধারিত। বলা হচ্ছে, (আয়াত ১২৮)

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আছেন, তাই কিসের ভয়? নিন্দুকেরা, ষড়যন্ত্রকারীরা তার কিইবা ক্ষতি করতে পারবে।

এটাই হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি। আর আল্লাহর ওয়াদা মোতাবেক দাওয়াতী কাজের সাফল্য এই মূলনীতির অনুসরণের মাঝেই নিহিত। আল্লাহর ওয়াদা সত্য হবে না তো আর কার ওয়াদা সত্য হবে?

সূরা বনী ইসরাঈল

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরাটা মক্কী। সূরাটা আল্লাহর তাসবীহ দিয়ে শুরু ও হামদ দিয়ে শেষ হয়েছে। এতে একাধিক বিষয় আলোচিত হয়েছে, যার অধিকাংশই আকীদা সংক্রান্ত। কোথাও কোথাও ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণের বিধি ও নিয়ম আলোচিত হয়েছে, যা ওই আকীদা থেকেই উৎসারিত। বনী ইসরাঈলের কিছু ইতিহাসও আলোচিত হয়েছে, যা মাসজিদুল আকসার সাথে সংশ্লিষ্ট। এই মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত রসূল (স.)-এর 'ইসরা' তথা নৈশভ্রমণ সংঘটিত হয়েছিলো যা মেরাজের একটা অংশ। সেই সাথে এ সূরায় হযরত আদম ও ইবলীসের কাহিনীর একাংশ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে সম্মানিত করার বিষয়টাও আলোচিত হয়েছে।

তবে সূরার প্রধান ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো রসূল (স.)-এর ব্যক্তিত্ব, তাঁর সাথে কোরায়শদের আচরণ, তাঁর আনীত কোরআনের বৈশিষ্ট্য কোরআন মানুষকে কোন্ পথে চালিত করে এবং আরববাসী তার প্রতি কী প্রতিক্রিয়া দেখায়। আনুষংগিকভাবে আরো আলোচিত হয়েছে রসূল ও রেসালাতের প্রকৃতি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়-এমন ধরনের অলৌকিক ঘটনাবলী, মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাতের বৈশিষ্ট্যরূপে স্থান লাভ, এর ফলে প্রকাশ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অলৌকিক ঘটনাবলী সম্বলিত রেসালাতকে অস্বীকার করলে সর্বব্যাপী অনিবার্য ধ্বংসের কবলে পড়তে হয় তা থেকে মোহাম্মদ (স.)-এর সমকালীন ও পরবর্তী লোকদের অব্যাহতি লাভ, আকীদা বিশ্বাসের পর্যায়ে সুপথপ্রাপ্তি বা পথভ্রষ্টতার পরিণাম ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকা এবং সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে সঠিক ও ভ্রান্ত পথ অনুসরণের কুফল সামাজিক পর্যায়ে বিস্তৃত হওয়া সংক্রান্ত খোদায়ী নীতি। এ সবের আগে আল্লাহ তায়ালা মানুষের কাছে রসূল পাঠানোর মাধ্যমে সুসংবাদ, সতর্কবাণী ও বিস্তারিত জীবন বিধান দিয়ে তাদের প্রয়োজন এমনভাবে পূর্ণ করেছেন যে, তারা আর কোনো ওজুহাত দাঁড় করাতে না পারে।

সূরায় একাধিকবার আল্লাহকে যাবতীয় অলীক ও অসংগত ধারণা থেকে পবিত্র ঘোষণা, তাঁর গুণকীর্তন প্রশংসা ও তাঁর নেয়ামতের শোকর আদায় করা হয়েছে। শুরুতেই বলা হয়েছে,

'পবিত্র সেই সত্ত্বা, যিনি তাঁর বান্দাকে এক রাত্রে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসায় ভ্রমণ করিয়েছেন।'

অন্যত্র বনী ইসরাঈলকে এক আল্লাহর এবাদাত করার নির্দেশ দেয়ার পাশাপাশি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে আযাব থেকে মুক্তি লাভকারী মোমেনদেরই বংশধর।

'আর নূহ তো ছিলো একজন কৃতজ্ঞ বান্দা।'

মোশরেকরা তাদের দেব-দেবী সম্পর্কে যে সব গালভরা দাবি উচ্চারণ করতো, তার উল্লেখ প্রসংগে মন্তব্য করা হয়েছে,

'তারা যেসব কথা বলে তা থেকে তিনি পবিত্র এবং অনেক উর্দ্ধে, তাঁর জন্যে সাত আকাশ তাসবীহ পড়ে ....।'

কোরআন পাঠ শুনে কিছু সংখ্যক আহলে কেতাবের উচ্চারিত বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। 'আর তারা বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।' সূরার শেষ আয়াতেও আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে।

'আর তুমি বলো, আল্লাহর জন্যে প্রশংসা ....'

যে প্রধান আলোচ্য বিষয়ের কথা আমরা বলে এসেছি, তাকে ঘিরে আলোচিত অন্যান্য বিষয়গুলোই এই সূরায় পর্যায়ক্রমে স্থান পেয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে এই আয়াত দ্বারা। 'পবিত্র সেই সত্ত্বা, যিনি তার বান্দাকে এক রাত্রে ভ্রমণ করিয়েছেন' সেই সাথে এই ভ্রমণের

উদ্দেশ্য বলা হয়েছে, 'যাতে আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাই।' মাসজিদুল আকসা প্রসংগে মূসা (আ.)-কে প্রদত্ত কেতাব ও ওই কেতাবে বনী ইসরাঈলের দু'বার ধ্বংসযজ্ঞ ও দেশ ত্যাগের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে তাদেরই অবাধ্যতা ও অপরাধের কারণে তৃতীয় ও চতুর্থবার সতর্ক করা সত্তেও। 'আর যদি তোমরা পুনরায় নিষিদ্ধ কাজ করো, তাহলে আমিও পুনরায় তোমাদেরকে শাস্তি দেবো।' এরপর বলা হয়েছে যে, 'শেষ কেতাব কোরআন সবচেয়ে স্থীতিশীল ব্যবস্থার দিকে নির্দেশ করে।' অথচ মানুষ দ্রুততা প্রবণ ও আবেগ প্রবণ হওয়ার কারণে নিজের ঝোঁক ও আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। সেই সাথে বলা হয়েছে যে, হেদায়াত ও গোমরাহীর কৃতিত্ব ও দায়-দায়িত্ব ব্যক্তির নিজস্ব এবং সামাজিক আচরণের দায় দায়িত্ব সমাজের ওপর অর্পিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে তাওহীদের নীতি ঘোষণার মধ্য দিয়ে। সমাজ ব্যবস্থা ও সামাজিক আচার ব্যবহারকে সে তাওহীদের ওপরই প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং এগুলোকে এই মূলনীতির সাথে সমন্বিত করে- যে মূলনীতি ছাড়া জীবন গড়ে উঠতে পারে না।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে জাহেলী ও পৌত্তলিক সমাজে প্রচলিত ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে, যা আল্লাহর সাথে শরীক করা ও ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করার উদ্ভট ও অলীক খেয়ালের সাথে সম্পৃক্ত। এই অধ্যায়ে আরো আলোচনা করা হয়েছে আখেরাতের কথা এবং আরবদের পক্ষ থেকে তাকে একটা অসম্ভব ব্যাপার মনে করার বিষয়টি। আলোচিত হয়েছে কোরআন সম্পর্কে তাদের ধারণা ও বক্তব্য, রসূল (স.) সম্পর্কে তাদের আজে বাজে কথা এবং মোমেনদেরকে ভালোভাবে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে কী কারণে মোহাম্মদ (স.)-কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অলৌকিক ঘটনাবলী দিয়ে পাঠানো হয়নি। এগুলোকে প্রাচীনকালের লোকেরা অস্বীকার করেছিলো এবং এর ফলে আল্লাহর নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। অনুরূপভাবে এতে উল্লেখ করা হয়েছে মোশরেকদের পক্ষ থেকে রসূল (স.)-এর স্বপ্নের ঘটনা অস্বীকার করা এবং এ জন্যে তাদের প্রতি আল্লাহর হুশিয়ারী। এই প্রসংগে ইবলীসের ঘটনার একটা অংশ এবং তার এ ঘোষণাও উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, সে অচিরেই আদমের বংশধরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। ইবলীসের ঘটনার এ অংশটা মোশরেকদের গোমরাহীর কারণ উদঘাটনের উদ্দেশ্যেই তুলে ধরা হয়েছে। এর উপসংহার টানা হয়েছে আল্লাহর আযাব থেকে মানুষকে সতর্ক করা। তাকে সম্মানিত করার আকারে যে অনুগ্রহ করা হয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহর অনুগত ও অবাধ্যদের জন্যে যে পরিণাম অপেক্ষা করছে তার বিবরণ দেয়ার মাধ্যমে। বলা হয়েছে, 'যে দিন আমি প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীকে তাদের নেতাসহ আহ্বান করবো, সেদিন যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তারা তাদের আমলনামা পড়বে এবং তাদের ওপর এক বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অন্ধ, সে আখেরাতেও অন্ধ ও অধিকতর বিপথগামী হবে।'

সূরার শেষ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে মোশরেকদের ষড়যন্ত্র, তাঁর ওপর যে ওহী নাযিল হয়েছে তার কিছু অংশ থেকে তাকে বিপথগামী করা এবং তাকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করার জন্যে মোশরেকদের অপচেষ্টা। বলা হয়েছে যে, তারা যদি তাকে জোরপূর্বক বিতাড়িত করতো এবং তিনি আল্লাহর নির্দেশে নিজেই হিজরত না করতেন, তাহলে পূর্বেকার কাফের জাতিগুলো তাদের রসূলদেরকে হত্যা বা বহিষ্কার করার কারণে যেভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো, সেভাবে তারাও ধ্বংস হয়ে যেতো। এই সাথে আল্লাহ রসূল (স.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি তাঁর নামায, কোরআন পাঠ, আল্লাহর কাছে নিজের প্রবেশ ও নির্গমনের জন্যে উত্তম স্থান প্রার্থনা এবং সত্যের আগমন ও বাতিলের বিনাশ প্রাপ্তির ঘোষণা দান অব্যাহত রাখেন।

অতপর আল্লাহ তায়ালা এই মর্মে মন্তব্য করছেন যে, যে কোরআনের অংশবিশেষ থেকে তারা রসূল (স.)-কে বিপথগামী করার চেষ্টা করেছিলো তাতে মোমেনদের জন্যে হেদায়াত ও রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা রয়েছে, অথচ মানুষ স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় তা জানে না।

এরপর কোরআনের অলৌকিকত্ব নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখা হয়েছে। মোশরেকরা চাইতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগত অলৌকিক ঘটনা। তারা চাইতো, রসূল (স.)-এর সাথে ফেরেশতা নেমে আসুক, তাঁর অসাধারণ কারুকার্য খচিত প্রাসাদ থাকুক, আংগুর ও খেজুরের এমন বাগান থাকুক, যার মাঝখান দিয়ে ঝর্ণা বা খাল প্রবাহিত হোক অথবা তিনি আকাশে আরোহন করে একখানা পুস্তক নিয়ে আসুন, যা তারা পড়ে দেখবে। এ ধরনের আরো বহু প্রস্তাব তারা দিতো, যার উদ্দেশ্য ছিলো নিজেদের ধৃষ্ঠতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা-হেদায়াত বা বুঝ লাভ করা নয়। এসব প্রস্তাবের জবাবে বলা হয়েছে যে, এসব রসূল (স.)-এর দায়িত্ব ও ক্ষমতার বহির্ভূত এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। এই সাথে যারা এ সব প্রস্তাব তুলেছে, তাদের সমালোচনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে, যদি আল্লাহর অনুগ্রহের সমস্ত ভান্ডার তাদের হাতে থাকতো-যার কোনো সীমা পরিসীমা নেই-তাহলে তারা খরচ করার ভয়ে তা আটকে রাখতো। সমগ্র সৃষ্টি জগত যে আল্লাহর গুণগান ও তাসবীহ করে, এটা উপলব্ধি করাই তাদের ঈমান আনার জন্যে যথেষ্ট ছিলো, বস্তুগত মোজেযা বা অলৌকিক ঘটনার প্রয়োজন ছিলো না। আর তাতে কোনো লাভও হতো না। কেননা এ ধরনের মোজেযা নিয়ে হযরত মূসা (আ.) এসেছিলেন। কিন্তু তার হঠকারী জাতি তার ওপর ঈমান আনেনি। এর ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর আযাব নাযিল করেন।

কোরআন ও তার ভেতরে বিদ্যমান প্রকৃত সত্যের আলোচনার মধ্য দিয়ে সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এই কোরআন সত্য ও মিথ্যাকে আলাদা আলাদা করে দেখিয়ে দেয়। এই কোরআনকে রসূল (স.) প্রয়োজন অনুসারে নিজে জাতির কাছে একটু একটু করে পেশ করতে থাকবেন, যাতে তারা তা দ্বারা প্রভাবিত হয় ও কার্যকরভাবে তা গ্রহণ করে। ইতিপূর্বে যারা ওহীর জ্ঞান লাভ করেছে, তাদের অনেকে এ কোরআনকে শুনে এতো প্রভাবিত হয় যে, তারা কাঁদে ও সেজদা করে। সর্বশেষে সেই আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে, যার কোনো সন্তান নেই। বিশ্ব পরিচালনায় যার কোনো শরীক নেই এবং যাকে হীনতা থেকে রক্ষা করার কোনো অভিভাবক নেই। সূরাটার সূচনায় আল্লাহর তাসবীহ ও প্রশংসাসূচক বাক্য রয়েছে।

সূরার শুরুতে রয়েছে ইসরা ও মেরাজের যুগান্তকারী ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। ইসরা ও মেরাজ দুটোই একই রাত্রে ঘটেছিলো। মক্কার মাসজিদুল হারাম থেকে বাইতুল মাকদেসের মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত তিনি যে নৈশ ভ্রমণ করেন তাকে ইসরা বলা হয়। আর বাইতুল মাকদেস থেকে উর্ধ্ব আকাশে, সিদরাতুল মোনতাহায় এবং আমাদের অজানা ও অদৃশ্য জগতে তিনি যে ভ্রমণ করেন, তাকে বলা হয় মেরাজ। এই ঘটনা সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা রয়েছে এবং এ ঘটনা নিয়ে প্রচুর বিতর্কও ঘটেছে।

কোন্ জায়গা থেকে তিনি এই নৈশ ভ্রমণ শুরু করেন, তা নিয়েও মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, মাসজিদুল হারাম থেকে। এটাই অধিক প্রচলিত মত। কেননা তিনি বলেছেন, 'আমি মাসজিদুল হারামে হাজরে আসওয়াদের কাছে কাবা শরীফের কাছে যখন ঘুমন্ত ও জাগ্রত এ দুই অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলাম-তখন জিবরাইল বোরাক নিয়ে আমার কাছে এলেন।'

আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি তাঁর চাচাতো বোন আবু তালেব কন্যা উম্মে হানীর ঘর থেকে যাত্রা করেন। এখানে মাসজিদুল হারাম দ্বারা হারাম শরীফ বুঝানো হয়েছে, যা মাসজিদকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সমগ্র হারাম শরীফই মাসজিদ।

বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত উম্মে হানীর ঘরে এশার নামাযের পর ঘুমিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মাসজিদুল আকসায়। তারপর একই রাত্রে ফিরে আসেন এবং উম্মে

হানীর কাছে পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার কাছে নবীদেরকে উপস্থিত করা হয়েছিলো এবং তাদেরকে নিয়ে আমি নামায পড়েছি। এরপর তিনি মাসজিদুল হারামের দিকে পা বাড়াতেই উম্মে হানী তার কাপড় টেনে ধরেন। রসূল (স.) বলেন, কী ব্যাপার? উম্মে হানী বলেন, তুমি তোমার জাতিকে এ ঘটনা জানালে তারা তোমাকে মিথ্যুক বলবে বলে আমার আশংকা হয়। তিনি বললেন, আমাকে তারা মিথ্যুক সাব্যস্ত করলে করুক। তবুও আমার বলতে হবে। অতপর তিনি বেরিয়ে গেলেন। আবু জাহল তার কাছে এসে বসলো। রসূল (স.) তাকে রাতের ভ্রমণের ঘটনা জানালেন। আবু জাহল কোরায়শের সবাইকে ডেকে জড়ো করলো। অতপর সে তাদের সবাইকে ঘটনাটা জানালো। এতে কেউ বা হাতে তালি দিলো, কেউ মাথায় হাত রেখে বিস্ময় ও অবিশ্বাস প্রকাশ করলো। ইতিপূর্বে রসূল (স.)-এর প্রতি যারা ঈমান এনেছে, তাদের কেউ কেউ ইসলাম ত্যাগ করে বসলো। কিছু লোক হযরত আবু বকরের কাছে ছুটে গেলো এবং তাকে ঘটনার কথাটা জানালো। আবু বকর বললেন, এটা কি মোহাম্মদ (স.) বলেছেন? তারা বললো, হাঁ। আবু বকর (রা.) বললেন, তিনি যদি বলে থাকেন, তবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি সত্যই বলেছেন। তারা বললো, একই রাত্রে তাঁর সিরিয়া যাওয়া এবং সকাল হওয়ার আগে মক্কায় ফিরে আসার কথা তুমি বিশ্বাস করো? তিনি বললেন, হাঁ, আমি তাঁর আরো দূরের কথাও বিশ্বাস করি। তিনি আকাশের খবর জানান। তাও আমি বিশ্বাস করি।' এ কারণেই তাকে সিদ্দীক নাম দেয়া হয়। কোরায়শ গোত্রে বাইতুল মাকদেস ভ্রমণ করেছে এমন অনেকেই ছিলো। তারা রসূল (স.)-কে মাসজিদের বিবরণ দিতে বললো। তখন গায়বীভাবে মাসজিদ তার সামনে হাযির করা হলো, তিনি তার দিকে তাকিয়ে মাসজিদের পূর্ণ বিবরণ দিলেন। তখন সবাই বললো, তাইতো, বিবরণ তো ঠিকই দিয়েছে। তারা বললো, 'হে মোহাম্মদ, আমাদের একটা কাফেলা সিরিয়ার পথে রয়েছে। তার বিবরণ দাও।

রসূল (স.) ওই কাফেলার উটের সংখ্যা ও অবস্থা জানালেন। তিনি বললেন, কফেলাটা অমুক দিন সূর্যোদয়ের সময় আসবে এবং তার সর্বাগ্রে থাকবে একটা সবুজ উট। নির্দিষ্ট দিনটাতে লোকেরা মক্কার প্রবেশদ্বারের দিকে ছুটে গেলো কাফেলার অগ্রভাগ দেখার জন্যে। যথার্থই একটা কাফেলা দেখা গেলো। জনৈক দর্শক বললো, আল্লাহর কসম, এখন সূর্য উঠছে। আর একজন বললো, হাঁ, আল্লাহর কসম, ওই তো কাফেলা এসেছে, ওর অগ্রভাগে সবুজ উটও রয়েছে, ঠিক যেমনটি মোহাম্মদ বলেছে। কিন্তু এরপরও তারা ঈমান আনলো না।.... একই, রাতে রসূল (স.) বাইতুল মাকদেস থেকে উর্ধ আকাশে আরোহণ করেন।

রসূল (স.)-এর এই নৈশ সফর বা 'ইসরা' তার জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিলো না স্বপ্নে-এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'আল্লাহর কসম, রসূলের দেহ বিছানা থেকে অদৃশ্য হয়নি, কেবল তার আত্মা সফরে গিয়েছিলো।' হযরত হাসান (রা.) বলেছেন, 'তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন, দেখেছিলেন।' অন্যান্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, দেহ ও আত্মা-উভয়ই এই সফরে গিয়েছিলো এবং রসূল (স.)-এর ফিরে আসা পর্যন্ত তাঁর বিছানাও গরম ছিলো।

এ সংক্রান্ত সব কটা হাদীসের সমন্বয়ে যে দৃশ্যটা ভেসে ওঠে তা হচ্ছে এই, রসূল (স.) উম্মে হানীর বাড়ীতে শুয়েছিলেন, সেখান থেকে মাসজিদুল হারামে যান, কাবা শরীফের কাছে হাজরে আসওয়াদে অবস্থানকালে তিনি যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হন, ঠিক তখনই তাকে ইসরা ও মেরাজের সফরে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তিনি তার বিছানা ঠান্ডা হওয়ার আগেই ফিরে আসেন।'

রসূল (স.)-এর জীবনে এই ঘটনা যে ঘটেছিলো, তা সুনিশ্চিত। তবে এর ধরন ও প্রকৃতি নিয়ে আগেও বিতর্ক ছিলো, আজও আছে। আমি সেই বিতর্কে না গিয়েও বলতে পারি যে, ইসরা ও মেরাজের ঘটনা সশরীরেই ঘটুক বা শুধু আত্মা সহকারেই ঘটুক এবং এটা স্বপ্নেই ঘটুক বা জাগ্রত অবস্থায়ই ঘটুক, উভয়ের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। মূলত ঘটনার প্রকৃতি এই যে,

এর মাধ্যমে রসূল (স.)-কে বহু দূরবর্তী জগত ও দূরবর্তী স্থানগুলোকে এক নিমিষেই দেখানো হয়েছে। এটা স্বপ্নেই ঘটুক বা জাগ্রত অবস্থায় ঘটুক, কিংবা সশরীরে ঘটুক বা শুধু আত্মা সহকারে ঘটুক-কিছুই এসে যায় না। যারা আল্লাহর শক্তি ও নবুওতের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুমাত্র অবহিত, তারা এ ঘটনায় অবাক হবার মতো কিছু দেখতে পাবেন না। যে সমস্ত কাজ মানুষ নিজের দৃষ্টিতে তার নিজের ক্ষমতা ও কল্পনাশক্তি অনুসারে এবং তার নিজস্ব অভ্যাস ও দৃষ্টিভংগীর বিচারে কঠিন বা সহজ মনে করে, আল্লাহর শক্তির সামনে তা সবই সমান। মানুষ নিজ ভুবনে যা কিছু দেখতে অভ্যস্ত, সেই অনুসারে আল্লাহর ক্ষমতাবলে সম্পাদিত বিষয়গুলোর মূল্যায়ন করা তার পক্ষে বেমানান। তাছাড়া নবুওতের প্রকৃতিও সাধারণ মানবীয় দৃষ্টিতে বিচার করার মতো বিষয় নয় নবুওতের প্রকৃতিই হলো উর্ধ্ব জগতের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ, যা সাধারণ মানুষের আন্দায অনুমান ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। দূরবর্তী স্থান ও দূরবর্তী জগত পরিদর্শন ও পরিচিত বা অপরিচিত কোনো বাহন দ্বারা সেখানে পৌঁছার এই কাজটা উর্ধ্ব জগতের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগের চেয়ে বেশী বিস্ময়কর কিছু নয়। হযরত আবু বকর (রা.) যথার্থই বলেছেন যে, আমি তো তাঁর সম্পর্কে এর চেয়েও দূরের ব্যাপার বিশ্বাস করি। তিনি সুদূর আকাশ থেকে যে খবর এনে দেন তাও বিশ্বাস করি, বায়তুল মাকদেস তো পৃথিবীরই আওতাভুক্ত। রসূল (স.) কর্তৃক কাফেলার নির্ভুল বিবরণ দেয়ার মাধ্যমে এই ঘটনার সত্যতা মোশরেকদের কাংখিত বস্তুগত প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পর যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো এই ঘটনা অতিমাত্রায় বিস্ময়কর বিধায় লোকেরা বিশ্বাস করবে না-এই মর্মে উম্মেহানী ভীতি প্রদর্শন করা সত্তেও রসূল (স.) তাতে কর্ণপাত করেননি। কেননা রসূল (স.) যে সত্য বহন করে এনেছেন এবং যে সত্য ঘটনা তাঁর ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে, তাতে তাঁর বিশ্বাস এতো দৃঢ় ছিলো যে, সে সম্পর্কে জনগণের মতামত কী হবে, তা ভেবে দেখেননি, বরং তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন। এ ঘটনা শুনে কোনো কোনো মুসলমান মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো এবং অনেকে এটাকে ব্যংগ-বিদ্রূপের ও সন্দেহ সংশয় সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছেন, সে কথা সত্য। কিন্তু তাই বলে তিনি এটা প্রচার না করে চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। যারা ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের কাজে নিয়োজিত, তাদের জন্যে এ ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তাদেরও কর্তব্য সত্যকে নির্ভয়ে ও নিসংকোচে প্রচার করে যাওয়া এবং কে কি ভাববে, কে খুশী বা নাখোশ হবে তার কোনো তোয়াক্কা না করা।

আরো লক্ষণীয় যে, জনগণ প্রকাশ্য ও বস্তুগত অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটানোর জন্যে অনেক পিড়াপিড়ি করা সত্তেও এবং অন্তত রসূলের বাইতুল মাকদাস সফরের সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরও রসূল (স.) এ ঘটনাকে নিজের রেসালাতের সত্যতা প্রমাণের জন্যে একটা অলৌকিক ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করেননি। কারণ ইসলামের দাওয়াত অলৌকিক ঘটনাবলীর ওপর নির্ভরশীল থাকতে পারে না। এটা শুধু ইসলামী জীবন বিধানের স্বভাবানুগতা ও সুস্থ বিবেকের কাছে তার স্বতস্ফূর্ত গ্রহণযোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং রসূল (স.) এই ঘটনাটা প্রকাশ করার জন্যে যেরূপ আপোষহীন ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেটা এ জন্যে নয় যে, তিনি তার রেসালাতের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্যে এর ওপর কিছুমাত্র নির্ভরশীল ছিলেন, বরং এর প্রকৃত কারণ ছিলো এই যে, তিনি সত্যকে অকাট্যভাবে সত্য বলে বিশ্বাস করতেন।

সূরা বনী ইসরাঈল

আয়াত ১১১ রুকু ১২

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

سُبۡحٰنَ الَّذِیۡۤ اَسۡرٰی بِعَبۡدِهٖ لَیۡلًا مِّنَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ اِلَی الۡمَسۡجِدِ

الۡاَقۡصَا الَّذِیۡ بٰرَکۡنَا حَوۡلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنۡ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیۡعُ الۡبَصِیۡرُ ①

وَاٰتَیۡنَا مُوۡسَی الۡکِتٰبَ وَجَعَلۡنٰهُ هُدًی لِّبَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ اَلَّا تَتَّخِذُوۡا مِنۡ

دُوۡنِیۡ وَکِیۡلًا ② ذُرِّیَّةَ مَنۡ حَمَلۡنَا مَعَ نُوۡحٍ ؕ اِنَّهٗ کَانَ عَبۡدًا شَکُوۡرًا ③

وَقَضَیۡنَاۤ اِلٰی بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ فِی الۡکِتٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِی الۡاَرۡضِ مَرَّتَیۡنِ

وَلَتَعۡلُنَّ عُلُوًّا کَبِیۡرًا ④ فَاِذَا جَآءَ وَعۡدُ اُوۡلٰىهُمَا بَعَثۡنَا عَلَیۡکُمۡ عِبَادًا لَّنَاۤ

اُولِیۡ بَاۡسٍ شَدِیۡدٍ فَجَاسُوۡا خِلٰلَ الدِّیَارِ ؕ وَکَانَ وَعۡدًا مَّفۡعُوۡلًا ⑤

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. পবিত্র ও মহিমান্বিত (সেই আল্লাহ তায়ালা), যিনি তাঁর (এক) বান্দাকে রাতের বেলায় মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আকসায় নিয়ে গেলেন, যার পারিপার্শ্বিতাকে আমি (আগেই) বরকতপূর্ণ করে রেখেছিলাম, যেন আমি তাকে আমার (দৃশ্য অদৃশ্য) কিছু নির্দশন দেখাতে পারি; (মূলত) সর্বশ্রোতা ও সর্বস্রষ্টা তো স্বয়ং তিনিই। ২. আমি মূসাকে (-ও) কেতাব দিয়েছি, আমি এ (কেতাব)-কে বনী ইসরাঈলের হেদায়াতের উপকরণ বানিয়েছিলাম (আমি আদেশ দিয়েছিলাম), আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে তোমরা (নিজেদের) কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করো না। ৩. (তোমরা হচ্ছো সেসব লোকের বংশধর), যাদের আমি নূহের সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম, অবশ্যই সে ছিলো (আমার) এক কৃতজ্ঞ বান্দা। ৪. আমি বনী ইসরাঈলদের প্রতি (তাদের) কেতাবের মধ্যে (এ কথার) ঘোষণা দিয়েছিলাম, অবশ্যই তোমরা দু'বার (আমার) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং (মানুষের ওপর তখন) বড়ো বেশী বাড়াবাড়ি করবে। ৫. অতপর এ দু'য়ের প্রথমটির নির্ধারিত সময় যখন এসে হাযির হলো, তখন (তোমাদের বিপর্যয় বন্ধ করার জন্যে) আমি তোমাদের ওপর আমার এমন কিছু বান্দাকে পাঠিয়েছিলাম, যারা ছিলো বীরত্বের অধিকারী, অতপর তারা (তোমাদের) ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সব কিছুই তছনছ করে দিয়ে গেলো; আর (এভাবেই) আমার (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়ে থাকে।

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنٰكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيْرًا ⑥ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ قف وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ط فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْءٗا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ⑦ عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يَّرْحَمَكُمْ ج وَإِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا م وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ⑧ إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيْرًا ⑨ وَّأَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ⑩ ع وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهٗ بِالْخَيْرِ ط وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُوْلًا ⑪

৬. অতপর আমি তাদের ওপর (বিজয় দিয়ে) দ্বিতীয় বার তোমাদের (সুদিন ফিরিয়ে দিলাম এবং) ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে তোমাদের আমি সাহায্য করলাম, (সর্বোপরি এ জনপদে) আমি তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম। ৭. যদি তোমরা কোনো ভালো কাজ করে থাকো তা করেছো (একান্তভাবে) তোমাদের নিজেদের জন্যে। (অপরদিকে) তোমাদের কেউ যদি কোনো মন্দ কাজ করে থাকো, তার দায়িত্বও একান্তভাবে তার নিজের ওপর; অতপর যখন আমার দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির সময় হাযির হলো, (তখন আমি আরেক দলকে তোমাদের মোকাবেলার জন্যে পাঠিয়েছিলাম) যেন তারা তোমাদের মুখমন্ডল কালিমাচ্ছন্ন করে দিতে পারে, যেমন করে প্রথমবার এ ব্যক্তিরা মাসজিদে (আকসায়) প্রবেশ করেছে (এবং এর প্রচুর ক্ষতি সাধন করেছে, আবারও) যেন তারা মাসজিদে প্রবেশ করতে পারে এবং যে যে জিনিসের ওপর তারা অধিকার জমাতে পারে তা যেন তারা ধ্বংস করে দিতে পারে। ৮. সম্ভবত এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করবেন, আর তোমরা যদি (আবার বিদ্রোহের দিকে) ফিরে যাও তাহলে আমিও (আমার শাস্তির) পুনরাবৃত্তি করবো, আর আমি তো কাফেরদের জন্যে জাহান্নামকে তাদের (চির) কারাগারে পরিণত করে রেখেছি। ৯. অবশ্যই এ কোরআন এমন এক পথের দিকে নির্দেশনা দেয় যা অতি (সরল ও) মযবুত এবং যেসব ঈমানদার মানুষ নেক আমল করে, এ (কেতাব) তাদের (এ) সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) এক মহাপুরস্কার রয়েছে। ১০. (অপরদিকে) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্যে (এক) কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।

রুকু ২

১১. আর মানুষ (যেভাবে নিজের জন্যে না বুঝে) অকল্যাণ কামনা করে, (তেমনি সে) তার (নিজের) জন্যে (বুঝে সুঝে) কিছু কল্যাণও (কামনা করে আসলে) মানুষ (কাংখিত বস্তুর জন্যে এমনিই) তাড়াহুড়ো করে।

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ
مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ
وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ﴿١٢﴾ وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ؕ
وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا ﴿١٣﴾ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ
الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿١٤﴾ مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ
فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى
نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾ وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا
فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ

১২. আমি রাত ও দিনকে (আমার কুদরতের) দুটো নিদর্শন বানিয়ে রেখেছি, অতপর রাতের নিদর্শন আমি বিলীন করে দিয়েছি এবং দিনের নিদর্শনকে আমি করেছি আলোকময়, যাতে করে (এর আলোতে) তোমরা তোমাদের মালিকের রেযেক সংগ্রহ করতে পারো, (সর্বোপরি) তোমরা (এর মাধ্যমে) বছরের গণনা ও (এর) হিসাবও জানতে পারো; আর (এর) সব কয়টি বিষয়ই আমি খুলে খুলে বর্ণনা করেছি। ১৩. প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যলিপি আমি তার গলায় (হারের মতো করে) ঝুলিয়ে রেখেছি; কেয়ামতের দিন তার জন্যে (আমলনামার) একটি গ্রন্থ আমি (তার সামনে) বের করে দেবো, সে তা (তার সামনে) খোলা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখবে। ১৪. (আমি তাকে বলবো) পড়ো, (এ হচ্ছে) তোমার আমলনামা; আজ নিজের হিসাবের জন্যে তুমি নিজেই যথেষ্ট; ১৫. যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথে চলবে, সে তো চলবে একান্তভাবে নিজের (ভালোর) জন্যে, যে ব্যক্তি গোমরাহ হবে তার গোমরাহীর দায়িত্ব অবশ্যই তার ওপর; (আসল কথা হচ্ছে, সেদিন) কেউই অন্য কারো (গুনাহের) ভার বইবে না; আর আমি কখনোই (কোনো জাতিকে) আযাব দেই না, যতোক্ষণ না আমি (সেখানে আযাব থেকে সতর্ককারী) কোনো রসূল না পাঠাই। ১৬. আমি যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করতে চাই তখন তার বিত্তশালী লোকদের (ভালো কাজের) আদেশ করি, কিন্তু (তা না করে) সেখানে তারা গুনাহের কাজ করতে শুরু করে, অতপর (এ জন্যে) সেখানে আমার আযাবের ফয়সালা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, পরিশেষে আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে দেই। ১৭. নূহের পর আমি (এই একই কারণে) কতো মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি; (হে নবী,) তোমার

بَعْدِ نُوْحٍ ۚ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿١٧﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَاءِ وَهٰٓؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ﴿٢٠﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ﴿٢١﴾

মালিক তাঁর বান্দাদের গুনাহের খবর রাখা ও তা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে (একাই) যথেষ্ট। ১৮. কোনো ব্যক্তি দ্রুত (দুনিয়ার সুখ সম্ভোগ) পেতে চাইলে আমি তাকে এখানে তার জন্যে যতোটুকু দিতে চাই তা সত্বর দিয়ে দেই, (কিন্তু) পরিশেষে তার জন্যে জাহান্নামই নির্ধারণ করে রাখি, যেখানে সে প্রবেশ করবে একান্ত নিন্দিত, অপমানিত ও বিতাড়িত অবস্থায়। ১৯. (অপরদিকে) যারা আখেরাত (ও তার সাফল্য) কামনা করে এবং তা পাওয়ার জন্যে যে পরিমাণ চেষ্টা করা উচিত তেমনভাবেই চেষ্টা করে, (সর্বোপরি) যারা হয় (সত্যিকার) মোমেন, (মূলত) তারাই হচ্ছে এমন লোক যাদের চেষ্টা সাধনা (আল্লাহর দরবারে) স্বীকৃত হয়। ২০. (হে নবী,) আমি এদের (যারা দুনিয়া চায়) এবং ওদের (যারা আখেরাত চায়), সবাইকেই তোমার মালিকের দান থেকে সাহায্য করে যাচ্ছি এবং তোমার মালিকের দান কারো জন্যেই বন্ধ নয়। ২১. (হে নবী,) তুমি দেখো, কিভাবে আমি (পার্থিব সম্পদের বেলায়) তাদের একজনকে আরেকজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলাম; অবশ্য মর্যাদার দিক থেকে আখেরাত অনেক বড়ো, তার ফযীলতও বহুলাংশে বেশী।

তাফসীর

আয়াত-১-২১

এবার আমরা সূরার প্রথম অধ্যায়টার ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করছি। 'সেই সত্ত্বা মহা পবিত্র, যিনি তার বান্দাকে রাতের বেলায় মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসায় নিয়ে যান.....'

(আয়াত-১)

সূরাটা আল্লাহর তাসবীহ দিয়েই শুরু হয়েছে। বস্তুত মেরাজের নৈশ ভ্রমণের চমৎকার পরিবেশের সাথে এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত কাজ। আর সেই আলোকময় পরিবেশে বান্দা ও তার মনিবের মাঝে এটাই সর্বোত্তম সংযোগ সেতু।

'তাঁর বান্দাকে রাতের বেলা নিয়ে গেলেন'....

এখানে রসূল (স.)-এর বান্দাসুলভ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো মেরাজ ও এসরার ক্ষেত্রে তিনি নিছক বান্দা হওয়া সত্তেও তাঁকে এতো উর্দ্ধে নেয়া হয়েছে যে, কোনো মানব সন্তানই ইতিপূর্বে অত উর্ধে উঠতে পারেনি। তা ছাড়া মানুষ যাতে তার এই বৈশিষ্ট্যটাকে কোনো অবস্থায়ই ভুলতে না পারে এবং বান্দার মর্যাদা ও খোদার মর্যাদা কখনো একাকার হয়ে না যায়, যেমনটি হয়েছে খৃষ্টধর্মে হযরত ঈসা (আ.)-এর অন্তর্ধানের পর। যেহেতু হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম ও অন্তর্ধান দুটোই অলৌকিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ছিলো এবং তাকে বেশ কিছু অলৌকিক ক্ষমতা ও নিদর্শনাবলীও দেয়া হয়েছিলো তাই অনেকে এটাকে খোদা ও বান্দার মর্যাদাকে একাকার করে ফেলার ওজুহাত হিসাবে দাঁড় করিয়েছে। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে এই পার্থক্যটা বজায় রাখার কারণে মহান আল্লাহর সত্তা সব ধরনের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ শেরেক থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং ইসলাম একটা নির্ভেজাল তাওহীদী জীবনাদর্শ হিসাবে চিরদিনের জন্যে সংরক্ষিত হয়েছে।

মেরাজ আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন

'ইসরা' শব্দটার আভিধানিক অর্থ হলো নৈশ ভ্রমণ। সুতরাং এই ক্রিয়াটার কাল স্বতসিদ্ধভাবেই তার ভেতরে বিদ্যমান। তাই আলাদাভাবে তার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু তা সত্তেও আয়াতে 'লাইলান' অর্থাৎ 'রাত্রকালে' শব্দটা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, মেরাজের ভাবগম্ভীর দৃশ্য ও পরিবেশটাকে কোরআনের বর্ণনাভংগীতে ফুটিয়ে তোলা। রাতের নীরব নিথর ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ মানবমনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং রসূল (স.)-এর চমকপ্রদ নৈশ ভ্রমণকে উপলব্ধি করতে শেখায়।

মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত রসূল (স.)-এর সফর মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর একটা সুপরিকল্পিত ও মনোনীত সফর। এ সফর হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর আমল থেকে চলে আসা–আকীদা ও আদর্শের সাথে শেষ নবী মোহাম্মদ (স.)-এর যোগসূত্র স্থাপন করে। সকল তাওহীদবাদী মুসলিম উম্মাহর মাঝেও এটা একটা সেতুবন্ধ রচনা করে। বলা যেতে পার যে, এই অলৌকিক সফর আসলে সর্বশেষ রসূলকে পূর্ববর্তী সকল নবী ও রসূলের পবিত্র স্থান ও অনুষ্ঠানাবলীর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা দেয়ারই প্রয়াস, তাঁদের সকলের পবিত্র স্থানসমূহকে এই রসূলের রেসালাতের আওতাধীন করা এবং এই রসূলের রেসালাতকে পূর্ববর্তী সকল নবী ও রসূলের রেসালাতের সাথে এক সূত্রে গ্রোথিত করার সমার্থক। এ সফর স্থান ও কালের চৌহদ্দি পেরিয়ে বিস্তৃত। এ সফর স্থান ও কালের চেয়ে ব্যাপকতর ও প্রশস্ততর। এ সফরের তাৎপর্য প্রথম দৃষ্টিতে যতোটুকু মনে হয় তার চেয়ে বৃহত্তর ও গভীরতর।

'মাসজিদুল আকসাকে যার চতুর্পার্শ্বে আমি বরকত নাযিল করেছি'-

এই বাক্য দ্বারা বিশ্লেষণ করার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বরকত ও কল্যাণ ওই মাসজিদকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে এবং তাকে বরকতের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে। এর পরিবর্তে যদি বলা হতো 'যার ওপর বা যার মধ্যে আমি বরকত নাযিল করেছি, তাহলে সেটা এতোটা তাৎপর্যবহ হতো না। এটা আসলে কোরআনের এক চমকপ্রদ বর্ণনাভংগী।

রসূল (স.)-এর এই ইসরা বা নৈশ ভ্রমণ আল্লাহর এমন এক নিদর্শন, যার সাথে আরো বহু নিদর্শন জড়িত রয়েছে। এ কথা বুঝানোর জন্যেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

'যাতে আমি তাকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাই।'

মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুল আকসার মাঝে এতো অল্প সময়ে এমন বিস্ময়করভাবে রসূল (স.)-এর গমনাগমন যে, তার বিছানা পর্যন্ত গরম থেকেছে, নিসন্দেহে আল্লাহর এক মহান নিদর্শন

ও মোজেযা, চাই তা যেভাবেই ঘটে থাক না কেন। এ নিদর্শন ও মোজেযা তাঁর হৃদয়চক্ষুকে খুলে দিয়েছিলো। তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলো আল্লাহর এই বিশাল সৃষ্টি জগতে কতো বিস্ময়কর জগত রয়েছে, আল্লাহর অন্যতম সৃষ্টি মানুষের সত্ত্বার ভেতরে কতো রকমারি ক্ষমতা ও প্রতিভা সুপ্ত রয়েছে এবং আল্লাহ অন্য বহু সৃষ্টির ওপর মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে ও এসব সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞান দান করে তার সৃষ্টির অপর বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করার কী অনুপম শক্তি তাকে দিয়েছেন।

'নিশ্চয় তিনি সব কিছু শোনেন ও সব কিছু দেখেন।'

অর্থাৎ যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য অন্য কারো চোখ ও কানের গোচরে আসে না, তা আল্লাহর চোখ ও কানের গোচরিভূত হয়।

প্রথম আয়াতে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা বা তাসবীহ উচ্চারিত হয়েছে যে, 'তিনি পরম পবিত্র সত্ত্বা যিনি তাঁর বান্দাকে এক রাত্রে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন।' তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে, 'যাতে আমি তাকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাই।' তারপর আল্লাহর গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'তিনি সব কিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।' এক সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল মানদন্ড দ্বারা নিরূপিত সূক্ষ্ম ও নির্ভুল বাচনভংগী অনুযায়ীই এই তিন ধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম তাসবীহ বা পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়েছে বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর জন্যে। দ্বিতীয়ত নৈশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যক্ত করা হয়েছে। তৃতীয়ত সবকিছু শোনা ও দেখার গুণের অধিকারী যে আল্লাহ তায়ালা, সে কথাটা একটা ঘোষণার আকারে এসেছে আয়াতের শেষাংশে। আর একই আয়াতে এই তিনটি বিষয়ের সমাবেশ ঘটিয়ে এর বক্তব্যগুলোকে পরিপূর্ণ স্বচ্ছতা দান করা হয়েছে।

বনী ইসরাইলের পতনের কারণ

এই নৈশ ভ্রমণ আল্লাহর এক অন্যতম নিদর্শন ও মোজেযা। মানুষ সাধারণভাবে পৃথিবীতে যা কিছু দেখতে শুনতে অভ্যস্ত, তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা একটা অভূতপূর্ব ও অসাধারণ ভ্রমণ। এই ভ্রমণের এক প্রান্তে রয়েছে মাসজিদুল আকসা। এই মাসজিদুল আকসা হলো সেই পবিত্র ভূমির কেন্দ্রস্থল, যার অধিকারী করেছিলেন আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলকে এবং পরে আবার সেখান থেকে তাদেরকে বিতাড়িতও করেছিলেন। তাই এ আয়াতের পরেই হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলের ইতিহাস আলোচনা প্রাসংগিক হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি মূসাকে কেতাব দিয়েছিলাম এবং ওই কেতাবকে বানিয়েছিলাম বনী ইসরাঈলের হেদায়াতের উৎস। (আয়াত ২-৮)

বনি ইসরাঈলের ইতিহাসের এ অধ্যায়টা সমগ্র কোরআনে শুধু এই সূরাতেই আলোচিত হয়েছে। এই সূরায় বনী ইসরাঈলের রাষ্ট্রীয় শক্তির পতনের বিবরণও দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, উত্থান পতনের যে অমোঘ নিয়ম আল্লাহর সৃষ্টি জগতে আবহমানকালব্যাপী চালু রয়েছে, সেই নিয়মের অধীন দুনিয়ার সকল জাতির পতনের মূল কারণ হলো তার নৈতিক অধপতন ও চারিত্রিক বিপর্যয়। আর একটু সামনে অগ্রসর হয়ে বিষয়টা এভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, আল্লাহ যখন কোনো মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের দুর্নীতি ও বিপথগামীতাকে তাদের ধ্বংস ও পতনের কারণে পরিণত করেন।

এ অধ্যায়ে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে অবতীর্ণ আসমানী কেতাব তাওরাত এবং ওই কেতাবে বনী ইসরাঈলকে প্রদত্ত হুশিয়ারী। অতপর তাদের মহান পূর্ব পুরুষ পরম কৃতজ্ঞ বান্দা হযরত নূহ (আ.) ও তার সাথে নৌকায় আরোহী মোমেনদের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

'আর আমি মূসাকে কেতাব দিয়েছিলাম ....(শুনে রাখো যে) নূহ একজন কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলো।' (আয়াত ২-৩)

উল্লেখিত হুশিয়ারী এবং এই স্মারক বক্তব্য আল্লাহর সেই প্রতিশ্রুতিরই বাস্তব রূপ, যা এই সূরায় কিছু পরে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিশ্রুতিটা হলো, আল্লাহ যতোক্ষণ কোনো জাতির কাছে রসূল না পাঠান এবং সেই রসূল তাদেরকে পূর্ববর্তীদের পরিণতি স্মরণ না করান ও সতর্ক না করেন, ততোক্ষণ তাদের ধ্বংস করেন না।'

মূসা (আ.)-কে কেতাব দেয়ার প্রথম উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে–

'বনী ইসরাঈলের হেদায়াতের উপকরণ এবং (বলেছিলাম যে) আমাকে ছাড়া আর কাউকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করো না।'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো ওপর নির্ভর এবং আর কারো কাছে নতি স্বীকার করো না। এটাই হলো হেদায়াতের পথ এবং এটাই ঈমানের দাবি। অতপর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকে অভিভাবক মানে সে ঈমানদারও নয়, হেদায়াতপ্রাপ্তও নয়।

আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলকে তাদের সেসব পিতৃ পুরুষের নামে সম্বোধন করেছেন, যাদেরকে তিনি নূহ (আ.)-এর নৌকায় আরোহী বানিয়েছিলেন। পৃথিবীতে প্রেরিত প্রথম রসূলের আমলে তারাই ছিলেন সমগ্র পৃথিবীর একমাত্র মানব গোষ্ঠী। আল্লাহ তায়ালা তাদের নামে সম্বোধন করার মাধ্যমে বনী ইসরাঈলকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে তাঁর পরম কৃতজ্ঞ বান্দা নূহের একনিষ্ঠ সাথী ও অনুসারী বানিয়েছিলেন এবং বনী ইসরাঈল সেই পূত পবিত্র মোমেন বান্দাদেরই বংশধর।

হযরত নূহ (আ.)-কে বান্দা হিসাবে উল্লেখ করার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর প্রিয় রসূলদের সাথে তাঁর সমন্বয় সাধন। ইতিপূর্বে এই বিশেষণে বিশেষিত করেছেন মোহাম্মদ (স.)-কেও। বস্তুত এ হচ্ছে কোরআনের সেই সমন্বয় প্রক্রিয়া, যা এ সূরায় কার্যকরী রয়েছে।

বনী ইসরাঈলের হেদায়াতের উৎস হিসাবে হযরত মূসা (আ.)-কে আল্লাহর দেয়া সেই কেতাব তাদেরকে জানিয়েছে যে, তাদের অনাচার অত্যাচার ও দুর্নীতির কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিধ্বস্ত করে দেয়ার ফয়সালা করেছেন। এই অনাচার ও দুর্গতি দু'বার দেখা দেয়ার কারণে তাদের পতনও দু'বার ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে তারা পুনরায় যখনই বিপর্যয় ও অনাচার ছড়াবে, তখনই পুনরায় তাদের অনুরূপ পরিণতি ঘটানো হবে। কেননা এ ব্যাপারে আল্লাহর অমোঘ নিয়ম চালু রয়েছে, যার কখনো রদবদল হয় না।

'আমি (তাওরাত) কেতাবে বনী ইসরাঈল সম্পর্কে এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছি যে, তোমরা পৃথিবীতে অবশ্যই দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমরা অবশ্যই বিরাট বিজয় লাভ করবে।'

এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার অর্থ হলো, বনী ইসরাঈলের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে পূর্বাভাস দিচ্ছেন। এই ঘোষণা দ্বারা তিনি তাদেরকে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বাধ্য করছেন না এবং এই ঘোষণা থেকে তাদের কার্যকলাপও তৈরী হচ্ছে না, কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর কোনো বান্দাকে বিপর্যয় সৃষ্টিতে বাধ্য করেন না। সূরা আ'রাফে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তুমি বলে দাও যে, আল্লাহ তায়ালা কোনো খারাপ কাজ করতে নির্দেশ দেন না। বস্তুত যে ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটবে বলে আল্লাহ তায়ালা জানেন, সেটাই তিনি আমাদেরকে জানান। আর

আল্লাহ তায়ালা যা ঘটবে বলে জানেন, তা ঘটবেই, চাই মানুষের জানামতে তা এখনো পর্যন্ত না ঘটে থাকুক এবং সে সম্পর্কে কিছুই জানা না থাক।

হযরত মূসা (আ.)-কে প্রদত্ত কেতাবে আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলের জন্যে এরূপ ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, তারা দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং পবিত্র স্থানে তারা বিজয়ী ও কর্তৃত্বশীল হবে। আর যখনই তারা বিজয়ী ও কর্তৃত্বশীল হবে এবং সেই কর্তৃত্বকে দেশে বিপর্যয়, দুর্নীতি ও অনাচারের বিস্তার ঘটানোর জন্যে ব্যবহার করবে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে এমন লোকদেরকে আধিপত্য দান করবেন, যারা তাদের ওপর নিপীড়ণ চালাবে, তাদের সম্মান ও মর্যাদাকে পদদলিত করবে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে ছাড়বে।

'যখন আমার প্রথম বিপর্যয়ের প্রতিশ্রুতির সময় এসে যেতো, তখন আমি তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিতাম আমার অত্যন্ত শক্তিশালী বান্দাদেরকে....' (আয়াত ৫)

বস্তুত প্রথম বিপর্যয়টা ঘটবে এভাবে যে, তারা পবিত্র ভূমিতে কর্তৃত্ব লাভ করবে, ক্ষমতা ও আধিপত্যের অধিকারী হবে, অতপর সেখানে অনাচার ও দুর্নীতি ছড়াবে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর পরাক্রমশালী ও প্রতাপশালী বান্দাদেরকে পাঠাবেন, যারা তাদের বাড়ীঘর দখল করবে, ঔদ্ধত্য সহকারে চলাফেরা করবে এবং সেখানকার অধিবাসী ও সহায় সম্পদের ওপর লুণ্ঠন ও নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চালাবে। 'এবং প্রতিশ্রুতি পালিত হবে।'

অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি মিথ্যা সাব্যস্ত হবে না এবং তার বরখেলাপ কিছু করা হবে না।

এভাবে বনী ইসরাঈল যখন হানাদার যালেম শাসকদের নিষ্ঠুর নির্যাতনে, লাঞ্ছনায় গঞ্জনায় ও অপমানে সর্বস্বান্ত হয়ে যেতো, তাদের ওপর চেপে বসা বিপদ মুসিবতের দরুন অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতো, আত্মশুদ্ধি করতো, অপরদিকে হানাদাররা বিপর্যয় সৃষ্টি করতো এবং ক্ষমতার নেশায় মত্ত হয়ে চরম স্বেচ্ছাচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো, তখন আল্লাহ তায়ালা পরাজিতদের পক্ষ হয়ে বিজয়ীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতেন এবং দাম্ভিক হানাদারদেরকে পর্যুদস্ত করে হীনবল পরাজিত পক্ষকে পুনরায় পরাক্রান্ত ও বিজয়ী করে দিতেন।

'পুনরায় আমি তোমাদের দিন ফিরিয়ে দিতাম এবং জনবল ও ধনবল দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করতাম.... (আয়াত ৬)

এভাবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতো।

অবশিষ্ট নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা সাধনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের বিবরণ দেয়ার আগে আল্লাহর কর্মফল সংক্রান্ত চিরন্তণ নিয়ম বিধিকে তুলে ধরা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে-

'তোমরা যদি ভালো কাজ করো, তবে তাতে তোমাদেরই লাভ হবে। আর যদি খারাপ কাজ কর তবে তাতে তোমাদেরই ক্ষতি হবে। এই কর্মফল বিধি এমন এক বিধি, যা দুনিয়া ও আখেরাতের কোথাও পরিবর্তিত হয় না।'

এ বিধি মানুষের যাবতীয় তৎপরতাকে তার সমস্ত ফল ও ফসল সমেত মানুষের নিজের জন্যেই নির্দিষ্ট করে দেয়, ফলাফলকে কাজের স্বাভাবিক ফল গণ্য করে এবং মানুষকে তার নিজের যাবতীয় কাজের জন্যে দায়ী করে। সে ইচ্ছা করলেই নিজের উপকার অথবা ক্ষতি সাধন করতে পারে। কাজেই সে যখন তার নিজের কাজের ফল ভোগ করে, তখন তার নিজেকেই তিরস্কার করা উচিত, অন্য কাউকে নয়।

বনী ইসরাঈলের দ্বিতীয় বিপর্যয়

কর্মফলনীতিটা তুলে ধরার পর পরবর্তী আয়াতে পুনরায় ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

'অতপর যখন শেষ প্রতিশ্রুতি সমাগত হলো, যাতে হানাদাররা তোমাদের মুখে কালিমা লেপন করে.... (আয়াত ৭)

দ্বিতীয়বার বনী ইসরাঈল ক্ষমতা ও আধিপত্য লাভ করার পর যে বিপর্যয় ও অনাচার ছড়ালো, তার উল্লেখ এখানে করা হয়নি। কেননা ইতিপূর্বে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে বলে যে কথা বলা হয়েছে, তা থেকেই এটা বুঝা যায়। এ দ্বারা তাদের ওপর পুনরায় যে যালেম হানাদারদের শাসন চেপে বসে তাও প্রমাণিত হয়।

'অতপর যখন শেষ প্রতিশ্রুতির সময় সমাগত হলো, যাতে হানাদাররা তোমাদের মুখে কালিমা লেপন করে .... ।

অর্থাৎ তোমাদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার চালাবে এবং তোমাদের পবিত্র স্থানসমূহের অবমাননা করবে।

'আর প্রথমবারের মতোই মাসজিদে প্রবেশ করবে, 'এবং তাদের দখলীকৃত জনপদ ও সহায় সম্পদকে ধ্বংস করবে।'

এখানে হানাদারদের হাতে সাধিত সর্বাত্মক ধ্বংসযজ্ঞের ছবিই ফুটে উঠেছে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রতিশ্রুতি যথার্থই পূর্ণ হয়েছিলো। প্রথমবারে বনী ইসরাঈলের ওপর স্বৈরাচারী একনায়ক শাসক জেঁকে বসে। দ্বিতীয়বার যারা জেঁকে বসে তারা তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে এবং তাদের রাজ্যকে পুরো মাত্রায় বিধ্বস্ত করে।

কোরআন বনী ইসরাঈলের ওপর জেঁকে বসা এই শাসকদের পরিচয় দেয়নি। কেননা পরিচয়ের ভেতরে বাড়তি কোনো শিক্ষা নেই। শিক্ষাটাই হচ্ছে এখানে কাংখিত বিষয়। সৃষ্টি জগতে আল্লাহর নির্ধারিত উত্থান পতনের বিধান কী, সেটাই এখানে মূল আলোচ্য বিষয়।

সত্য প্রমাণিত ভবিষ্যদ্বাণী ও বাস্তবায়িত প্রতিশ্রুতির মন্তব্য করে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই ধ্বংসযজ্ঞ ও তোমাদের জন্যে করুণায় পর্যবসিত হতে পারে যদি তোমরা তা থেকে শিক্ষা নাও। 'তোমাদের প্রভু তোমাদের ওপর করুণা বর্ষণ করতে পারেন।' আর বনী ইসরাঈল আবার আগের মতো আচরণ করলে আল্লাহ আবারো শাস্তি দিতে পারেন। 'আর যদি তোমরা প্রত্যাবর্তন করো তবে আমিও প্রত্যাবর্তন করবো।'

বনী ইসরাইল বাস্তবিক পক্ষেই তাদের সাবেক অপকর্ম ও অনাচারের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছিলো এবং তার বদলায় আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর মুসলমানদেরকে চাপিয়ে দেন। মুসলমানরা তাদেরকে সমগ্র আরব উপদ্বীপ থেকে বিতাড়িত করে ছেড়েছিলো। এরপর আবারো তারা অপকর্মের পুনরাবৃত্তি করে। ফলে যুগে যুগে তাদের ওপর বিভিন্ন নিষ্ঠুর শাসকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিককালে তাদের ওপর নেমে আসে হিটলারের পৈশাচিক অত্যাচার। এরপরও তারা পুনরায় বিপর্যয় ছড়াতে আরম্ভ করেছে। 'ইসরাঈল' নামক রাষ্ট্রের মাধ্যমে তারা আসল আরব অধিবাসীদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালাচ্ছে। এর বদলা তারা অবশ্যই পাবে।(১) তাদের ওপর

---

(১) ইসরাঈল রাষ্ট্র জন্ম নেয়ার পর আটান্ন বছর অতিবাহিত হতে চললো। এ সামান্য সময়ের মধ্যে তাদের লম্প জম্প দেখে এটা মনে করা উচিত নয় যে আল্লাহর ওয়াদা সত্যে নয়। আল্লাহর এই ওয়াদার সততা দেখার জন্যে আমাদের আরো কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে এই যা!—সম্পাদক

আবারো এমন কোনো শাসন চেপে বসবে, যা আল্লাহর অকাট্য ওয়াদা ও অমোঘ প্রাকৃতিক বিধি অনুসারে তাদের নিষ্ঠুরতম শাস্তি দেবে। তাদের এ পরিণতির বাস্তবরূপ লাভ করতে বেশী দেরী নেই।

আয়াতের শেষাংশে আখেরাতে কাফেরদের কী পরিণতি হবে তা তুলে ধরা হয়েছে। কেননা তাদের পরিণতিও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বনি ইসরাঈলের মতোই।

'আর আমি জাহান্নামকে বানিয়েছি কাফেরদের খোয়াড়।'

এই খোয়াড়ে তাদেরকে আটক রাখা হয়। ফলে কেউ বেরুতে পারে না।

বনি ইসরাঈলের ইতিহাসের এই পর্বটা এবং তাদের হেদায়াতের জন্যে মূসা (আ.)-এর কাছে প্রেরিত তাদের কেতাব ও ওই কেতাবের অবাধ্যতাবশত তাদের গোমরাহ ও ধ্বংসের প্রসংগ আলোচনার পর কোরআন সম্পর্কে আলোচনা এসে গেছে পরবর্তী আয়াতে। 'এই কোরআন সবচেয়ে নির্ভুল পথের সন্ধান দেয় ....।' (আয়াত ৯-১০)

এখানে কাকে ও কোন বিষয়ে নির্ভুল পথের সন্ধান দেয়, তার উল্লেখ করা হয়নি। এ কারণে তা সর্বকালের সকল জায়গার সকল মানুষকে এবং সর্বকালের সর্বোত্তম পথ ও বিষয়কে বুঝায়।

এ কোরআন মানুষকে সর্বোত্তম আকীদা, আদর্শ, চিন্তাধারা ও মতবাদের পথ দেখায়। সে আদর্শে কোনো অস্পষ্টতা ও জটিলতা নেই। সে আদর্শ মানুষের অন্তরাত্মাকে অলীক ধ্যান ধারণা ও কু-সংস্কারের জঞ্জাল থেকে মুক্ত করে। মুক্ত করে মানুষের ক্ষমতা ও প্রতিভাকে কাজে লাগানোর জন্যে স্বাধীন করে দেয়। কোরআন বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম ও মানব সত্ত্বার প্রাকৃতিক নিয়মের মাঝে সংযোগ স্থাপন করে। সমন্বয় সাধন করে মানুষের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সত্ত্বার মাঝে, মানুষের চিন্তা ও কর্মের মাঝে এবং তার আদর্শ ও বাস্তবতার মাঝে। ফলে মানুষ এমন এক যোগসূত্রের সন্ধান পেয়ে যায়, যা কখনো ছিন্ন হয় না। সে পৃথিবীতে অবস্থান করেও উর্ধ্ব জগতে বিচরণ করে। এ জন্যে মানুষ যখন আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট থাকে, তখন তার কাজও এবাদাতে পরিণত হয়, এমনকি তা যদি জৈবিক সুখ উপভোগের কাজও হয়।

এবাদাতের ক্ষেত্রেও সর্বোত্তম পথ প্রদর্শন করে কোরআন। এ ক্ষেত্রে সে ক্ষমতা ও দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে। মানুষের ওপর সে এতো কষ্টকর দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় না, যা পালন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। আবার তার প্রতি এতো নমনীয়তাও প্রদর্শন করে না যে, তার ভেতরে উদাসীনতা ও ধৃষ্টতার মনোভাব গড়ে উঠতে পারে। সে দায়িত্ব অর্পণ করে তা মধ্যমপন্থী, সুষম ও সহনীয়তার সীমা অতিক্রম করে না।

আশু মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কোরআন সবচেয়ে সুষ্ঠু ও নিখুঁত পন্থা শিক্ষা দেয়। ব্যক্তিগত, দাম্পত্য, রাষ্ট্রীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক-সর্বক্ষেত্রেই সে এই সম্পর্ককে এমন টেকসই ও মযবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে যে, তা কারো প্ররোচনা বা ভাবাবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয় না, বা ভালোবাসা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না এবং স্বার্থপরতা দ্বারা তাড়িত হয় না। এর ভিত্তিগুলোকে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা নিজের সৃষ্টির জন্যে তৈরী করেছেন। নিজের সৃষ্টির ভালোমন্দ সম্পর্কে তিনি নিজেই ধিকতর অভিজ্ঞ। কোন দেশ ও কোন প্রজন্মের জন্যে কোন্ জিনিস অধিকতর উপযোগী, তা তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। তাই তিনি রাজনৈতিক, অর্থনেতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিখুঁত ও নির্ভুল পন্থা প্রদর্শন করেন এই কোরআনের মাধ্যমে।

নবী ও রসূলদের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে ইসলামের যে বিধানসমূহ নাযেল হয়েছে, তার মধ্য থেকে সর্বোত্তম বিধানকে বেছে গ্রহণ করার ব্যাপারেও কোরআন পথ প্রদর্শন করে। পথ প্রদর্শন

করে ওই সব বিধানের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধনের এবং প্রত্যেক উম্মাতের পবিত্র স্থান ও বিধি-নিষেধের প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরও। ফলে সব কটা ঐশী বিধানের অনুসারীরা সহ গোটা মানবজাতি পরিপূর্ণ শান্তি ও সংহতির সাথে জীবন যাপন করে।

'এই কোরআন সবচেয়ে সুষ্ঠ ও নির্ভুল বিধানের দিকে পথ প্রদর্শন করে এবং সৎকর্মশীল মোমেনদেরকে বিপুল পুরস্কারের সুসংবাদ দেয়, আর যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের জন্যে নির্ধারণ করে রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'

এটা হচ্ছে কর্ম ও কর্মফলের ব্যাপারে কোরআনের মূলনীতি। ঈমান ও সৎকর্মশীলতার ওপর সে তার ভিত্তি গড়ে তোলে। সৎকর্ম ছাড়া ঈমানের মূল্য নেই, আর ঈমান ছাড়া কোনো সৎকর্মের গ্রহণযোগ্যতা নেই।

প্রথমটা অপূর্ণতার দোষে দুষ্ট। আর দ্বিতীয়টা অগ্রহণযোগ্য। এই উভয়টার সমন্বয়েই সবচেয়ে নির্ভুল ও সুষ্ঠ জীবন গড়ে ওঠে এবং এই উভয়টার সমন্বয় ঘটলেই মানুষ কোরআন দ্বারা হেদায়াত লাভ করতে সক্ষম হয়।

যারা কোরআন দ্বারা হেদায়াত লাভ করে না, তারা মানবীয় খেয়ালখুশীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে যায়।' আর মানুষ স্বভাবতই দ্রুততাপ্রিয়, নিজের লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে অজ্ঞ এবং নিশ্চিত অকল্যাণকর জেনেও নিজের ভাবাবেগের গোলাম হয়ে থাকে।

'আর মানুষ যেভাবে নিজের কল্যাণকে আহ্বান করে, ঠিক সেইভাবে তার অকল্যাণকেও আহ্বান করে। মানুষ বড়ই দ্রুততা প্রিয়।।'

কারণ সে কিসের পরিণতি ও শেষফল কী তা জানে না। জানে না বলেই ক্ষতিকর কাজও সে করে এবং তা দ্রুততার সাথে করে। কখনো কখনো সে ক্ষতিকর জেনেও করে। কেননা, নিজেকে সংযত করতে পারে না। এ অবস্থাটা তার হতো না যদি সে কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতো। মানুষের ভাবাবেগ আর কোরআনের হেদায়াত-এ দু'য়ের ভেতরে অনেক ব্যবধান।

প্রাকৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মফলের যৌক্তিকতা

রসূল (স.)-এর নৈশ ভ্রমণ, সেই ভ্রমণের সময় যেসব অলৌকিক ঘটনা ঘটে ও যেসব নিদর্শন তিনি দেখেন, হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর সাথে নৌকায় আরোহণকারী মোমেনরা, বনী ইসরাঈলের ঘটনা ও তাদের পরিণতি, এই পরিণতি থেকে আল্লাহর যে প্রাকৃতিক বিধান জানা যায়, কর্মফল সংক্রান্ত যে নীতি জানা যায় এবং সবচেয়ে সুষ্ঠ ও নির্ভুল বিধানসম্বলিত এই সর্বশেষ কেতাব কোরআনের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার পর নবীদের মোজেযা ও প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী নিয়ে পরবর্তী আয়াতগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে দেখানো হয়েছে এই প্রাকৃতিক বিধানের সাথে মানুষের কর্মকান্ড, চেষ্টা, চেষ্টার ফল, আর রোযগার ও হিসাব নিকাশের গভীর সম্পর্ক। দেখানো হয়েছে যে, আল্লাহর এই প্রাকৃতিক জগত তাঁরই রচিত প্রাকৃতিক বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শাসিত, তাঁরই রচিত প্রাকৃতিক নিয়ম ও বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ওই সব নিয়ম কখনো লংঘিত বা পরিবর্তিত হয় না। রাত ও দিনের আবর্তন ঘটায় সেই অমোঘ প্রাকৃতিক বিধান। রাত ও দিনের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর পরিকল্পনা ও পরিচালনা অনুসারেই চলে এ মহাবিশ্ব।

'আমি রাত ও দিনকে দুটো নিদর্শনের আকারে সৃষ্টি করেছি।..... (আয়াত ১১-১২)

বস্তুত যে প্রাকৃতিক বিধান রাত ও দিনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার সাথে মানুষের উপার্জন প্রচেষ্টা, বর্ষ ও কালের হিসাব, মানুষের ভালো বা মন্দ কর্ম, ভালো ও মন্দ কাজের ফলাফল, হেদায়াত ও

গোমরাহীর ফলাফল, একজন অন্যজনের কর্মফল বহন না করা সংক্রান্ত কঠোর ব্যক্তিগত বিধি, রসূল পাঠানোর আগে কোনো মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস না করার খোদায়ী বিধান, বিত্তশালী নাগরিকদের পাপাচারের কারণে দেশকে ধ্বংস করার খোদায়ী রীতি এবং যারা দুনিয়া চায় ও যারা আখেরাত চায় তাদের উভয়ের পরিণতি নিবীড়ভাবে সম্পৃক্ত। এগুলো একটা শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় নীতিমালা অনুসারে চলে। এলোমেলো ও অপরিকল্পিতভাবে চলে না।

'আমি রাত ও দিনকে দুটো নিদর্শন বানিয়েছি। অতপর রাতের চিহ্ন মুছে ফেলেছি এবং দিনের চিহ্নকে চক্ষুষ্মান করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ খুঁজতে পারো এবং বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার। আর প্রতিটি জিনিস আমি সবিস্তারে বর্ণনা করেছি।' (আয়াত ১১)

বস্তুত রাত ও দিন দুটো বড় ধরনের প্রাকৃতিক নিদর্শন। এ নিদর্শন দুটো প্রাকৃতিক বিধানকে নির্ভুল ও অব্যর্থ প্রমাণ করে যে, এক মুহূর্তের জন্যেও তাতে কোনো পরিবর্তন বা অচলাবস্থা দেখা দেয় না। দিন রাত অবিরাম গতিতে সচল ও সক্রিয় থাকে এই মহাবিশ্ব। তাহলে প্রশ্ন জাগে যে, রাতের চিহ্ন মুছে ফেলা দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? রাতের চিহ্ন তো দিনের চিহ্নের মতোই বহাল রয়েছে। এর সঠিক জবাব তো আল্লাহ তায়ালাই জানেন। তবে আমার মনে হয় এ দ্বারা রাতের অন্ধকারকে বুঝানো হয়েছে, যার ভেতরে সব জিনিস আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং সকল বস্তু ও প্রাণীর তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ দিনের আলোয় যেভাবে প্রাণী ও বস্তুর নড়াচড়া ও তৎপরতা চলে, তার তুলনায় রাতটা যেন একেবারেই অস্তিত্বহীন। আর দিনের যে আলো যাবতীয় জিনিসকে আলোকময় করে, সেই আলো দিয়েই যেন দিন সব কিছুকে দেখতে পায়।

রাতের এই নিশ্চিহ্ন হওয়া এবং দিনের এই আলোকময় হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, 'যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ খুঁজতে পারো এবং বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব জানতে পারো।' রাত হলো বিশ্রামের জন্যে আর দিন কাজের জন্যে ও উপার্জনের জন্যে। রাত ও দিনের মাঝের ব্যবধান থেকেই মানুষ বর্ষ সংখ্যা, লেনদেনের প্রতিশ্রুতির হিসাব ও ঋতু বৈচিত্র সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে পারে।

'প্রতিটি জিনিস আমি সবিস্তারে বর্ণনা করেছি।' অর্থাৎ মহাবিশ্বে কোনো জিনিস কাকতালীয়ভাবে এবং আকস্মিকভাবে ঘটে না। প্রাকৃতিক নিয়মের নির্ভুলতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহাবিশ্বের পরিচালনা ও পরিকল্পনার ব্যবস্থাও নির্ভুল ও নিখুঁত।

এই নির্ভুল ও নিখুঁত প্রাকৃতিক বিধানের সাথে কর্ম ও কর্মফলের নিবীড় সম্পর্ক রয়েছে।

'আমি প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যকে তার কাঁধের সাথে সংলগ্ন করে রেখেছি। আর কেয়ামতের দিন তার জন্যে একখানা উন্মুক্ত আমলনামা বের করবো। তুমি তোমার আমল নামা পড়ো। আজকে তোমার হিসাব গ্রহণের জন্যে তুমিই যথেষ্ট।' (আয়াত ১৩-১৪)

এখানে মানুষের ভাগ্য দ্বারা তার আমলকে বুঝানো হয়েছে, যা তার জন্যে বরাদ্দ করা হয়। তার কাঁধের সাথে এটাকে সংলগ্ন করা দ্বারা তার সাথে তার লেগে থাকা ও বিচ্ছিন্ন না হওয়া বুঝানো হয়েছে। তত্ত্বীয় বিষয়কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর আকারে তুলে ধরার এ রীতি কোরআনের একটা সুপরিচিত রীতি। মানুষের আমল বা কাজ তার কাছ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না এবং মানুষ তা থেকে কখনো দায়মুক্ত হয় না। অনুরূপভাবে 'কেয়ামতের দিন তার জন্যে উন্মুক্ত পুস্তক বের করবো' এই কথাটাও কোরআনের সুপরিচিতি বাচনভংগী। এ দ্বারা তার আমল বা কাজকে একটা প্রকাশ্য বস্তুর আকারে তুলে ধরা হয়েছে, যা গোপন করা বা অস্বীকার করা সম্ভব হবে না।

এ বিষয়টাকে একটা উন্মুক্ত পুস্তক বলা হয়েছে, যা মনের ওপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। এখানে কন্ঠলগ্ন সেই ভাগ্য যেন মানুষের কল্পনার চোখে ভেসে ওঠে এবং এই পুস্তক যেন এক দুর্যোগময় দিনের আতংকদায়ক পুস্তক হয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে, যাতে সমস্ত গোপনীয় বিষয় উন্মোচিত হয়। কোনো সাক্ষী-সাবুদের দরকার হয় না। 'তুমিই তোমার পুস্তক পড়ো, তোমার হিসাবগ্রহণকারী হিসাবে তুমিই যথেষ্ট।'

ওই প্রাকৃতিক বিধানের সাথে কর্ম ও কর্মফলের বিধানের গভীর সম্পর্ক ও অবিচ্ছেদ্য সংযোগ রয়েছে। 'যে ব্যক্তি হেদায়াত লাভ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যেই হেদায়াত লাভ করে, আর যে বিপথগামী হয় সে নিজের ক্ষতির জন্যেই বিপথগামী হয়। একজন অন্যজনের পাপের বোঝা বহন করে না।' বস্তুত এ হচ্ছে ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব, যা প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ব্যাপার। সে যদি সৎপথে চালিত হয় তবে তারই কল্যাণ হয়, আর যে কুপথে চলে তবে তারই অকল্যাণ হয়। কোনো মানুষ অন্য মানুষের দায় বহন করে না। কেউ অন্যের দায় হালকাও করতে পারে না। প্রত্যেককে তার কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, প্রত্যেককে তার কাজের ফলাফল ভোগ করানো হবে এবং কোনো অন্তরংগ বন্ধুও অপর অন্তরংগ বন্ধুর কাজের দায়ভার বহন করবে না।

আযাব ও গযব নাযিলের নিয়ম

আল্লাহ তায়ালা নিজ দয়াগুণে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বিশ্ব প্রকৃতিতে আল্লাহর যে নিদর্শনাবলী ছড়িয়ে রয়েছে কিংবা প্রত্যেক মানুষের কাছে থেকে তার পিতার ঔরসে থাকা অবস্থায় যে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিলো, তার ভিত্তিতে তাকে ঈমান আনার জন্যে দায়ী করা হবে না, বরং তার কাছে নবী ও রসূল পাঠিয়ে সতর্ক করা ও স্মরণ করানো হবে। সে কথাই ১৫ নং আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে,

'রসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি (কাউকে) শাস্তি দেই না।'

বস্তুত এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, বান্দাদেরকে শাস্তি দেয়ার আগে যাবতীয় সুযোগ দিয়ে ওযর বাহানার পথ বন্ধ করেছেন।

অনুরূপভাবে রসূলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে দুনিয়ার জীবনেই শাস্তি দেয়া ও ধ্বংস করার শাশ্বত খোদায়ী বিধান কার্যকর থাকে। দিন ও রাতের সংঘটক সেই প্রাকৃতিক বিধানের সাথে এর অংগাংগী সংযোগ রয়েছে।

'আমি যখন কোনো জনপদ ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেই, তখন তার বিত্তশালীদেরকে আদেশ দেই, অতপর তারা (তারা তা না করে) পাপাচারে লিপ্ত হয়, ফলে তার ওপর আমার ফায়সালা কার্যকর হয়। আর আমি তাকে ধ্বংস করে দেই।'

'মুতরাফুন' বলতে প্রত্যেক জাতির সেই বিলাসী ধনকুবের শ্রেণীকে বুঝায় যাদের ধন সম্পদ, চাকর-নকর, সুখ-সমৃদ্ধি সর্বোচ্চ পরিমাণে বিদ্যমান। সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব ও তাদের করায়ত্ত থাকে। ফলে তাদের মন অত্যন্ত ভোগবাদী ও পাপাসক্ত হয়ে পড়ে, নৈতিক মূল্যবোধ, পবিত্র স্থান, ও মহৎ কর্মকান্ডকে অগ্রাহ্য ও অমান্য করে, মানুষের সম্মান ও মর্যাদাকে বুড়ো আংগুল দেখায়, প্রতিরোধকারী কেউ না থাকলে সর্বত্র বিপর্যয় বিশৃংখলা ও অনাচার ছড়ায়। সমাজে অশ্লীলতার বিস্তার ঘটায় এবং যে মূল্যবোধগুলোর উদ্দেশ্যেই মানবজাতি বেঁচে থাকে, সেগুলোকে ভূ-লুণ্ঠিত করে। এ জন্যে জাতি তার জীবনী শক্তি হারিয়ে নিস্তেজ হতে হতে এক সময়ে একেবারেই ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

আল্লাহর এই শাশ্বত বিধানটাই এ আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। বিধানটা এই যে যখন কোনো জাতি ধ্বংসের যাবতীয় উপকরণ অবলম্বন করে, ওই জাতিতে পাপাচারী ভোগবাদী ধনিকদের সংখ্যা ও দৌরাত্ম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়, এবং ওই জাতি তাদের অব্যাহত অপতৎপরতা প্রতিরোধের

কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তায়ালা ওই পাপাচারী ধনিকদেরকে ওই জাতির ওপর চাপিয়ে দেন। এর ফলে ওই ধনিকরা ব্যাপকভাবে পাপাচারে লিপ্ত হয়, সমাজে সর্বত্র অন্যায় ও অনাচার ছড়িয়ে পড়ে এবং গোটা জাতি পাপাসক্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে ওই জাতি আল্লাহর শাশ্বত বিধানের প্রয়োগক্ষেত্র হবার যোগ্য হয়ে পড়ে এবং ধ্বংস হয়ে যায়। এই ধ্বংসযজ্ঞের জন্যে ওই জাতি নিজেই দায়ী হয়ে থাকে। কেননা সেই জাতি ক্রমবর্ধমান পাপাচারে বাধা দিতে ও ওই পাপাচারীদের বরদাশতকারী সমাজ ব্যবস্থাকে সংশোধন করতে চেষ্টা করেনি। মোদ্দাকথা হলো, পাপাসক্ত ধনিক শ্রেণীর অস্তিত্বই সমাজের তাদের পরিপূর্ণ আধিপত্য ও প্রতিষ্ঠা লাভের মূল কারণ। সমাজ তাদেরকে টিকে থাকতে দেয়ার কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে গোটা জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। আর ঘাড়ে চেপে বসার পরই তারা পূর্ণ ঔদ্ধত্য সহকারে, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপ ও অনাচারকে ছড়িয়ে দেয়ার সুযোগ পায়। জাতি যদি শুরুতে তাদের আবির্ভাবে বাধা দিতো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন না, তারাও জাতিকে ধ্বংসের পথে টেনে নেয়ার সুযোগ পেতো না এবং জাতি ধ্বংসের কবলে নিক্ষিপ্ত হতো না।

আল্লাহ তায়ালা মানব জীবনের জন্যে কিছু নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যার কোনো রদবদল হয় না। এই নিয়ম অনুসারে কিছু নির্দিষ্ট কারণ ঘটলে নির্দিষ্ট ফলাফল অনিবার্যভাবে দেখা দেয়। এভাবেই আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকর হয় এবং তার ফয়সালা বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহ তায়ালা নিজে কখনো পাপ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। কিন্তু পাপাসক্ত ধনিকদের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে, জাতি ও সমাজ কখনো কখনো নিজেই নিজের ধ্বংসের কারণ সৃষ্টি করে এবং পাপিষ্ঠ লোকদেরকে লালন পালন করে ও বিকাশবৃদ্ধির সুযোগ দিয়ে আল্লাহর শাস্তি স্বরূপ ধ্বংসের যোগ্য হয়ে যায়।

সুতরাং আয়াতে আল্লাহর যে ইচ্ছার উল্লেখ রয়েছে, সেটা ধ্বংসের কারণ সৃষ্টিকারী ও বল প্রয়োগমূলক আদেশ দানের সিদ্ধান্ত নয়, বরং তা ধ্বংসের কারণ সৃষ্টির পর তার ফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত এবং সে ফল শাশ্বত প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন স্বয়ংক্রিয় ও অনিবার্য, আর যে আদেশের উল্লেখ আয়াতে রয়েছে, তা পাপাচারের আদেশ নয়, বরং পাপাচারী ধনিকদের অস্তিত্ব বরদাশত করার স্বাভাবিক ফল প্রকাশের আদেশ। সেই স্বাভাবিক ফল হলো সমাজে সর্বব্যাপী পাপাচার, অত্যাচার ও অনাচার।

দুনিয়া পুজারীদের পরিণতি

অনিবার্য বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সমাজ ব্যবস্থার সংশোধনে জাতির দায়িত্ব কতোখানি এবং দুষ্কর্মকারীদের প্রতিরোধ করে সমাজ থেকে পাপাচার নির্মূল ও ধ্বংযজ্ঞের হুমকি থেকে আত্মরক্ষার উপায় কী, তা এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হযরত নূহ (আ.)-এর পরবর্তী সকল জাতির ক্ষেত্রে এই নিয়ম যুগ যুগ কাল ধরে কার্যকরী থেকেছে। কোনো সমাজে যখনই আল্লাহর নাফরমানী ছড়িয়ে পড়েছে, তখনই তা এই ভয়াবহ পরিণতি অনিবার্য করে তুলেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'নূহের পর আমি বহু জাতিকে ধ্বংস করেছি। তোমার প্রতিপালকই তাঁর বান্দাদের গুনাহ জানা ও দেখার জন্যে যথেষ্ট। (আয়াত ১৭)

যারা একমাত্র দুনিয়ার জীবনের সুখ সমৃদ্ধিই চায় এবং এই দুনিয়ার উর্ধে কী আছে, তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করে না, তাদের দুনিয়ার জীবনের সুখ আল্লাহ তায়ালা ও যার জন্যে যতোটুকু ইচ্ছা করেন ত্বরিত দিয়ে দেন। অতপর আখেরাতে তার জন্যে জাহান্নামই থাকে অপেক্ষমান এবং সেটাই তার যোগ্য পরিণাম। কেননা দুনিয়ার জীবনের ওপারের কথা যারা ভাবে না, তারা দুনিয়ার নোংরামিতে আকণ্ঠ ডুবে থাকে, পশুর মতো ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে যায় এবং প্রবৃত্তির লোভ

লালসার কাছে আত্মসমর্পণ করে। ফলে পার্থিব জীবনের সুখ ভোগের জন্যে এমন সব কাজ করে, যা জাহান্নামকে অবধারিত করে তোলে। ১৮ নং আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে। 'যে ব্যক্তি ইহকালের সুখ চায় আমি সেই সুখ যাকে যতোটুকু দিতে চাই–দেবো, অতপর তার জন্যে জাহান্নাম প্রস্তুত করবো, যেখানে সে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় জ্বলবে।' অর্থাৎ কৃত কু-কর্মের জন্যে নিন্দিত এবং আযাব দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়া হলো তার প্রাপ্ত কর্মফল।

'আর যে ব্যক্তি আখেরাত চায় এবং মোমেন অবস্থায় তার জন্যে যথোপযুক্ত চেষ্টা সাধনা করে, তার চেষ্টার যথোপযুক্ত মূল্য দেয়া হবে।' (আয়াত ১৮)

বস্তুত যে ব্যক্তি আখেরাত চায় তাকে তার জন্যে যথাযথ চেষ্টা করতেই হবে, তার জন্যে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করতে হবে, তার দাবী পূরণ করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত সমস্ত চেষ্টা সাধনার ভিত্তি রাখতে হবে ঈমানের ওপর। আর ঈমান শুধু কামনা বাসনার নাম নয়। ঈমান হচ্ছে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত সেই বিশ্বাসের নাম, যা তার কার্যকলাপ দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। আখেরাতের জন্যে করণীয় চেষ্টা সাধনা মানুষকে দুনিয়ার ন্যায়সংগত সুখ আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে না, বরং তার দৃষ্টিকে উচ্চতর মার্গে সম্প্রসারিত করে মাত্র। ফলে দুনিয়ার সম্পদটাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় না। মানুষ যখন নিজেকে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে, তখন দুনিয়ার সম্পদ ভোগে কোনো ক্ষতি হয় না। কেননা সে সম্পদের গোলাম হয়ে যায় না।

যে ব্যক্তি দুনিয়ার সুখ ও সম্পদ চায়, তার শেষ পরিণতি লাঞ্ছনা গঞ্জনায় পূর্ণ জাহান্নাম, সেখানে যে ব্যক্তি আখেরাতের সুখ চায় ও তার জন্যে যথোপযুক্ত চেষ্টা সাধনা করে, তার চেষ্টাকে যথোচিত মূল্য দেয়া হবে এবং তাকে ফেরেশতাদের মধ্যে সম্মানিত করা হবে। কারণ সে আখেরাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলো।

নিছক দুনিয়ার জন্যে যে জীবন যাপন করা হয়, তা পোকা মাকড় ও পশু পাখীর জীবনের চেয়ে উন্নত কিছু নয়। পক্ষান্তরে আখেরাতের জন্যে যে জীবন যাপন করা হয়, তা আল্লাহর কাছে পরম সম্মানার্হ জীবন। যে আল্লাহ তায়ালা তাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাকে আত্মা দিয়েছেন, যা তাকে আকাশে উত্তোলন করে যদিও সে পৃথিবীতে অবস্থান করে।

লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, যারা দুনিয়া চায় এবং যারা আখেরাত চায়, সেই উভয় গোষ্ঠী নিজ নিজ কাংখিত জিনিস যদি পায়, তবে তা অবশ্যই আল্লাহর দান হিসাবেই পায়। আর আল্লাহর দানকে কেউ ঠেকাতে পারে না। এ দান অবারিত ও উন্মুক্ত। আল্লাহ তায়ালা যাকেই দিতে চান দিতে পারেন। ২০ নং আয়াত দেখুন–

'আমি উভয় গোষ্ঠীকেই সাহায্য করি তোমার প্রভুর দান থেকেই। তোমার প্রভুর দান কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।'

এই উভয় শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তা তাদের সহায় সম্পদ, কাজকর্ম ও উপায় উপকরণ দ্বারা বুঝা যায়। অথচ পৃথিবীর উপায় উপকরণ ও ভূমি সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ জগতেই যখন ব্যবধানটা টের পাওয়া যায়, তখন আখেরাতের সেই সুপরিসর জগতে ব্যবধানটা কতো বড়ো হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। যে আখেরাতের সামনে দুনিয়া একটা মাছির ডানার সমান, সেই আখেরাতে এ দুই শ্রেণীর ব্যবধানও হবে বিশালকায়। ২১ নং আয়াত দেখুন–

'দেখো, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপর দলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। অবশ্যই আখেরাত উচ্চতর মর্যাদা সম্পন্ন এবং অগ্রাধিকারযোগ্য।'

এখন যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতর মর্যাদা চায়, তার প্রাপ্য রয়েছে আখেরাতে। সেখানে রয়েছে সুপ্রশস্ত জায়গা, যার সীমা কতদূর আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। অতএব দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদের জন্যে নয়, আখেরাতের সেই অতুল বৈভবের জন্যেই প্রতিযোগিতা করা উচিত।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿٢٢﴾ وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا
تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ
صَغِيْرًا ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ۚ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ
لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿٢٥﴾ وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ
وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۚ وَكَانَ
الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾ وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ
تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿٢٨﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى

রুকু ৩

২২. (হে মানুষ,) আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে মাবুদ বানিয়ো না, নতুবা (পরকালে) তোমরা নিন্দিত অপমানিত ও নিসহায় হয়ে পড়বে। ২৩. তোমার মালিক আদেশ করছেন, তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারো এবাদাত করো না এবং তোমরা (তোমাদের) পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো; তাদের একজন কিংবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদের (সাথে) বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং কখনো তাদের ধমক দিয়ো না, তাদের সাথে সম্মানজনক ভদ্রজনোচিত কথা বলো। ২৪. অনুকম্পায় তুমি ওদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, হে (আমার) মালিক, ওদের প্রতি (ঠিক সেভাবেই) তুমি দয়া করো, যেমনি করে শৈশবে ওরা আমাকে লালন পালন করেছিলো। ২৫. (আসলে) তোমাদের মালিক তোমাদের অন্তরসমূহের ভেতরে যা আছে তা ভালো করেই জানেন; তোমরা (সত্যিই) যদি ভালো মানুষ হয়ে যাও তাহলে (আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করে দেবেন, কেননা), যারা তাওবা করে তিনি তাদের (গুনাহ) মাফ করে দেন। ২৬. আত্মীয় স্বজনকে তাদের (যথার্থ) পাওনা আদায় করে দেবে, অভাবগ্রস্ত এবং মোসাফেরদেরও (তাদের হক আদায় করে দেবে), কখনো অপব্যয় করো না। ২৭. অবশ্যই অপব্যয়কারীরা হচ্ছে শয়তানের ভাই; আর শয়তান হচ্ছে তার মালিকের বড়োই অকৃতজ্ঞ! ২৮. যদি তোমাকে কখনো (এ) হকদারদের বিমুখ করতেই হয় (এ কারণে যে), তাকে দেয়ার মতো সম্পদ তোমার কাছে নেই এবং তুমি তোমার মালিকের কাছ থেকে অনুগ্রহ কামনা করছো, যা পাওয়ার তুমি আশাও রাখো– তাহলে একান্ত নম্রভাবে তাদের সাথে কথা বলো। ২৯. কখনো নিজের (ব্যয়ের) হাত নিজের গর্দানের

عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ

সাথে বেঁধে রেখো না (যাতে কার্পণ্য প্রকাশ পায়), আবার তা সম্পূর্ণ খুলেও রেখো না, অন্যথায়(বেশী খরচ করার কারণে) তুমি নিন্দিত নিস্ব হয়ে যাবে। ৩০. তোমার মালিক যাকে চান তার রেযেক বাড়িয়ে দেন, আবার যাকে চান তাকে কম করে দেন, অবশ্যই তিনি তাঁর বান্দাদের (প্রয়োজন সম্পর্কে) ভালোভাবেই জানেন এবং (তাদের অবস্থাও) তিনি দেখেন।

রুকু ৪

৩১. তোমরা তোমাদের সন্তানদের কখনো দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না; আমি (যেমন) তাদের রেযেক দান করি (তেমনি) তোমাদেরও কেবল আমিই রেযেক দান করি; (রেযেকের ভয়ে) তাদের হত্যা করা (হবে) অবশ্যই একটি মহাপাপ। ৩২. তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেয়ো না, নিসন্দেহে এ হচ্ছে একটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ। ৩৩. কোনো জীবনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না, যা আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন; যে ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় আমি তার উত্তরাধিকারীকে (এ) অধিকার দিয়েছি (সে চাইলে রক্তের বিনিময় দাবী করতে পারে), তবে সে যেন হত্যার (প্রতিশোধ নেয়ার) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে; কেননা (হত্যার মামলায় যে ব্যক্তি মযলুম) তাকেই সাহায্য করা হবে। ৩৪. এতীমদের মাল সম্পদের কাছেও যেয়ো না, তবে এমন কোনো পন্থায় যা (এতীমের জন্যে) উত্তম (বলে প্রমাণিত) হয় তা বাদে– যতোক্ষণ পর্যন্ত সে (এতীম) তার বয়োপ্রাপ্তির পর্যায়ে উপনীত হয় এবং তোমরা (এদের দেয়া যাবতীয়) প্রতিশ্রুতি মেনে চলো, কেননা (কেয়ামতের দিন এ) প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে (তোমাদের) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ৩৫. কোনো কিছু পরিমাপ করার সময় মাপ কিন্তু পুরোপুরিই করবে, আর (ওযন করার জিনিস হলে) দাঁড়িপাল্লা সোজা করে ধরবে;

الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾ ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٣٩﴾

(লেনদেনের ব্যাপারে) এই হচ্ছে উত্তম পন্থা এবং পরিণামে (-র দিক থেকে) এটাই হচ্ছে উৎকৃষ্ট। ৩৬. যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, (অযথা) তার পেছনে পড়ো না; কেননা (কেয়ামতের দিন) কান, চোখ ও অন্তর, এ সব কয়টির (ব্যবহার) সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। ৩৭. আল্লাহর যমীনে (কখনোই) দম্ভভরে চলো না, কেননা (যতোই অহংকার করো না কেন), তুমি কখনো এ যমীন বিদীর্ণ করতে পারবে না, আর উচ্চতায়ও তুমি কখনো পর্বত সমান হতে পারবে না। ৩৮. (হে নবী,) এগুলো সবই (খারাপ কাজ,) এর মন্দ দিকগুলো তোমার মালিকের কাছেও একান্ত ঘৃণিত। ৩৯. তোমার মালিক ওহীর মাধ্যমে যে প্রজ্ঞা দান করেছেন এ (সব) হচ্ছে তার অন্তর্ভুক্ত, যা তোমার মালিক ওহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন; তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মাবুদ বানাবে না, অন্যথায় তুমি নিন্দিত, অপমানিত ও (আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে) বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

তাফসীর

আয়াত-২২-৩৯

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কর্ম ও কর্মফল, হেদায়াত ও গোমরাহী এবং উপার্জন ও তার হিসাব-নিকাশের নীতিমালাকে দিন ও রাতের আবর্তন বিবর্তনকারী প্রাকৃতিক বিধানের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর এই অধ্যায়ে নৈতিক আচরণ এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়দায়িত্বকে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের যাবতীয় সম্পর্ক ও বন্ধনকেও এই অবিচ্ছেদ্য ও অটুট সূত্রের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

শেরেকের ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, 'এই কোরআন সবচেয়ে মযবুত ও নিখুঁত পথের সন্ধান দেয় এবং 'আমি সকল জিনিস সবিস্তারে বর্ণনা করেছি।'

বর্তমান অধ্যায়ে কোরআন সেসব বিধির কিছু অংশ তুলে ধরেছে, যা সবচেয়ে মযবুত ও নিখুঁত পথের সন্ধান দেয়। বর্ণনা করা হয়েছে সমাজ জীবনের সেসব আচরণবিধি, যা কোরআনের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

এ অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে 'শেরেক নিষিদ্ধ ও এককভাবে শুধু আল্লাহর এবাদাত অপরিহার্য' ঘোষণার মধ্য দিয়ে। এরপরই একে একে জারী হয়েছে মৌলিক বিধিসমূহ, যথা, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, আত্মীয় স্বজন, দরিদ্র ও পথিকের প্রাপ্য দান করা, অপচয় ও অপব্যয় বন্ধ করা, বংশনিধন রোধ করা, ব্যাভিচার, হত্যা ও এতীমের সম্পত্তি আত্মসাতে নিষেধাজ্ঞা, ওয়াদা পালনের হুকুম, মাপে ও ওযনে কমবেশী করা, সত্য ও ন্যায়ের ওপর অবিচল থাকা, অহংকার ও দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করা। সব শেষে পুনরায় শেরেক থেকে সতর্ক করা হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে, সব কটা আদেশ, নিষেধ ও নির্দেশ অধ্যায়ের সূচনা সমাপ্তি বক্তব্য তথা তাওহীদী আকীদা ও আদর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তার সাথে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ আর এই তাওহীদী আকীদা ও আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে মুসলমানদের গোটা জীবনের ভিত্তি।

'আল্লাহর সাথে আর কোনো মাবুদকে শরীক করো না। তাহলে তুমি অবশ্যই ধিকৃত ও লাঞ্ছিত হয়ে বসে থাকবে। (আয়াত ২২)

এ আয়াতে শেরেকে লিপ্ত হতে যেমন নিষেধ করা হয়েছে, তেমনি তার পরিণতি সম্পর্কেও সাবধান করা হয়েছে। আদেশটা যদিও সার্বজনীন ও সর্বাত্মক, তথাপি একবচন ব্যবহার করে একে ব্যক্তিগত পর্যায়ের নির্দেশের রূপ দেয়া হয়েছে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি অনুভব করে যে, আদেশটা তার জন্যেই এবং তার ওপরই জারীকৃত। প্রকৃতপক্ষে আকীদা বিশ্বাস মাত্রই ব্যক্তিগত বিষয় এবং প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবেই এর জন্যে দায়ী। আর যে ব্যক্তি তাওহীদ বিশ্বাস থেকে বিপথগামী হয়, তার জন্যে এই পরিণতিই অপেক্ষা করছে যে, সে তার এই নিন্দনীয় কাজের কারণে ধিকৃত ও নিন্দিত হবে, আর এ কারণে এতো লাঞ্ছিত হবে যে, তার কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যার সাহায্যকারী হন না, তার আর যতো সাহায্যকারীই থাকুকতাকে লাঞ্ছিত হতেই হবে। 'বসে থাকবে' কথাটা দ্বারা লাঞ্ছিত ও ধিকৃত মোশরেকের অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ লাঞ্ছনা ও ধিক্কার কুড়াতে কুড়াতে সে যেন দিশেহারা হয়ে বসে পড়েছে। 'বসা'র অবস্থাটা দুর্বলতার লক্ষণ। কেননা মানুষের দুর্বলতম অবস্থা হলো বসা অবস্থা। এটা লাঞ্ছনা-গঞ্জনার দীর্ঘস্থায়ীত্বের লক্ষণও বটে। কেননা 'বসা'র অর্থই হলো, পরিবর্তনহীনতা, স্থবিরতা ও নিস্তব্ধতা। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, এ শব্দটা যে অর্থ বুঝাচ্ছে, আসলে সেই অর্থটাই এখানে কাংখিত।

'তোমার প্রতিপালক ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা তার ছাড়া আর কারো এবাদাত করবে না।'

শেরেককে নিষিদ্ধ করার পর এটা হচ্ছে তাওহীদের পক্ষে আদেশ। এ আদেশ চূড়ান্ত ফয়সালার আকারে উচ্চারিত হয়েছে এবং অত্যন্ত কঠোর তাকীদ সহকারে উচ্চারিত হয়েছে।

এভাবে ভিত্তি স্থাপিত ও মূলনীতি নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের করণীয় কাজগুলো একে একে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ কাজগুলোর প্রত্যেকটার মূলে উৎসাহ যোগায় তাওহীদ সংক্রান্ত বদ্ধমূল বিশ্বাস। এই বিশ্বাস মানুষের যাবতীয় কাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকেও একীভূত করে।

পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব

আকীদা বিশ্বাসের সংযোগের পর সবচেয়ে অগ্রগণ্য বিষয় হলো পরিবারের সাথে সংযোগ। এ জন্যে পিতামাতার সাথে সদাচার ও সদ্ব্যবহারকে আল্লাহর একত্বের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর কাছে এই সদ্ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

'এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন বা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দসায় বার্ধ্যকে উপনীত হয়, তাহলে তাদের সামনে উহু করো না, তাদেরকে কষ্ঠ পাওয়ার মতো কিছু বলোন এবং তাদের দুজনের সাথে সসম্মানে কথা বলো।..... (আয়াত ২৩-২৪)

মৃদু ও কোমল ভাষায় উচ্চারিত এই নির্দেশসমূহ এবং এই তাৎপর্যময় দৃশ্যসমূহ দ্বারা কোরআন সন্তানদের হৃদয়ে দয়া ও সহানুভূতির আবেগ সৃষ্টি করেছে। শুধু সন্তানদের নয় গোটা নতুন প্রজন্মের মনোযোগ আকর্ষণ করে পিতামাতা তথা পূর্ববর্তী প্রজন্মের প্রতি। এভাবে নতুন প্রজন্মের হৃদয়ে পূর্ববর্তী প্রজন্ম তথা পিতামাতার প্রতি দয়া ও মমতা জাগ্রত হওয়া খুবই প্রয়োজন।

পিতামাতা জন্মগতভাবেই সন্তানদের প্রতি দয়ার্দ্র। তারা সন্তান লালন পালনের জন্যে সব কিছু– এমনকি প্রয়োজনে নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। সবুজ-গাছের চারা যেমন বীজের সমস্ত খাদ্য খেয়ে উজাড় করে, মুরগীর বাচ্চা যেমন ডিমের ভেতরে সমস্ত খাদ্য নিঃশেষ করে দেয়, তেমনি সন্তানরাও পিতামাতার সমস্ত সুখ শান্তি নিজেরাই উপভোগ করে পিতামাতার জন্যে রেখে দেয় বার্ধক্য। এই বার্ধক্য নিয়ে তারা যে কয়দিন সন্তানদের সাহচর্য দেয়ার অবকাশ পায়, তাতেই তারা সুখী!

পক্ষান্তরে সন্তানরা খুব দ্রুত এসব ভুলে যায়। তারা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে মেনে থাকে। এভাবেই জীবন একে একে নিঃশেষ হয়ে যায়।

এ কারণে পিতামাতা সন্তানদের জন্যে কোনো ওসীয়ত লেখার প্রয়োজন অনুভব করেন না। বরং অনুভব করেন তাদের ভাবাবেগকে প্রচন্ডভাবে জাগিয়ে তোলার, যাতে তাদের বাবা মা তাদের জন্যে যে ত্যাগ স্বীকার করেছে তাদের প্রতি যে দায়িত্ব পালন করেছে সে কথা তারা মনে রাখে। এখানে আল্লাহর এবাদাতের আদেশের পরেই এসেছে পিতামাতার প্রতি সদাচরণের আদেশ।

এরপর আয়াতে গোটা পরিবেশকে অত্যন্ত আবেগময় করে তোলা হয়েছে। শৈশবকালের স্নেহমমতার দৃশ্য তুলে ধরে আবেগ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে।

যদি তাদের কোনো একজন কিংবা উভয়ে তোমার জীবদ্দসায় বার্ধক্যে উপনীত হয়' ..... বার্ধক্যের একটা সহজাত গাম্ভীর্য রয়েছে, আর বার্ধক্যের দুর্বলতারও কিছু দাবী রয়েছে। 'তোমার জীবদ্দসায়' কথাটা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, বার্ধক্যের দুর্বল ও অসহায় সময়টাতে একটা নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজন রয়েছে। 'তাহলে তাদের সামনে বিরক্তিসূচক কোনো কথা বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না।'

এ হচ্ছে সদাচরণ ও আদবের প্রথম ও নূন্যতম স্তর যে, সন্তানের পক্ষ থেকে বিন্দুমাত্রও বিরক্তি, বেআদবী ও অসম্মানের ভাব প্রকাশ পাবে না।

'তাদের সাথে সম্মানজনক কথাবার্তা বলো।'

এ হচ্ছে ইতিবাচক সম্মান ও আদবের সর্বোচ্চ স্তর। 'তুমি তাদের উভয়ের জন্যে দয়া ও বিনয়ের ডানা নামিয়ে দাও।' এ বাক্যটার বাচনভংগী এতো সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ যে তা হৃদয়ের গভীরতম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে এবং আবেগকে নাড়া দেয়। দয়া যেন মানুষের এক বিগলিত ও বিনম্র রূপ। দয়া যেন বিনয়েরই এমন এক রূপ, যার অধিকারী মানুষ চোখ তুলে তাকায় না এবং কোনো

ন্যায়-সংগত বিষয়কেই প্রত্যাখ্যান করে না। বিনয়ের যেন ডানা আছে, যা নামিয়ে শান্তি ও আত্ম সমর্পণের ঘোষণা দেয়া হয়।

'আর বলো, হে আমার প্রতিপালক, তুমি তাদের উভয়কে ঠিক সেইভাবে দয়া করো, যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছেন।'

এ হলো, আবেগবিজড়িত স্মৃতি। শৈশবের অসহায় ও দুর্বল অবস্থায় পিতামাতা কর্তৃক সন্তান পালনের স্মৃতি। আজ তারা উভয়ে একই ধরনের অসহায় অবস্থায় নিপতিত এবং একই ধরনের সাদর ও সস্নেহ লালন পালনের মুখাপেক্ষী। এ কারণেই আল্লাহর কাছে দয়া ও করুণা প্রার্থনা করা হয়েছে। কেননা আল্লাহর দয়াই সবচেয়ে প্রশস্ত। আল্লাহর তদারকীই সবচেয়ে ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। আল্লাহর আশ্রয়ই প্রশস্ততম। পিতামাতা সন্তানের জন্যে যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তার প্রতিদান দেয়া সন্তানদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের ত্যাগের যথাযথ প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দিতে পারেন।

হাফেয আবু বকর আল বাযযার হযরত বারীদার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি তার মাকে ঘাড়ে করে তওয়াফ করছিলো। সে রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি মায়ের প্রাপ্য পরিশোধ করতে পেরেছি? রসূল (স.) বললেন, 'না, এমনকি সন্তানের জন্যে মা যতোবার কান্নাকাটি করেছে, তার কোনো একবারের ঋণও এতে পরিশোধ হয়নি।'

যেহেতু আলোচ্য আয়াতগুলোতে মানুষের আবেগ ও কার্যকলাপকে আকীদা বিশ্বাসের সাথে যুক্ত করা হয়েছে, তাই এতে সব কিছুকে আল্লাহর জ্ঞানের আওতাধীন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যিনি অন্তর্যামী এবং কথা ও কাজের আড়ালে যা কিছু থাকে তা সম্পর্কে অবহিত। ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরের ভেতরে কী আছে, তা জানেন। তোমরা যদি সৎ হও, তবে তিনি তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের জন্যে ক্ষমাশীল।'

অন্যান্য বিধিসমূহ বর্ণনা করার আগে এই কথাটা বলার তাৎপর্য এই যে, প্রতিটি কাজ ও কথা যেন আল্লাহর দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয় আর যারা ভুল বা পাপ করে, অতপর তা বর্জন ও তাওবা করতে চায়, তাদের জন্যে তাওবার দুয়ার যেন উন্মুক্ত হয়ে যায়। যতোক্ষণ মানুষের মন সরল ও পাপাসক্তিমুক্ত থাকে, ততোক্ষণ ক্ষমার দরজা খোলা থাকে। 'আওয়াবুন' তাদেরকে বলা হয়, যারা গুনাহ করামাত্রই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়।

অপচয় রোধ ও অধিকার আদায়

পিতামাতা সম্পর্কে নির্দেশাবলী দেয়ার পর সব ধরনের আত্মীয়স্বজন, মেসকীন তথা দরিদ্র ও পথিকের ব্যাপারেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এভাবে আত্মীয়তার পরিমন্ডলকে প্রশস্ত করে ব্যাপকতর অর্থে গোটা মানব জাতির সাথে বন্ধন মযবুত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে,

'আত্মীয়স্বজনকে তাদের অধিকার দাও ...... ' (আয়াত ২৬-২৮)

এভাবে কোরআন আত্মীয়, মেসকীন পথিকের জন্যে অধিকার চাপিয়ে দিয়েছে প্রত্যেকের ওপর এবং সম্পদের অংশবিশেষ দান করেই এ অধিকার থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায়। এটা একজনের ওপর আর একজনকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া নয়, বরং এটা এমন একটা অধিকার, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে তার এবাদাত ও তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ অধিকার প্রদান করেই এর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। সেই সাথে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা ও সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়। অথচ দাতা কোনো স্বেচ্ছামূলক দান করে না, বরং আল্লাহর অর্পিত দায়িত্বই পালন করে।

কোরআন অপচয় ও অপব্যয়কে নিষিদ্ধ করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, অপচয় ও অপব্যয় হলো অন্যায়, ও অসৎ পথে ব্যয়। মোজাহেদ বলেছেন, কোনো মানুষ যদি তার সমস্ত সম্পদ সৎ পথে ব্যয় করে তবুও সেটা অপব্যয় নয়। কিন্তু যদি একটা পয়সাও অসৎ পথে ব্যয় করে, তবে সেটা অপব্যয়।

কাজেই বেশী বা কম ব্যয় করাকেই অপব্যয় ও অপচয় বলা হয় না। কোথায় ব্যয় করা হচ্ছে, এটাই আসল প্রতিপাদ্য বিষয়। অপচয় ও অপব্যয়কারীদেরকে শয়তানের ভাই এ জন্যেই বলা হয়েছে যে, তারা অন্যায় ও অসৎ পথে ব্যয় করে। আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহর কাজে ব্যয় করে। তাই তারা শয়তানের সাথী ও বন্ধু। 'আর শয়তান হচ্ছে নিজ প্রতিপালকের প্রতি চরম অকৃতজ্ঞ।' অর্থাৎ সে আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের হক আদায় করে না। অনুরূপভাবে শয়তানের অপব্যয়ী ভাইরাও নেয়ামতের হক আদায় করে না। এর হক্ হলো, সৎ পথে ব্যয় করা, অপচয় ও অপব্যয় না করা।

কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তি আত্মীয়স্বজন, মেসকীন ও পথিকের হক দেয়ার মতো সম্পদের অধিকারী হয় না এবং নিজেদের অক্ষমতার কারণে তাদের সামনে যেতে লজ্জাবোধ করে। তখন তার কর্তব্য হলো একদিকে আল্লাহর কাছে দোয়া করা যেন তিনি তাকে ও তার আত্মীয়স্বজনকে জীবিকার সচ্ছলতা দান করেন। সচ্ছলতা এলে তাদেরকে সাধ্যমত দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। আর যতোদিন সচ্ছলতা না আসে, ততোদিন সে তাদেরকে বিনীতভাবে ও উপকারী কথা দ্বারা সাহায্য করতে পারে। তাহলে তাদের সামনে লজ্জা ও সংকোচে ভুগতে হবে না। আর্থিক সাহায্য করতে না পেরে দুঃখে ও লজ্জায় আত্মীয় ও দরিদ্রদেরকে ত্যাগ করলে ও নীরবতা অবলম্বন করলে তারাও তার প্রতি সংকুচিত হয়ে পড়বে। বস্তুত বিনম্র কথাবার্তায়ও অনেক উপকারিতা, আশা ও সৌজন্যে থাকতে পারে।

অপচয় ও অপব্যয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞাজারী করার পর প্রসংগত যাবতীয় ব্যয় সাপেক্ষ কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমার হাত ঘাড়ের ওপর তুলে রেখো না, আবার হাতকে পুরোপুরি প্রসারিতও করো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও অক্ষম হয়ে বসে পড়বে।'

ভারসাম্যতা হচ্ছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট। উগ্রতা ও চরম ভাবাপন্নতা যেমন ভারসাম্যকে ব্যাহত করে, তেমনি ঢিলেমী ও উদাসীনতাও ভারসাম্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কোরআনের বর্ণনাভংগী এখানে ছবির মতো এঁকে স্পষ্ট করে দিয়েছে তার বক্তব্যকে। কৃপণতাকে সে ঘাড়ের ওপর তুলে রাখা হাত সদৃশ, অপব্যয়কে এমন উন্মুক্ত হাত সদৃশ, যা কোনো কিছুই ধরে রাখতে পারে না এবং কার্পন্য ও দানশীলতার চরমাবস্থাকে নিন্দিত, তিরস্কৃত ও অক্ষম হয়ে বসে থাকার সদৃশ বলে উল্লেখ করেছে। আভিধানিক অর্থে 'হামীর' বলা হয় সেই পশুকে, যা দীর্ঘপথ চলতে চলতে কাহিল ও অক্ষম হয়ে বসে পড়েছে এবং আর পথ চলতে পারছে না। কার্পণ্য দ্বারা মানুষ যেমন নিজেকে অপাংক্তেয় ও অক্ষম বানিয়ে ফেলে, তেমনি অপব্যয়ী ব্যক্তিও তার অপব্যয়ের কারণে অচল হয়ে পড়ে। কৃপণ ও অপব্যয়কারী উভয়েই হয় নিন্দিত ও তিরস্কৃত। তাই মধ্যম পন্থাই সর্বোত্তম পন্থা।

এরপর ব্যয়ের মধ্যম পন্থা অবলম্বনের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলা হয়েছে যে, মূলত আল্লাহ তায়ালাই রেযেকদাতা। তিনিই জীবিকা প্রসারিত বা সংকুচিত করেন। তিনি রেযেকদাতা, তিনিই ব্যয়ের মধ্যম পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। ৩০ নং আয়াত লক্ষ্য করুন,

'নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক যার জন্যে চান রেযেক প্রশস্ত ও সংকুচিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি তার বান্দাদের সম্পর্কে সব কিছু জানেন এবং সব কিছু দেখেন।'

অর্থাৎ যার জীবিকা বাড়িয়ে দেন, জেনে বুঝেই বাড়িয়ে দেন। আর যার জীবিকা কমিয়ে দেন জেনে বুঝেই কমিয়ে দেন। তিনি মধ্যম পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেন এবং কৃপণতা ও অপব্যয় করতে নিষেধ করেন। সর্বাবস্থায় কোন্ পন্থাটা সঠিক, সেটা তিনিই জানেন ও দেখেন। তিনি এই কোরআনকে সেই বিধান সহকারে নাযিল করেছেন, যা সর্বাবস্থায় নির্ভুল ও নিখুঁত।

জন্ম নিয়ন্ত্রন ও ব্যভিচারের কুফল

জাহেলী যুগের কিছু কিছু লোক অভাব অনটনের আশংকায় মেয়েদেরকে হত্যা করতো। পূর্ববর্তী আয়াতে যখন বলা হয়েছে যে, জীবিকা কমানো বাড়ানোর ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ, তখন সেই প্রসংগেই যথোচিত জায়গায় অভাবের আশংকায় সন্তান হত্যার ওপর নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছে। জীবিকা যতোক্ষণ আল্লাহর হাতে থাকছে, ততোক্ষণ জনসংখ্যার সাথে অভাবের কোনো ওৎপ্রোত সম্পর্ক নেই। সব কিছুই আল্লাহর ফয়সালার ওপর নির্ভরশীল। দরিদ্র ও জনসংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক আছে-এ ধারণা যখন মানুষের মন থেকে মুছে যাবে এবং এ ব্যাপারে মানুষের আকীদা বিশ্বাস যখন বিশুদ্ধ রূপ নেবে, তখন মানুষের বংশ বিস্তারের পরিপন্থী ওই পৈশাচিক কাজটায় প্ররোচনা দানকারী উপাদান আর থাকবে না। ৩১ নং আয়াত লক্ষ্য করুন,

'তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না অভাবের ভয়ে। আমিই তো তাদেরকে ও তোমাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি। তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।'

আকীদা বিশ্বাসের বিকৃতি ও বিভ্রান্তি শুধু বিশ্বাস ও এবাদাত উপাসনার পরিবেশের বিকৃতি সাধন করেই ক্ষান্ত থাকে না, বরং সমাজ জীবনের ওপরও প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করে থাকে। পক্ষান্তরে আকীদা বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা, আবেগ অনুভূতির স্বচ্ছতা ও সুস্থতা এবং সামষ্টিক জীবনের সুস্থতা ও স্থীতির নেয়ামক হয়ে থাকে। সমাজ জীবনে আকীদা বিশ্বাসের প্রভাব যে কতো তীব্র ও প্রবল হয়ে থাকে, তার একটা উদাহরণ হলো মেয়ে শিশুকে জ্যান্ত কবর দেয়ার জাহেলী প্রথা। এই উদাহরণ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, জীবন আকীদা-বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত না হয়েই পারে না এবং আকীদা বিশ্বাস বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে টিকে থাকতেও পারে না।

এখানে কোরআনের কয়েকটি বিস্ময়কর সূক্ষ্মতত্ত্বের দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

এখানে সন্তানদের জীবিকার বিষয়টি পিতামাতার জীবিকার আগে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আমিই তো তাদেরকে ও তোমাদেরকে জীবিকা দান করে থাকি।' পক্ষান্তরে সূরা আনয়ামে পিতামাতার জীবিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সন্তানদের জীবিকার আগে। যথা 'আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি।' উভয় সূরার আয়াত দুটোর বক্তব্যের বিভিন্নতার কারণেই এটা ঘটেছে। এখানকার আয়াতে বলা হয়েছে, 'অভাবের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তো তাদেরকে ও তোমাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি।'

আর এখানে বলা হয়েছে, 'অভাবের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তো তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা সরবরাহ করে থাকি।'

এখানে সন্তান হত্যার মূলে রয়েছে সন্তানদের কারণে অভাব দেখা দেয়ার আশংকা। তাই সন্তানদের জীবিকার কথা প্রথমে বলা হয়েছে।

আর সূরা আনয়ামে সন্তান হত্যার মূলে রয়েছে পিতামাতার অভাবের বাস্তব উপস্থিতি। তাই পিতামাতার জীবিকার উল্লেখ প্রথমে করা হয়েছে। সুতরাং উভয় জায়গায় আগ-পাছ-করার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য দেখা যায়, বক্তব্যের বিভিন্নতার দাবী অনুসারেই তা হয়েছে।

সন্তান হত্যার নিষেধাজ্ঞার পরেই এসেছে ব্যাভিচারের নিষেধাজ্ঞা। 'তোমরা ব্যাভিচারের ধারে কাছেও যেও না। কেননা ওটা একটা অশ্লীল কাজ একং জঘন্য পন্থা।'

বস্তুত সন্তান হত্যা ও ব্যাভিচারের মধ্যে এক ধরনের সংযোগ ও সাদৃশ্য রয়েছে। এই সংযোগ ও সাদৃশ্যের কারণেই সন্তান হত্যা ও নরহত্যার নিষেধাজ্ঞার মাঝখানে ব্যাভিচারের নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

ব্যাভিচারের মধ্যে একাধিক হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রথমত এতে জীবনের উপাদান বীর্যকে তার অযোগ্য স্থানে নিক্ষেপ করা হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাভিচারকারী নরনারী সন্তান থেকে অব্যাহতি পেতে চায়-চাই তা ভ্রুণহত্যার আকারেই হোক অথবা গর্ভপাতের আকারে। আর যদি সন্তানকে ভূমিষ্ট হবার সুযোগ দেয়াও হয়, তবে সেটা হয় একটা দুষ্কর্মময় কিংবা লাঞ্ছনা গঞ্জনাময় জীবনের আবির্ভাব। মানব সমাজে একটা জারজ সন্তানের জীবন যেভাবেই হোক, ব্যর্থ ও নিস্ফল জীবনে পর্যবসিত হয়ে থাকে। আকারে কিছুটা ভিন্নতর হলেও এটাও একটা হত্যাকান্ড। যে সমাজে সে লালিত পালিত হয় সেই সমাজটারই বিলুপ্তি ঘটে। সমাজ তার বংশ পরিচিতি হারিয়ে বসে, আসল ও নকল রক্ত মিশে একাকার হয়ে যায় এবং সন্তান ও সম্পদের বিশ্বস্ততা বিনষ্ট হয়। এভাবে সমাজ ক্রমান্বয়ে তার সমস্ত সম্পর্ক-বন্ধনসহ বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তার সার্বিক ধ্বংস সাধন করে।

আরো এক দিক দিয়েও এটা সমাজের অপমৃত্যুর শামিল। কেননা কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার এই সহজ বিকল্প পথ দাম্পত্য জীবনকে নিস্প্রয়োজন ঐচ্ছিক ব্যাপারে পর্যবসিত করে। পরিবার হয়ে ওঠে একটা অবাঞ্ছিত বোঝা। অথচ পরিবারই হলো সুস্থ, স্বাভাবিক ও সৎ সন্তানের সুতিকাগার। পরিবারের নির্মল পরিবেশে ছাড়া আর কোথাও তার সুষ্ঠু বিকাশ বৃদ্ধি এবং নিখুঁত লালন, প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণের সুযোগ নেই।

আদিমকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত যখনই যে জাতিতে ব্যাভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, সে জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্তির ও ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়েছে। অনেকের ধারণা যে, ইউরোপ ও আমেরিকায় ব্যাভিচারের ব্যাপক বিস্তৃতি সত্তেও বস্তুগত শক্তির দিক দিয়ে প্রবল ও পরাক্রান্ত রয়েছে। কিন্তু এ অঞ্চলের যে জাতিগুলো প্রাচীন (যেমন ফ্রান্স) সেগুলোর জীবনে আসন্ন ধ্বংসের চিহ্ন বেশ স্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হয়। তবে মার্কিনীদের মতো নবীন জাতিগুলোর জীবনে এ লক্ষণ এখনো পরিষ্কার নয়। এর কারণ এ জাতির তারুণ্য ও সম্পদের ব্যাপকতা। একজন নবীন যুবক যতোই যৌন উচ্ছৃংখলতায় লিপ্ত হোক, এর কুফল সে যৌবনকালে টের পাবে না, টের পাবে পৌঢ় বয়সে। তখন বয়সের ভারে সে নুয়ে পড়বেই। অথচ যে সব যুবক সুশৃংখল ও মধ্যমপন্থী জীবন যাপন করে, তারা প্রৌঢ়ত্বেও বেশ সবল থাকে। (১)

কোরআন শুধু ব্যাভিচার করতেই নিষেধ করে না, বরং তার ধারে কাছেও ঘেষতে নিষেধ করে। এ হচ্ছে তার প্রবল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। কেননা প্রবল কামোত্তেজনা মানুষকে ব্যাভিচারে প্ররোচিত করে। তাই তার ধারে কাছেও যেতে নিষেধ করা অধিকতর নিরাপদ। উত্তেজনা সৃষ্টিকারী উপকরণসমূহের কাছাকাছি চলে গেলে আর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কোনো ব্যবস্থা থাকবে না।

---

(১) এই তাফসীর প্রকাশিত হবার পর বিগত তিন দশকে মার্কিন মুল্লুকসহ সমগ্র পশ্চিমী দুনিয়ায় যেভাবে ব্যাভিচারের অভিশাপ নেমে এসেছে তাতে সেখানকার চিন্তাশীল মহল এখনই তাদের সভ্যতারূপী এই প্রসাদে বড়ো আকারের ধ্বংস দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।–সম্পাদক

এ কারণে ইসলাম ব্যাভিচারে প্ররোচনাদানকারী উপকরণগুলোর পথ রোধ করে, যাতে তাতে লিপ্ত হবার আশংকা দেখা না দেয়। নিষ্প্রয়োজনে নর নারীর মেলামেশাকে সে অবাঞ্ছিত ও নির্জনে মেলামেশা হারাম ঘোষণা করে। সৌন্দর্য প্রদর্শনী করে নারীর বাইরে ঘোরাফেরা করাকে সে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। যে ব্যক্তি বিয়ে করার ক্ষমতা রাখে তাকে বিয়ে করতে এবং যে বিয়ে করতে অসমর্থ, তাকে রোযা রাখার নির্দেশ দেয়। বিয়ের পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী কারণগুলো যেমন মাত্রাতিরিক্ত দেনমোহর ধার্যকরণ, ইত্যাদি দূর করে। সন্তানের কারণে অভাব অনটনের আশংকাও সে অমূলক বলে প্রত্যাখ্যান করে। যারা বিয়ে করে নিজেদের চরিত্র রক্ষা করতে চায়, তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসার জন্যে কোরআন সকলকে আহ্বান জানায়। এতোসব ব্যবস্থার পরও ব্যাভিচার সংঘটিত হলে তার ওপর কঠিন শাস্তি প্রয়োগ করে। অনুরূপ, নিরীহ সতী সাধ্বী মহিলাদের বিনা প্রমাণে ব্যাভিচারের অপবাদ আরোপকারীকেও ইসলাম কঠোর শাস্তি দেয়। এভাবে ইসলাম মুসলিম সমাজকে নৈতিক অধপতন ও ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে বহুসংখ্যক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

জীবনের নিরাপত্তাদানে ইসলাম

সন্তান হত্যার নিষেধাজ্ঞা ও ব্যাভিচারের নিষেধাজ্ঞার পর সে নরহত্যার নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণ করে।

'সংগত কারণ ব্যতীত আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত প্রাণ বধ করো না। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, তার অভিভাবককে আমি ক্ষমতা দিয়েছি। সুতরাং সে যেন হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে। তাকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে।'

ইসলাম হচ্ছে বেঁচে থাকার বিধান এবং শান্তির বিধান। সুতরাং তার কাছে নরহত্যা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করার পর সবচাইতে বড় গুনাহ। জীবনদাতা হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো অধিকার নেই যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া এবং তাঁরই নির্ধারিত সীমার মধ্যে ছাড়া কারো প্রাণ সংহার করে। প্রত্যেক প্রাণই পবিত্র। তাকে সংগত কারণ ছাড়া স্পর্শ করা যাবে না এবং বৈধ উপায় ছাড়া হত্যা করা যাবে না। আর এই বৈধ ও সংগত সীমার কোনো অস্বচ্ছতা নেই, বরং তা হচ্ছে সুস্পষ্ট। এটা কারো খেয়ালখুশী বা মনগড়া মতামতের ওপর ন্যস্ত করে রাখা হয়নি। রসূল (স.) বলেছেন, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল-এই মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছে এমন কোনো মুসলমানকে হত্যা করা তিনটি ক্ষেত্রে ছাড়া বৈধ হবে না। যদি সে কাউকে হত্যা করে থাকে তবে তার বদলা হিসাবে, যদি সে বিবাহিত হয়েও ব্যাভিচার করে এবং যদি সে ইসলাম ত্যাগ করে ও মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (বোখারী ও মুসলিম)

কেসাস ন্যায় বিচার নিশ্চিত করে

'এর মধ্যে প্রথমটা হলো কেসাস যা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে এবং সমগ্র মানবজাতির প্রাণের নিরাপত্তা দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'কেসাসে তোমাদের জীবন রয়েছে।' (আল-বাকারা)

যারা অন্যদের ওপর আগ্রাসন চালাতে ইচ্ছুক, তাদের হাতকে এটা থামিয়ে দেয়। কেননা তারা জানে যে, কেসাস তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। তাই এ জঘন্য অপরাধে অগ্রসর হবার আগেই কেসাস-ভীতি তাদের ইচ্ছাকে দমন করে। অনুরূপভাবে, এটা নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী ও অভিভাবকদের বাড়াবাড়ি থেকেও খুনীর নিরাপরাধ আত্মীয়দেরকে রক্ষা করে। প্রতিশোধের মাত্রাতিরিক্ত আক্রোশে অধীর হয়ে যখন তারা হত্যাকারীকে হত্যা করেই ক্ষান্ত থাকতে চায় না,

বরং অধিকতর প্রাণ নাশ করতে চায়। যেন বদলার পর বদলা এবং রক্তের হোলিখেলা চলতেই থাকে-এমতাবস্থায় কেসাসের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা খুনীর পরিবারও আত্মীয়দের জীবনের নিরাপত্তা দেয়। কেসাস ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ জীবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকে। ফলে সবাই নিশ্চিন্তে চলাফেরা করে, কাজ করে, উৎপাদনের চাকা সচল রাখে। এভাবে গোটা জাতির জীবনে অব্যাহত থাকে শান্তি ও প্রাণচাঞ্চল্য।

দ্বিতীয়টা হলো অশ্লীলতার বিস্তার ঘটার মাধ্যমে যে সর্বনাশা বিপর্যয় ও নৈরাজ্য দেখা দেয়, তার বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ। আমি আগেই ব্যাখ্যা করে এসেছি যে, অশ্লীলতাও এক ধরনের হত্যাকান্ড।

তৃতীয়টা হলো আধ্যাত্মিক বিপর্যয় ও বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, যা মুসলিম সমাজে নৈরাজ্য ছড়ায় এবং তার শান্তি ও শৃংখলাকে হুমুকির মুখে নিক্ষেপ করে। ইসলাম ত্যাগকারীকে হত্যা করা হবে এ জন্যে যে, সে ইসলামকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলো, কেউ তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেনি। সে মুসলমানদের সমাজদেহে লীন হয়ে গিয়েছিলো এবং তার যাবতীয় গোপন তথ্য জেনে ফেলেছিলো। এমতাবস্থায় তার ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ও মুসলিম সমাজ থেকে বেরিয়ে যাওয়া ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে হুমকিস্বরূপ। সে যদি অমুসলিম থাকতো, কেউ তাকে মুসলমান হতে বাধ্য করতো না, বরঞ্চ সে ইহুদী বা খৃষ্টান হলে ইসলাম তার জানমাল রক্ষার দায়িত্ব নিতো। মোশরেক হলে তাকে নিরাপত্তা দান ও নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিত। ধর্ম বিরোধীদের প্রতি এর চেয়ে বেশী উদারতা আর কিছুই থাকতে পারে না।

'সংগত কারণ ছাড়া আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত প্রাণ বধ করো না'। ...... (আয়াত ৩৩)

উপরোক্ত তিনটি কারণই নরহত্যাকে বৈধতা দান করে। ওই তিনটি কারণের কোনো একটিও যেখানে উপস্থিত নেই, সেখানে হত্যাকান্ড অবৈধ, অন্যায় ও যুলুমের পর্যায়ভুক্ত। আর এরূপ অবৈধভাবে ও অত্যাচারিত হয়ে যে ব্যক্তি নিহত হয়, আল্লাহ তায়ালা তার অভিভাবককে হত্যাকারীর ওপর এতোটা ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করেছেন যে, সে ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করতে পারে। ইচ্ছা করলে তার কাছ থেকে দিয়াত তথা রক্তপণ নিয়ে ক্ষমা করে দিতে পারে, ইচ্ছা করলে তাকে দিয়াত ছাড়াও সে ক্ষমা করে দিতে পারে। এভাবে হত্যাকারীর ব্যাপারে সে ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারী। কেননা হত্যাকারীর রক্ত তারই প্রাপ্য।

ইসলাম একদিকে তাকে দিচ্ছে এই ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী ক্ষমতা। অপরদিকে সে তাকে প্রতিশোধের সীমা অতিক্রম থেকে নিষেধ করছে। তাকে যে প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তার অপব্যবহার রোধ করাই ইসলামের উদ্দেশ্য। প্রতিশোধের সীমা অতিক্রম নানাভাবে করা যেতে পারে। যথা শুধু হত্যাকারীকে নয়, বরং অন্যান্য নিরীহ নিরপরাধ ব্যক্তিদেরকেও হত্যা করা। জাহেলী যুগে এভাবেই প্রতিশোধ নেয়া হতো। হত্যাকারীর পিতা, ভাই, সন্তান ও আত্মীয় স্বজনকেও হত্যা করা হতো। অথচ হত্যাকারীর পরিবারভুক্ত হওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো অপরাধ থাকতো না। অনুরূপভাবে, হত্যাকারীকে হত্যা করে তার মুখমন্ডল বিকৃত করা এবং অংগ প্রত্যংগ টুকরো টুকরো করাও এক ধরনের বাড়াবাড়ি। নিহত ব্যক্তির অভিভাবক বা উত্তরাধিকারীকে শুধু প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, মুখমন্ডল বা অংগ প্রত্যংগ বিকৃত করার অধিকার দেয়া হয়নি। আল্লাহ তায়ালা এটা অপছন্দ করেন, আর রসূল (স.) এটা নিষিদ্ধ করেছেন।

'অতএব, সে যেন হত্যার প্রতিশোধে বাড়াবাড়ি না করে। তাকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে।' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তঁর পক্ষে ফয়সালা করবেন, শরীয়তের বিধি তাকে সমর্থন করবে এবং শাসকরাও তাকে সাহায্য করবে। এভাবে সবাই যখন তাকে সাহায্য করবে এবং তার অধিকার আদায়ে সহযোগিতা করবে তখন তার উচিত প্রতিশোধ গ্রহণে ন্যায়-পরায়ন হওয়া।

খুনের বদলা গ্রহণের জন্যে অভিভাবক, আইন আদালত ও শাসককে এভাবে ক্ষমতা দিয়ে আসলে মানুষের স্বভাবসুলভ দাবী ও চাহিদাই পূরণ করা হয়েছে এবং উত্তরাধিকারীর মনের আবেগ উচ্ছাসকে দমন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নচেত এই আবেগ ও উচ্ছাস হয়তো উত্তরাধিকারীকে ক্রোধোম্মত করে বাড়াবাড়ির পথে ঠেলে দিতো। কিন্তু সে যখন উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে খুনের বদলা গ্রহণের ক্ষমতা দিয়েছেন এবং শাসক তাকে বদলা নিতে সাহায্য করে, তখন তার উত্তেজনা প্রশমিত হবে এবং সে ন্যায়সংগত পন্থায়ই খুনের বদলা নিয়ে ক্ষান্ত হবে।

আপনজনের খুনের বদলা গ্রহণ মানুষের স্বভাব-সুলভ ও মজ্জাগত চাহিদা। ইসলাম মানুষের এ চাহিদাকে অস্বীকার করে না। এ চাহিদাকে সে স্বীকার করে এবং নিরাপদ সীমার ভেতরে তা পূরণ করে। এ চাহিদাকে সে অবজ্ঞা করে না এবং খুনীকে ক্ষমা করতে বাধ্য করে না। তবে ক্ষমা করার জন্যে উপদেশ দেয়, উদ্বুদ্ধ করে এবং ক্ষমাকারীকে পুরস্কৃত করে। কিন্তু এসব কিছুই করে উত্তরাধিকারীকে খুনের বদলা নেয়ার অধিকার দেয়ার পর। উত্তরাধিকারী তাকে ক্ষমাও করতে পারে, প্রতিশোধও নিতে পারে। তার যে এই উভয় ক্ষমতা রয়েছে, সেটা উপলব্ধি করার পর সে হয়তো ক্ষমা করার দিকেই ঝুঁকতে পারে। কিন্তু তাকে যদি ক্ষমা করতে বাধ্য করা হতো, তাহলে সে উত্তেজিত হয়ে বাড়াবাড়ির দিকে ঝুঁকতে পারতো।

এতীমের সম্পদ সংরক্ষণ

নরহত্যা ও ব্যাভিচার নিষিদ্ধ করার পর আল্লাহ তায়ালা এতীমের সম্পত্তি আত্মসাত করা ও ওয়াদা লংঘন করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ৩৪নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমরা এতীমের সম্পত্তির কাছেও যেয়ো না এবং ওয়াদা পালন করো। .....'

ইসলাম যদিও মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও সম্ভ্রম রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং রসূল (স.) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত সম্ভ্রম ও সম্পদ অপর মুসলমানের জন্যে নিষিদ্ধ, কিন্তু সে এতীমের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে আরো কঠোর। মুসলমানদেরকে সে কল্যাণকর পন্থায় ছাড়া এতীমের সম্পত্তির ধারে ঘেঁষতেই নিষেধ করে। কেননা এতীম তার সম্পত্তির পরিচালনা ও সংরক্ষণে দুর্বল। ইসলাম এতীম ও তার সম্পদ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মুসলিম সমাজের ঘাড়ে ন্যস্ত করে যতোক্ষণ সে প্রাপ্তবয়স্ক না হয়, নিজের ভালো মন্দ ও ন্যায় অন্যায় বুঝতে সক্ষম না হয় এবং নিজের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ না হয়।

এই আদেশ ও নিষেধগুলোর মধ্যে একটা জিনিস লক্ষণীয়। সেটি হলো, যে আদেশ বা নিষেধ কাউকে ব্যক্তিগতভাবে দেয়া হয়েছে, সেটা দেয়া হয়েছে একবচনের ক্রিয়ার মাধ্যমে। আর যেটা সমগ্র সমাজের সাথে যুক্ত সে সম্পর্কে আদেশ বা নিষেধ এসেছে বহু বচনে। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার আত্মীয় স্বজন, দরিদ্র ও পথিককে সাহায্য করা, অপব্যয় না করা, কার্পণ্য ও মাত্রাতিরিক্ত দানশীলতার মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ দান করা, সত্যের ওপর অবিচল থাকা এবং অহংকার ও দাম্ভিকতা পরিহার করার নির্দেশাবলী একবচনে উল্লেখ করা হয়েছে পক্ষান্তরে সন্তান হত্যা, ব্যাভিচার, নরহত্যার নিষেধাজ্ঞা এবং এতীমের সম্পদ সংরক্ষণ, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, মাপে কম বেশী

না করা, এ সবের নির্দেশাবলী এসেছে বহুবচনে। কেননা, এগুলোর ভেতরে সামষ্টিকতার ছাপ রয়েছে।

এ কারণেই কল্যাণধর্মী পন্থায় ছাড়া এতীমের সম্পত্তির নিকটবর্তী হতে নিষেধ করা হয়েছে বহুবচনে যাতে গোটা সমাজ এতীম ও তার সম্পদের জন্যে দায়ী থাকে। এটা তার সামষ্টিক দায়িত্ব।

আর যেহেতু এতীমের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান সমাজের দায়িত্ব, তাই তার সাথে প্রতিশ্রুতি পালনের নির্দেশ সংযুক্ত করা হয়েছে।

ওয়াদা পালন ও বাণিজ্যিক স্বচ্ছতা

'তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করো। প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন এবং প্রতিশ্রুতি ভংগকারীর হিসেব নেবেন।

ইসলাম ওয়াদা পালনকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। কেননা এর ওপর ব্যক্তির বিবেকের ও সমাজ জীবনের স্থীতি, বিশ্বস্ততা ও পরিচ্ছন্নতা নির্ভরশীল। কোরআন ও হাদীসে ওয়াদা পালনের জন্যে নানাভাবে বারংবার তাগিদ দেয়া হয়েছে–চাই সে ওয়াদা আল্লাহর মানুষের ব্যক্তির সমাজের রাষ্ট্রের শাসকের বা শাসিতের যারই হোক না কেন। ইসলাম তার ইতিহাসে ওয়াদা পালনের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, সমগ্র মানবেতিহাসে তার কোনো তুলনা নেই।

ওয়াদা পালনের পরের প্রসংগ হচ্ছে সঠিক মাপ ও ওযন প্রদান,

'যখন মেপে দেবে, তখন পূর্ণভাবে মেপে দাও। আর সঠিক পাল্লা দিয়ে ওযন করে দাও। এটাই কল্যাণকর ও উত্তম পরিণামবহ।'

বস্তুত ওয়াদা রক্ষা এবং ওযনে ও মাপে সঠিক দেয়ার মাঝে শাব্দিক ও তাত্ত্বিক উভয় দিক দিয়ে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

মাপে ও ওযনে সঠিক দেয়া লেন দেনের সততা ও মনের পবিত্রতার লক্ষণ। এ দ্বারা সমাজের লেনদেন সুষ্ঠু হয়। পারস্পরিক বিশ্বস্ততা ও সামষ্টিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় তা সুফল বয়ে আনে।

রসূল (স.) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো হারাম কাজে সক্ষম হওয়া সত্তেও শুধু আল্লাহর ভয়ে তা থেকে ফিরে থাকে, তবে আল্লাহ আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই তাকে ওই জিনিসের বিনিময়ে উৎকৃষ্টতর বিকল্প জিনিস দান করবেন।'

মাপে ও ওযনে কম দেয়া ও বেশী আনার লোভ অন্তরের নোংরামি ও হীনতার বহিপ্রকাশ। পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এটা এমন বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার জন্ম দেয় যে, পারস্পরিক আস্থা একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় ও প্রবৃদ্ধি কমে যায়। আর এই কুফলগুলো এক সময় ব্যক্তিবর্গকেও ভুগতে হয়। যদিও তারা মাপে ও ওযনে কমবেশী করা দ্বারা লাভবান হবে বলে আশা করে, কিন্তু যে লাভটুকু হয়, তা নিতান্তই সাময়িক ও স্থুল। সমাজে যে সর্বগ্রাসী অচলাবস্থা দেখা দেয়, এক সময় ব্যক্তিগত জীবনেও তার অশুভ প্রভাব পড়ে।

এই সত্যটা বাণিজ্যিক জগতের দূরদর্শীরা উপলব্ধি করেছে এবং তারা এটা অনুসরণও করেছে। তবে এর পেছনে কোনো নৈতিক প্রেরণা বা ধর্মীয় উদ্দীপনা সক্রিয় নেই। বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা এটা অনুভূত হয়েছে বলেই এর অনুসরণ করা হয়েছে।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে পণ্যের সঠিক পরিমাপ এবং ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক পরিমাপে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক পরিমাপ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যও পূরণ করে। আর সেই সাথে অন্তরের পবিত্রতা, পার্থিব জীবনের চেয়ে উচ্চতর জীবন বোধ ও মহত্তর রুচিবোধ অতিরিক্ত প্রাপ্তি হিসাবে অর্জন করা যায়।

এভাবেই ইসলাম সব সময়ে একই সাথে পার্থিব জীবনের সকল উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন পূরণ করে। আবার মানুষের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষও নিশ্চিত করে।

আকীদা বিশ্বাসের স্বচ্ছতা

ইসলামী আকীদা বিশ্বাস স্বচ্ছতা, দৃঢ়তা ও স্পষ্টতার প্রতীক। এর কোনো একটাও সন্দেহ, সংশয়, কিংবা কাল্পনিক ধ্যান ধারণা ভিত্তিক নয়। (আয়াত ৩৬)

'তোমার যা জানা নেই, তার পেছনে ছুট না। .....' এই ক্ষুদ্র আয়াতটা মন ও বিবেকের সামনে এমন একটা পূর্ণাংগ মতবাদ তুলে ধরে যে আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলোও এর আওতায় পড়ে। তৎসহ মনের দৃঢ়তা ও আল্লাহর স্মরণ আধুনিক বাতিল মতবাদসমূহের ওপর ইসলামের বাড়তি বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য হয়।

প্রত্যেক সংবাদ, প্রত্যেক তত্ত্ব প্রত্যেক তথ্য ও প্রত্যেক তৎপরতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তার সত্যাসত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া জরুরী। এই হলো কোরআনের বক্তব্য। এই হলো ইসলামের নির্ভুল তত্ত্ব। মন ও বিবেক এই নির্ভুল তত্ত্বের ওপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করলে আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আর কোনো বিভ্রান্তি বা কল্পনা বিলাসের অবকাশ থাকে না। সন্দেহ সংশয়ের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হবার এবং পারস্পরিক আচরণ ও লেনদেনের অবকাশ থাকে না। অনুরূপভাবে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও কাল্পনিক তত্ত্ব ও ভ্রান্ত স্থুল সিদ্ধান্তের অবকাশ থাকে না।

আধুনিক যুগের মানুষ যে বৈজ্ঞানিক সততার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তা আসলে সেই বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্তিক সততারই অংশ, যা কোরআন তৈরী করেছিলো। কোরআন মানুষকে সতর্ক করেছিলো যে, তার চোখ, কান, ও মন সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে হবে। সেই সতর্কবাণীর ওপর ভিত্তি করেই বুদ্ধিবৃত্তিক সততা ও বিশ্বস্ততা গড়ে উঠেছিলো।

এটা আসলে চেতনা, অনুভুতি বিবেক ও মনের সততা ও বিশ্বস্ততা। এ সম্পর্কে মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে। হৃদয়, মন, চোখ, কান সবাইকেই জিজ্ঞেস করা হবে। এই সততার বিরাটত্ব ও সুক্ষ্মতার কথা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। যখনই মানুষ কোনো কথা উচ্চারণ করে, যখন কেউ কোনো কথা বর্ণনা করে এবং যখনই কেউ কোনো ব্যক্তি বা ঘটনার সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করে, তখনই তার ঘাড়ে এই সততা প্রদর্শনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়।

'তুমি যা জাননা তার পেছনে ছুট না।'.....

অর্থাৎ সুনিশ্চিতভাবে না জেনে তুমি কোনো কিছুর অনুসরণ করো না। কোনো কথা, বর্ণনা, তথ্য বা ঘটনার নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোনো মতামত বা সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করো না। অনুরূপভাবে শরীয়তসংক্রান্ত কোনো বিধি এবং আকীদাসংক্রান্ত কোনো তত্ত্ব সম্পর্কেও ভালোভাবে না জেনে শুনে কোনো রায় দেয়া উচিত নয়।

হাদীসে আছে, সাবধান! অনর্থক ধারণা পোষণ করো না। কেননা ধারণা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিথ্যে কথা। সুনান আবু দাউদে আছে, মানুষের ওযর রটানোর নিকৃষ্টতম বাহন হলো, 'লোকেরা

বলাবলি করেছে' এ কথাটা। অপর হাদীসে আছে, সবচেয়ে বড় ধোঁকাবাজি হলো, নিজের চোখ যা দেখেনি, তা তাকে দেখানো।' (অর্থাৎ না দেখেও এরূপ বলা যে স্বচক্ষে দেখেছি।)

এভাবে একাধিক আয়াত ও হাদীস থেকে ইসলামের ওই পূর্ণাংগ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদটাই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। এই মতবাদ শুধু বিবেক বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকেই প্রতিষ্ঠিত হয় না, বরং আবেগ উদ্দীপনা ও চেতনা দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত হয়। মুখ দিয়ে এর যে শব্দটাই উচ্চারণ করা হোক বা যে ঘটনাই বর্ণনা করা হোক, বিবেক যে সিদ্ধান্তই নিক এবং যে সংকল্পই গ্রহণ করুক, প্রতিটি কর্মকান্ড থেকেই ওই খোদায়ী মতবাদের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়। আল্লাহ তায়ালা সূরার শুরুতে এই মতবাদ সম্পর্কেই বলেছেন,

'নিশ্চয়ই এই কোরআন সবচেয়ে নির্ভুল ও মযবুত বিধানের দিকেই পথ দেখায়।' আল্লাহর এই চিরঞ্জীব মতবাদ ও বিধান সম্পর্কে কোরআনের এ উক্তি অত্যন্ত বাস্তব ও সত্য।

অহমিকার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী

তাওহীদ বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট এসব নির্দেশের সর্বশেষ নির্দেশ হলো অন্তসারশুন্য অহংকার ও মিথ্যে দম্ভের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত,

'পৃথিবীতে দাম্ভিকতার সাথে বিচরণ করো না। তুমি পৃথিবীকে ফেড়ে ফেলতেও পারবে না, পাহাড়ের সমান উঁচুও হতে পারবে না।' (আয়াত ৩৭)

আল্লাহ তায়ালা যে তাঁর বান্দাদের ওপর পরাক্রমশালী, সে কথা যখন মানুষ ভুলে যায়, তখনই সে নিজের বিত্তবৈভব, ক্ষমতা ও সৌন্দর্যের প্রভাবে অহংকারে মেতে ওঠে। সে যদি স্মরণ রাখতো যে, তার যা কিছু সম্পদ ও সম্পত্তি রয়েছে, তা আল্লাহ তায়ালাই দিয়েছেন এবং আল্লাহর শক্তি ও প্রতাপের সামনে সে একবারেই দুর্বল ও অসহায়, তাহলে তার অহংকার কমে যেতো, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব উপলব্ধি করে সে বিনয়ী হতো এবং পৃথিবীর ওপর অহংকারের সাথে নয় বরং বিনয়ের সাথে চলাফেরা করতো।

নিজের দুর্বলতা, অক্ষমতা ও ক্ষুদ্রতা সত্তেও যে ব্যক্তি দম্ভের সাথে চলাফেরা করে ও অহংকার করে, তাকে কোরআন নিম্নরূপ জবাব দেয়,

'তুমি কখনো পৃথিবীকে ফেড়ে ফেলতে পারবে না এবং পাহাড়ের সমান উঁচুও হতে পারবে না।'

মানুষ শারীরিকভাবে এতোটা ক্ষুদ্র ও দুর্বল যে, আল্লাহর বহু প্রকান্ড প্রকান্ড সৃষ্টির সামনে সে আদৌ কোনো বস্তু বলেই গণ্য হয় না। সুতরাং তাকে বুঝতে হবে যে, তার যেটুকু ক্ষমতা, প্রতাপ, সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে, তা আল্লাহর প্রদত্ত। সে যাতে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখে, তাঁর দিকে মন রুজু রাখে এবং তাকে ভুলে না যায়, সে জন্যে তিনি তাঁকে রূহ বা আত্মা দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

কোরআন অহংকার পরিত্যাগ করে বিনয় ও বিনম্রতা অবলম্বনের যে আহ্বান জানিয়েছে, তা আল্লাহর সাথে ও জনগণের সাথে উভয়ের সাথেই সুশীল ও সুসভ্য আচরণ হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই এটা একমাত্র গ্রহণযোগ্য নৈতিক ও ভদ্র রীতি। এই সুসভ্য ও ভদ্র রীতিকে পরিত্যাগ করে অহংকার ও দাম্ভিকতা অবলম্বন করে শুধু সেই বিবেকহীন, সংকীর্ণমনা ও অবিবেচক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তায়ালাও পছন্দ করেন না। জনগণও নয়। আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না তাঁর দেয়া নেয়ামতকে ভুলে যাওয়া ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের জন্যে, আর জনগণ পছন্দ করে না তার বাড়াবাড়ি ও ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের জন্যে।

রসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিনয়ী হয়, আল্লাহ তায়ালা তাকে উন্নতি দান করেন। সে নিজের কাছে ক্ষুদ্র, কিন্তু সমাজের কাছে বড়। আর যে অহংকার করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে অধোপতিত করেন। সে নিজের কাছে বড়, কিন্তু জনগণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হয়। এমনকি সমাজের চোখে সে কুকুর ও শুকরের চেয়েও ঘৃণিত হয়ে থাকে।' (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

এ পর্যন্ত এসে এই নির্দেশাবলী শেষ হয়েছে। এর বেশীর ভাগই নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত, যা অত্যন্ত ঘৃণিত কার্যকলাপ ও কূ-স্বভাবসমূহের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়েছে।

'এই সব দোষের মধ্যে যেগুলো অপেক্ষাকৃত খারাপ, তা তোমার প্রতিপালকের কাছে ঘৃণিত।' (আয়াত ৩৮)

উপসংহারে এই মোদ্দা কথাটুকু স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে এসব নির্দেশের ভিত্তি হলো, এ সবের মধ্য থেকে যেগুলো খারাপ, দৃশগুলো আল্লাহর কাছে ঘৃণিত। আর যে কটা ভালো কাজের আদেশ এর ভেতর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তা নিয়ে কোনো কথা বলা হয়নি। কেননা নিষিদ্ধ খারাপ কাজের সংখ্যাই এখানে বেশী।

সর্বশেষে এসব আদেশ ও নিষেধকে আল্লাহর একত্বের সাথে ও তার সাথে শরীক করার বিরুদ্ধে উচ্চারিত সতর্কবাণীর সাথে যুক্ত করা হয়েছে, যেমনটি করা হয়েছে শুরুতেও। সেই সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এগুলোর ভেতরে সেসব প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞানময় বাণীও (হেকমত) রয়েছে, যার প্রতি কোরআন বিশেষভাবে পথনির্দেশ দেয়।

'এ হচ্ছে তোমার প্রতিপালক তোমার কাছে যে বিজ্ঞানময় বাণী নাযিল করেছেন, তার অংশ বিশেষ।..... (আয়াত ৩৯)

এই উপসংহারেরও সূচনার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। এর দু'দিকেই রয়েছে ইসলামের সেসব প্রধান মূলনীতি, যার ওপর সে মানব জীবনের ভিত্তি গড়ে তুলেছে। সেই মূলনীতিটা হলো আল্লাহর একত্ব এবং তার এবাদাত ও আনুগত্যে অন্য কাউকে শরীক না করা।

أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَٰئِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا ۚ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ سُبْحَٰنَهُ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَٰوَٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٥﴾ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾

৪০. এটা কেমন কথা, তোমাদের মালিক তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করেছেন পুত্র সন্তান, আর নিজে ফেরেশতাদের কন্যা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন; তোমরা সত্যিই (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) একটা জঘন্য কথা বলে বেড়াচ্ছো।

রুকু ৫

৪১. আমি এই কোরআনে (এ কথাগুলো) সবিস্তার বর্ণনা করেছি, যাতে করে তারা এর থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু এ (বিষয়)-টি তাদের (ঈমানের প্রতি) বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই বাড়ালো না। ৪২. (হে নবী, এদের) তুমি বলো, যদি আল্লাহর সাথে আরো মাবুদ থাকতো যেমন করে এ (মোশরেক) লোকেরা বলে, তাহলে অবশ্যই তারা (এতোদিনে) আরশের মালিকের কাছে পৌঁছার একটা পথ বের করে নিতো। ৪৩. (মূলত) এরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যা কিছু (অবান্তর কথাবার্তা) বলে, তিনি তার চাইতে অনেক পবিত্র, অনেক মহিমান্বিত। ৪৪. সাত আসমান, যমীন এবং এ (দু'য়ের) মাঝখানে যা কিছু (মজুদ) আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে; (সৃষ্টিলোকে) কোনো একটি জিনিসই এমন নেই যা তাঁর প্রশংসা, পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের এ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না; অবশ্যই তিনি একান্ত সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ। ৪৫. (হে নবী,) যখন তুমি কোরআন পাঠ করো তখন তোমার ও যারা পরকালের ওপর বিশ্বাস করে না তাদের মাঝে আমি একটি প্রচ্ছন্ন পর্দা এঁটে দেই। ৪৬. আমি তাদের অন্তরের ওপর (এক ধরনের) আবরণ রেখে দেই, ওদের কানে (এনে) দেই বধিরতা, যাতে করে ওরা তা উপলব্ধি করতে না পারে, (তাই তুমি দেখবে); যখন তুমি কোরআনে তোমার মালিককে স্মরণ করতে থাকো, তখন তারা ঘৃণাভরে (তোমার কাছ থেকে) সরে পড়ে। ৪৭. আমি ভালো করেই জানি যখন ওরা কান

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰٓى اِذْ
يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿٤٧﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا
لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٤٨﴾ وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا
وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٤٩﴾ قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ﴿٥٠﴾
اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ۚ قُلِ الَّذِيْ
فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ۚ قُلْ
عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّوْنَ
اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٥٢﴾ وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ
الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿٥٣﴾

পেতে তোমার কথা শোনে, তখন ওরা কান পেতে (কি কথা) শোনে (আমি এও জানি), যখন এই যালেমরা নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শ করে বলে, তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত লোকেরই অনুসরণ করে চলেছো। ৪৮. হে নবী, দেখো, এরা তোমার ব্যাপারে কি ধরনের উপমা তৈরী করেছে, (মূলত এসব কারণেই) অতপর এরা গোমরাহ হয়ে গেছে, অতএব এরা সঠিক পথের সন্ধান পাবে না। ৪৯. এ (মূর্খ) লোকেরা বলে, আমরা (মৃত্যুর পর) হাড্ডিতে পরিণত হয়ে পচে গেলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরায় উত্থিত হবো? ৫০. তুমি (তাদের) বলো, (মৃত্যুর পর) তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহায় (পরিণত) হও (সর্বাবস্থায়ই তোমরা পুণরুত্থিত হবে), ৫১. কিংবা এমন কিছু সৃষ্টি, তোমাদের ধারণায় যার (বাস্তবায়ন) হওয়া খুবই কঠিন, অচিরেই তারা বলবে, (অবস্থা এমন হলে) কে আমাদের পুনরায় জীবিত করবে; তুমি বলো (হাঁ), তিনিই করবেন যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতপর (তুমি দেখবে) তারা তোমার সামনে মাথা নাড়াবে এবং বলবে, (তাহলে) কবে হবে (এ সব কিছু); তুমি বলো, সম্ভবত সেদিন খুব শীঘ্রই (সংঘটিত) হবে। ৫২. যেদিন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ডাক দেবেন এবং তোমরা সবাই তাঁর প্রশংসা করতে করতে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে, (আর) তোমরা ভাববে, সামান্য কিছু সময়ই তোমরা (কবরে) কাটিয়ে এসেছো!

রুকু ৬

৫৩. (হে নবী,) আমার বান্দাদের বলে দাও, তারা যেন (কথা বলার সময়) এমন সব কথা বলে যা উত্তম; (কেননা) শয়তান (খারাপ কথা দ্বারা) তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; আর শয়তান তো হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ؕ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ؕ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ
عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿٥٤﴾ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ
فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿٥٥﴾ قُلِ ادْعُوا
الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ﴿٥٦﴾
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ
وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ؕ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ﴿٥٧﴾

৫৪. (হে মানুষ,) তোমাদের মালিক তোমাদের সম্পর্কে ভালো করেই জানেন; তিনি চাইলে তোমাদের ওপর দয়া করবেন, কিংবা তিনি চাইলে তোমাদের শাস্তি দেবেন (হে নবী); আমি তো তোমাকে তাদের ওপর কোনো অভিভাবক করে পাঠাইনি। ৫৫. তোমার মালিক (তাদের) ভালো করেই জানেন যা আসমানসমূহ ও যমীনের মাঝে (মজুদ) রয়েছে; আমি একেকজন নবীকে একেকজনের ওপর (স্বতন্ত্র কিছু) মর্যাদা দান করেছি, (এমনিভাবেই আমি) দাউদকে যাবুর কেতাব দান (করে মর্যাদাবান) করেছি। ৫৬. (হে নবী, এদের) বলো, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের (মাবুদ) মনে করে ডাকো, তাদের ডেকে দেখো, (দেখবে,) তারা তোমাদের কাছ থেকে কষ্ট দূর করার কোনো ক্ষমতাই রাখেনা– না ক্ষমতা রাখে (তাকে) বদলে দেয়ার। ৫৭. ওরা যাদের ডাকে তারা (স্বয়ং) নিজেরাই তো তাদের মালিকের কাছে (পৌঁছার) উসিলা তালাশ করতে থাকে, (তারা দেখতে চায়) তাদের মধ্যে কে (আল্লাহ তায়ালার) নিকটতর হতে পারে এবং তারা তাঁরই দয়া প্রত্যাশা করে, তাঁর আযাবকে ভয় করে; (মূলত) তোমার মালিকের আযাব এমনই একটি বিষয় যা একান্ত ভীতিপ্রদ।

তাফসীর

আয়াত ৪০-৫৭

এখানে থেকে শুরু হচ্ছে সূরায়ে বনি ইসরাঈল বা ইসরার দ্বিতীয় পাঠ, এ অধ্যায়ে আলোচনা এসেছে আল্লাহর একত্ব ও শেরেকের প্রতি নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে। এ আলোচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো অংশের মধ্যে আরও যুক্ত হয়ে রয়েছে আল্লাহর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত অনেক কথা এসব কিছু এবং এসব কিছুর জন্যে যা নিয়ম শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হয়েছে আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস (বা তাওহীদ)-এর ভিত্তিতে।

শেরেকের অসারতা

অধ্যায়টি শুরু ও শেষ হয়েছে আল্লাহর সন্তান হওয়া ও তাঁর শরীক হওয়ার অলীক ধারণাকে প্রতিহত করতে গিয়ে! জানানো হয়েছে, মানুষের মনগড়া ও অনুমানভিত্তিক এসব কথা সমাজ জীবনকে পেরেশান করে মাত্র এবং মানবতার মূল্যকে নীচে নামিয়ে দেয়। এর সাথে সাথে দৃঢ়তার সাথে প্রমাণ করা হয়েছে যে গোটা সৃষ্টি জগৎ এক স্রষ্টার দিকে কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে এবং তাঁর অদৃশ্য ইশারায় একই নিয়মে দিবারাত্র সব কিছু আবর্তিত হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'যতো কিছু (দৃশ্য জগতে) আছে সবই (তাঁর হুকুম পালনের মাধ্যমে) তার তাসবীহ্ জপে চলেছে।'

অর্থাৎ সব কিছু জানাচ্ছে যে আখেরাতে তারা এক ও অদ্বিতীয় মহান সত্ত্বা আল্লাহ রব্বুল আলামীন এর কাছেই ফিরে যাবে, আরো জানাচ্ছে যে, একমাত্র সেই মহান সত্ত্বাই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত সব কিছুর খবর রাখেন, আর কেউ নয়, আর তিনি সব কিছুকে একাই পরিচালনা করে চলেছেন, যার জন্যে কারো কাছে তাঁকে কৈফিয়ত দেয়া লাগে না। এরশাদ হচ্ছে, 'তিনি চাইলে তোমাদের প্রতি রহম করবেন এবং চাইলে তোমাদেরকে আযাব দেবেন।'

আলোচনার মধ্যে শেরেকের অসারতা প্রমাণিত হয়েছে এবং পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এটা মানুষের মনগড়া এক ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে মহান সেই সত্ত্বা, যাঁর হাতে রয়েছে সবার জীবন ও মৃত্যু একমাত্র তাঁরই দিকে সবাইকে রুজু করতে হবে, এবং সকল ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই; সবাইকে পরিচালনা করা এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সৃষ্টিজগতের সবাইকে প্রকাশ্যে ও গোপনে নির্দেশ দানের ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই। আরও প্রকাশ পাচ্ছে যে, জীবিত মৃত সজীব নির্জীব, জীব জন্তু, কীট পতংগ ও যতো পদার্থ আছে সবাই তাদের সৃষ্টিকর্তার দিকে রুজু হয়ে আছে এবং তাদের সারাক্ষণের আনুগত্যের মাধ্যমে এটা জানা যাচ্ছে।

'তোমাদের রব কি তোমাদের জন্যে বরাদ্দ করলেন পুত্র সন্তান এবং নিজের জন্যে গ্রহণ করলেন কন্যা সন্তান? (আয়াত ৪০)

এখানে জিজ্ঞাসাবোধক বাক্য ব্যবহার করে আল্লাহ রব্বুল আলামীন কাফেরদের এ কথার প্রতি ঘৃনা ও অসন্তোষ প্রকাশ করছেন যে তারা বলছে, 'ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা' তারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যেসব বাজে কথা উচ্চারণ করছে, যে আল্লাহর সন্তান আছে, আছে জীবন সংগিনী, আছে তাঁর শরীক, এসব কথার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছেন এবং আরও ক্রোধ প্রদর্শন করছেন এজন্যে যে তারা আল্লাহর জন্যে বাছাই করেছে কন্যা আর নিজেদের জন্যে পুত্র, অথচ তারা নিজেরা কন্যাদেরকে পুত্রদের তুলনায় তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করে; তারা দারিদ্র ও লজ্জার ভয়ে কন্যা সন্তানদের হত্যা করে, এতদসত্তেও আল্লাহর জন্যে তারা কন্যা–সন্তান পছন্দ করছে! আল্লাহ তায়ালা যখন পুত্র কন্যা উভয়টিই দান করছেন তখন তাদের পক্ষে আল্লাহর জন্যে কন্যা সন্তান পছন্দ করার হেতু কি এবং নিজেদের জন্যে পুত্র সন্তান পছন্দ করারই বা যৌক্তিকতা কি?

এখানে এসব ভুল দাবীর কারণে যে আত্ম-বিস্মৃতি মানুষে মানুষে অনৈক্য এবং অধপতন শুরু হয়েছে এগুলোকে যাতে করে সঠিক পথে আনা যায় তার যুক্তি তর্ক-দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে এ কাজ না হলে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনার বুনিয়াদই ধসে যেতো। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই তোমরা বিরাট কথা বলছো'...... নিকৃষ্ট চরিত্র ও ব্যবহারের দিক দিয়ে তোমার কথা ছিলো অবশ্য খুবই বড়, দম্ভ ও অসভ্যতার দিক দিয়ে ওরা এটা বিরাট কথা বলছে। বিরাট কথা বলছে তারা মিথ্যা হওয়ার দিক দিয়ে এবং সঠিক ও চেতনাও কল্পনা থেকে দূরে সরে যাওয়ার দিক দিয়েও তাদের কথা খুবই বড় ও মারত্মক। এরশাদ হচ্ছে,

'আর অবশ্যই আমি, এই আল কোরআনের মধ্যে সব কিছুকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, যাতে করে ওরা শিক্ষা গ্রহণ করে, কিন্তু এতদসত্তেও সত্য থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো ফায়দা হয়নি।'

মহা পবিত্র আল কোরআন আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপাত্য কায়েমের জন্যেই এসেছে আর এই আকীদাকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে এবং এ বিশ্বাসকে সুস্পষ্টভাবে মানুষকে বুঝানোর জন্যে

সারাক্ষণ এর তৎপরতা এগিয়ে চলেছে, এজন্যে নানা প্রকার পদ্ধতি ও হেকমত অবলম্বন করা হয়েছে, বিভিন্ন উপায় ও ওসীলা গ্রহণ করা হয়েছে-এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন অন্তর প্রাণ দিয়ে তাওহীদের মর্মকথা মানুষ বুঝতে পারে এবং স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে নিজেদের বুঝ শক্তির নিরিখেই এ মহা সত্যকে গ্রহণ করতে পারে, তাই বলা হয়েছে,

'যেন তারা শিক্ষা নিতে পারে।'

অতপর চিন্তা করে দেখুন, তাওহীদকে বুঝানোর জন্যে এর প্রয়োজন ও যৌক্তিকতা বুঝানো ছাড়া আর কিছু করার নাই, মানুষকে তাদের বাস্তব প্রকৃতির দিকে ফিরে যাওয়ার কথা বলা ও যুক্তি প্রদর্শন করা এবং সৃষ্টির বিভিন্ন নিদর্শন দেখিয়ে তাদেরকে সত্যের দিকে উদ্বুদ্ধ করা ইসলামী দাওয়াতের সর্বপ্রধান কাজ। কিন্তু, দুনিয়ার স্বার্থ ও জাহেলিয়াতের অন্ধ অনুসরণে তারা এমনই নির্বোধ হয়ে গেছে যে আল কোরআন থেকেই তারা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, যখনই আল কোরআন তারা শোনে তখনই তারা দূরে সরে যায়, এভাবে যতোবারই তাদেরকে সত্যের দিকে ডাকা হচ্ছে ততোবারই তারা সত্যের বাতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যে আকীদা গ্রহণ করার জন্যে তাদেরকে আহবান জানানো হয়েছে তার থেকে তারা দূরে সরে যাচ্ছে—আল কোরআন থেকে তাদের দূরে সরে যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন আল কোরআনের আওয়ায তাদের ওপর বিজয়ী হয়ে তাদের বর্তমান অবস্থান থেকে তাদেরকে সরিয়ে দিতে না পারে আর আল কোরআনের যতোটুকু আওয়ায তাদের কানে গেছে এবং এর সম্মোহনী শক্তি যতোটুকু তারা দেখার সুযোগ পেয়েছে তাতে তাদের মধ্যে প্রতীতি জন্মে গেছে যে এ কেতাবের আওয়ায যদি ব্যাপকভাবে মানুষের কান পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে মানুষকে এর থেকে বেশীদিন দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হবেনা; তাদের সেই মিথ্যা ও কাল্পনিক ধারণা বিশ্বাসের ওপর আল কোরআন অবশ্যই বিজয় লাভ করবে যাকে তারা অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরে আছে। তাদের শেরেকের আকীদা, তাদের মনগড়া মাবুদদের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস ও আনুগত্য এবং তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন যেসব জিনিসকে অযথা তারা গুরুত্ব দিয়ে চলেছে আল কোরআনের সামনে একদিন সেসব কিছুই অসার ও অর্থহীন প্রমাণিত হবে।

'যেমন করে ইতিমধ্যে তাদের কাছে আল্লাহর জন্যে কন্যা বানানোর কথাটা যুক্তিহীন ও অসার প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি করে ইলাহ্ বা জীবন-মৃত্যুর মালিক ও ভালো মন্দের কর্তা বলে যেসব মাবুদদেরকে তারা গ্রহণ করেছিলো তারাও যে সত্যিকারে কোনো শক্তি-ক্ষমতার মালিক নয় তা এখন তাদের নযরে ধরা পড়ে গেছে। তাদেরকে বুঝানো হচ্ছিলো যে তাদের অধপতনের মূল কারণ হচ্ছে অন্ধভাবে ওইসব অলীক দেব-দেবীর পূজা উপাসনা করা এবং তাদের কাছে সাহায্যের জন্যে হাত পাতা। তাদেরকে জানানো হচ্ছিলো যে এসব দেব-দেবী যদি আল্লাহর সাথে তাঁর ক্ষমতায় শরীক হতো বা তারা আল্লাহর আত্মীয় হতো তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহর নৈকট্য-লাভের চেষ্টা করতো এবং আল্লাহর কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্যে নানা প্রকার উপায় তালাশ করতো। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, সত্যই যদি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আরও বিভিন্ন ব্যক্তি বা দেব-দেবী ক্ষমতার মালিক হতো, যেমন ওরা বলে, তাহলে অবশ্যই তারা আকাশবাসীর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করতো।'

ব্যাকরণবিদ বা ভাষাবিদরা যেমন বলেন, কোনো বিষয়ে না সুচক কোনো কথা বলা বা বিরোধিতা করা যদি শুধু বিরোধিতার জন্যেই হয় তাহলে পুরো বিষয়টাই রদ হয়ে যায়, সেখানে কোনো যুক্তি পেশ করার সুযোগ থাকে না বা যুক্তি পেশ করে কোনো লাভও হয় না। প্রকৃত পক্ষে, আল্লাহর সাথে তাঁর ক্ষমতায় ভাগ বসানোর মতো কোনো ক্ষমতাবান সত্ত্বা নাই, যে নিজের এবং অন্য কারো মালিক হতে পারে, কোনো জীবন মৃত্যুর কর্তা হতে পারে অথবা সকল শক্তি ক্ষমতার

মালিক অথবা সর্বময় ক্ষমতার মালিকের সমকক্ষ বা অংশীদার হওয়ার দাবী করতে পারে। যেসব জিনিস অথবা ব্যক্তিকে তারা পূজনীয় মনে করে, তাদের সামনে মাথা নত করে এবং বিপদ আপদে তাদের কাছে সাহায্যের জন্যে হাত প্রসারিত করে তারা সবাই তো আল্লাহরই সৃষ্টি, সে কোনো তারকা হোক, হোক কোনো গ্রহ, মানুষ বা পশু, বৃক্ষ বা কোনো ইট পাথর নির্মিত জড় পদার্থ যাইই হোক না কেন সবাই প্রকৃতিগতভাবে সৃষ্টি কর্তার দিকে ফিরে যেতে বাধ্য, সবারই লয় আছে, আছে ক্ষয় এবং অবশেষে সবাইকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে তিনি যা ইচ্ছা করেন, সে ইচ্ছার কাছে সবাইকেই নতি স্বীকার করতে হয় এবং অবশ্যই একদিন সবাইকে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। তাই এরশাদ হচ্ছে, ক্ষমতা অন্য কারো হাতে যদি থাকতো 'তাহলে অবশ্যই তারা আরশের মালিকের কাছে পৌছে যাওয়ার চেষ্টা করতো। ..... আরশের উল্লেখ হয়েছে এই জন্যে যে আল্লাহ তায়ালা মহান ও তাঁর মর্যাদা সর্বোচ্চ আর যেসব সৃষ্টিকে ওরা আল্লাহর সাথে মাবুদ বা ক্ষমতাধর মনে করে ডাকে, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নীচে বা তাঁর অধীনস্থ তাঁর সাথে বা পাশাপাশি কেউ নয়, একথা বলার পর পরই জানানো হচ্ছে, তিনি ওই সকল দুর্বলতা থেকে পবিত্র যা সৃষ্টিজগতের সবার আছে। এরশাদ হচ্ছে,

'তিনি পবিত্র সব কিছু দুর্বলতা থেকে, সমুচ্চ তাঁর মর্যাদা, তাঁর সম্পর্কে যা বলে তার থেকে তিনি বহু বহু উর্ধ্বে।'

প্রকৃতির সাথে যেভাবে সখ্যতা হয়

এরপর জানানো হচ্ছে যে, এই মহাকাশের নীচে অবস্থিত যে বিশাল জগৎ-এর মধ্যে যা কিছু আছে সবই পারস্পরিক অদেখা এক বন্ধনে আবদ্ধ, এরা সবাই আল্লাহমুখী ও আল্লাহর অনুগত জীবন যাপন করছে এবং অহরহ আল্লাহর নির্দেশিত পথে আবর্তিত হয়ে তাঁর তাসবীহ করছে (সবাই জানাচ্ছে যে, তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর হুকুমমত চলতে বাধ্য) এবং আরও জানাচ্ছে যে সব কিছু এগিয়ে চলেছে তাঁরই দিকে। এরশাদ হচ্ছে,

'সপ্ত-আকাশ, পৃথিবী ও এ দুই এর মাঝে যা কিছু আছে সবই ও সবাই নিরন্তর তাসবীহ জপে চলেছে। আর যেখানে যা কিছু আছে তাঁর প্রশংসা-গীতি গেয়ে চলেছে, কিন্তু তাদের এই তাসবীহ তোমরা বুঝতে পারো না নিশ্চয়ই তিনি বড়ই সহনশীল মাফ করনেওয়ালা।'

এ বিশাল সৃষ্টির মধ্যে প্রতিটি অণু-পরমাণু প্রতিনিয়ত তাদের নড়াচড়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহর গুণগান করে চলেছে, অর্থাৎ প্রানী ও জড়পদার্থ সবাই ও সবকিছু চলমান অবস্থায় আছে– প্রকৃতপক্ষে তাদের সবারই জীবন আছে এবং সবাই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণায় রত। সবাই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রশংসা ও কৃতিত্ব বর্ণনা করে চলেছে। আমরা তাদের তাসবীহ জপার অর্থ করতে গিয়ে বড় জোর এতোটুকু বুঝি যে সব কিছু নিরলসভাবে আল্লাহর হুকুম অবিরত পালন করে প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, সর্ব শক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ক্ষমতা সারাক্ষণ এবং সর্বত্র বিরাজমান, তাঁর ক্ষমতার বাইরে কেউ নেই, তাঁর হুকুম অমান্য করার সাধ্য বা স্বাধীনতা কারো নেই।

এ হচ্ছে তুলনাহীন এক দৃশ্য। যখন গভীর দৃষ্টিতে এই বিশ্ব প্রকৃতির দিকে মানুষ তাকায় হৃদয়ের গভীর চিন্তা করে এবং অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চায়, তখন ছোটো বড়ো প্রত্যেকটি নুড়ি ও পাথর, প্রত্যেকটি দানা-কণা, প্রতিটি পল্লব প্রত্যেকটি ফুল ও ফল, প্রত্যেকটি চারা ও গাছ, প্রতিটি কীট পতংগ ও বুকে হাঁটা প্রাণী এবং প্রত্যেকটি জীবজন্তু ও মানুষ এবং পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে থাকা প্রত্যেকটি জীব জানোয়ার, শূন্য আকাশে উড়ন্ত পাখীকূল ও পানিতে সন্তরণশীল প্রতিটি প্রাণী.... এসব কিছুর সাথে যখন মহাশূন্যলোকে বিরাজমান সকল বস্তু নিচয়ের দিকে

তাকায় তখন সে অনুভব করে সবাই অদৃশ্য কোনো এক শক্তির টানে এগিয়ে চলছে, সবাই একই নিয়মে বিচরণ করছে, সবাই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্ব লোকের এসব দৃশ্য বিদগ্ধ হৃদয়ে জাগায় এক প্রবল প্রকম্পন, আবেগ মুগ্ধ নেত্রে সে পুনরায় এগুলোর দিকে যখন দৃষ্টিপাত করে তখন সে দৃশ্য অদৃশ্য সব কিছুর মধ্যে এক প্রাণ প্রবাহ লক্ষ্য করে যখন যেটা সে স্পর্শ করে, যখন যেদিকে পদবিক্ষেপে এগিয়ে যায় সব কিছু থেকেই সে যেন শুনতে পায় এক মর্মকথা, সবাই যেন আপন মালিকের বন্দনা গাইতে ব্যস্ত, সব-কিছুর মধ্যেই যেন প্রাণ প্রবাহের বন্যা পরিস্ফুট। এরশাদ হচ্ছে,

'যতো কিছু আছে সবাই তাঁর প্রশংসা-গীতি গেয়ে চলেছে।'

হাঁ, অবশ্যই তারা আল্লাহর তাসবীহ জপছে, কিন্তু তারা যেমন ধরনের প্রাণী বা বস্তু তাদের তাসবীহও সেই রকম এবং তারা তাসবীহ পড়ে তাদের আপন আপন ভাষায়। এইজন্যেই বলা হচ্ছে,

'তোমরা বুঝো না তাদের তাসবীহ জপা।'

তোমরা বুঝো না কারণ তোমরা তো মাটি-দ্বারা সৃষ্টি মানুষ-এই মাটির আবরণে তোমাদের দেহ গড়া। মাটির আবরণ ভেদ করে যেমন আলো পার হয়না, তেমনি তোমাদের দেহাবরণ ভেদ করে জীবজন্তু প্রাকৃতিক বস্তু নিচয়ের ভাষা তোমাদের কাছে পৌছায় না, আরও একটা বড় সত্য হচ্ছে এই যে, তোমরা তো সাধারণভাবে হৃদয়ের কান দিয়ে শোন না এবং সৃষ্টির গোপন রহস্য বুঝার জন্যে চেষ্টা করো না, খেয়ালও করো না ও সবের দিকে এবং দিগন্ত বিস্তৃত যে সব নিদর্শন এই বিশাল সৃষ্টিকে ধরে রেখেছে সেগুলোকেও দেখার দরকার মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে এসবের দিকে খেয়াল করে তাকালে সৃষ্টিকুলের যেসব রহস্য নযরের সামনে ভেসে ওঠে তা জানাতে থাকে সেই মহান স্রষ্টার কথা, যিনি এ সবেরও সৃষ্টিকর্তা এবং যিনি এ সবের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারী।

আর মানুষের অন্তরাত্মা যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা সৃষ্টি রহস্যগুলো অবলোকন করতে থাকে এবং পরিস্কারভাবে এ নিদর্শনগুলো তার নযরের সামনে ভাসতে থাকে তখন সজীব-নির্জীব সব কিছু যেন তার সাথে কথা বলতে শুরু করে দেয়, আর তখনই সে সব কিছুর মধ্যে এক প্রাণ স্পন্দন দেখতে পায় এবং সেই সময়েই সে তাদের তাসবীহ জপা শুনতে পায়, অতপর সেই সময় তার হৃদয় মন স্বর্গ রাজ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠে, আর সেই সময়েই সে সৃষ্টি রহস্যের গোপন তত্ত্ব ও তথ্যাদির সন্ধানে পেতে থাকে যা সাধারণ দুনিয়া পূজারীর দল ও উদাসীন লোকেরা পায় না, পেতে পারে না। পায়না সেই সব স্থবির ও স্থুল দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষেরা, যাদের হৃদয় মাটির পুরু আবরণে আচ্ছন্ন থাকায় সৃষ্টি রাজ্যের গভীরে লুকায়িত গোপন রহস্য উদঘাটনে তারা ব্যর্থ হয়ে যায়, ব্যর্থ হয় ওই সব রহস্যদ্বার খুলতে যা প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব বস্তুর মধ্য থেকে ব্যক্ত হতে থাকে, প্রকাশিত হতে থাকে এ মহাসৃষ্টির সব কিছু থেকে।

এ পর্যায়ে এসে জানানো হচ্ছে যে মহান স্রষ্টা এইসব অপরিনামদর্শী ব্যক্তিদের ওপর রাগ করে তাদেরকে সাথে সাথে শাস্তি দেন না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল বড়ই মাফ-করনেওয়ালা।'

আল্লাহর অসীম ক্ষমতা

এখানে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সহনশীলতা ও ক্ষমাশীলতার কথা উল্লেখের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে তিনি বান্দাদের এই উদাসীনতা, পরিণামের কথা চিন্তা করে কাজ ও ব্যবহার না করার কারণে এবং পরকালীন জীবনে মুক্তি লাভের জন্যে এ জীবনে কি কি দায়িত্ব পালন করতে হবে সে বিষয়ে চিন্তা না করার সাথে সাথে অধৈর্য হয়ে পড়েন না এবং তাদের ওপর সংগে সংগে শাস্তিও

নাযিল করেন না। তিনি তাদের এ উদাসীনতা জনিত অপরাধকে তার মৃত্যু পর্যন্ত ক্ষমা করতে থাকেন, সৃষ্টি রাজ্যের সব কিছু যে অহরহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার তাসবীহ জপে চলেছে, মানুষ-এটা বুঝে না, চেষ্টাও করে না, এজন্যে ও আল্লাহ তায়ালা তাদের অপরাধ নেন না, আবার এদের মধ্যে এমন বেশ কিছু নিলজ্জ মানুষও আছে যারা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করতে রাযি নয়। এসব অর্বাচীন, অভদ্র ও অসত্য মানুষ কেমন প্রগলভতার সাথে বলে, 'এসব কিছু এমনি এমনিই সৃষ্টি হয়েছে, আর এমনি এমনিই প্রকৃতির বুকে এগুলো বিলীন হয়ে যাবে।' তথাকথিত এসব মুর্খ বুদ্ধিজীবীরা একটুও চিন্তা করতে প্রস্তুত নয় যে, যে প্রকৃতির কথা তারা বড় গলায় বলছে, সেই প্রকৃতি কী? কে রয়েছে তার পেছনে? মানুষে মানুষে দেহাবয়বের দিক দিয়ে, চেহারা ছবিতে, কর্মক্ষমতায় হৃদয়ানুভূতিতে, শক্তি-সামর্থে এবং জ্ঞান গরিমা ও যোগ্যতায় এতো পার্থক্য কেন, কে এসবের স্রষ্টা আবার এমনও কিছু সংখ্যক মানুষ আছে যারা আল্লাহকে সর্বশক্তিমান মানে বটে, আবার তাঁর ক্ষমতায় তাঁরই কোনো কোনো সৃষ্টি জীবজন্তু না বস্তুকে অংশীদার বানায়। এরা কতো জঘন্য ধরনের বেওকুফ যে যাঁকে সর্বশক্তিমান বলে মানে তাঁর ক্ষমতায় অন্য কারো কোনো অংশ স্বীকার করলে ক্ষমতার নিরংকুশ মালিক বা সর্বশক্তিমান বলতে আর কেউ থাকে না এতোটুকুও তারা বুঝে না। এর পর তাদের সীমাহীন বোকামীর ও আত্ম প্রবঞ্চনার আর একটি দৃষ্টান্ত এই যে, তারা বলে ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা। হতভাগারা এটা হিসাব করে না যে সন্তান হওয়া এটা তো সৃষ্টিরই নিয়ম, যাদের প্রয়োজন হয় সাহায্যকারীর, যাদের মৃত্যুর পর প্রয়োজন হয় উত্তরাধিকারীর! আর এ হতভাগারা আল্লাহর জন্যে সন্তান বানায়, তা আবার এমন একশ্রেণীকে, যাদেরকে তারা নিজেরা সন্তান বানাতে লজ্জাবোধ করে। যাকে মালিক বলে স্বীকার করো তার জন্যে অপয়াটা, আর গোলামদের জন্যে সেরাটা—এ কেমন ধারা ভাগাভাগি? ছিঃ একটুও লজ্জা লাগে না এমন কথা বলতে।

যিনি তোমাকে জ্ঞান বুদ্ধি ও সুন্দরতম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টির সেরা বানালেন আর সবাইকে নিয়োজিত করে দিলেন তোমার খেদমতে—তাঁর সাথে এই ব্যবহার! ধিক তোমার জীবন, ধিক তোমার বিবেচনাবোধের ওপরে, আর ধিক তোমার জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায়। যেখানে তোমার কর্তব্য ছিলো মালিকের এতোসব নেয়ামতের কথা স্বীকার করে তাঁর কাছে নিজেকে সোপর্দ করা, তাঁর ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা বানিয়ে তাঁর আরও কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণ করা, তাঁকে খুশী করার জন্যে সারাক্ষন মান তাঁর প্রশংসা-গীতিতে মুখর থাকা এবং তাঁর আরও মহব্বত লাভ করার জন্যে, তাঁকে খুশী করার জন্যে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকা—তুচ্ছ জ্ঞান করে এ নশ্বর জীবনকে ও এর সকল ক্ষণস্থায়ী সমারোহকে সকল মনোযোগিকে তাঁর দিকেই সংযোগ করা যেন তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে তাঁর চিরন্তন মোহব্বতের পরশ পাওয়া যায়। প্রেমময় প্রভু-পরওয়ারদেগার মানুষকে যে যোগ্যতা, যে জ্ঞান, যে সুযোগ এবং যে শক্তি সামর্থ দিয়েছেন, তাতে তার পক্ষে সর্বোত্তম উপায়ে তাঁর প্রশংসা-গীত গাওয়া, তাঁর আনুগত্য করা এবং তাঁর ইচ্ছাকে কার্যকর করে এ পৃথিবীকে বেহেশতে পরিণত করা প্রয়োজন ছিলো-এজন্যেই তো মালিক তাকে তাঁর প্রতিনিধি বানিয়ে সকল কিছুকে তাঁর ইচ্ছামত পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু হায় এ হতভাগা মানুষ নিজের পজিশন, নিজের মান-সম্মান, নিজের পদমর্যাদা সব কিছুকে মাটি করে দিয়ে নিজের নিকৃষ্টতম সৃষ্টিতে পরিণত করেছে, যা দেখে পশুরাও লজ্জা পায়, তাদেরকে বোধহয় ঘৃণা করে—তাদের পরিচালনাকে অস্বীকার করতে চায়! আল্লাহ তায়ালা যদি চরম সহনশীল না হতেন, না হতেন সীমাহীন ক্ষমাশীল তাহলে তাদেরকে অচিরেই নীস্ত-নাবুদ করে দিতেন, যেমন করে বিলীন করে দিয়েছেন অতীতে বহু জাতি ও জনপদকে, ওলট-পালট করে দিয়েছেন তাদের ভূমিকে। কিন্তু না, আল্লাহর হাবীব শেষ রসূলের খাতিরে তিনি তা করছেন না-করবেন না-এটা তাঁর ওয়াদা—এজন্যে অপরাধের

জঘন্যতায় পূর্ববর্তী কওমগুলোকে ছাড়িয়ে গেলেও কোনো এলাকার গোটা জনপদকে পুরোপুরি ভাবে ধ্বংস করছেন না-করবেন না। শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে তিনি তাদেরকে মৃত্যু দম পর্যন্ত সময় দিয়ে রেখেছেন সুযোগ দিয়েছেন, বুঝ শক্তি দিয়েছেন তাদেরকে স্মরণ করানোর জন্যে তাদের দুয়ারে দুয়ারে পাঠিয়ে দিচ্ছেন মোব্বালেগ (প্রচারক)-এর দলকে এবং তাদেরকে সন্দেহমুক্ত সঠিক পথের সুদৃঢ় দিশা দেয়ার জন্যে তাঁর কেতাবকে রেখেছেন অবিকৃত, যার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত এতো কথা রয়েছে যার চর্চা শেষ হয়েও কেয়ামত পর্যন্ত হবে না। এইজন্যেই ত 'তিনি সহনশীল, মাফ করনেওয়ালা'-উপাধি নিয়েছেন।

কোরআনের বিস্ময়কর সম্মোহনী শক্তি

কোরায়শ সর্দাররা কোরআন শুনতো এবং বুঝত যে, অবশ্যই এ সম্মোহনী বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিন্তু তবু তারা মনের সাথে সংগ্রাম করতো, যেন মন নরম না হয়, যেন তাদের স্বভাবের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়তে না পারে এই কারণেই তিনি তাদের ও রসূলের মধ্যে গোপন এক পর্দার আড়াল করে দিয়েছেন তাদের হৃদয় দুয়ারকে বন্ধ করে দিয়েছেন, ফলে কোরআন শুনলেও তারা বুঝতো না। তাদের কানগুলোকে বধির করে দিয়েছেন, এজন্যে যা শুনত তা বেশীক্ষণ তারা মনে রাখতে পারতো না। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যখন তুমি কোরআন পড় তখন আমি, তোমার ও আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসীদের মধ্যে একটি পর্দা নিক্ষেপ করি যা তাদেরকে সত্য থেকে আড়াল করে রাখে.... দেখো, কেমনভাবে তোমার জন্যে আল্লাহ তায়ালা উদাহরণ পেশ করছেন, এর পরও তারা ভুল পথটিই বেছে নিলো, ফলে তারা আর সঠিক পথে এগুতে পারবে না।' (আয়াত ৪৫-৪৮)

ইবনে ইসহাক, তাঁর রচিত 'সীরাতে এবনে হিশাম' গ্রন্থে মোহাম্মাদ এবনে মুসলিম থেকে রেওয়াত করেছেন যে মক্কার কিছুসংখ্যক কোরায়শ সর্দার যেমন আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, আবু জেহেল ইবনে হিশাম এবং আখনাস ইবনে শোরায়েক প্রমুখ ব্যক্তিরা ছিলো বনূ যোহরার মিত্র। এরা এক রাতে রসূলুল্লাহ (স.)-এর যবানে মোবারক থেকে খেয়াল করে কোরআন পাঠ শোনার জন্যে রওয়ানা হলো। তিনি তাঁর বাড়ীতে নামায পড়ছিলেন এবং নামাযে কোরআন পাঠ করছিলেন। তখন তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ পছন্দমত জায়গায় বসে তারা মনোযোগ সহকারে কোরআন তেলাওয়াত শুনতে লেগে গেলো, অন্ধকারের কারণে কে কোথায় বসেছে তারা দেখতে পাচ্ছিলো না। অতপর তারা পাক কালামের তেলাওয়াত শুনতে শুনতে রাত কাটিয়ে দিলো, অবশেষে ফজরের সময় হয়ে গেলে তারা সেখান থেকে উঠে গেলো এং যাওয়ার পথে পরস্পরের সাথে সাক্ষাত হয়ে গেলো; তখন তারা 'সারারাত ধরে কেন থাকা হয়েছে' একথা বলে একে অপরকে দোষারোপ করতে লেগে গেলো এবং পরস্পর বলাবলি করলো, যদি আমাদেরকে কেউ দেখে ফেলে এবং আমাদের এই ঘটনা জানতে পারে তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে, অবশ্যই তার মনে কিছু না কিছু দাগ কেটে যাবে। সুতরাং অন্য কেউ যেন জানতে না পারে এবং আর যেন একাজের পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্যে একে অপরকে সাবধান করে তারা নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে গেলো। এরপর পরবর্তী রাত্রিতে, পূর্বের মতো আবারও তারা লোভ সামলাতে না পেরে আল্লাহর পাক কালাম শুনতে গেলো এবং পূর্ব রাত্রির ন্যায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ জায়গায় আসন নিলো। এইভাবে এ রাতটিও কোরআন শুনতে শুনতে কাটিয়ে দিলো এবং ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গেলে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলো ও পথের মধ্যে আবারও পরস্পর সবার সাক্ষাত হয়ে গেলো। তখন পূর্ব রাত্রির মতো এবারও তারা পরস্পরকে দোষারোপ করলো এবং তাই বললো যা আগের রাত্রিতে বলেছিলো। এরপর তারা নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে গেলো। তৃতীয়

রাত্রিতেও তারা এমনি করে, আল্লাহর পবিত্র কালাম শোনার প্রবল লোভ সামলাতে না পেরে আবারও আগের মতো গেলো, নিজ নিজ স্থানে বসে সারারাত ধরে শুনলো এবং ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গেলে বেরিয়ে এলো, তারপর পথিমধ্যে পরস্পর মিলিত হলে আগের মতো বলাবলি করলো এবং বললো, আমরা এমনি করে, রোজ পরস্পর দেখা সাক্ষাত করে মত বিনিময় না করা পর্যন্ত ফিরবো না। এ কথার ওপর একমত হয়ে তারা আপন আপন বাড়ীতে ফিরে গেলো। পরে সকাল হয়ে গেলে আখনাস এবনে শোরায়েক লাঠি হাতে আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে গেলো এবং তাকে ডেকে বললো, আচ্ছা, আবু হানযালা (এটা ছিলো তার ডাকনাম), যা কিছু তুমি এ পর্যন্ত শুনেছো সে বিষয়ে তোমার মন্তব্য কী? আবু সুফিয়ান বললো, শোনো হে আবু সা'লাবা,আমি যা শুনেছি তা ঠিকই বুঝেছি এবং এর উদ্দেশ্য কি তাও বুঝেছি, আর এমন আরও কিছু কথা শুনেছি যা আমি বুঝিনি এবং তার উদ্দেশ্য কি তা হৃদয়ংগম করতে পারিনি। তখন আখনাস বললো, আমি এবং ওই ব্যক্তি যার সাথে আমি হলফ করে বলেছি যে এসব কথা প্রকাশ করবো না একইভাবে বুঝছি যা তুমি বুঝেছো। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে এসে সে আবু জেহেলের বাড়ীতে গেলো এবং তাকে বললো, হে আবুল হাকাম, মোহাম্মদের কাছ থেকে যা কিছু শুনেছো–সে বিষয়ে তোমার মতামত কী? সে বললো, তুমি কী শুনেছো? আখনাস বললো, আমরা এবং বনু আবদে মানাফ বংশ মর্যাদা ও ঐশ্বর্য দেখানোর ব্যাপারে প্রতিযোগীতা করেছি, তারা দাওয়াত করে মানুষকে খাওয়ালো, আমরাও লোকদেরকে দাওয়াত করে খাওয়ালাম, তারা যুদ্ধাভিযান চালালো, আমরাও বীরত্বের সাথে যুদ্ধাভিযান চালালাম, তারা মানুষকে দান খয়রাত করলো আমরাও যথেষ্ট লোককে দান খয়রাত করে তাদের সমানে সমানে থাকলাম, তারা হাঁটু গেড়ে বসে মানুষকে বিনয় প্রদর্শন করলো আমরাও বিনয় দেখানোর প্রতিযোগিতায় হার মানলাম না এবং উট ও ঘোড়া সওয়ারীর প্রতিযোগিতায় আমরা তাদের সমান সমান থাকলাম। কিন্তু ওরা বললো, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছে, যার কাছে আকাশ থেকে ওহী আসে, এখন এটা আমরা কোত্থেকে পাবো? আল্লাহর কসম, কিছুতেই এবং কখনোই তাঁর প্রতি আমরা ঈমান আনবো না এবং তাঁকে নবী বলে মানবোও না! বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আখনাস সেখান থেকে উঠে এলো এবং তাকে পরিত্যাগ করলো (ও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললো)।

এভাবেই তৎকালীন কোরায়শ জনগণের প্রকৃতির ওপর অবশ্যই আল কোরআনের প্রভাব পড়তো, কিন্তু তারা, নিজেদের প্রাধান্যকে টিকিয়ে রাখার হীন মানসিকতার কারণে এ প্রভাবকে সর্বদাই প্রতিহত করতো। তবুও তাদের অন্তর আল কোরআনের দিকে অবশ্যই আকৃষ্ট হয়ে থাকতো, যা তারা শত চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারতো না। তাদের নিজ প্রকৃতির বিরুদ্ধে, পার্থিব ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের অপচেষ্টার কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাদের ও রসূলের মাঝে এক অদেখা পর্দা দিয়ে আড়াল সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন, এজন্যে সত্যকে তারা অনুভব করা সত্তেও চোখে দেখতে পেত না, এর ফলে কোরআন থেকে তারা কোনো ফায়দা গ্রহণ করতে পারতো না, আর অনেক সময় তারা কোরআন তেলাওয়াত করা সত্তেও এর থেকে সঠিক পথের সন্ধান (হেদায়াত) নিতে পারতো না। এইভাবে, তাদের অন্তরের ওপর কোরআনের প্রভাবের ব্যাপারে তারা পরস্পর পরামর্শ করতো বটে, কিন্তু অবশেষে কোরআন থেকে দূরে থাকতে হবে, আর শোনা ঠিক হবে না–ইত্যাদি কথা বলাবলি করতো, তবু পুনরায় অজানা এক আকর্ষণে আবার শোনার জন্যে এগিয়ে যেত, আবারও কোরআনের ধারে কাছে ঘেঁষা যাবে না বলে নতুন করে পরামর্শ করতো, শেষ পর্যন্ত আর আসা যাবে না বলে দৃঢ়তার সাথে সংকল্প নিতো এবং পরম আকর্ষণীয় এ পাক কালাম থেকে তাদের হৃদয় মনকে দূরে সরিয়ে নিতো। এই আকর্ষণের কারণ ছিলো এই যে, সমগ্র কোরআনের মধ্যে বারবার ঘুরে ঘুরে এ তাওহীদের আকীদাকেই তুলে ধরা হয়েছে যা তাদের হৃদয়

দুয়ারে প্রচন্ড আঘাত হানতো এবং চাপ সৃষ্টি করতো তাদের বদ্ধমূল ধারণা ও অলীক কল্পনার ওপরে এবং তাদের মেকী শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার মানসিকতার ওপরে কিন্তু তবুও তারা কোরআন থেকে ঘৃণাভরে দূরেই সরে যেতো। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যখন তুমি কোরআন তেলাওয়াত করার মধ্য দিয়ে একমাত্র তোমার রবকেই স্মরণ করো তখন ওরা ঘৃণা ভরে পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়।'

তাদের ঘৃণা ছিলো তাওহীদের প্রতি, কারণ এ ধ্বনি ছিলো তাদের প্রচলিত সামাজিক জীবনের ওপর এক প্রচন্ড শেলের আঘাতের মতো, যার ভিত্তি ছিলো পৌত্তলিকতা ও অন্ধ জাহেলী অনুসরণের ওপর। তা ছাড়া কোরায়শরা তাদের আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে যে অধপতন সৃষ্টি হয়েছিলো সে বিষয়ে ভালভাবেই বুঝত এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর মানুষের মধ্যে যে দৃঢ়তা পয়দা হতো তাও তাদের সামনে ছিলো, মহাগ্রন্থ আল কোরআনের মধ্যে যে সব অজানা রহস্যপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনা এসেছে এবং এর ভাষা ভংগি, আলোচ্য বিষয়সমূহের ব্যাপকতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের যে গভীর রহস্য এর মধ্যে বিদ্যমান এসব কিছু যে তাদের অজানা ছিলো তা নয়। আল কোরআনের এ সম্মোহনী আকর্ষণকে তারা কিছুতেই দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম ছিলো না। এর প্রভাব বলয় থেকেও তারা এড়াতে পারছিলো না এবং যতোই মন থেকে আল কোরআনের কথা ঝেড়ে মুছে ফেলতে চাইতো, ততোবারই তাদের অজান্তে তারা দেখতো কোরআনের কথাগুলো সদা সর্বদা তাদের মনের মধ্যে আনাগোনা করছে এবং কিছুতেই তাদের মন থেকে এসব কথা মুছে ফেলা সম্ভব হচ্ছে না।

আর তৎকালীন মানুষের প্রকৃতি তাদেরকে আল্লাহর কালাম শুনতে এবং এর প্রভাব গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করছিলো, অপরদিকে তাদের অহংকার কোরআনকে মেনে নিতে ও আনুগত্য করতে বাধা দিচ্ছিলো। একারণে তারা রসূলুল্লাহ (স.)-কে নানাভাবে দোষারোপ করে চলছিলো ও তাঁর বিরুদ্ধে নানা প্রকার অপবাদ রটাচ্ছিলো–এতে তাদের স্বার্থ ছিলো নিজেদের বড়ত্ব প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন। এরশাদ হচ্ছে,

'আর ওই যালেমরা বললো, '(তোমরা ত যাদুগ্রস্ত যাদুর স্পর্শ পাওয়া) একজন মানুষেরই অনুসরণ করছো।'

ওপরের এই কথাটিই সাক্ষ্য দেয়, কত গভীরভাবে আল কোরআন তাদের হৃদয়কে প্রভাবিত করতো, আর এই প্রভাবকে এড়ানোর উদ্দেশ্যে ও অন্তর থেকে কোরআনের আকর্ষণ ধুয়ে মুছে ফেলে দেয়ার জন্যে তারা অত্যন্ত বেশী বেশী করে বলতো, 'এটা মানুষের কথা।' কারণ তারা গভীরভাবে অনুভব করতো যে এর মধ্যে মানবীয় শক্তির উর্ধের বেশ কিছু উপাদান রয়েছে, যার কিছু নীরব পদধ্বনি তাদের চেতনার মধ্যে যেন তারা শুনতে পেতো এবং তার নীরব স্পর্শকে তারা যাদু বলে অভিহিত করতো–আর যার মুখ দিয়ে তাদের কাছে কথাগুলো পৌছুত তাকে বলতো সে অবশ্যই একজন যাদুগ্রস্ত মানুষ, অর্থাৎ আল্লাহর কালাম তাদের হৃদয় প্রাণকে এমন গভীরভাবে আকর্ষণ করতো যে দিশেহারা হয়ে গিয়ে তারা কি বলবে ঠিক পেতো না, কখনও বলতো 'এ লোকটি যাদুকর', যার কথা হৃদয়কে মোহিত করে ফেলে। আবার তাকেই যাদুগ্রস্ত বা পাগল বলে লোকদেরকে তাঁর থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করতো, কিন্তু তার ফল হতো উলটা, অর্থাৎ লোকজন আরো বেশী কৌতূহলী হয়ে তাঁর কথা শোনার জন্যে এগিয়ে যেতো। প্রকৃতপক্ষে, এসব লাগামছাড়া কথা দ্বারা নিজেদেরই তারা সাধারণ মানুষের কাছে অস্থির মস্তিস্ক বলে প্রমাণিত করতো, সাথে সাথে কোরআনে পাকের উজ্জ্বলতা বলিষ্ঠতা, যৌক্তিকতা, সত্য মিথ্যার মধ্যে

পার্থক্য দেখানোর যোগ্যতা এর ভাষার মধ্যে ছন্দের গতিময়তা, এর অর্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ও হৃদয়গ্রাহী গাঁথুনী তাদের যেন ডাক দিয়ে বলতো, না, না, এসব বাজে কথা নয়, মোহাম্মদের নিজের তৈরী করা কথাও এসব নয়। অবশ্যই একথাগুলো সে নিজে বলছে না, নিশ্চয়ই একথাগুলো যাদু, কারণ যাদুর স্পর্শ না হলে কোনো মানুষের কথায় এতো শক্তি থাকতে পারে না! তবে, অবশ্যই এটা সত্য কথা, যদি ওরা বিবেচক হতো, ইনসাফ করে কথা বলতো তাহলে বলতে বাধ্য হত যে, 'এগুলো নিশ্চয়ই আল্লাহর কথা, অবশ্যই এগুলো কোনো মানুষের কথা হতে পারে না। এমন কেউও এসব কথা বানাতে পারে না, যাকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন। এরশাদ হচ্ছে,

দেখো কেমন করে ওরা তোমার উদাহরণ দিয়েছে, এর ফলে তারা সঠিক পথ থেকে সরে গেছে, অতপর কিছুতেই তারা আর হেদায়াতের পথে আসতে পারবে না।'

তোমার উদাহরণ দিতে গিয়ে ওরা বুঝাচ্ছে যে, তুমি একজন যাদুগ্রস্ত মানুষ, অথচ অবশ্যই তুমি যাদুগ্রস্ত নও। অবশ্য অবশ্যই তুমি একজন রসূল বিশ্বপ্রভুর বার্তাবাহক কিন্তু তারা সঠিক পথ থেকে সরে গেলো এবং তারা হেদায়াত পেলো না, আর দিশেহারা হয়ে গেলো তারা, যার ফলে তারা এমন পথ পাচ্ছে না যার ওপর দৃঢ়তার সাথে চলতে পারে কখনোই তারা সরল সঠিক পথ পাবে না, পাবে না সন্দেহমুক্ত ও যুক্তিপূর্ণ পথের সন্ধান!

একটি অবধারিত মহাসত্য

এটাই ছিলো আল কোরআন সম্পর্কে তাদের মন্তব্য এবং রসূল (স.) সম্পর্কে তাদের মতামত, অথচ তিনি তো তাদের সামনে আল কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন, কালামে পাক থেকেই তাদেরকে শোনাচ্ছিলেন পুনরুত্থান সম্পর্কে এবং তারা অস্বীকার করছিলো আখেরাতকে; এরশাদ হচ্ছে,

'আর ওরা বললো, আমরা যখন হাড্ডিতে পরিণত হব এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখন কি আবার নতুন এক সৃষ্টি হয়ে উঠে আসব?'........সেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাক দেবেন আর তোমরা তখন তাঁর অনুগত বান্দা হিসাবে, তাঁর প্রশংসা গীতি গাইতে গাইতে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে, আর তোমরা তখন ভাবতে থাকবে যে তোমরা সামান্য কিছু সময়ের জন্যেই (কবরের মধ্যে) অবস্থান করেছিলে।' (আয়াত ৪৯-৫২)

মৃত্যুর পর আবার জীবিত হওয়ার বিষয়টি ছিলো রসূলুল্লাহ (স.) ও মোশরেকদের মধ্যে বিরাট একটি বিতর্কের বিষয়। কোরআনে কারীমে এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন প্রসংগে বিস্তর আলোচনা এসেছে, এর ব্যাখ্যাও অনেকভাবে দেয়া হয়েছে। যার কারণে জীবন ও মৃত্যুর রহস্য সম্পর্কে অনুমান করা যায়, পুনরায় জীবিত হওয়া ও আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়ার বিষয়ে অনুমান করা যায়। এ বিষয়ের ওপর কোরআনে করীম বহুবার আলোকপাত করেছে, কিন্তু ওই হতভাগা জাতি এ ব্যাখ্যাকে সঠিকভাবে ও বিস্তারিতভাবে বুঝতে সক্ষম হয়নি। তাদের কাছে মৃত্যুর পরে আবার জীবিত হয়ে উঠে আসা এবং হাশরের ময়দানে হাযির হওয়ার ব্যাপারটা খুবই কঠিন এবং বড়োই অবোধ্য মনে হচ্ছিলো, কেননা যে দেহ পচে গলে মাটিতে মিশে যাবে, যার কোনো চিহ্নই থাকবে না, তার অণুপরমাণুগুলো আবার একত্রিত হয়ে জীবিত মানুষ আকারে কি উঠে আসবে, এটা কিছুতেই বুঝা যায় না। এজন্যে তাদের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হচ্ছে,

'আর ওরা বলতে লাগলো, আমরা যখন হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাবো, হয়ে যাবো চূর্ণ বিচূর্ণ অস্থি সে অবস্থা থেকে কি আমরা নতুন এক সৃষ্টি হিসাবে আবারও উঠে আসবো?'

এসব লোক পুনরুত্থান সম্পর্কে এতো সন্দিহান হওয়ার কারণ হচ্ছে, তারা কখনো এটা চিন্তা করেনি যে তাদের অস্তিত্ব 'না' থেকে হাতে কেমন করে আসলো–সেটাই যদি সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয়বার জন্ম হওয়া সম্ভব না হবে কেন। প্রকৃতপক্ষে প্রথমবারে অস্তিত্বে আসা ত আরো কঠিন ছিলো। আরো আমাদের চিন্তা করা দরকার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে যখন সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মনে করা হয়, তখন তো একথা বুঝা দরকার যে সবই তাঁর ক্ষমতাধীন, এমন কোনো জিনিস নেই যেখানে তাঁর ক্ষমতা কাজ করে না, অতএব, মহান আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব কিছুই নেই। সব কিছুর ব্যাপারে সৃষ্টি যন্ত্র এবং সৃষ্টিক্রিয়া তো একই, আর তা হচ্ছে যখন বলা হয়, 'হয়ে যাও', আর তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।' একথাটা মানুষের নযরে কঠিন হলেও সৃষ্টিকর্তার কাজে এটা সব সময়ে একইভাবে সহজ। এজন্যে শুধু প্রয়োজন তাঁর এরাদা বা ইচ্ছা।

আসলে এর বিপরীত চিন্তাটাই হচ্ছে আশ্চর্যজনক, এরশাদ হচ্ছে, 'বলো, পাথর অথবা লোহা অথবা তোমাদের অন্তরে এর থেকে আরো কোনো বড় জিনিসও যদি হতে ইচ্ছা করে তাহলে তাই হয়ে যাও।'

হাড় ও চূর্ণ বিচূর্ণ দেহাবশেষের মধ্যে মানুষের গন্ধ পাওয়া যায় এবং এগুলো বলার সাথে সাথে পার্থিব জীবনের কথা মনে পড়ে যায়। অপরদিকে লোহা ও পাথর জীবন থেকে অধিক দূরের জিনিস, এজন্যে তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা পাথর অথবা লোহা হয়ে যাও অথবা অন্য কোনো সৃষ্টি, কিংবা পাথর ও লোহা থেকেও আরো অনেক দূরের জিনিস যা মানুষের কাছে খুব বড় বলে মনে হয়। তবে মনে রেখো তোমরা যাই হওনা কেন পুনরায় তোমাদের উঠতেই হবে। লোহা এমন একটি খনিজ পদার্থ যা অত্যন্ত শক্ত ও বড় জিনিস বলে মানুষ জানে এবং শক্তির প্রতীক হিসাবে এটাকে ব্যবহার করে। এর মধ্যে জীবনের সজীবতা ও বলিষ্ঠতার সন্ধান পাওয়া যায় যা তোমাদের অন্তর অনেকাংশে বুঝতে পারে..... এতদসত্ত্বেও শীঘ্রই আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে (কবর থেকে) তুলবেন।

আসলে যতো চিন্তা করা হোক না কেন আর যতো প্রকার উপমাই দেয়া হোক না কেন, ওরা কখনও পাথর বা লোহা বা আর কিছু হবে না, ওরা মাটির মানুষ মাটিতেই মিশে যাবে এবং সুনির্দিষ্ট দিনে সেখান থেকেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তুলে নিয়ে আসবেন। ওপরে প্রদত্ত উপমাটা দেয়া হয়েছে একটা সীমার মধ্যে মানুষের মন মগযকে সীমাবদ্ধ রাখার জন্যে। এমনিভাবে ওপরের কথার মধ্যে একটি ধমকের সুরও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। পাথর এবং লোহা জড় পদার্থ, যা না পারে অনুভব করতে, আর না পারে কারো ওপর প্রভাব ফেলতে। একথার মধ্যে একটা ইশারা রয়েছে যে মানুষের চিন্তা চেতনার মধ্যে, আংশিক হলেও বন্ধাত্ব এবং পাথরের জড়ত্ব রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'অতপর শীঘ্রই ওরা বলবে, কে আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে? 'অর্থাৎ, আমরা যদি গলিত লাশে পরিণত হয়ে যাই এবং শুধু জীর্ণ শীর্ণ হাড্ডিগুলো অবশিষ্ট থেকে যায়, আর তাও যদি মাটিতে মিশে যায়–সে অবস্থায়-কে আমাদেরকে পুনরায় জীবন দান করবে? যা মৃত্যুর পর এবং জীবনের সকল চিহ্ন মুছে যাওয়ার পর পুনরায় জীবিতাবস্থায় ফিরিয়ে আনা আরো আরো কঠিন হবে না কি? এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, (যিন্দা করে তুলবেন তিনি) যিনি তোমাদেরকে প্রথম বারে সৃষ্টিকরেছেন।'

তারা এ জীবন শেষে পুনরায় উঠে আল্লাহর দরবারে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে যে সন্দেহ করছিলো এবং পচে গলে মাটিতে মিশে যাওয়ার পর পুনরায় জীবিত হয়ে উঠাকে অসম্ভব মনে

করছিলো, তার জবাবে বিস্তারিতভাবে জানানো হচ্ছে, যিনি কারো কোনো অস্তিত্ব না থাকা অবস্থা থেকে অস্তিত্ব দিতে পারলেন, তাঁর পক্ষে পুনরায় অস্তিত্বে ফিরিয়ে আনা কি বড়ই কঠিন হয়ে গেলো? এভাবে তাদের সৃষ্টির গোড়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের বিবেককে আকর্ষণ করছেন এবং বলছেন। যিনি প্রথম বারে সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে পুনরায় তাদেরকে ফিরিয়ে আনা কোনো কঠিন নয়, বরং খুবই সহজ এবং তাদেরকে আবার জীবিত করতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম, কিন্তু এতোসব যুক্তি প্রদর্শন করা সত্তেও এর থেকে তারা কোনো ফায়দা হাসিল করতে পারেনি এবং তারা একথার ওপর দৃঢ়ভাবে আস্থাও স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

(দ্বিধা দ্বন্দ চিত্তে ও অস্বীকার করতে গিয়ে) তারা তোমার দিকে (না সূচক) মাথা নাড়তো।' তারা ওপরে নীচে মাথা দোলাতো, অস্বীকার করতে গিয়েও বিদ্রূপ করে ওরা বলতো ওরা, কখন হবে এটা?' এ প্রশ্ন দ্বারা তারা বুঝাতে চাইতো এটা বহু দূরের এক কল্পনা এবং সুদূর পরাহত এক অবাস্তব চিন্তা। তাই আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'বলো হয়তো খুব শীঘ্রই এটা সংঘটিত হবে।'

অবশ্য এটাও ঠিক, ঠিক কখন এ ঘটনাটা ঘটবে রসূলুল্লাহ (স.) তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারছেন না, তবে এটা ঠিক যে অবশ্যই এটা ঘটবে এবং যতো বিলম্বে এটা ঘটবে বলে তারা মনে করে তার থেকে অনেক কম সময়ের মধ্যেই এটা ঘটবে। ওরা যতোটা ধারণা করতে পারে সম্ভবত তার থেকেও অনেক অনেক তাড়াতাড়ি এটা সংঘটিত হবে। যতোই তারা কেয়ামতের ভয়কে দূরে ঠেলে রাখার চেষ্টা করুক না কেন, এ ব্যাপারে যতো উদাসীনতাই তারা দেখাক না কেন, যতোই অস্বীকার করুক এবং মরার পর পচে গলে মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পরে আবার নাকি জীবিত হয়ে উঠতে হবে– এসব কথা বলে যতো উপহাসই তারা করুক না কেন–এটা ঘটবেই ঘটবে। ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে গিয়ে যখন আজে বাজে কথা বলতে থাকবে, তখন হঠাৎ করেই তাদের কাছে একদিন মৃত্যুদূত (মালাকুল মওত) হাযির হয়ে যাবে। তখন তারা অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে থাকবে বটে, কিন্তু তাতে কোনো ফায়দা হবে না।

এর পরের আয়াতেই সেই দিনের দৃশ্যের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে–যা হঠাৎ করে এসে পড়বে। এটা সংঘটিত হবে সেই দিন, যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন তখন তোমরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাবে এবং তাঁর শক্তি ক্ষমতার কথা ঘোষণা করতে করতে তাঁর ডাকের জবাব দেবে এবং তোমরা ধারণা করতে থাকবে যে–পৃথিবীতে মাত্র সামান্য কিছু সময়ের জন্যেই অবস্থান করেছিলে।' (আয়াত ৫২)

মৃত্যুর পর আবার উঠতে হবে সেই কথাটা অস্বীকারকারীর ডাকে সাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং তাদের জিহবাগুলো আল্লাহর প্রশংসা গীতিতে তখন মুখরিত হতে থাকবে। সে দিন আল্লাহর প্রশংসা ছাড়া কারো মুখে আর কারো কোনো কথা থাকবে না আর কারো কোনো জওয়াবও থাকবে না।

যারা আজকের দিনে আল্লাহকে অস্বীকার করছে, সেদিন তাদের জওয়াব হবে বড়ই আশ্চর্যজনক। তারা বলবে, আলহামুদ লিল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, এছাড়া তাদের আর কোনো জবাব থাকবে না। সে দিন ছায়ার মতই দুনিয়ার জীবন তাদের অনুসরণ করবে এবং তাদেরকে পেছনের কথা স্মরণ করাতে থাববে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তোমাদের কাছে মনে হবে যে তোমরা দুনিয়ার জীবনে অতি সামান্য কিছু সময়ের জন্যে অবস্থান করেছিলে।'

এভাবে দুনিয়া সম্পর্কে তাদের অনুভূতিকে ছবির মত তুলে ধরে মানুষের সামনে পার্থিব জীবনের তুচ্ছতা প্রমাণ করা হচ্ছে, অর্থাৎ বলা হচ্ছে আখেরাতের চিরন্তন জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবন অতি অল্প, অতি তুচ্ছ। সেদিন ক্ষণস্থায়ী এ জীবনের ছায়াও মানুষের স্মৃতিপটে উদিত হবে না, তার অনুভূতির মধ্যে এ তুচ্ছ জীবনের কোনো চিহ্নও থাকবে না। বরং মনে হবে এটা ভুলে যাওয়া একটি মুহূর্ত মাত্র, যা শেষ হয়ে গেছে এবং কোনো দিন ওই হারানো মুহূর্তটিকে তারা ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

দাওয়াতের কাজে মার্জিত ভাষার গুরুত্ব

এরপর আলোচনা ধারা এগিয়ে চলেছে ওই সব মিথ্যা সাব্যস্তকারী ও হঠকারী ব্যক্তিদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে মৃত্যু-পরবর্তী জীবন ও হাশরের ময়দানের অবস্থাকে কেন্দ্র করে। যারা আল্লাহর ওয়াদা ও রসূল (স.)-এর কথাকে ঠাট্টা বিদ্রুপের বিষয় মনে করতো সত্য সঠিক বিষয়গুলো বুঝার পরও তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যেতো, উপহাস বিদ্রুপ করে রসূলুল্লাহ (স.)-কে কষ্ট দিতো, এদের থেকে আলোচনার গতি সরিয়ে নিয়ে আল্লাহর মোমেন বান্দাদের দিকে ইংগিত করে রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলা হচ্ছে যেন তিনি এদেরকে উন্নতমানের আদব কায়দা শিক্ষা দেন, সুন্দরতম মানুষ হিসাবে গড়ে তোলেন এবং তাদেরকে পবিত্র কথা ও মিষ্টি মধুর আচরণ শেখান, যেন সদা সর্বদা তারা ভাল ও কল্যাণকর কথা বলেন। এরশাদ হচ্ছে,

'আর বলো আমার বান্দাহদেরকে যেন তারা সেই কথাই বলে যা সর্বাধিক ভালো। নিশ্চয়ই শয়তান তাদের মধ্যে কুপ্ররোচনা দান করে চলেছে। অবশ্যই সে মানুষের জন্যে প্রকাশ্য দুশমন।'

'আর বল আমার বান্দাদেরকে তারা যেন সর্বোত্তম কথা বলে।'

অর্থাৎ তারা যেন পুরোপুরি ও সাধারণভাবে সবখানেই উত্তম কথা বলে। এমন সুন্দর কথা যেন বলে যা মানুষের কাছে শুনতে ভাল লাগে, মনের ওপর দাগ কেটে যায় এবং হৃদয়ের ওপর মধুর পরশ বুলিয়ে দেয়। এমন কথাকেই শয়তান ভয় পায় এবং সে শক্ত কথা ও কষ্টদায়ক ব্যবহার করতে মানুষকে প্ররোচনা দেয় যেন মানুষের পারস্পরিক মোহব্বত নষ্ট হয়ে যায়, ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং পরস্পর শত্রুতা করতে উদ্বুদ্ধ হয়, আর ভ্রাতৃত্ববোধ পারস্পরিক দরদ সহানুভূতির মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব গড়ে ওঠে। অবশ্যই একথা সত্য যে মিষ্টি-মধুর কথা হৃদয়ের মলিনতাকে দূর করে দেয় অন্তরের ব্যধিকে নিরাময় করে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া থেকে মানুষকে রক্ষা করে এবং পরস্পরকে ভালবাসতে শেখায় এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাগায়। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।'

এ মরদূদ শয়তান মানুষের মুখে মন্দ কথা যুগিয়ে দেয় এবং জিহ্বাকে সঠিক কথা উচ্চারণ করা থেকে সরিয়ে দেয়। যার ফলে মানুষে মানুষে ও ভাইয়ে ভাইয়ে জাগে দুশমনি ও ঘৃণা বিদ্বেষ। অপরদিকে সুন্দর সুমিষ্ট কথা মানুষের সম্পর্কের দূরত্বকে কাছে টেনে নিয়ে আসে, ব্যবধান কমিয়ে দেয় এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে মযবুত বানায়, আর ভাই-এর অপরাধকে মার্জনা করে তাদের পরস্পরের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করে। শয়তানের উস্কানিতে তাদের মধ্যে যে সব দূরত্ব আসতে চায় ভ্রাতৃত্ববোধ সেগুলোকে রোধ করে।

কেয়ামতের অবস্থার এ ছবি তুলে ধরার পর আলোচনার প্রসংগ আবার ফিরে যাচ্ছে ওই হঠকারী জাতির শেষ পরিণতির কথার দিকে-সেদিন তাদেরকে যখন ডাকা হবে তখন তারা আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে জওয়াব দেবে। সেদিন সবার পরিণতি একমাত্র আল্লাহর হাতেই

নিবদ্ধ থাকবে। যাকে তিনি চাইবেন রহম করবেন, আর যাকে চাইবেন শাস্তি দেবেন। তাদের সবাইকে সেদিন আল্লাহর ফয়সালার ওপর ছেড়ে দেয়া হবে। সেদিন রসূলও কারো জন্যে দায়ী থাকবেন না। আজ তিনি তো শুধু বার্তা বাহকই মাত্র, এরশাদ হচ্ছে, 'তোমাদের রব ভাল করেই জানেন তোমাদের সম্পর্কে, তিনি চাইলে তোমাদের প্রতি রহম করবেন, আর চাইলে শাস্তি দেবেন। আর তোমাকে তো আমি, কারো জন্যে জামিন বা অভিভাবক বানিয়ে পাঠাইনি। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর যেখানে যা আছে সে সম্পর্কে তোমার রব ভাল করেই জানেন।'

অতপর, অবশ্যই এটা সত্য যে যাবতীয় জ্ঞানের আধার একমাত্র আল্লাহ। তাঁর পূর্ণাংগ জ্ঞান দ্বারা তিনি সব কিছুর ব্যবস্থা করে থাকেন। তাঁর রহমত দ্বারাই তিনি ঠিক করেন কাকে আযাব দেবেন এবং কাকে করবেন পুরস্কৃত। অবশেষে বলা হচ্ছে, রসূলের কাজ পৌঁছে দেয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ পৌঁছে দেয়া পর্যন্তই তাঁর কাজ শেষ হয়ে যায়, কারণ তিনি তো মাত্র একজন রসূল (বার্তাবাহক মাত্র) আল্লাহ তায়ালা তাঁর পূর্ণাংগ জ্ঞানের দ্বারা সব কিছুর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেন, এই রহমত ও করুণার কারণেই কারো প্রতি রহম করেন আর কাউকে শাস্তি দেন। পৌঁছে দেয়া পর্যন্তই তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পূর্ণাংগ জ্ঞানের মধ্যেই রয়েছে আসমান যমীনের সমস্ত জ্ঞান ভান্ডার–ফেরেশতা, রসূলরা, মানুষ জ্বিন এবং গোটা সৃষ্টিকুল, এসব কিছুর খবর তিনি ছাড়া আর কেউ রাখে না–রাখতে পারে না। কেউ জানেনা কার মূল্য কতটুকু কার মর্যাদা কতটুকু।

আর তাঁর এই সর্বব্যাপী জ্ঞানের দ্বারাই তিনি গোটা সৃষ্টি জগতের কাউকে কারো ওপর মর্যাদা দিয়েছেন-মর্যাদা দিয়েছেন কোনো নবীকে কোনো নবীর ওপর। এরশাদ হচ্ছে,

'আর আমি নবীদের মধ্যে কাউকে অন্য কারো ওপর মর্যাদাবান বানিয়েছি।'

এই যে শ্রেষ্ঠত্ব এর কারণ কি? এর কারণ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ জানেনা এ মর্যাদা দান সম্পর্কে কিছু কথা ইতিমধ্যে 'ফী যিলালিল কোরআন' এর দ্বিতীয় খন্ডে বর্ণিত হয়েছে। সেখানেও আল্লাহর বাণী 'সকল রসূলদের মধ্যে আমি মহান আল্লাহ, কাউকে কারো ওপর মর্যাদাবান বানিয়েছি.... এখানে আবারও সে কথার উল্লেখ করা হচ্ছে,

'আর আমি, দাউদকে যাবুর (কেতাব) দিয়েছি ......' এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নবীর জন্যে এক নিদর্শন এবং অবশ্যই মর্যাদার এক চিহ্নও বটে, কারণ মানুষ তো নির্দিষ্ট একটি সময় পার হয়ে যাওয়ার পর দুনিয়া ছেড়ে যায়, কিন্তু পৃথিবীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত জ্ঞান ভান্ডারের আধার কেতাব থেকে যায় অগণিত মানুষের জন্যে জ্ঞানের উৎস হিসাবে, যা থেকে পরবর্তী লোকেরা উপকৃত হয়।

শেরেকের অসারতা ও তাওহীদের যৌক্তিকতা

এখানেই এ পাঠটি শেষ হচ্ছে। আমরা দেখতে পেয়েছি এ পাঠের মধ্যে আল্লাহর পক্ষে সন্তান গ্রহণ ও কোনো অংশীদার থাকার কথাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে অস্বীকার করা হয়েছে এবং সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একমাত্র আল্লাহর দিকে মনোযোগ দেয়ার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে যে বান্দাদের শেষ পরিণতি সম্পর্কিত জ্ঞান একমাত্র তাঁর কাছেই রয়েছে। যেসব অর্বাচীন, নিজেদের দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের কাছে কাতর মিনতি জানায় এবং মনে করে, আল্লাহর অংশীদার হিসাবে তাদেরও কিছু ক্ষমতা আছে, তাদেরকে চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, চাইলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আযাব দেবেন অথবা তিনি চাইলে অন্য কাউকে আযাব দেবেন। এরশাদ হচ্ছে,

'(হে রসূল তুমি এদের) বলো তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে, তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্যে যাদের কাছে মিনতি জানাও–আসলে কারো দুঃখ দুর্দশা দূর করার মতো কোনো ক্ষমতাই তাদের নেই অথবা তারা তোমাদের দুঃখকে কিছুমাত্র লাঘবও করতে পারে না।'

অতপর একথা স্বতসিদ্ধ যে দুঃখ দুর্দশা দূর করনেওয়ালা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নেই, তিনি তাঁর বান্দাহর জন্যে যা কিছু বরাদ্দ করেন তাই হয়, এর বাইরে কিছু হওয়া সম্ভব নয়।

আর এটা তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে ফেরেশতা, জ্বিন বা মানুষ যাদেরকেই ওরা উপাস্য মনে করুক না কেন এবং যাদেরকেই ওরা ক্ষমতার অধিকারী মনে করুক না, তারা সবাই অন্যান্য সৃষ্টির মতোই আল্লাহরই সৃষ্টি, তারা সবাই আল্লাহর কাছে পৌঁছুনোর জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছে, সবাই তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যে চেষ্টা করে চলেছে এবং যারা আল্লাহর আযাবকে জানে, বুঝে এবং ভয় করে, তারা সবাই সেই আযাবের ভয়ে কম্পমান। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা নিজেরাই তো হচ্ছে সেসব অসহায় ব্যক্তি যারা নিজেরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, তারা আল্লাহর কাছে পৌঁছুনোর জন্যে এবং তাঁর নৈকট্যে ধন্য হওয়ার জন্যে ওসীলা তালাশ করে, ওরা তাঁর রহমত পাওয়ার আশা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে নিশ্চয়ই তাঁর আযাব ভীতিপ্রদ'।

ওদের মধ্যে অনেকে আছে, যারা ওযায়েরকে আল্লাহর পুত্র বলে এবং তাঁর পূজা করে (তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থী হয়ে তাঁর কাছে বা তাঁর মূর্তির সামনে মাথা নত করে) অনেকে ঈসা (আ.) কে আল্লাহর পুত্র বলে অভিহিত করে এবং তাঁর কাছে সাহায্য চায় ও তার পূজা করে, আবার অনেকে আছে যারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে মনে করে এবং তাদের কাল্পনিক মূর্তি তৈরী করে তাদের উপাসনা করে, আর তাদের মধ্যে আরো বহু লোক আছে, যারা এদের ছাড়া অন্যান্য জিনিসের (যেমন গাছ পালা, চাঁদ সূর্য তারা ইত্যাদির) পূজা করে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এদের সবাইকে লক্ষ্য করে বলছেন, এসকল ব্যক্তি ও বস্তু তোমরা যাদেরই পূজা উপাসনা কর না কেন তাদের মধ্যে যাকে তোমরা সব থেকে বেশী আল্লাহর ধন্য কাছে বা নৈকট্য ধন্য মনে কর সেও আল্লাহর কাছে পৌঁছুনোর জন্যে ওসীলা তালাশ করে চলেছে এবং দিবানিশি তাঁর হুকুম পালন করার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য হাসিল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তাঁর রহমত কামনা করছে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করছে। আর অবশ্যই আল্লাহর আযাব বড়ই কঠিন যার থেকে বাঁচার জন্যে সদা সর্বদা হুঁশিয়ার থাকতে হয় এবং সব সময় তাঁকে ভয় করে চলতে হয়, সুতরাং তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়া থেকে বড় জিনিস তোমাদের কাছে আর কি হতে পারে বলো দেখি! আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর যে সব বান্দাদের পূজা উপাসনা তোমরা করছো তারা যে ভাবে আল্লাহর আনুগত্য করেছিলো সেইভাবে তোমরা কেন আল্লাহর হুকুম পালন করছো না? যে ভাবে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির জন্যে চেষ্টা করে গেছেন, তোমরা কেন সেইভাবে তাঁর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির জন্যে চেষ্টা কর না?

এখানে এসে পুনরায় সব ধরনের শেরক-এর অসারতা এবং এসব ভুল বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে। এসব অলীক বিশ্বাসকে বাদ দিয়ে সর্বময় ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে এবং এ আলোচনার সমাপ্তি টানা হচ্ছে এই কথা দিয়ে যে সকল ব্যাপারে তাঁরই আনুগত্য করতে হবে ও তাঁরই মুখাপেক্ষী হতে হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর কোনো জনবসতি এমন নেই, যাদেরকে আমি মহান আল্লাহ কেয়ামতের পূর্বে ধ্বংস না করে ছেড়ে দেব, অর্থাৎ সকল জনপদকেই আমি কেয়ামতের পূর্বে ধ্বংস করে দেব। .... আর যে এই পৃথিবীতে অন্ধ হয়ে থাকবে সে আখেরাতেও অন্ধ হয়ে উঠবে আর বহু দূরে থাকবে সে সঠিক পথ থেকে। (আয়াত ৫৮-৭২)

وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا
شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ
إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ
وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ
بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ
وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا
كَبِيرًا ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ
أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ
لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾

৫৮. এমন কোনো একটি জনপদ নেই যা আমি কেয়ামতের দিন আসার আগেই ধ্বংস করে দেবো না! কিংবা তাদের আমি কঠোর আযাব দেবো না! এসব কথা তো (আমার পাঠানো) কেতাবেই লিপিবদ্ধ আছে। ৫৯. আমাকে (আযাবের) নিদর্শনসমূহ পাঠানো থেকে এ ছাড়া অন্য কোনো কিছুই নিবৃত্ত করতে পারেনি যে, তাদের আগের লোকেরা তা অস্বীকার করেছে; আমি সামুদ জাতিকে দৃশ্যমান নিদর্শন (হিসেবে) একটি উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম, অতপর তারা (আমার) সে (নিদর্শন)টির সাথে যুলুম করেছে; (আসলে) আমি ভয় দেখানোর জন্যেই (তাদের কাছে আযাবের) নিদর্শনসমূহ পাঠাই। ৬০. (হে নবী,) যখন আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার মালিক (তার অপরিমিত জ্ঞানের পরিধি দিয়ে) সব মানুষদের পরিবেষ্টন করে আছেন; যে স্বপ্ন আমি তোমাকে দেখিয়েছিলাম তাকে আমি (আসলে) মানুষদের জন্যে পরীক্ষার (বিষয়) বানিয়ে দিয়েছিলাম এবং কোরআনের (বর্ণিত) অভিশপ্ত গাছটিকেও (পরীক্ষার কারণ বানিয়েছি), (এভাবেই) আমি তাদের ভয় দেখাই, (মূলত) আমার ভয় দেখানো তাদের গোমরাহীই কেবল বাড়িয়ে দিয়েছে!

রুকু ৭

৬১. (স্মরণ করো,) যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সাজদা করো, তখন তারা সবাই (আমার আদেশে) সাজদা করলো, ইবলীস ছাড়া; সে বললো, আমি কি তাকে সাজদা করবো যাকে তুমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো। ৬২. সে বললো, তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছো যাকে তুমি আমার ওপর মর্যাদা দান করলে! যদি তুমি আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দাও, তাহলে আমি অবশ্যই তার (গোটা) বংশধরদের নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসবো, তবে একটি ক্ষুদ্র দল ছাড়া (যারা বেঁচে থাকতে পারবে)।

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا ﴿٦٣﴾ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾

৬৩. আল্লাহ তায়ালা বললেন, যাও, (দূর হয়ে যাও এখান থেকে, তাদের মধ্যে) যারা তোমার আনুগত্য করবে, তোমাদের সবার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম, আর (জাহান্নামের) শাস্তিও পুরোপুরি (দেয়া হবে)। ৬৪. এদের মধ্যে যাকেই পারো তুমি তোমার আওয়ায দিয়ে গোমরাহ করে দাও, তোমার যাবতীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদের ওপর গিয়ে চড়াও হও, ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে তুমি তাদের সাথী হয়ে যাও এবং (যতো পারো) তাদের (মিথ্যা) প্রতিশ্রুতি দিতে থাকো; আর শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। ৬৫. নিসন্দেহে যারা আমার (খাস) বান্দা তাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা চলবে না; (হে নবী,) তোমার মালিক (অবশ্যই তাদের) কর্মবিধায়ক হিসেবে যথেষ্ট। ৬৬. (হে মানুষ,) তোমাদের মালিক তো হচ্ছেন তিনি, যিনি তোমাদের জন্যে সমুদ্রে জলযান পরিচালনা করেন, যাতে করে তোমরা (জলে স্থলে তাঁর প্রদত্ত) রেযেক তালাশ করতে পারো; নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের ওপর পরম দয়ালু। ৬৭. আর (উত্তাল) সমুদ্রের মধ্যে যখন তোমাদের ওপর কোনো বিপদ মসিবত আপতিত হয় তখন আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (ইতিপূর্বে) তোমরা যাদের ডাকতে তারা সবাই (তোমাদের মন থেকে) হারিয়ে যায় এবং (ডাকার জন্যে) এক আল্লাহই (সেখানে বাকী) থেকে যান; অতপর তিনি যখন তোমাদের স্থলে (এনে বিপদ থেকে) উদ্ধার করেন, তখনই তোমরা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও; (আসলে) মানুষ হচ্ছে (নেহায়াত) অকৃতজ্ঞ। ৬৮. তোমরা কি করে নিশ্চিত হয়ে গেছো, তিনি তোমাদের স্থলে এনে (এর কোথাও) তোমাদের গেড়ে দেবেন না, অথবা তোমাদের ওপর (মরণমুখী) কোনো ধূলিঝড় নাযিল করবেন না, (এমন অবস্থা যখন আসবে) তখন তোমরা কোনো অভিভাবকও পাবে না,

أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧١﴾ وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

৬৯. অথবা তোমরা এ ব্যাপারেও কি নিশ্চিত হয়ে গেছো যে, তিনি পুনরায় তোমাদের সেখানে নিয়ে যাবেন না এবং (স্থলে এসে যে আচরণ তোমরা তাঁর সাথে করছো,) তোমাদের (সেই) অকৃতজ্ঞতার শাস্তিস্বরূপ তিনি অতপর তোমাদের ওপর প্রচন্ড ঝড় পাঠাবেন না এবং তোমাদের (উত্তাল) সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবেন না! (আর এমন অবস্থা দেখা দিলে) তোমাদের জন্যে (সেদিন) আমার মোকাবেলায় কোনো সাহায্যকারী পাবে না। ৭০. আমি অবশ্যই আদম সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে আমি ওদের চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং তাদের পবিত্র (জিনিসসমূহ দিয়ে) আমি রেযেক দান করেছি, অতপর আমি অন্য যতো কিছু সৃষ্টি করেছি তার অধিকাংশের ওপরই আমি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

রুকু ৮

৭১. যেদিন আমি প্রত্যেক জাতিকে তাদের নেতাদের সাথে ডাকবো, সেদিন যাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে, তারা (খুশী হয়ে তা) পড়তে শুরু করবে, তাদের ওপর সেদিন বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না। ৭২. যে ব্যক্তি (জেনে বুঝে) এখানে (সত্য থেকে) অন্ধ হয়ে থেকেছে, পরকালেও সে (আল্লাহর নেয়ামত থেকে) অন্ধ থেকে যাবে এবং (হেদায়াত থেকেও) সে হবে পথহারা!

তাফসীর

আয়াত-৫৮-৭২

পূর্ববর্তী পাঠ এই সিদ্ধান্তের সাথে শেষ হয়েছে যে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তাঁর বান্দাদের পরিণতি নির্ধারণকারী। তিনি চাইলে তাদের প্রতি রহম করবেন, আর চাইলে তাদেরকে আযাব দেবেন, আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে বানাওটি উপাস্যদেরকে তারা কার্য উদ্ধার ও সাহায্যের জন্যে ডাকে, প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের কোনো দুঃখ দুর্দশা দূর করতে সক্ষম নয় বা তাদের কষ্ট থেকে কিছু কম করিয়ে দিতেও সক্ষম নয়।

এবারে আলোচনার মোড় ফিরে যাচ্ছে সকল মানুষের শেষ পরিণতির দিকে যার তাকদীরে যা আছে তার পরিণতি তাই হবে এবং এ খবর একমাত্র আল্লাহরই জ্ঞান ভান্ডারের মধ্যে লুকিয়ে আছে। আর এই শেষ পরিণতির অবস্থা হচ্ছে এই যে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে সকল জনপদ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবে অথবা কেউ মারাত্মক কোনো অপরাধ করলে তার ওপর বা ওই জনপদের অংশ বিশেষের ওপর তাদের অপরাধের কারণে শাস্তি এসে পড়বে, কিন্তু কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে সবাইকেই ধ্বংস করে দেয়া হবে। এ ধ্বংস দুই অবস্থার যে কোনো একটির মাধ্যমে আসবে। স্বাভাবিক মৃত্যুর মাধ্যমে অথবা আযাব নাযিল হওয়ার মাধ্যমে, যার কারণে পৃথিবীতে আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।

অতীতের যে সকল জাতির ওপর আযাব নাযিল হয়েছিলো তাদের বর্ণনা প্রসংগে জানানো হচ্ছে যে মোহাম্মদ (স.)-এর পূর্বে বহু জাতিকে, আল্লাহর গযব নাযিল করার মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো এবং সে আযাব এসেছিলো এক অস্বাভাবিক পন্থায়, হঠাৎ করে। কিন্তু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর আগমনের পর ওই ধরনের আকস্মিক আযাব নাযিল করে সামগ্রিকভাবে উম্মতে মোহাম্মাদীকে ধ্বংস করে দেয়া হবে না, কারণ অতীতের জাতিসমূহের কাছে রসূলরা আল্লাহর বাণী নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাঁরা আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন হিসাবে মোজেযা দেখিয়েছেন। কিন্তু ওইসব জনপদের অধিকাংশই আল্লাহর তরফ থেকে তাঁদের আনীত বার্তাকে অস্বীকার করেছে, উপেক্ষা করেছে, নবী রসূলদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং শেষ পর্যন্তও তারা হেদায়াতের পথকে গ্রহণ করেনি, যার ফলে তাদের ওপর ধ্বংস ও বিপর্যয় নেমে আসাটা অবধারিত হয়ে গেছে। উম্মতে মোহাম্মদীর ওপর এই ধরনের সর্বাত্মক ধ্বংস নেমে আসবে না এটা পূর্বেই সিদ্ধান্ত হয়ে রয়েছে, যার কারণে অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কোনো বস্তুগত নিদর্শন উম্মতে মোহাম্মদীর ওপর নাযিল হবে না। অতীত জাতিসমূহের জন্যে অলৌকিক ক্ষমতা (মোজেযা) প্রদর্শন ছিলো তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্যে, কিন্তু মোজেযা দেখার পরও যখন নবীকে তারা মানেনি তখন তাদের ওপর এমন কঠিন ও সর্বাত্মক আযাব নাযিল হয়েছে যে গোটা জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।

কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামীন রসূলুল্লাহ (স.)-কে কাফেরদের মারাত্মক আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছেন, ফলে তারা, চাইলেও তাঁর তেমন বড় কোনো ক্ষতি করতে পারছে না। এরপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন রসূলুল্লাহ (স.) কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে তাঁকে এক অত্যাশ্চর্য বাস্তব সফরের দৃশ্য দেখালেন, যা ছিলো সকল মানুষের জন্যে ঈমানের এক পরীক্ষা স্বরূপ। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্যে প্রেরিত অলৌকিক ক্ষমতার (মোজেযার) মতো কোনো মোজেযা এটা ছিলো না। এরপর, আল্লাহ তায়ালা 'যাককুম' নামক এক ভীষণ তিতা ফল তাদেরকে খেতে দেবেন বলে ভয় দেখিয়েছেন। রসূলুল্লাহ জানিয়েছেন যে তিনি জাহান্নামের গভীরে এ ফলটি দেখেছেন কিন্তু হলে কি হবে এতো বড় হঠকারী ও যালেম ছিলো তাঁর জাতি যে তাঁকে চির সত্যবাদী জানা সত্তেও তাঁর একথাকে তারা উপহাস বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিয়েছে এবং এ ভীতি প্রদর্শন ও তাদের বিদ্রোহাত্মক ব্যবহার ও ক্রোধাগ্নিতে আরো ঈন্ধন জোগানো ছাড়া আর কোনো ফায়দা হয়নি।

এখানে প্রসংক্রমে আদম (আ.)-এর সাথে ইবলিসের কেসসাটা এসে গেছে, এসেছে আল্লাহর নেক বান্দারা ছাড়া আদম সন্তানদের অন্য সবার প্রতি ইবলিস-এর ক্ষমতা খাটানোর অনুমতি

প্রাপ্তির কথা, একথা স্পষ্টভাবে আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর অনুগত ও সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে শয়তানের ক্ষমতা ও জারিজুরি থেকে নিজেই রক্ষা করবেন.........এরপর উল্লেখ করা হয়েছে সেই মূল কারণগুলোকে যা আদম ও বিবি হাওয়াকে শয়তানের ধোঁকায় ফেলে দিয়েছিলো এবং যা মানুষকে কুফরী কাজের দিকে টেনে নিয়ে যায়, অহংকারী বানায় এবং আল্লাহর নিদর্শনগুলোর ওপর চিন্তা ভাবনা করা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

এখানে প্রসংক্রমে আদম সন্তানদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানীর কথা উল্লেখ করে তাদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি মোহব্বত ও আবেগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। পাশাপাশি এই মোহব্বতের সাথে তুলনা করা হচ্ছে ওই অহংকার ও অস্বীকৃতি (কুফরী)কে। যখন মানুষের মধ্যে মন্দ খাসলাতটি পয়দা হয়ে যায় তখন আর তারা কঠিন ও ভীষণ বিপদের মধ্যে না পড়া পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে না। দেখা গেছে, সমুদ্রে ঝড়ের কবলে পড়ে যখন তারা কষ্ট পায় তখন তাঁর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করে, তারপর যখন তিনি তাদেরকে নাজাত দিয়ে স্থলভাগে পৌঁছে দেন তখন তারা আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কিন্তু (এটা তারা ভাবে না) স্থলে বা পানিতে যেখানেই তারা থাকুক না কেন, সবখানে সমানভাবেই তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতে পারেন, আর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সৃষ্টির মধ্যে অনেকের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দিয়েছেন, কিন্তু তারা তাঁর শোকরগোযারি করে না তবে তারা যখন অসহায় হয়ে পড়ে তখন তাঁকে স্মরণ ঠিকই করে।

আলোচনার এ প্রসংগটিকে শেষ করা হচ্ছে কেয়ামতের দৃশ্যগুলোর মধ্য থেকে একটি ভয়াবহ দৃশ্যের বর্ণনা তুলে ধরে। যেদিন তাদের কৃতকর্মের ফল তারা পেতে শুরু করবে, সেদিন কেউ তাদেরকে বাঁচাতে পারবে না একমাত্র পেছনের ভাল কাজের ফলেই তারা রেহাই পেতে পারবে।

'কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই, আমি, সকল জনবসতিকে ধ্বংস করে দেবো অথবা তাদেরকে কঠিন আযাবের মধ্যে তাদেরকে ফেলে দেবো। এটা (আল্লাহর কাছে রক্ষিত) কেতাবের মধ্যে লিখিত রয়েছে।'

আল্লাহ তায়ালা সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করে রেখেছেন যে অবশ্যই তিনি কেয়ামত সংঘটিত করবেন এবং এ যমীনকে সকল প্রাণী থেকে খালি করবেনই, সুতরাং যতোপ্রকার জীবজন্তু ও জীবন্ত যা কিছু আছে, সবাই ওয়াদাকৃত ওই দিনটি আসার আগেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় কাল গুনে চলেছে। এমনি করে যে সকল এলাকাবাসী নানা প্রকার অপরাধের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে, তারাও সবাই আল্লাহর আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাবে একথা আল্লাহর জ্ঞানের পরিধির মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা জানেন যা শীঘ্রই সংঘটিত হবে, আর যা বিলম্বে সংঘটিত হবে। সুতরাং, এটাও সত্য, যা আগেই সংঘটিত হয়ে গেছে এবং যা ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে তা সমানভাবে তিনি জানেন।

মোজেযার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার যে সব নিদর্শন দেখিয়েছেন, হিসাব করে দেখলে যে কোনো লোক বুঝবে যে রসূলদের সমর্থনে এবং ওই পথভ্রষ্ট লোকদেরকে সতর্ক করার লক্ষ্যে প্রেরিত আল্লাহর বাণীগুলোও ওই অলৌকিক নিদর্শনগুলোর অন্যতম। বিভিন্ন যামানায় ও বিভিন্ন দেশে পথভ্রষ্ট ওই সব মানুষ নিজেরা ভুল পথে চলেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তাদের মধ্যেই

লালিত পালিত সবার প্রিয় ও সবার আস্থাভাজন ব্যক্তিদেরকে নিছক নিজেদের স্বার্থহানির ভয়ে, তারা জোর করে মিথ্যাবাদী সাবস্ত করার চেষ্টা করেছে, এর ফল অবশ্যই তাদেরকে ভোগ করতে হবে আর তা হচ্ছে শীঘ্র আযাব নাযিল করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া। জনগণের তরফ থেকে মোজেযা দেখানোর দাবী করায় প্রায় প্রতি যামানাতেই মোজেযা দেখানো হয়েছে, কিন্তু তখনও ঈমান আনতে আগ্রহী ব্যক্তিরা ছাড়া বাকি লোকেরা ঈমান আনেনি। বিভিন্ন যামানার অস্বীকারকারীরা তাদের নিজ নিজ রসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেও আখ্যা দিয়েছে। একারণে শেষ রসূল যখন এলেন তখন, পূর্ববর্তী রসূলদের মতো তাঁর কাছেও সরাসরি এবং তাৎক্ষণিকভাবে মোজেযা দেখানোর দাবী করা হয়েছিলো, কিন্তু তাঁকে এজন্যে ওই ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা বা মোজেযা দেখানোর শক্তি দেয়া হয়নি যে মোজেযা দেখানোর পর ঈমান না আনলে তাদের ওপরও আযাব অবধারিত হয়ে যাবে এবং গোটা জাতি পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। শেষ যামানার এই আযাব উম্মতদের ওপর নাযিল হলে গোটা জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে আর কোনো বার্তাবাহক রসূল আসবে না ফলে আর কোনো দিন দুনিয়ারবাসী হেদায়াতের আলো পাবে না একারণেই মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে সরাসরি কোনো বস্তুগত মোজেযা পাঠানো হয়নি। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর আমি যে আমার নিদর্শনাবলী পাঠাতে বিরত হয়েছি তা এইজন্যে যে পূর্ববর্তীরা এগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং ওদের জ্ঞানের চোখ খুলে দেয়ার জন্যে আমি, সামূদ জাতিকে দিয়েছিলাম একটি উষ্ট্রী, কিন্তু ওরা সে উষ্ট্রীর ওপর অত্যাচার করলো। আর যতো নিদর্শনই আমি পাঠিয়ে থাকি তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের মধ্যে (আমার) ভয় সৃষ্টি করা।'

হাঁ, ইসলামের জন্যে একেবারে কোনো মোজেযা নেই, তা নয় বরং ইসলামের মোজেযা হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কোরআন। এ হচ্ছে এমন এক কেতাব যা জীবনের দুর্গম পথে চলার জন্যে পূর্ণাংগ ও ক্রটিমুক্ত এক শুভ্র সমুজ্জ্বল ব্যবস্থার সন্ধান দিয়েছে এবং মানুষের চিন্তা চেতনা ও অন্তরের কাছে আবেদন জানিয়েছে। সুদৃঢ় মানব প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে আগত জাতিসমূহের কাছে এর দরজাকে সদা-সর্বদা খোলা রেখেছে কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ এ কেতাব পড়তে থাকবে এবং ঈমান আনতে থাকবে। বস্তুগত যে অলৌকিকতা এ কেতাবের মধ্যে দেখা যায় তা হচ্ছে এ কেতাব নাযিল হয়েছে বিশেষ একটি জাতিকে সম্বোধন করে। আর যারা এ কালামকে দেখে, সেই জাতিকে লক্ষ্য করে কথা বলতে গিয়ে সংক্ষিপ্ত করে কথা বলা হয়েছে।

এখন বাস্তবে দেখা যায়, যাদেরকে সরাসরি আল কোরআন সম্বোধন করেছে এবং যারা আল কোরআনকে দেখেছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই ঈমান আনেনি। এখানে দেখা যায়, আল কোরআন উদাহরণ দিতে গিয়ে সামুদ জাতির উদাহরণ দিয়েছে। যাদের মোজেযা প্রদর্শনের দাবী অনুযায়ী তাদের কাছে একটি উটনী পাঠানো হয়েছিলো, তারা একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন বা মোজেযা দেখানোর দাবী করেছিলো। তারপর যখন তাদেরকে এই নিদর্শন দেখান হলো, অর্থাৎ তাদের কাছে মোজেযা স্বরূপ একটি উটনী পাঠানো হলো, তখন তারা সে উঁটনীটিকে হত্যা করে নিজেদের ওপর মারাত্মক যুলুম করে বসলো এবং এ ধরনের ব্যবহার করলে তাদের ধ্বংস করে দেয়া হবে বলে আল্লাহ তায়ালা যে কথা দিয়েছিলেন সে কথাকে তারা সত্যে পরিণত করার ব্যবস্থা করে দিলো, অর্থাৎ তারা ওই নিদর্শনের অবমাননা করলো এবং এর ফলেই তাদের ওপর এমন গযব নাযিল করা হলো যে গোটা জাতি একই সময়ে ধ্বংস হয়ে গেলো। এ নিদর্শনটি পাঠানো হয়েছিলো তাদেরকে সতর্ক করার জন্যে ও ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে, বলা হয়েছিলো তোমাদের দাবী অনুসারে মোজেযা পাঠানো হচ্ছে-এর পরেও যদি নাফরমানী করো এবং নবীর প্রতি ঈমান না আনো তাহলে বিনা নোটিশে তোমাদের ওপর আল্লাহর সর্বাত্মক গযব নাযিল হবে। কিন্তু এ সতর্ক বাণীকে

অগ্রাহ্য করে তারা ঈমান আনা থেকে দূরে থেকে গেলো এবং উটনীটিকে হত্যা করে ওই নিদর্শনের অবমাননা করলো, যার কারণে এসে গেলো ওই সর্বাত্মক ধ্বংসলীলা এবং গোটা জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো।

এ পর্যন্ত গোটা মানব জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে হঠকারী লোকদের দাবী অনুযায়ী যদিও নবী রসূলরা মোজেযা দেখিয়েছেন, কিন্তু তার দ্বারা উপকার থেকে অপকারই হয়েছে বেশী এবং মানবজাতি সাধারণভাবে শেষ রসূলের কাছে অলৌকিক শক্তি (মোজেযা) দেখানোর পক্ষপাতি ছিলো না, কারণ পরবর্তীকালের জাতিসমূহ আর কোনো রসূলের অভিজ্ঞতা পাবে না, এজন্যে পরবর্তীতে আর কোনো অলৌকিক ঘটনার আলোকে বিচার বিবেচনা করার সুযোগও থাকবে না। শেষ নবী মোহাম্মদ (স.)-এর প্রদর্শিত যুক্তি আল কোরআনের ভাষাও তার মধ্যে অবস্থিত জ্ঞানগর্ভ কথাসমূহের সমাবেশ হচ্ছে এমন এক আশ্চর্য বার্তা যা যুগের পর যুগ ধরে মানব মনে দাগ কাটতে থাকবে। মানব মনের এ অনুভূতি এমনই সম্মানজনক এবং এমনই মূল্যবান যা তার মানবতাকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলে, আর এই সত্যানুভূতির কারণেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাকে তাঁর সৃষ্টির অনেকের ওপর সম্পর্কিত করেছেন।

মোহাম্মদ (স.)-এর মোজেযা

বস্তুগত ও ব্যাপক অর্থে মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে মোজেযা না আসলেও তাঁকে হালকা ও মনস্তাত্বিক যে সব মোজেযা দেয়া হয়েছিলো সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো আল কোরআনের ভাষার মাধুর্য, যার বর্ণনা ওপরে দেয়া হয়েছে। এরপর উল্লিখিত হচ্ছে তাঁর কাবা শরীফ থেকে বায়তুল মাকদেসের দিকে সফর এবং মে'রাজ (মহাকাশ সফর) এর ঘটনাকে। প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনা সাধারণভাবে তাদের চোখে দেখা অলৌকিক ঘটনা ছিলো না, বরং এ ছিলো মোমেনদের ঈমানের এক কঠিন পরীক্ষা এবং সাধারণ মানুষের জন্যেও এক বিরাট ও অসাধারণ পরীক্ষা। এরশাদ হচ্ছে,

'আর স্মরণ করে দেখো, ওই সময়ের কথা যখন আমি, তোমাকে বলেছিলাম। অবশ্যই তোমার রব মানুষকে তাঁর জ্ঞানের পরিধির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছেন আর .... কারণ যাকূম বৃক্ষ দোযখের গভীর তলদেশে উৎপন্ন হবে, যার ফল অবিশ্বাসীদেরকে খেতে বাধ্য করা হবে। এ খবরটা কাফেরদের জন্যে একাধারে এক মহা বিপদ-সংকেত বহন করছে এবং একটি বিরাট পরীক্ষাও বটে, কারণ তাদেরই আল আমীনের পবিত্র মুখ থেকে মেরাজের এ খবরটা শুনে বাহ্যিকভাবে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলেও তাদের অন্তরের গভীরে তারা এ কথার সত্যতা অনুভব করছিলো, কিন্তু এর ফলে ভয়ে প্রকম্পিত হওয়া সত্তেও, স্বার্থ ও সামাজিক মর্যাদা হারানোর ভয়ে তারা ঈমান আনতে পারছিলো না। এ জন্যে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ, তাদেরকে (ঐ আযাবের) ভয় দেখাচ্ছি। কিন্তু তাদের দ্বারা ভীষণ বিদ্রোহাত্মক ব্যবহার ছাড়া এ ভীতি প্রদর্শন তাদের কোনো উপকার করতে পারল না।'

মেরাজের ঘটনাটা মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সবার জন্যেই ছিলো এক কঠিন পরীক্ষা। অন্যান্য নবী-রসূলদের আমলে আগত মোজেযা তো ছিলো সরাসরি বস্তুগত জিনিস এবং কাফেরদের জন্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। সে সব মোজেযা মোমেনদের জন্যে কোনো পরীক্ষার জিনিস ছিলো না। কিন্তু কোরায়শদের কাছে আল-আমীন মোহাম্মদের কথা ছিলো এতোই বিস্ময়কর যা মুসলমানদের রসূল (স.)-এর মুখ দিয়ে বের হওয়া সত্তেও, তাদের কাছে এ সত্য বিষয়টাকে মেনে নেয়া বড় কঠিন ব্যাপার ছিলো। এজন্যে এ ঘটনা তাদের জন্যেও ছিলো এক বিরাট পরীক্ষার বিষয়। মহাকাশের সফর সম্পর্কিত বিবরণের এ পরীক্ষায় পড়ে মোমেনদের মধ্যে অনেকে মোরতাদ হয়ে গিয়েছিলো তারা রসূলের ওপর ঈমান আনা সত্তেও, এ কঠিন পরীক্ষায় টিকতে

পারেনি। অবশ্য অনেকে দৃঢ়ভাবে এ ঘটনাকে বিশ্বাসও করেছিলেন বরং তাঁদের ঈমান আরও মযবুত হয়ে গিয়েছিলো। এজন্যে মেরাজের রাতে সংঘটিত সফর এবং এ সফরে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে যে দৃশ্য দেখিয়েছিলেন তাকে তিনি 'ফেৎনাতান লিন্নাসে' (মানবমন্ডলীর জন্যে কঠিন পরীক্ষা) আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ, এটা ছিলো তাদের ঈমান-এর জন্যে এক কঠিন পরীক্ষা। মানুষকে আল্লাহর ঘিরে রাখা বা তাদেরকে তাঁর জ্ঞানের পরিধির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার ব্যাপারটা ছিলো আল্লাহর তরফ থেকে রসূলের সাহায্যের জন্যে এক ওয়াদা। কাফেররা যেন তাঁর দিকে তাদের আক্রমণের হাত তুলতে না পারে তার জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজেই তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাঁর ওয়াদার কথা জানিয়েছেন এবং জানিয়েছেন সেই ওয়াদার কথা যা তিনি তাঁর নবীকে মেরাজের সফরের সময়ে জানিয়েছেন। এই সময়ে তিনি যাককূম বৃক্ষের কথা উল্লেখ করে মিথ্যাবাদী ও সত্যকে অস্বীকারকারীদেরকে ভয় দেখাচ্ছেন, কিন্তু এতদসত্তেও আবু জেহেল তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টায় লেগে থাকল, এমনকি ঘৃণার সাথে এবং তির্যকভাবে সে বললো, আমাদেরকে কিছু খুরমা এবং পনির দাও দেখি, এগুলো তাকে দেয়া হলে সে খেতে খেতে বললো, এগুলোকে যাকূম বানাও দেখি, আমরা তো এগুলোর বাইরে অন্য কিছুকে যাকূম বলে জানি না!

পূর্বে আগত রসূলদের জন্যে যেমন আল্লাহর নিদর্শনগুলো ছিলো মোজেযা এবং সেগুলোকে রেসালাতের প্রতীক বলে গণ্য করা হত, কিন্তু সেগুলো দ্বারা গযব আনা ছাড়া যেমন আর কোনো ফায়দা হয়নি, তেমনি মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (স.)-কে যদি অনুরূপ কোনো অলৌকিক ক্ষমতা বা নিদর্শন দেয়া হতো তাহলে তার দ্বারা আর কী ফায়দা হতো? মেরাজের সফর ও যাককূম বৃক্ষের দ্বারা ভীতি প্রদর্শন তাদের অহংকার ও বিদ্রোহাত্মক ব্যবহারকে কি আরও তীব্রতর করে দেয়নি?

কাফেরদের বিশ্বাস ছিলো আল্লাহ তায়ালা তাঁর আযাব নাযেল করে ওদেরকে ধ্বংস করতে পারেন না বা করবেন না আর এ জন্যে তিনি কোনো মোজেযা নাযেল করেননি। অন্যান্যদেরকে তিনি নিদর্শন বা মোজেযাকে প্রত্যাখ্যান করার অপবাদে ধ্বংস করার এরাদা করেছিলেন বলেই তিনি তা করেছেন কিন্তু কওমে নূহ, কওমে হুদ, কওমে সালেহ, কওমে লূৎ ও কওমে শোয়ায়বকে যেমন করে চিরতরে ধ্বংস করে দিয়েছেন, তেমনি করে তিনি কোরায়শ জাতিকে ধ্বংস করবেন না, বরং তাদেরকে অবশ্যই সময় দিয়েছেন এবং দেবেন ....আর (প্রকৃতপক্ষে) সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্য থেকেও তো পরবর্তীতে অনেকে ঈমান এনেছে। তারা ইসলামের প্রকৃত সৈনিকে পরিণত হয়েছেন এবং সব থেকে সম্ভ্রান্ত ও সত্যনিষ্ঠ মোমেন হিসাবেও পরিচিত হয়েছেন। অপর দিকে কোরআনের ভাব, ভাষা ও ভংগি সব কিছু এ কেতাব নিজেই ইসলামের এক মোজেযা। এ মহান কেতাব কারও দৃষ্টির অন্তরালে নেই—এ কেতাব মোহাম্মদ (স.)-এর কওমের সবার সামনে রয়েছে সদা উন্মুক্ত, পরবর্তীকালের সকল জাতির অধ্যয়নের জন্যেও রয়েছে অবারিত সুযোগ। তাই দেখা যায়, যারা রসূলুল্লাহ (স.)-কে দেখেনি, তাঁর যামানা পায়নি, সাহাবায়ে কেরামের যামানাও পায়নি। তারাও এ পাক কালামের ওপর ঈমান এনেছে। এইভাবে যে কোনো ব্যক্তি পরবর্তীতে ঈমান এনেছে, সে অবশ্যই কোরআন পড়েছে এবং এর মায়াময় বাণীতে মুগ্ধ হয়েছে। এর বাচন ভংগি, শব্দ চয়ন, বর্ণনা মাধুর্য এবং এর মধ্যে অবস্থিত ভাষা শৈলী সব কিছু তাকে এতোই মুগ্ধ করেছে যে তার অন্তরের গভীরে এ কেতাবের জন্যে এবং এ কেতাবের মধ্যে উপস্থাপিত বিষয়াদির জন্যে সে গভীর মোহব্বত অনুভব করেছে, শত বৈরী মনোভাবও এ পাক কালামের আকর্ষণে, আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে। তাতেই তো আমরা দেখতে পাই, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এ পাক কালামের সংস্পর্শে এসে ফারূকে আযম হযরত ওমরের মধ্যে

এক প্রবল ভাবান্তর। অবশ্যই এ মহান কেতাব নাযেল হয়েছে সকল মানবমন্ডলীর হেদায়াতের জন্যে, কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে কুক্ষিগত করে রেখে দেয়ার জন্যে নয়। তাই, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবারই রয়েছে এ কালাম পড়ার অবারিত অধিকার। এই অধিকার নিয়ে, নিজের কেতাব হয়ার দাবী নিয়ে যখন যে কোনো ব্যক্তি এ কেতাব অধ্যয়ন করবে, তার মন বলবে—এ কেতাব তাকেই সম্বোধন করছে, তখন তার অজান্তেই সৃষ্টি হবে এ কেতাবের জন্যে, এ কেতাবের বিষয়াদির জন্যে এক প্রচন্ড আকর্ষণ, এক গভীর ভালোবাসা, আর তখনই সে আহ্বানে সাড়া দিতে সে বাধ্য হবে; তার ঈমান হবে মযবুত এবং তার আমল হবে সুগঠিত, সুসংবদ্ধ, সুসম্পন্ন; আর তখনই সে পেছনের অনেকের তুলনায় ইসলামের জন্যে অনেক বেশী উপকারী বন্ধুতে পরিণত হবে।

মানবজাতির চিরশত্রু

রসূলুল্লাহ (স.) মেরাজের রাত্রিতে যেসব দৃশ্য দেখেছিলেন, সেসব নিগূঢ়তম রহস্য সমূহ অবগত হয়েছিলেন এবং জাহান্নামের গভীর তলদেশে উদ্‌গত যাকুম বৃক্ষ সম্পর্কে জেনেছিলেন যার ফল খেতে আল্লাহর অবাধ্য, আল্লাদ্রোহী ও শয়তানের অনুগামী ব্যক্তিদেরকে বাধ্য করা হবে .....এসব কিছুর মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে মালউন (চির নিন্দিত-বিকৃত ও অভিশপ্ত) শয়তানের সেই সব কারসাজি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিলো যা পথভ্রষ্টদেরকে কখনও ভয় দেখিয়েছে, কখনও অমর হওয়ার কুহকে ফেলেছে, আবার কখনও দুনিয়ার সুখ-সৌন্দর্যে এতো বেশী মাতিয়ে ফেলেছে যে তারা হেদায়েতের পথ থেকে অনেক সুদূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করে দেখো ওই সময়ের কথা, যখন আমি, মহান আল্লাহ, ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলেছিলোম। সেজদা করো আদমকে, অতপর সবাই সেজদা করলো ইবলিস ছাড়া। সে বললো, আমি কি তাকে সেজদা করবো যাকে তুমি সৃষ্টি করেছ মাটি দিয়ে? ....প্রকৃত পক্ষে যারা আমার বান্দাহ, তাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই এবং তোমার রব অভিভাবক ও পরিচালক হিসাবে যথেষ্ট।' আয়াত ৬১-৬৫)

যে সব মানুষ ভুল পথে চালিত হয়েছে তাদের পথভ্রষ্টতার মূল কারণগুলো এ আলোচনা প্রসংগে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। মানুষকে সতর্ক করার জন্যেই এ দৃশ্যটিকে এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যেহেতু তারা গোমরাহীর কারণগুলো দেখতে পাচ্ছে এবং স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে যে ইবলিস তাদের ও তাদের বাপ-দাদাদের দুশমন। সময় থাকতেই তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হচ্ছে যেন তারা তাদের চিরাচরিত হঠকারিতা পরিহার করে!

এরশাদ হচ্ছে,

'আর স্মরণ করে দেখো ওই সময়ের কথা যখন.......মাটি দিয়ে?'

এ কথা দ্বারা আদমের প্রতি ইবলিসের হিংসা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এবং মাটি দ্বারা সৃষ্টি'-এ কথাটি উল্লেখ করায় তার প্রচন্ড হিংসা প্রকাশ পাচ্ছে, অথচ সে ভুলে গেছে যে মাটি দ্বারা সৃষ্টি হলেও তার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা রূহ (প্রাণ) স্থাপন করেছেন। আর যেহেতু ইবলিসকে জানানো হয়েছিলো যে আদমের মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে আরও আছে তার মধ্যে ভুল করার প্রবনতা, এজন্যে সে অহংকারের সাথে বলছে, 'তুমি কি চিন্তা করে দেখেছ ওই ব্যক্তিটি সম্পর্কে যাকে তুমি শ্রেষ্ঠত্ব দিলে আমার ওপর?' '(ঠিক আছে, যখন এমনই করলে তখন) যদি কেয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকার সুযোগ আমাকে তুমি দাও তাহলে (দেখতে পাবে) আমি তার বংশধরদেরকে অবশ্যই গোমরাহ করে ছাড়ব, কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বাদে-যাদের আমি ভুল পথে চালাতে পারবো না। ....অর্থাৎ, ভাল কাজ থেকে আমি তাদের মুখ ফিরিয়ে দেবো, তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করবো, তাদেরকে আমি নিয়ন্ত্রণ করবো এবং আমার অধীনে নিয়ে এসে যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবেই তাদের কাজকে আমি পরিচালনা করবো।

ইবলিস যখন দাবী করে ওপরের কথাগুলো বলছিলো তখন সে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলো যে বাবা আদমের মধ্যে যেমন মন্দের প্রভাব গ্রহণের প্রবণতা আছে, তেমনি তার মধ্যে কল্যাণ ও হেদায়াতের পথ অনুসরণ করার যোগ্যতাও রয়েছে। বিশেষ করে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে তিনি নিজেই তো তার মর্যাদাকে উন্নীত করবেন, তাঁকে সম্মান দেবেন এবং অন্যায় ও ভুল পথ থেকে তাকে বাঁচাবেন, আর তিনি তাদের ওই সব ভুলভ্রান্তি থেকে নযর ফিরিয়ে নেবেন যেগুলো সে ইচ্ছাকৃতভাবে করবে না। মর্যাদাবান বানানোর সাথে সাথে ভুলভ্রান্তি হয়ে যাওয়ার প্রবণতাও এই বিশেষ সৃষ্টির মধ্যে তিনি নিজেই রেখে দিয়েছেন, কিন্তু পাশাপাশি তিনি তাকে এ যোগ্যতাও দিয়েছেন যে ভুল বুঝার পরপরই সে অনুতপ্ত হবে এবং জেনে বুঝে ও ইচ্ছা করে অন্যায় কাজ করবে না এবং অন্যায়ের ওপর জিদ ধরেও থাকবে না-সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই বিস্ময়কর সৃষ্টির প্রকৃতির মধ্যে ইচ্ছা শক্তি ও তার প্রয়োগই এক বিশেষ রহস্যময় জিনিস যা তাকে অন্যান্য সবার ওপর বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে।

অবশ্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর মর্জিতে একথাও এসেছে যে, অন্যায় ও অনিষ্টের দূত ইবলিস মানব জাতিকে অন্যায় পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করতে পারে। সাথে সাথে যারা তার অনুসরণ করবে তাদেরকেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'তিনি বললেন, বেরিয়ে যাও এখান থেকে, যে যে তোমার অনুসরণ করবে, তোমাদের সেই সকল ব্যক্তির জন্যে জাহান্নামই হচ্ছে সমুচিত প্রতিদান।'

অর্থাৎ, ঠিক আছে ওদেরকে বিপথগামী করার প্রচেষ্টা চালানোর স্বাধীনতা তোমাকে দেয়া হলো। এই স্বাধীনতা নিয়ে তুমি তোমার সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাও, তবে তোমার জেনে রাখা দরকার আমার প্রিয়তম সৃষ্টি মানুষকে আমি জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রবল ইচ্ছা শক্তি দ্বারা ভূষিত করেছি, তাদেরকে যে মযবুত ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা দিয়েছে তা ব্যবহার না করে যেমন তারা তোমার অনুগামী হবে তেমনি সে স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে তারা তোমাকে অস্বীকারও করতে পারবে। 'অতপর, ওদের মধ্যে যে কোনো ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করবে' অর্থাৎ , হেদায়াতের পথের তুলনায় যারা যারা ভুল পথের দিকে ঝুঁকে থাকবে, মহা দয়াময় আল্লাহর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে যারা শয়তানের ডাকে সাড়া দেবে, যারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনগুলো থেকে উদাসীন থাকবে এবং রেসালাত সম্পর্কিত আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে ভ্রুক্ষেপ করবে না 'তোমাদের সেই সব ব্যক্তিদের জন্যে রয়েছে জাহান্নাম।' অর্থাৎ, হে অভিশপ্ত শয়তান, তোমার জন্যে ও তোমার অনুসারীদের জন্যে রয়েছে 'জাহান্নামই সমুচিত প্রতিদান।' এরশাদ হচ্ছে,

'এদের মধ্যে যাকেই পারো তোমার কথা দ্বারা গোমরাহ করে দাও। তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তার ওপর গিয়ে চড়াও হও।'

অর্থাৎ, ভুল পথে চালিত করার জন্যে শয়তান যতো প্রকার উপায়-উপকরণ অবলম্বন করতে পারে সে সব পন্থা পদ্ধতিগুলোকে ওপরের কথাগুলোর মাধ্যমে যেন বাস্তব রূপ দেয়া হয়েছে। অন্তর, চেতনা ও বুদ্ধিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করা এসব কথা দ্বারা হয়েছে। আসলে আদম সন্তানদের সাথে শয়তানের সাথে চলছে অবিরত এক কঠিন যুদ্ধ। এ যুদ্ধে শয়তান তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করে চলেছে, যেমন করে বাস্তব কোনো যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় নানা প্রকার অস্ত্র। যেমন কঠিন শব্দ, ঘোড় সওয়ার বাহিনী ও পদাতিক বাহিনী। শব্দের হুংকার ধ্বনিতে শত্রুদেরকে উজ্জীবিত ও উত্তেজিত করা হয় এবং তাদেরকে কেল্লা থেকে বের হয়ে আসতে বাধ্য করা হয়; অথবা প্রচন্ড শব্দের ঝংকারে শত্রু বাহিনীর মধ্যে আতংক ছড়িয়ে দেয়া হয় এবং যখন তারা প্রতিপক্ষের প্রচন্ড শব্দে আতংকিত হয়ে দিক-বিদিক জ্ঞান হারা হয়ে

ছুটোছুটি করতে শুরু করে দেয়, তখন তাদের অশ্বারোহী বাহিনী ঘিরে ফেলে এবং পদাতিক বাহিনীর সৈন্যরা সাক্ষাত আক্রমণে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে থাকে। এরপর এরশাদ হচ্ছে,

'আর তুমি শরীক হয়ে যাও তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে।'

এই 'শরীক হওয়া'-কথাটি জাহেলী যুগে পৌত্তলিকতাপূর্ণ যে সমাজ ছিলো তারই চিত্র তুলে ধরেছে। ওই পৌত্তলিক সমাজের লোকেরা তাদের অলীক ও কাল্পনিক দেব-দেবীদের জন্যে নিজেদের সম্পদের একটি ভাগকে আলাদা করে দিত অনেক সময়ে তাদের নামে অনেক কিছুই উৎসর্গ করতো প্রকৃতপক্ষে ঐটি হতো শয়তানের জন্যে। তারা তাদের সন্তানদের মধ্যে কোনো কোনো বাচ্চাকে দেবতার নামে মানত করতো বা উৎসর্গ করতো, অথবা দেবতার সেবাদাস বানিয়ে দিতো। প্রকৃত পক্ষে এগুলোও হতো শয়তানেরই জন্যে, যেমন বলা হয়েছে, লাত-এর গোলাম, উযযার গোলাম বা মানাত-এর গোলাম, আর কখনও তারা সরাসরি শয়তানের নামেই ছেড়ে দিয়ে সেইভাবে তার নামকরণ করতো; যেমন আব্দুল হারেস।

এমনি করে-হারাম বা অবৈধভাবে অর্জিত ধন-সম্পদ, নাহক ভাবে ব্যয়িত সোনা-দানা-টাকা-পয়সা, অপরাধজনক কাজের জন্যে নিয়োজিত সম্পদ-সম্পত্তি, অন্যায় ও অবৈধভাবে প্রাপ্ত সন্তান ইত্যাদির মধ্যেও শয়তানের জন্যে একটা হিসসা তারা বরাদ্দ করতো।

এসব কিছুর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখা যায়, শয়তানের ভক্তরা তাদের গুরুর সাথে সম্পদ ও সন্তানের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়াকেই কাল্পনিকভাবে জীবনের জন্যে কল্যাণকর ও সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করতো; তারা মনে করতো এই ভাগাভাগির মধ্যে রয়েছে তাদের জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি।

মানুষকে গোমরাহ করার জন্যে ইবলিসকে সব রকমের উপায় উপাদান ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ সবের মধ্যে মানুষকে আবেগমুগ্ধ করে ধোঁকার মধ্যে ফেলার শক্তি শয়তানের এক মোক্ষম হাতিয়ার। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তাদের সাথে তুমি ওয়াদা করো, (হে মোমেনগণ জেনো রেখো) অবশ্যই শয়তানের ওয়াদা ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।' যেমন শাস্তি দেওয়া হবে না প্রতিশোধও নেওয়া হবে না বলে ওয়াদা করা হয়েছে। আবার হারাম উপায় উপকরণ ব্যবহার করার মাধ্যমে স্বচ্ছলতা আসবে এবং ধোঁকাবাজি, মন্দ ব্যবহার ও অসচ্চরিত্রতার মাধ্যমে আসবে বিজয় ও সাফল্য ......।'

আর সম্ভবত সব থেকে অপরাধ ও ভুলভ্রান্তি যাইই করা হোক না কেন এক সময় সব ক্ষমা করে দেয়া হবে। এইই হচ্ছে সেই সুড়ংগ পথ যার ভিতর দিয়ে বহু হৃদয়ের মধ্যে শয়তান প্রবেশ করে, আর এই ধোঁকাপ্রাপ্ত হৃদয়গুলোই তাদেরকে অপরাধ এবং মারাত্মক দোষগুলো করতে উস্কানি দেয়। এমনই দুর্বলতার অবস্থায় তাদের প্রবৃত্তি মন্দ কাজ ও মন্দ ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে যায়, তখন তাদের কাছে অপরাধজনক কাজগুলো সুন্দর ও শোভনীয় মনে হয় এবং তাদেরকে জানায় যে, আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা করার ক্ষমতা এতো প্রশস্ত যার কোনো সীমা নেই! একথা মনে করে অন্যায় কাজ করতে থাকা এবং চিন্তা করা যে তিনি যখন এতো দয়াময় তখন মাফ তো অবশ্যই করবেন। কাজেই আমাদের অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকাতে কোনো অসুবিধা নেই এটাই হচ্ছে অন্যায় কাজ করার জন্যে সুড়ংগ পথ তালাশ করা!

এহেন মানুষের জন্যে আল্লাহর ক থা, যে যে ব্যক্তি তোমার দিকে ঝুকে থাকবে তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে তোমার পথে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনুমতি দেয়া হলো। কিন্তু তুমি এমনও এক দল লোক দেখতে পাবে যার ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা খাটবে না, কারণ তাদের রয়েছে এমন এক মযবুত কেল্লাহ যা তাদেরকে রক্ষা করবে তোমার অশ্ববাহিনী এবং তোমার পদাতিক বাহিনী থেকে।

'অবশ্যই যারা আমার অনুগত বান্দা তাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই-আর অভিভাবক হিসাবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।'

সুতরাং যখন কোনো অন্তর আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায় এবং তাঁর আনুগত্য করার মাধ্যমে তাঁর দিকে ঝুঁকে থাকে, যখন সে বান্দা এমন এক রশি দ্বারা নিজেকে বেঁধে রাখে যা কোনো দিন ছিঁড়বার নয়, যখন সে তার অন্তরের মধ্যে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মোহব্বতের পরশ অনুভব করে এবং দেখতে পায় যে তার গোটা অস্তিত্ব আল্লাহর নূরের আলোয় আলোকিত হয়ে গেছে, তখন আর মরদূদ শয়তানের কোনো জারিজুরিই তার ওপর খাটে না; যেহেতু সে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হয়ে গেছে। অবশ্যই এমন সব আত্মা ঈমানের আলোকে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে ...... তাদের জন্যে 'তোমার রব অভিভাবক হিসাবে যথেষ্ট'। তিনি তাদের বাঁচাবেন, তিনিই তাদেরকে সাহায্য করবেন এবং শয়তানের যাবতীয় ষড়যন্ত্রকে অবশ্যই তিনি বানচাল করে দেবেন।

সদা-সর্বদা শয়তানের প্রতিশ্রুতি এগিয়ে চলেছে, প্রতিনিয়ত সে চেষ্টা করে যাচ্ছে আল্লাহর অনুগত বান্দাদেরকে বশীভূত করার জন্যে; কিন্তু যারা প্রকৃতপক্ষে করুণাময় আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর বান্দা, তাদের ওপর ওর কোনোই ক্ষমতা নেই এবং ভবিষ্যতেও কোনো দিন থাকবে না।

শুধু বিপদে পড়লেই আল্লাহকে স্মরণ করা

এইভাবেই শয়তান মানুষের অকল্যাণের জন্যে অহরহ নানা ফাঁদ পেতে চলেছে, মানুষের কষ্টতেই তার আনন্দ। এরপরও দেখা যায় একশ্রেণীর মানুষ এই শয়তানের অন্ধ অনুসরণ করে চলেছে এবং তার ইচ্ছা অনুযায়ী নিজের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে চলেছে, অপর দিকে আল কোরআনের এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর আহবান ও পথনির্দেশনা তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে, কেননা তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা বড়ই মেহেরবান। তাদের গতিপথকে তিনিই ঠিক করে দেন এবং তাঁর ওপর যারা নির্ভর করে, তিনি নিজেই তাদেরকে পরিচালনা করেন ও তাদের জীবিকা আহরণের পথকে সহজ করে দেন, নাজাত দেন তাদেরকে দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তা থেকে এবং যে কোনো কঠিন অবস্থা ও সংকটে পড়ে যখন তারা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে কাকুতি-মিনতি করে তখন অবশ্যই তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন। এর পরেও দেখা যায়, শয়তানের ধোঁকায় পড়ে অনেক সময় মানুষ আল্লাহর কাছ থেকেও তাঁর নিয়ম-নীতি থেকে দূরে সরে যায় এবং কুফরী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমাদের প্রতিপালক সেই মহান সত্তা, যিনি মহাসাগরের বুকে পরিচালনা করেন জাহাজসমূহকে......আসলে মানুষ চিরদিন বড়ই অকৃতজ্ঞ।'

এখানে এই যে দৃশ্যটি তুলে ধরা হয়েছে তা যে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে বড়ই চমকপ্রদ। কল্পনার চোখে একবার তাকিয়ে দেখুন, উত্তাল তরংগাভিঘাতে মহাসাগর যখন উন্মত্ত-রূপ ধারণ করে আর তার কবলে পড়ে জাহাজের নাবিক ও আরোহীরা যখন, সবার কথা ভুলে গিয়ে কায়মনো বাক্যে সারা বিশ্বের মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে ডাকে, তখন তাদের অন্তরের মধ্যে লুক্কায়িত মূল মালিকের চেতনা আত্মপ্রকাশ করে। তখনই তারা গভীরভাবে বুঝে যে সারা বিশ্বে এক আল্লাহ ছাড়া কোথাও কেউ নেই শক্তি-ক্ষমতার মালিক; সুতরাং এ চরম সংকট কালে আর কারও কথা মনে থাকে না, আপনা থেকে মন বিশ্ব-সম্রাটের দরবারে ঝুঁকে পড়ে। এ উদাহরণটা এমনই হৃদয়গ্রাহী, যা যে কোনো সমুদ্রযাত্রীর মানসপটে ওই সংকটকালের চিত্রটিকে হাযির করে দেয়। অকূল সাগরের বুকে পর্বতময় ঢেউ যখন জাহাজকে পৌঁছে দেয় সমুদ্রবক্ষ থেকে বহু বহু উর্ধে এবং তার পরক্ষণে যখন তাদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় পাতাল পুরীতে, কখনও

এক মাইল নীচে, কখনও তার কাছাকাছি, কখনও তার থেকেও ওপর বা নীচে, তখন যাত্রী ও নাবিকদের মধ্যে জীবনের আর কোনো আশা থাকে না; আর সেই মুহূর্তেই মনের মাঝে আল্লাহর আশ্বাসবাণী 'নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের প্রতি বড়ই মেহেরবান'-আশার ক্ষীণ আলো জ্বালিয়ে দেয়। হতাশার মাঝে আশার এক ক্ষীণ রেখা ফিরে আসে, তখন তাদের মন বলে ওঠে–হে পাক পরওয়ারদেগার, নিজ দয়াগুণে ক্ষমা করে দাও আমাদেরকে আর কখনও তোমার না-ফরমানী করবো না-একথা বলে তারা পুরোপুরিভাবে নিজেদেরকে আল্লাহর হাতে সঁপে দেয়।

অবশ্যই এটা এমন একটা দৃশ্য যা সাধারণভাবে বুঝা খুবই মুস্কিল, একমাত্র সেই ব্যক্তিই এ কথার মর্ম বুঝতে পারে যার জীবনে এই অবস্থায় পড়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে। নৌযানে যে ব্যক্তি সমুদ্র-যাত্রা করেছে সে ওই দৃশ্যের কথা চিন্তা করে প্রকম্পিত হয়। ঝড়ের দাপটে আছড়ে পড়া জাহাজটির অবস্থা যখন তার মনে পড়ে তখন তার মনে জাগে ঢেউয়ের আঘাতে জাহাজটি যেন ছিলো তীব্র বাতাসের মুখে হাঁস-মুরগীর একটি পাখনার মতো।

প্রচন্ড ওই ঝড়ের চিত্র আঁকতে গিয়ে বলা হচ্ছে। এহেন ঝড়ের কবলে যখন কোনো যাত্রীদল পতিত হয়, তখন তাদের কী কঠিন অবস্থা হয়, তার বর্ণনা দান করে জানানো হচ্ছে যে, তখনকার করুণ অবস্থার দৃশ্য পাঠকের মনে এক ভীষণ কম্পন সৃষ্টি করে। পাঠক তখন অনুভব করে যে, তখনকার ওই কঠিন অবস্থা থেকে বেঁচে ফিরে আসা আল্লাহর অপার করুণা ছাড়া কিছুতেই সম্ভব হতো না এবং এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে একমাত্র আল্লাহর অদৃশ্য হাত যেন ওই অবস্থায় জাহাজকে পরিচালনা করে ডাংগার দিকে ফিরিয়ে এনেছে। অবশ্যই তিনি তোমাদের প্রতি মেহেরবান। ওই কঠিন অবস্থায় আল্লাহর রহমতের কথা সহজেই বুঝা যায়।

এরপর সমুদ্র বক্ষে, ঝড়ের কবলে পতিত এক যাত্রীদলের চিত্র তুলে ধরে, কেমন করে শান্ত সাগর উম্মত ঢেউয়ের রূপ গ্রহণ করলো এবং জাহাজের যাত্রীরা ওই কঠিন বিপদ ও পেরেশানীর মধ্যে একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া আর সবাইকে ভুলে গেলো, যাদেরকে স্থলভাগে থাকাকালে সুসময়ে ওরা সাহায্যের জন্যে ডাকতো। এ সময়ে ওরা সর্বান্তকরণে আল্লাহরই দিকে একাগ্রচিত্তে ঝুঁকে পড়েছিলো এবং আর কারোও কথাই তাদের মনে ছিলো না। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ডাকতে সবাই তখন তোমাদের (স্মৃতিপট) থেকে দূর হয়ে গিয়েছিলো।'

কিন্তু হায়, মানুষ তো মানুষই, যখন তার কঠিন দুরবস্থা কেটে যায়, জাহাজ কূলে এসে নোংগর করে, তার পদযুগল মাটির স্পর্শ লাভ করে তুফান থেমে যায় ও বিপদের ঘনঘটা স্তিমিত হয়ে আসে তখন মানুষ ওই ভীষণ করাল গ্রাসের কথা ভুলে যায়, ভুলে যায় ত্রাণকর্তা মহান আল্লাহকে, তখন তার মোহ ও আবেগ তাকে সঠিক বুঝ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, ছেয়ে যায় তার ওপর কুপ্রবৃত্তির তাড়ণ, আর যা কিছু প্রাকৃতিক বিপদ তার বীভৎস রূপ নিয়ে হাযির হয়েছিলো তার স্মৃতিপটে আঁকা সে কঠিন চিত্র ঢাকা পড়ে যায়; এরশাদ হচ্ছে,

'যখন তিনি তোমাদেরকে স্থলভাগের দিকে নিয়ে গিয়ে বিপদমুক্ত করলেন তখন তাঁর থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে। আসলে মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।'

তবে আল্লাহর সাথে যার অন্তর জুড়ে আছে তার হৃদয়ে আল্লাহর নূরের ঝলক সর্বদা পরিস্ফুট হয়ে থাকে এবং সুখে-দুঃখে সর্বদা সে নূর আরও সমুজ্জ্বল হতে থাকে।

এখানকার আলোচনা প্রসংগে সম্বোধন করা হচ্ছে সেই সব ব্যক্তিকে যারা সমুদ্রবক্ষে বিপদসংকুল সফরের অভিজ্ঞতা লাভ করার পর স্থল ভাগে ফিরে এসেছে। তাদের ছেড়ে আসা ওই

বিপদজনক পরিস্থিতি আবার তাদের সামনে তুলে ধরে আল্লাহ তায়ালা তাঁর মেহেরবানীর কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যেহেতু তারা নিরাপদ স্থলভাগে পৌঁছে যাওয়ার পর ফেলে আসা দিনগুলো ভুলে গিয়ে গিয়ে আবার নাফরমানীতে মেতে উঠেছে। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে পানিভাগ ও স্থলভাগ উভয় স্থানের একচ্ছত্র মালিক একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীন। তিনি চাইলে বিপদ যেমন পানিতে আসতে পারে, তেমনি আসতে পারে যমীনেও। বিপদ-আপদ বা নিরাপত্তা সবই আসে তাঁরই ইচ্ছায়। তিনিই নিরাপত্তাদানকারী সর্বস্থানে। চাইলে তিনি যমীনেও বিপদাপন্ন করতে পারেন, আর যদি তিনি পানিতেই কাউকে বিপদ দিতে চান তাহলে তাকে আবার সমুদ্রের বুকে ফিরিয়ে নিতেও সম্পূর্ণ সক্ষম। এসব কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে এ চেতনা দান করা যে সর্বাবস্থায় বিপদ ও নিরাপত্তা উভয়ের মালিক এক আল্লাহ তায়ালা। ভূধরে, সাগরে, শান্ত আবহাওয়ায় বা ঝড় তুফানের সময়ে সদা-সর্বদা তিনিই সব কিছুর নিয়ন্ত্রণকারী। মানুষকে যেমন তিনিই ভাল রাখেন ও নিরাপদ রাখেন মযবুত কেল্লার মধ্যে তেমনি তিনিই তাদেরকে বিপদমুক্ত রাখেন উন্মুক্ত প্রান্তরে–তাঁরই হাতে রয়েছে সকল ক্ষমতার চাবিকাঠি; তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তোমরা কি মনে করো পৃথিবীর স্থলভাগে থাকাকালে যমীনের বুকে বসে যাওয়া থেকে তোমরা নিরাপদ হয়ে গেছ, ... এর পর তোমরা পাবে না, তোমাদের জন্যে আমার কাছে কোনো সাহায্যকারী। (আয়াত ৬৮-৬৯)

অবশ্যই, সর্বাবস্থায় এবং সকল দেশে মানুষ আল্লাহর কব্জার মধ্যে রয়েছে, স্থলভাগে যেমন তারা রয়েছে আল্লাহর মুঠোর মধ্যে, তেমনি রয়েছে তারা তাঁরই হাতে পানিভাগেও। সুতরাং তাঁর পাকড়াও থেকে তারা নিরাপদ হয় কেমন করে? কেমন করেই বা তারা যমীনের মধ্যে ধসে যাওয়া থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করবে, কেমন করে তারা নিরাপদ মনে করবে ভূমিকম্প থেকে বা যমীনের স্থির থাকাবস্থায়? আর এ দুটি অবস্থা যদি নাও হয়, তাহলে আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতার মধ্যে আরও যে সব বিপদজনক অবস্থা রয়েছে সেগুলো থেকেও বা তারা নিজেদেরকে কি করে নিরাপদ ভাববে? অথবা হয়তো এমন হবে যে স্থির শান্ত আবহাওয়া হঠাৎ করে উন্মত্ত হয়ে উঠবে। প্রচন্ড ঝড় তুফান শুরু হয়ে যাবে, শান্ত-শিষ্ট জ্বালামুখ থেকে বেরিয়ে আসবে জ্বলন্ত আগুন-উত্তপ্ত লাভা, গরম পানি ও গলিত পাথর ও নুড়িসমূহ, যা ধ্বংস করে দেবে আশে পাশের সকল জনপদকে ধ্বংস করে ছাড়বে সবকিছুকে, এ প্রলয়ংকরী ধ্বংসযজ্ঞ থেকে একমাত্র তারাই বাঁচতে পারবে যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা নিজ দায়িত্বে হেফাযত করবেন।

অথবা তারা কেমন করে মনে করে যে তাদেরকে আবার সাগরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না এবং পুনরায় তাদেরকে প্রচন্ড ঝড়ের মুখোমুখি হতে হবে না? তাদের কুফুরীর কারণে এবং সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে পুনরায় সাগরের বুকে এমন ঝড়ের মুখোমুখি তারা হবে যা তাদেরকে সহ তাদের জাহাজগুলো ভেংগে চুরমার করে সাগরের অতল তলে ডুবিয়ে দেবে, অতপর এমন কেউ সেখানে এগিয়ে আসবে না, আসার সুযোগ পাবে না, যে বা যারা তাদের ব্যাপারে কাউকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করতে পারে। শোনো হে ভ্রান্ত মানব গোষ্ঠী, মানুষ যে তাদের রব প্রতিপালক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে এবং কুফরী করে, এটার কারণ গাফলতী ছাড়া আর কিছুই নয়, অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন ও তার সুখ সমৃদ্ধি নিয়ে এমনভাবে মানুষ ব্যস্ত হয়ে রয়েছে যে পরবর্তীতে তার কি অবস্থা হবে তা চিন্তা করার কোনো অবসর সে পায় না। তাদের এ গাফলতী ও বেওকুফী এতোদূর পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছে যে এরপরও তারা মনে করে যে তারা সব রকমের

পাকড়াও থেকে এবং আযাব থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। সুখের দিনে তারা আল্লাহর কথা, পরকালের কথা এবং তাদের দুষ্কর্মের পরিণতির কথা চিন্তা করে না-একমাত্র তখনই আল্লাহকে স্মরণ করে যখন ভীষণ কষ্টের মধ্যে পড়ে, কিন্তু যখনই বিপদ থেকে মুক্তি পায় তখনই আল্লাহকে ভুলে যায়। ভাবখানা এই, ব্যস আল্লাহ তায়ালা শেষ বারের মত কষ্ট দিয়ে দিয়েছেন, আর কখনও কষ্ট আসবে না।

সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ

অবশ্যই এটা সত্য যে আল্লাহ তায়ালা এই মানব জাতিকে তাঁর সকল সৃষ্টির ওপর মর্যাদা দিয়েছেন; মর্যাদা দিয়েছেন তাকে আকার-আকৃতিতে, তাকে মাটি দিয়ে তৈরী করে তার মধ্যে ছুটিয়েছেন প্রাণ প্রবাহ। তারপর জ্ঞানে এতো বেশী তাকে ক্ষমতা দিয়েছেন যে পৃথিবীর জলভাগে, স্থলভাগে ও আকাশে বাতাসে, সর্বত্র পরিভ্রমণ করার ও সব কিছু ভোগ ব্যবহার করার অবাধ সুযোগ করে দিয়েছেন।

আবারও দেখুন, তিনি মানুষকে বিভিন্ন যোগ্যতা দিয়ে সম্মানিত করেছেন আর তার প্রকৃতির মধ্যে রেখে দিয়েছেন অফুরন্ত সম্ভাবনার বীজ। সর্বোপরি পৃথিবীর বুকে তাকে আল্লাহর খলীফা হওয়ার যোগ্যতা দান করেছেন। পৃথিবীর বুকে আনে সে নানা প্রকার পরিবর্তন, এক জিনিস ধ্বংস করে অন্য নতুন নতুন জিনিসের পত্তন ঘটায়, আবিষ্কার করে অভূতপূর্ব অনেক কিছু, যার অস্তিত্বই ইতিপূর্বে সে জানতো না, এইভাবে জীবনকে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সে কখনও ভাংগে কখনও গড়ে, আবার নতুন করে ভেংগে-চুরে নতুন জিনিস বানায়।

তাকে মর্যাদাবান বানিয়েছেন প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার ও কাজে লাগানোর ক্ষমতা দিয়ে- আকাশে বাতাসে-অন্তরীক্ষে ও সৌরজগতের বহু উর্ধে পরিভ্রমণের অসাধারণ ক্ষমতাও তাকে আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন।

এইভাবে চিন্তা করে দেখুন, কেমন করে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর সৃষ্টিলগ্নেই ফেরেশতাদের দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়ে গোটা সৃষ্টির ওপর তাঁর মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান ফেরেশতাকুল আদি মানুষ আদমকে সেজদা করে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পর তার মর্যাদার ঘোষণা দিলো।

আর যে কেতাবে মানুষের এই মর্যাদার কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা নাযিল হয়েছে আকাশের সর্বোচ্চ স্তর থেকে ....এ কেতাবই হচ্ছে ....আল কোরআন .... সর্বাধিক পঠিতব্য মহাগ্রন্থ। এ কেতাবে এরশাদ হয়েছে,

'অবশ্যই আমি, মহান আল্লাহ, বনী আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে বহন করে নেয়ার ব্যবস্থা করেছি স্থলভাগে এবং জলভাগে ....আমি তাকে সবোত্তম মর্যাদা দিয়েছি আমার সকল সৃষ্টির ওপর ....।'

'আর তাকে আমি স্থলভাগে ও জলভাগে ওদের চলাচলের জন্যে বাহন দিয়েছি। আল্লাহ তায়ালা যে নিয়ম কানুন চালু করেছেন সেই নিয়ম অনুযায়ীই আল্লাহ তায়ালা স্থল ও জলভাগের সবখানে মানুষ কর্তৃক নানা প্রকার যানবাহনের ব্যবস্থা করেছেন এবং সেগুলোতে মানুষকে আরোহণ করিয়েছেন আর এগুলোকে বানিয়েছেন সম্পূর্ণভাবে তার (মানুষের) জীবনের জন্যে জরুরী এবং তার প্রকৃতি সংগত। এ সমস্ত নিয়ম-কানুন যদি তার প্রকৃতি সংগত না হতো তাহলে পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রকৃতি এতোই দুর্বল ও ভংগুর যে স্থল ও পানিভাগে এতো সব জটীলতাকে আল্লাহর মেহেরবানী ছাড়া তারা কিছুতেই আয়ত্তাধীন

করতে পারতো না। তিনি মানুষকে বড়ই ভালবাসেন, আর এজন্যেই তার প্রয়োজনে বিশ্বের সব কিছুকে তার খেদমতে নিয়োজিত করে দিয়েছেন—এসব কিছুর মধ্যে আল্লাহর অপার করুণাধারা পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর আমি তাদেরকে উত্তম ও পাক-সাফ জিনিস থেকে রেযেক দান করেছি (যা তাদের জীবনকে করেছে সুন্দর ও কল্যাণধর্মী)' ....

কিন্তু হায়, মানুষকে সাধারণভাবে আল্লাহ তায়ালা মোহব্বত করে তাকে যে সব জীবন ধারণের উপায়-উপকরণ দিয়েছেন তা বে-মালুম ভুলে যায়। তাদের মধ্যে অধিকাংশই এসব নেয়ামতের গুরুত্ব বুঝে না এবং এসব কিছু যে আল্লাহরই দান তা মনে করতে চায় না, কিন্তু তখনই তারা আল্লাহ সোবহানাহুর দানের কথা স্মরণ করে যখন এগুলো থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে যায় বা এসব রেযেক তাদের থেকে দূরে সরে যায়—তখন তারা বুঝতে পারে, যে সব নেয়ামতের কথা তারা শুনে এসেছে সেসব নেয়ামতের মূল্য কত বেশী। কাজেই এসব নেয়ামতের যে কোনো একটা হারালেই মানুষ তার মূল্য মনে প্রাণে অনুধাবন করে। কিন্তু বড় তাড়াতাড়িই মানুষ সুদিনে এসব নেয়ামতের কথা ভুলে যায় .... এই যে সূর্য, এই যে বাতাস, এই পানি, এই স্বাস্থ্য ও সুস্থতা, এই শক্তি সামর্থ ও অংগ-প্রত্যংগ সঞ্চালন ক্ষমতা, এই অনুভূতি শক্তি, এই ভালমন্দ বুঝার জ্ঞান-বুদ্ধি, এই সব নানাবিধ খাদ্য খাবার ও রকম বে-রকমের সুপেয় পানীয়, আর সর্বত্র পরিব্যপ্ত মন মাতানো দৃশ্যাবলী....... এসব সর্বত্রই সুবিশাল দৈর্ঘ-প্রস্থ সঞ্চালিত পৃথিবীর প্রতিনিধি এই মানুষই তো; এখানেই রয়েছে সর্বপ্রকার পবিত্র ও মনোরম এতো দ্রব্য সম্ভার যার সংখ্যার কোনো সীমা শেষ নেই। এরশাদ হচ্ছে,

'আর আমি, তাদেরকে মর্যাদা দিয়েছি সারা পৃথিবীর বহু জীবের ওপর। .... এই বিশাল পৃথিবীর বুকে খলীফা হওয়ার কারণেই তাদেরকে আমি সুমহান মর্যাদা দিয়েছি এবং সৃষ্টির সব কিছুকে পরিচালনা করার জন্যে তাদের প্রকৃতির মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার বীজ রেখে দিয়েছি, আর এ কারণেও মানুষ মর্যাদার অধিকারী যে সে নিজের ব্যক্তি সত্ত্বার ওপর পরিচালক, যেখানে প্রবৃত্তির দাসত্ব করার সর্ব প্রকার সম্ভাবনা এবং সুযোগ আছে, সে অবস্থাতেও নিজের ওপর ও নিজের কাজের ওপর সে আমারই দেয়া ক্ষমতাবলে নিয়ন্ত্রণকারী। এটাই সেই সর্বপ্রথম ও সর্ব প্রধান গুণ যার কারণে মানুষ মানুষের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। যে কোনো দিকে ঝুঁকে পড়া ও কুপ্রবৃত্তির তাড়নে যে কোনো মন্দ কাজ করার যোগ্যতা বা সুযোগ থাকা সত্তেও সে আল্লাহর হুকুম মতো নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, আল্লাহর খলীফা হিসাবে নিজের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখে এবং বাস্তব কর্মক্ষেত্রে সে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করে। সুতরাং ইনসাফ বা সুবিচারের দাবী হচ্ছে তার এই কষ্টার্জিত নেক আমল ও একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টির জন্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের উচিত প্রতিদান পাওয়া অর্থাৎ অবশ্যই হিসাব-নিকাশের দিন সে যথার্থভাবে তার মর্যাদা পাবে। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করে দেখো সেদিনের কথা যেদিন আমি সকল জনপদকে তাদের নেতাদের সহকারে ডাকবো....... সে আখেরাতেও অন্ধ হয়ে থাকবে এবং সঠিক পথ থেকে সে অনেক দূরে সরে থাকবে।'

এমন একটি দৃশ্যের ছবি এখানে আঁকা হচ্ছে যার মধ্যে যেন দেখা যাচ্ছে গোটা মানব গোষ্ঠী...... জড় হয়ে রয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে যেন প্রত্যেক জাতিকে তাদের পরিচয়বহ বিশেষ চিহ্ন ধরে ডাকা হচ্ছে, ডাকা হচ্ছে সেই পথের পথিক হিসাবে যে পথে তারা চলতো, অথবা যে

নবীর অনুসারী তারা ছিলো সেই নবীর নাম ধরে তাদেরকে ডাকা হবে, বা দুনিয়ার বুকে যে নেতার অনুসরণ করে তারা জীবন যাপন করে সেই নেতাদের নাম ধরে তাদের অনুসারীদেরকে ডাকা হবে। ডাকা হবে তাদেরকে নিজেদের হাতে তাদের আমলনামা গ্রহণ করার জন্যে এবং ওই আমলনামাতে তাদের যে প্রতিদান প্রাপ্য হিসাবে লিপিবদ্ধ থাকবে তা গ্রহণ করার জন্যে ...... এ সময় যার ডান হাতে কেতাব দেয়া হবে, সে তার কেতাব নিয়ে পড়ে মহা খুশীতে উল্লসিত হবে এবং তখন তাকে তার ন্যায্য পাওনা বুঝে দেয়া হবে, সে পাওনা থেকে তাদেরকে কিছুমাত্র কম দেয়া হবে না, এমন কি খেজুরের দানা বিভক্তকারী যে সূক্ষ্ম সূতার মতো আঁশ আছে, ওই তুচ্ছ আঁশটির মতো সামান্য পাওনাও তাকে কম দেয়া হবে না। আর যে ব্যক্তি সত্য থেকে অন্ধ হয়ে থাকবে অথবা আজ যে চোখ থাকতেও সত্যকে দেখতে পায় না, সেদিনের চুল-চেরা বিচারের দিনেও সে আগের মতোই অন্ধ হয়ে থাকবে, কঠিন এক দেয়াল তুলে দেয়া হবে তার ও সত্যের মাঝে। তার প্রতিদান তো জানাই আছে। কিন্তু ওই কঠিন ভীড়ের মধ্যে সে এমনই অন্ধ হয়ে থাকবে যে কোথায় যাবে সে কিছুই বুঝে উঠতে পারবে না, হয়রাণ পেরেশান হয়ে এদিক ওদিক গুঁতা খেতে থাকবে সেখানে এমন কাউকে পাবে না যে তাকে পথ দেখিয়ে আল্লাহর দরবারে নিয়ে যাবে বা সঠিক পথ-প্রদর্শন করবে। এমনি করে এমন অবস্থায় তাকে সেদিন ছেড়ে দেয়া হবে যে সে কোনো কিছুই স্থির করতে পারবে না, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সেদিন সে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ঘুরে বেড়াবে। কারণ সেদিনকার ওই কঠিন দিনে এইভাবে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানোই হবে নিজেকে জীবদ্দশায় অন্ধ ও পথভ্রষ্ট রাখার এক করুণ পরিণাম। আল্লাহর পাক কালামে ওই অন্তর এ বর্ণনায় অভিভূত হয়ে পড়ে। এজন্যে বুদ্ধিমান মানুষের আজকে বড় প্রয়োজন, সময় থাকতে এ সব আয়াত অধ্যয়ন করা বা কারো মুখ থেকে এ আয়াতগুলো শ্রবণ করা।

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾

৭৩. (হে নবী,) আমি তোমার প্রতি যে ওহী পাঠিয়েছি, তার (প্রচার ও প্রতিষ্ঠা) থেকে তোমার পদস্খলন ঘটাবার ব্যাপারে এরা কোনো প্রকার চেষ্টা থেকেই বিরত থাকেনি, যাতে করে তুমি (ওহীর বদলে) আমার সম্পর্কে কিছু মিথ্যা কথা বানাতে শুরু করো, (যদি তেমন কিছু করতে) তাহলে এরা তোমাকে (তাদের ঘনিষ্ঠ) বন্ধু বানিয়ে নিতো। ৭৪. যদি আমি তোমাকে অবিচল না রাখতাম তাহলে তুমি অবশ্যই তাদের দিকে সামান্য কিছুটা (হলেও) ঝুঁকে পড়তে। ৭৫. (আর এমনটি যদি হতো) তাহলে (এ) জীবনে ও মৃত্যু পরবর্তীকালে আমি তোমাকে দ্বিগুণ (শাস্তি) আস্বাদন করাতাম, অতপর তুমি আমার বিরুদ্ধে তখন কোনোই সাহায্যকারী পেতে না। ৭৬. (হে নবী,) এরা এ ব্যাপারেও কোনো চেষ্টার ক্রুটি করেনি যে, তোমাকে এ ভূখন্ড থেকে উৎখাত করে (এর বাইরে কোথাও ফেলে) দেবে, যদি তেমনটি হতো তাহলে তোমার পরে তারা নিজেরাও (সেখানে) সামান্য কিছুক্ষণই মাত্র টিকে থাকতে পারতো! ৭৭. তোমার আগে আমি যতো নবী রসূল পাঠিয়েছিলাম তাদের ব্যাপারে এই ছিলো আমার নিয়ম, আর তুমি আমার সে নিয়মের কখনো রদবদল (দেখতে) পাবে না।

রুকু ৯

৭৮. (হে নবী,) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত (সময়ের ভেতর) নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং ফজরের সময় কোরআন তেলাওয়াত (জারি রাখবে); অবশ্য ফজরের কোরআন তেলাওয়াত (সহজেই) পরিলক্ষিত হয়। ৭৯. রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ (নামায) প্রতিষ্ঠা করো, এটা তোমার জন্যে (ফরয নামাযের) অতিরিক্ত (একটা নামায), আশা করা যায় তোমার মালিক এর (বরকত) দ্বারা তোমাকে প্রশংসিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবেন।

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ

مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝٨٠ وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ اِنَّ

الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۝٨١ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ۝٨٢ وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى

الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوْسًا ۝٨٣ قُلْ كُلٌّ

يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ۚ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ۝٨٤ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ

عَنِ الرُّوْحِ ۚ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۝٨٥

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا

وَكِيْلًا ۝٨٦ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ۝٨٧ قُلْ لَّئِنِ

৮০. তুমি বলো, হে আমার মালিক (যেখানেই আমাকে নিয়ে যাও না কেন), তুমি আমাকে সত্যের সাথে নিয়ে যেও এবং (যেখান থেকেই আমাকে বের করো না কেন) সত্যের সাথেই বের করো এবং তোমার কাছ থেকে আমার জন্যে একটি সাহায্যকারী (রাষ্ট্র) শক্তি প্রদান করো। ৮১. তুমি বলো সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা (চিরতরে) বিলুপ্ত হয়ে গেছে; অবশ্যই মিথ্যাকে বিলুপ্ত হতে হবে। ৮২. আমি কোরআনে যা কিছু নাযিল করি তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে (তাদের রোগের) উপশমকারী ও রহমত, কিন্তু এ সত্ত্বেও তা যালেমদের জন্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না। ৮৩. যখন আমি মানুষদের ওপর কোনোরকম অনুগ্রহ করি তখন (তারা কৃতজ্ঞতার বদলে আমার দিক থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং (নিজেকে) দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, আবার যখন (কোনোরকম) কষ্ট মসিবত তাকে স্পর্শ করে তখন সে (একেবারে) নিরাশ হয়ে পড়ে। ৮৪. (হে নবী, এদের) তুমি বলো, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ প্রকৃতির ওপর কাজ করে যাচ্ছে; অতপর তোমাদের মালিক ভালো করেই জানেন কে সঠিক পথের ওপর রয়েছে।

রুকু ১০

৮৫. (হে নবী,) এরা তোমার কাছে জানতে চায় 'রূহ' কি (জিনিস), তুমি (এদের) বলো, রূহ হচ্ছে আমার মালিকের আদেশ সম্পর্কিত একটি বিষয়, (আসলে সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে) তোমাদের যা কিছু জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা নিতান্ত কম। ৮৬. (তারপরও) আমি তোমার প্রতি যে (কতোটুকু) ওহী পাঠিয়েছি, যদি আমি চাইতাম তা অবশ্যই তোমার ওপর থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারতাম, আর (তেমন কিছু হলে) তুমি আমার মোকাবেলায় কোনোই সাহায্যকারী পেতে না, ৮৭. কিন্তু (এটা হচ্ছে) তোমার মালিকের একান্ত দয়া; এতে কোনোই সন্দেহ নেই, তোমার ওপর তার অনুগ্রহ অনেক বড়ো। ৮৮. তুমি (তাদের

اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٩٠﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩١﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٢﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٣﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ

এও) বলো, যদি সব মানুষ ও জ্বিন (এ কাজের জন্যে) একত্রিত হয় যে, তারা এ কোরআনের অনুরূপ (কোনো কিছু) বানিয়ে আনবে, তাতেও তারা এর মতো কিছু (তৈরী করে) আনতে পারবে না, যদিও এ ব্যাপারে তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয় (তবুও নয়)। ৮৯. আমি এ কোরআনের মধ্যে মানুষদের (বুঝানোর) জন্যে সব ধরণের উপমা দ্বারা (হেদায়াতের বাণী) বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অমান্য না করে ক্ষান্ত হলো না। ৯০. এরা বলে, কখনোই আমরা তোমার ওপর ঈমান আনবো না, যতোক্ষণ না তুমি আমাদের জন্যে এ যমীন থেকে এক প্রস্রবণ (ধারা) প্রবাহিত না করবে, ৯১. কিংবা তোমার জন্যে খেজুরের অথবা আংগুরের একটি বাগান (তৈরী) হবে এবং তাতে তুমি অসংখ্য নদীনালা বইয়ে দেবে, ৯২. অথবা যেমন করে তুমি (কেয়ামত সম্পর্কে) মনে করো– সে অনুযায়ী আসমানকে টুকরো টুকরো করে আমাদের ওপর ফেলে দেবে অথবা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) ফেরেশতাকে আমাদের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে, ৯৩. কিংবা থাকবে তোমার কোনো স্বর্ণ নির্মিত ঘর অথবা তুমি আরোহণ করবে আসমানে; কিন্তু আমরা তোমার (আকাশে) চড়ার ঘটনাও বিশ্বাস করবো না, যতোক্ষণ না তুমি (সেখান থেকে) আমাদের জন্যে একটি কিতাব নিয়ে আসবে– যা আমরা পড়তে পারবো; (হে নবী,) তুমি (এদের শুধু এটুকু) বলো, মহান পবিত্র (আমার) আল্লাহ তায়ালা, আমি তো কেবল (তাঁর পক্ষ থেকে) একজন মানুষ, (একজন) রসূল বৈ কিছুই নই।

রুকু ১১

৯৪. যখনই মানুষদের কাছে (আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে) হেদায়াত এসেছে তখন তাদের ঈমান আনা থেকে এ ছাড়া অন্য কোনো জিনিসই বিরত রাখেনি যে, তারা বলতো,

اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٤﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ

لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًاۢ بَيْنِيْ

وَبَيْنَكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا ﴿٩٦﴾ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ

وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ

سَعِيْرًا ﴿٩٧﴾ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا

وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٨﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا

لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٩٩﴾

আল্লাহ তায়ালা (আমাদের মতো) একজন মানুষকেই কি নবী করে পাঠালেন! ৯৫. (হে নবী,) তুমি (তাদের) বলো, (যদি এ) যমীনে ফেরেশতারাই (বসবাস করতো এবং তারা এখানে) নিশ্চিন্তভাবে ঘুরে বেড়াতো, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্যে আসমান থেকে কোনো ফেরেশতাকেই নবী করে পাঠাতাম। ৯৬. তুমি বলো, আমার এবং তোমাদের মাঝে আল্লাহ তায়ালাই (আমি মনে করি) সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট, অবশ্যই তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে জানেন, তিনি (তাদের সব আচরণও) দেখেন। ৯৭. যাকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত দান করেন সে-ই (মূলত) হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়, আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন তাদের (হেদায়াতদানের) জন্যে (হে নবী,) তুমি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর অন্য কাউকেই সাহায্যকারী পাবে না; এমন সব গোমরাহ লোকদের আমি কেয়ামতের দিন মুখের ওপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্রিত করবো, এরা তখন হবে অন্ধ, বোবা ও বধির; এদের সবার ঠিকানা হবে জাহান্নাম; যতোবার তা স্তিমিত হয়ে আসবে ততোবার আমি তাকে তাদের জন্যে (প্রজ্বলিত করে) আরো বাড়িয়ে দেবো। ৯৮. এ হচ্ছে তাদের (যথার্থ) শাস্তি, কেননা তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো, তারা আরো বলতো, (মৃত্যুর পর) যখন আমরা অস্থিতে পরিণত হয়ে যাবো ও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবো, তখনও কি আমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবো? ৯৯. এ (মূর্খ) লোকেরা কি ভেবে দেখেনি, আল্লাহ তায়ালা— যিনি আসমানসমূহ ও যমীন পয়দা করেছেন, তিনি এ বিষয়ের ওপরও ক্ষমতা রাখেন যে, তাদের মতো মানুষদের তিনি সৃষ্টি করতে পারেন, (দ্বিতীয় বার) তাদের পয়দা করার জন্যে একটি ক্ষণ তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন— যাতে কোন রকম সন্দেহের অবকাশ নেই; তথাপি এ যালেম লোকেরা (সেদিনকে) অস্বীকার করেই যাচ্ছে।

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّىْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ط

وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿١٠٠﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ فَسْئَلْ

بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى

مَسْحُوْرًا ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

بَصَآئِرَ ج وَاِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ﴿١٠٢﴾ فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ

الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ﴿١٠٣﴾ وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ

اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ﴿١٠٤﴾ وَبِالْحَقِّ

اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ط وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿١٠٥﴾

১০০. (হে নবী,) বলো, আমার মালিকের দয়ার ভান্ডার যদি তোমাদের করায়ত্তে থাকতো, তবে তা ব্যয় হয়ে যাবে এ ভয়ে তোমরা তা আঁকড়ে রাখতে চাইতে, (আসলে) মানুষ (স্বভাবগতভাবেই) অতিশয় কৃপণ,

রুকু ১২

১০১. আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম, অতএব (হে নবী), তুমি স্বয়ং বনী ইসরাঈলদের কাছেই (কথাটা) জিজ্ঞেস করো, যখন সে তাদের কাছে (নবী হয়ে) এসেছিলো, তখন ফেরাউন তাকে বলেছিলো, হে মূসা, আমি মনে করি তুমি একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি। ১০২. (এর জবাবে) সে (মূসা) বলেছিলো, তুমি একথা ভালো করেই জানো, (নবুওতের প্রমাণ সম্বলিত এসব) অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞান আসমানসমূহ ও যমীনের মালিক ছাড়া আর কেউই নাযিল করেননি, হে ফেরাউন, আমি তো মনে করি তুমি সত্যিই একজন ধ্বংসপ্রাপ্ত মানুষ। ১০৩. অতপর সে (ফেরাউন) তাদের (এ) যমীন থেকে উৎখাত করে দিতে চাইলো, কিন্তু আমি তাকে এবং যারা তার সংগী-সাথী ছিলো তাদের সবাইকে (এ না-ফরমানীর জন্যে) সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছি। ১০৪. অতপর আমি বনী ইসরাঈলদের বললাম, (এবার) তোমরা এ যমীনে (নির্বিবাদে) বসবাস করো, এরপর যখন আখেরাতের প্রতিশ্রুতি (-র সময়) আসবে তখন আমি তোমাদের সবাইকে সংকুচিত করে (আমার সামনে) নিয়ে আসবো। ১০৫. এ (কোরআন)-কে আমি সত্য (বাণী) সহকারে নাযিল করেছি, তাই তা সত্য নিয়েই নাযিল হয়েছে; আমি তো তোমাকে কেবল (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি।

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ﴿١٠٦﴾ قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿١٠٩﴾ (সাজদা) قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۭ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١١٠﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ﴿١١١﴾

১০৬. আমি কোরআনকে (ভাগে ভাগে) বিভক্ত করে দিয়েছি, যাতে করে তুমিও ক্রমে ক্রমে তা মানুষদের সামনে পড়তে পারো, আর (এ কারণেই) আমি তা পর পর নাযিল করেছি। ১০৭. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা এ (কোরআন)-কে মানো কিংবা না মানো (তাতে এর মর্যাদা মোটেই ক্ষুণ্ন হবে না), যাদের এর আগে (আসমানী কেতাবের) জ্ঞান দেয়া হয়েছে (তাদের অবস্থা হচ্ছে), যখনি তাদের সামনে এটি পড়া হয় তারা নিজেদের মুখের ওপর সাজদায় লুটিয়ে পড়ে। ১০৮. তখন তারা বলে, আমাদের মালিক পবিত্র, অবশ্যই আমাদের মালিকের ওয়াদা পরিপূর্ণ হবে। ১০৯. আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মুখের ওপর ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে, (মূলত) এ (কোরআন) তাদের বিনয়ই বৃদ্ধি করে। ১১০. তুমি (আরো) বলো, তোমরা (আল্লাহ তায়ালাকে) আল্লাহ (বলে) ডাকো কিংবা রহমান; তোমরা যে নামেই তাঁকে ডাকো, তাঁর সবকটি নামই উত্তম, (হে নবী), চীৎকার করে নামায পড়ো না, আবার তা অতিশয় ক্ষীণভাবেও নয়, বরং (নামায পড়ার সময়) এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করো। ১১১. তুমি আরো বলো, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি কখনো কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কখনোই কারো কোনো অংশীদারিত্ব ছিলো না, না তিনি কখনো দুর্দশাগ্রস্ত হন যে, তাঁর কোনো অভিভাবকের প্রয়োজন হয় (তিনি সব কিছুর উর্ধ্বে), তুমি (শুধু) তাঁরই মাহাত্ম্য ঘোষণা করো– পরমতম মাহাত্ম্য।

তাফসীর

আয়াত ৭৩-১১১

বর্তমানের এই শেষ অধ্যায়টিতে যে বিষয়টির ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে তাই এই সূরার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর সে বিষয়টি হচ্ছে রসূলুল্লাহ (স.)-এর ব্যক্তিত্ব, তাঁর জাতির দৃষ্টিভংগী তিনি আল কোরআন নামক যে পবিত্র কেতাবটি নিয়ে এসেছেন সেই কোরআন এবং সে কোরআনের বৈশিষ্ট্যসমূহ। আলোচ্য অধ্যায়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীন জানাচ্ছেন মোশরেকরা রসূলুল্লাহ (স.)-কে আল কোরআনের মধ্যে অবতীর্ণ কথাগুলোর মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ের প্রতি ইংগীত করে খুবই বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার চেষ্টা করছিলো এবং তারা ষড়যন্ত্র করছিলো রসূলল্লাহ (স.)-কে মক্কা থেকে বের করে দিতে, কিন্তু তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও না না প্রকার কুচক্রের জাল ছিন্ন করে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিরাপদ রাখলেন এবং অতীতে এমনই ষড়যন্ত্রকারীদের ওপর যেসব আযাব নাযেল হয়েছিলো সেই সামগ্রিক আযাব থেকেও তাদেরকে রেহাই দিয়েছেন। তবে তারা যদি রসূলুল্লাহ (স.)-কে দেশ থেকে বের করে দিত তাহলে অবশ্যই তাদেরকে পূর্ববর্তীদের মতো কঠিন আযাবে ঘেরাও হয়ে যেতে হতো। কারণ আল্লাহর নিয়ম বরাবর এটাই থেকেছে যে যখনই কোনো জাতি তাদের রসূলকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে তখনই সামগ্রিক আযাব নাযেল হয়ে তাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর এ নিয়ম চিরদিন একই থেকেছে।

এই জন্যেই আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তিনি তাঁর রব-এর সন্তুষ্টির জন্যে নামায আদায় করতে থাকেন, আল কোরআন পাঠ করেন এবং আল্লাহ তাবারক ওয়া তায়ালার কাছে একথা বলে দোয়া করেন যেন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সত্য সহারে ও মান-ইযযতের সাথে সত্যপ্রিয় অধিবাসী সম্বলিত কোনো স্থানে প্রবেশ করান এবং কোনো এলাকা থেকে যদি বের করেন তাহলেও যেন ইযযতের সাথে বের করে নেন আর তাঁকে যেন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজ ক্ষমতা বলে কোনো রাষ্ট্রীয় শক্তির সহায়তা দান করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আরও নির্দেশ দিচ্ছেন, (বিজয়ী বেশে যখন তিনি পুনরায় নিজ দেশে আগমন করবেন তখন যেন সত্যের বিজয়ডংকা বাজিয়ে দেন এবং অসত্যের পরাজয়ের কথা ঘোষণা করে দেন। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে এটাই হচ্ছে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের শেষ ফল। বান্দা যখন আল্লাহর সাথে এই ভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে তখন তিনি নিজেই হয়ে যান তাঁর সেই মহা অস্ত্র যা তাকে বাঁচায় সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে এবং সাহায্য ও রাষ্ট্রীয় শক্তি তার পেছনে তার যমীন হিসাবে দাঁড়িয়ে যায়।

এরপর আল কোরআনের দায়িত্ব সম্পর্কে কথা আসছে, আর তা হচ্ছে অবশ্যই এ মহাগ্রন্থ একটি আরোগ্য দানকারী ওষুধ সেই সব লোকের জন্যে যারা এ কেতাবকে বিশ্বাস করে, কিন্তু যারা এ পবিত্র কেতাবকে আল্লাহর কেতাব বলে মানে না তাদের জন্যে এ কেতাব হচ্ছে শাস্তি ও প্রতিশোধ গ্রহণের সংবাদ বহনকারী। ওই সব লোকদের সম্পর্কে এ কেতাব জানায় যে দুনিয়াতে যেমন তাদেরকে নানা প্রকার আযাব ভোগ করতে হবে তেমনি আখেরাতেও রয়েছে তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি।

এরপর বলা হচ্ছে যে রহমত ও আযাব এই দুই অবস্থার মধ্যে পতিত হয়ে মানুষের এক শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়, তারা সুদিনে, অর্থাৎ স্বচ্ছলতার অবস্থায় অহংকারী হয়ে যায়, আর এর ফলে এক সময় তাকে হতাশা পেয়ে বসে এবং তার নিজের আপনজন এবং অন্যান্য মানুষও তার

থেকে দূরে সরে চলে যায়। যারা অহংকারপূর্ণ জীবন যাপন করে, দুনিয়ায় তারা মানুষ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় পরিশেষে তার পরকালীন জীবনের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে বড়ই কঠিন শাস্তি।

এরপর জানানো হচ্ছে, যে দুনিয়ায় মানুষ যে জ্ঞান অর্জন করে তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জ্ঞানের কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ–তার কাছে এ কথা পরিস্ফুট হয়ে যায় সেই মুহূর্তে যখন তাদের কাছ থেকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন আসে। এ বিষয়টি বুঝবার জন্যে তাদের শক্তি এতোই দুর্বল যে কিছুতেই তারা এ বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে কিছু বুঝতে পারে না, এ কারণে তাদেরকে শুধু এতোটুকু জানানো হচ্ছে যে এ রহস্যপূর্ণ জিনিস হচ্ছে আল্লাহর গোপন রহস্য ভান্ডারের মধ্যে একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয় যার অবস্থা ও প্রকৃতি কোনো মানুষের পক্ষে কিছুতেই বুঝা সম্ভব নয়। এ রহস্য দ্বারা সঠিকভাবে উন্মোচিত হয়েছে একমাত্র আল্লাহর রসূলের কাছে, তাও এতে রসূলের নিজের কোনো কৃতিত্ব নেই। আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করে তাঁকে জানিয়েছেন, তাই তিনি কিছু জানেন, ইচ্ছা করলে যে কোনো সময়ে তাঁকে প্রদত্ত এ জ্ঞান এবং এ মর্যাদা আল্লাহ তায়ালা তুলে নিতে পারেন, যার কোনো প্রতিকার তিনি করার যোগ্যতা রাখেন না। রসূল (স.)-এর এ জ্ঞান অবশ্যই তাঁর প্রতি আল্লাহর খাস রহমত।

আল কোরআন একটি চিরন্তন মোজেযা

এরপর জানানো হচ্ছে যে এ মহাগ্রন্থ আল কোরআন এমন এক কঠিন ও সুরক্ষিত দূর্গ যার সুকঠিন প্রাচীর ডিংগিয়ে কোনো মানুষ বা জ্বিন এর মধ্যে অবস্থিত কোনো বিষয়ের কোনো ক্ষতিই করতে পারে না। আর তারা সবাই মিলেও যদি অনুরূপ কোনো কেতাব রচনা করতে চায় তাও তারা কোনো দিন পারবে না। অনুরূপ কোনো জ্ঞানগর্ভ কথা আনতে পারবে না যুক্তি-প্রমাণ এবং সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে আল কোরআনে যে খবর দিয়েছে তার মতো নিশ্চিত কোনো খবরদানকারী কোনো খবর দিতে পারবে না মানব রচিত অন্য কোনো গ্রন্থ থেকে। এটা তৎকালীন মানুষেরা যথাযথভাবেই বুঝেছিলো। তবুও কোরআন কোরায়শ কাফেরদের কোনো কাজে আসেনি এবং তারা কোনো ফায়দাই এ কেতাব থেকে গ্রহণ করতে পারেনি। এ জন্যেই দেখা যায়, তারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে মোজেযা দেখানোর জন্যে বারবার দাবী জানিয়েছে। তাদের দাবী, সাধারণ মানুষের বোধগম্য জিনিস দ্বারা মোজেযা দেখাতে হবে, যেমন পৃথিবীতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করা, অথবা স্বর্ণের ঘর তৈরী করে দেয়া, তারা জিদ ধরেছে এমন কিছু করতে যা সাধারণ মানুষ করতে পারে না, যেমন তাদের সামনে আকাশে উড়তে হবে এবং ধরা-ছোঁয়া যায় আকাশ থেকে এমন কোনো পুস্তক নামিয়ে আনতে হবে যেন তা দেখে দেখে তারা পড়তে পারে অথবা এসব করতে চাইলে বা না পারলে আকাশের কোনো একটা টুকরো কেটে এনে দিতে পারলে তা দিয়ে তাদেরকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলুক–এইভাবে তাদের জিদ ও কুফরী বাড়তেই থাকলো এবং এতো বেশী বেড়ে গেলো যে তারা আল্লাহ তায়ালা ও ফেরেশতাদেরকে তাদের সামনে নিয়ে আসার জন্যে দাবী করে বসলো।

আর এখানে কেয়ামতের দৃশ্যাবলীর মধ্যে থেকে এমন একটি দৃশ্য পেশ করা হচ্ছে যে যার দ্বারা তাদের ভয়ানক পরিণতি ছবির মতো ফুটে উঠেছে, আর এ পরিণতি আসবে তাদের ভুল ও অন্যায় পথে জিদ ধরে টিকে থাকার প্রতিদান হিসাবে, আখেরাত অস্বীকার করার কারণে এবং 'হাড্ডি ও দেহের অংশগুলো ভেংগে চুরমার হয়ে মাটিতে মিশে যাওয়ার পর পুনরায় জীবিত হতে হবে'–এটাকে উপেক্ষাও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার শাস্তি স্বরূপ।

ওদের এসব নানা প্রকার প্রস্তাবের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে আন্তরিকতা ছিলো না, বরং জিদের বশবর্তী হয়ে তারা এই তাচ্ছিল্যপূর্ণ প্রস্তাবগুলো দিচ্ছিলো। তারা আল্লাহর রহমতের ভান্ডারও যদি পায় তবুও তাদের মধ্যে যে মানবীয় দুর্বলতা ও সংকীর্ণতা আছে তার কারণে তাদের সর্বদা ভয় লেগে থাকে যে, এসব সম্পদ ফুরিয়ে যাবে এবং ফুরিয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না! এ সংকীর্ণতার কারণে তাদের চাহিদার কোনো শেষ নেই এবং তাদের বিভিন্ন প্রকার দাবী-দাওয়ারও কোনো সীমা নেই।

মক্কার কোরায়শদের মোজেযা দেখানোর এসব অযৌক্তিক দাবী-দাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অতীতের সেই মোজেযাগুলোর কথাও উল্লেখ করা হচ্ছে যা মূসা (আ.)-এর কাছে এসেছিলো। এতোসব মোজেযা দেখা সত্তেও তাকেও তো ফেরাউন ও তার জাতি মিথ্যাবাদী বানিয়ে ছেড়েছিলো, যার পরিণতি হয়েছিলো এই যে আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী, নবীদের মিথ্যাবাদী বানানোর সাজাস্বরূপ তাদের ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো।

অতীতের মোজেযার মতো মোজেযা মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (স.)-কে না দেয়া হলেও তাঁকে দেয়া হয়েছে আল কোরআন, যা সকল কেতাবের আসল রূপ, নির্ভুল, নির্ভেজাল, অপরিবর্তনীয় ও সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সন্দেহের উর্ধ্বে, যার প্রতিটি কথা, ভাষার সৌন্দর্য, অর্থের ব্যাপকতা, হৃদয়গ্রাহী বর্ণনাভংগী ও যার মধ্যে বিদ্যমান আবেগপূর্ণ সুরের মূর্ছনা যে কোনো পাঠক বা শ্রোতার মন গলিয়ে দেয়। কিন্তু সমগ্র কোরআন একই সময়ে এবং একই সাথে নাযেল হয়নি বরং প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণে নাযেল হয়েছে। আর এ কেতাবের যথার্থতা বুঝতে পেরেছে বিশেষভাবে সেই সব বিশ্বাসী মানুষ যারা পূর্বের কেতাবগুলো থেকে প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছে, এ কারণে যখনই তারা এ কেতাবের কথা জানতে পেরেছে, সংগে সংগে তারা সাক্ষ্য দিয়েছে, মেনে নিয়েছে এবং বিনয় নম্রতার সাথে আত্মসমর্পণ করেছে।

পরিশেষে, এ সূরাটি জানিয়েছে যে রসূলুল্লাহ (স.) নিজে সর্বান্তকরণে ও একাগ্রচিত্তে আল্লাহর দাসত্ব করে চলেছেন, তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা প্রকাশের কাজে সদা-সর্বদা মগ্ন রয়েছেন। সূরাটি যেভাবে আল্লাহর গুণগান দিয়ে শুরু হয়েছিলো সেইভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

আয়াতের দিকে আবারও একবার খেয়াল করুন,

আমি তোমার প্রতি যে ওহী পাঠিয়েছি তার প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় পদস্খলন ঘটাবার ব্যাপারে এরা কোনোপ্রকার চেষ্টা থেকেই বিরত থাকেনি। যাতে করে ....এই ছিলো আমার নিয়ম। আর তুমি আমার সে নিয়মে কোনো রদবদল দেখতে পাবে না। (আয়াত ৭৪-৭৮)

বাতিলের সাথে আপোষের পরিণতি

বর্তমান আলোচনার মধ্যে দেখা যয়য, রসূলুল্লাহ (স.)-কে তাঁর দ্বীন থেকে বিচ্যুত করার জন্যে মোশরেকদের নানা প্রকার অপচেষ্টার বিবরণ। এ সব তৎপরতার মধ্যে প্রথম বিষয়টিই হচ্ছে, তাঁর কাছে যে ওহী নাযেল হয়েছে সেই ওহীর ব্যাপারে তাঁর মনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়া, যাতে করে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তিনি কিছু মিথ্যা কথা তৈরী করে বলে ফেলেন; অথচ তিনি তো সেই মহান ব্যক্তি যাকে সবাই সাদেকুল আমীন–অবিসংবাদিত সত্যবাদী–মহা আমানতদার বিশ্বস্ত খেতাব দিয়েছিলো।

বিভিন্নভাবে তারা এই অপচেষ্টা চালিয়েছিলো ....এসব নিকৃষ্ট তৎপরতার মধ্যে একটি ছিলো তাঁর সাথে এ ব্যাপারে দরকষাকষি করা যে ওদের বাপদাদার ও ওই সব দেব-দেবীদের সমালোচনা ও তাদের প্রতি কটাক্ষ করা বন্ধ করতে হবে তাহলে তারা তাঁর মনিব আল্লাহর হুকুম পান করবে। আর একটি শর্ত তারা আরোপ করেছিলো, তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা যে পবিত্র

ঘরটিকে নিরাপদ স্থান বলে ঘোষণা করেছিলো, তাদের ঘরগুলোকেও সেই ঘরের মতোই পবিত্র ও নিরাপত্তার স্থান ও পাক-পবিত্র বলে ঘোষণা দিতে হবে। উপরন্তু তাদের আর একটি দাবীও মেনে নিতে হবে যে তাদের বিশেষ বিশেষ নেতৃবৃন্দকে যে বৈঠকে ডাকা হবে সেখানে সাধারণ গরীব-মিসকীন লোকেরা বসতে পারবে না। কারণ ....এতে তাদের মান-সম্ভ্রম নষ্ট হয়,-নেতৃবৃন্দের এমন বে-ইযযতী মেনে নেয়া যায় না।

এ সম্পর্কে আল কোরআনে কোনো ফয়সালা দেয়া হয়নি, বরং তাদের দাবীগুলোর দিকে ইংগীত করা হয়েছে মাত্র। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যের ওপরে মযবুতির সাথে টিকে থাকার জন্যে রসূলুল্লাহ (স.)-কে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তাঁকে অযৌক্তিক ও অন্যায় কাজ থেকে বাঁচানো। আসলে, যেভাবে তারা ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতেছিলো, তাতে আল্লাহ তায়ালা যদি তাঁকে সত্যের পথে টিকে থাকার জন্যে নিজে দৃঢ়তা না দিতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যেতেন এবং ওদের দিকে ঝুঁকে পড়তেন, যার ফলে তারা তাঁকে নিজের বন্ধু বানিয়ে নিতো এবং মোশরেকদের দিকে ঝুঁকে পড়ার ফলে মোশরেকদের ফাঁদে তাঁর পা দেয়া হয়ে যেতো, আর এর অর্থ দাঁড়াতো দুনিয়া ও আখেরাত-উভয় স্থানেই তিনি দ্বিগুণ আযাবের অধিকারী হয়ে যেতেন এবং সে অবস্থায় আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানোর মতো কোনো সাহায্যই ওই সব দেব -দেবীরা করতে পারতো না।

এইসব নানাবিধ ষড়যন্ত্র থেকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-কে বাঁচিয়েছিলেন। এসব চক্রান্তকারীরা ছিলো তৎকালীন সমাজে শক্তিশালী ও সব রকমের ক্ষমতার অধিকারী, এরা দাওয়াতদানকারীদের বিরুদ্ধে সর্বদা অসৎ তৎপরতায় লিপ্ত ছিলো। সত্যের দাওয়াত থেকে বিরত রাখার জন্যে ওরা মানুষকে নানাভাবে উস্কানি দিতো এবং অবশ্যই তাদের উস্কানিতে কিছু না কিছু লোক তো প্ররোচিত হতোই-তা সংখ্যায় তারা যতো কমই হোক না কেন, এমনকি এ দাওয়াতে সাড়া দানকারীদেরকেও তারা নানা কুপরামর্শ দিয়ে তাদের দৃঢ়তা নষ্ট করার চেষ্টা করতো, যার ফলে তারা যুদ্ধে যোগ দিয়ে বহু মালে গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) লাভ করা থেকে পেছনে থেকে যাওয়াকেই বেশী পছন্দ করতো। ইসলামী দাওয়াত থেকে পিছিয়ে রাখার জন্যে ওই সব কাফেররা অন্য যে সব চক্রান্ত করতো তা হচ্ছে, তারা মানুষকে বুঝাতো-ওসব ঝামেলার মধ্যে গিয়ে কী হবে! অপর দিকে শক্তি ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিরা ইসলামী দাওয়াতকে পুরোপুরি গ্রহণ করতো না, বরং তারা সত্য-মিথ্যার মাঝামাঝি একটা পথ বেছে নিতো, কারণ এটাকেই তারা সহজ পথ মনে করতো এরা ছিলো বেশী চালাক, সত্য-মিথ্যা কখন কোনটার বিজয় হয় কে জানে, কাজেই সবার সাথে সম্পর্ক রাখা দরকার, যাতে যেদিকেই বিজয় আসুক না কেন তারা যেন সুযোগ না হারায়-এই ছিলো তাদের অন্তরের মধ্যে যুক্তি। প্রকৃত পক্ষে এই চোরাপথে বহু সৎ চিন্তাশীল, এমনকি ইসলামী-দাওয়াত গ্রহণকারী বহু মানুষকে শয়তান বিপথগামী করতে সফল হয়েছে। এরা এতেই কল্যাণ মনে করেছে যে ইসলামী জীবন যাপনের মধ্যে কিছু ক্ষতি স্বীকার করেও ক্ষমতাসীনদের কাছাকাছি থাকাটাই শ্রেয়।

কিন্তু চিরদিনের জন্যেই একথা মনে রাখতে হবে, সত্য পথে প্রবেশের প্রথম ধাপে এতোটুকু পদস্খলন বা ঢিলেমি শেষ পরিণতিতে সত্য থেকে মানুষকে এতো বেশী দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় যে সেখান থেকে ফিরে আসার আর কোনো উপায় থাকে না। আর ইসলাম গ্রহণকারী যে কোনো ব্যক্তি একবার অন্যায়ের সাথে আপোষ করতে রাযি হয়ে গেলে, সে ধীরে ধীরে অন্যায়ের সর্বগ্রাসী ছোবলের মধ্যে পড়ে যায়। কারণ, ছোটো বা বড়ো যে কোনো অন্যায়ের কাছে আত্মসম্পর্ণ করলে

মানুষের মনের বল শুধু দুর্বলই হয় না, বরং আস্তে আস্তে একেবারেই নষ্ট হয়ে যায় এবং একবার পরাজয় স্বীকার করার পর সত্যের পথে দৃঢ় হয়ে থাকা, তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না এবং আল্লাহর সাহায্য থেকেও সে বঞ্চিত হয়ে যায়।

আসলে নবীর আহ্বান ছিলো দ্বীন ইসলাম-এর দাওয়াতকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা, কিন্তু যে ব্যক্তি একবার নীতিভ্রষ্ট হয়ে যায়, তা সে যতো ছোটো কারণেই হোক না কেন, অথবা কোনো ব্যক্তি যখন সত্যের ব্যাপারে সামান্যতম আপোষও করে বসে বা চুপ থেকে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে চায় তখন প্রকৃতপক্ষে সে ঈমানের হক আর আদায় করতে পারে না। একজন মোমেন দ্বীন-এর দাওয়াতের ছোটো বড়ো প্রতিটি বিষয়কে সমধিক গুরুত্ব দেয়, দ্বীনের কাজের কোনোটিই তার কাছে ছোট বা তুচ্ছ নয়, তার কাছে কোনোটা অত্যাবশ্যকীয় বা বেশী জরুরী এবং কোনোটা নফল তা নয়। সে গভীরভাবে অনুভব করে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কোনো কথা এমন নয় যে তা উপেক্ষা করা যেতে পারে! দ্বীনের নিয়ম-কানুন সবগুলোই পরিপূর্ণ ও পূর্ণাংগভাবে মানুসের জীবনের প্রয়োজনগুলো মেটানোর ব্যাপারে নিয়োজিত এবং প্রতিটি বিষয় পরস্পরের সাথে এমন অংগাংগিভাবে জড়িত যে এগুলোর কোনো একটি বাদ দিলে অপরগুলোর কার্যকারিতা ক্ষুণ্ন হয়–এতে বুঝা যায় ইসলামী বিধান একটি আর একটির ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং, ইসলামের সৌন্দর্য ও শান্তি পেতে হলে এর প্রত্যেকটি বিধান একই সাথে চালু হতে হবে; মানুষের তৈরী যে কোনো কারখানায়ও দেখা যায়, প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশ অপর যন্ত্রাংশের ওপর নির্ভরশীল–এদের একটি বন্ধ হলে অপরগুলো আর কর্মক্ষম থাকতে পারে না। চিরদিন পৃথিবীর বুকে একই নিয়ম চলে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও এই একই নিয়ম চলবে বলে বুঝা যায়। ক্ষমতাসীন ব্যক্তি সত্যের নিশান বর্দারদেরকে পর্যায়ক্রমে ও ধীরে ধীরে বশীভূত করতে চায়; তারা সত্য পথের পথিকদের সামনে নানা প্রকার লোভের টোপ ফেলে। এমনই কোনো লোভনীয় জিনিসের কাছে যখন কোনো মোমেন আংশিকভাবে হলেও আত্মসমর্পণ করে বসে তখন তার ভাবমূর্তি একধাপ নেমে যায়, তার মর্যাদা ও তার দুর্ভেদ্যতা হ্রাস পায় এবং শক্তিদর্পীরা বুঝে ফেলে যে আর একটু দর কষাকষি করলে বা লোভনীয় জিনিসের মাত্রা আর একটু বাড়িয়ে দিলে এইসব নীতিবান (?)দেরকে খরীদ করতে আর বেগ পাওয়ার কথা নয় এবং তারা নিশ্চিন্ত হয়ে যায় যে, পর্যায়ক্রমে ক্রমবর্ধমান দরকষাকষির মাধ্যমে এদেরকে পুরোপুরি বশীভূত করে ফেলা যাবে!

এই ভাবে বাতিল শক্তিল প্রস্তাবের অংশবিশেষ মেনে নেয়া– হোক সে পূর্ণাংগ ইসলামের তুলনায় অতি সামান্য বিষয়, কিন্তু তা অন্যায় অপশক্তির বিজয়ের পথকেই ত্বরান্বিত করে। এই প্রক্রিয়ায় দ্বীন বিকিয়ে দেয়অর মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ওপর তাদের প্রভাব ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। অপর দিকে সত্যের নিশান বর্দাররা যখন অন্যায় অপশক্তির সাথে কোনো ব্যাপারে আপোষ করে তখন তারা আত্মিকভাবে মরে যায়–আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন হয় বঞ্চিত। অথচ প্রকৃত মোমেনরা তো তাদের দাওয়াতের প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে; কিন্তু যখন পরাজয় একবার হামাগুড়ি দিয়ে কারও ঘরে ঢুকে পড়ে তখন সে পরাজয়ের গ্লানিকে ধুয়ে মুছে ফেলে আবার বিজয়ের কেতন ওড়ানো সম্ভব হয় না।

এ কারণেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর রসূলদের প্রতি তাঁর এহসান–এর কথা স্মরণ করিয়ে মোমেনদেরকে মযবুত হওয়ার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছেন। বলছেন, যা কিছু আল্লাহ তাবারক ওয়া তায়ালা তাঁর রসূলের ওপর নাযেল করেছেন, তিনি যেন তার ওপর পুরোপুরি মযবুত হয়ে থাকেন, তাহলেই তিনি তাদেরকে মোশরেকদের ফেৎনা ও চক্রান্ত থেকে রক্ষা করতে পারবেন।

যেমন করে অতীতে করেছেন। তিনি রসূলুল্লাহ (স.)-কে পেছনের কথা স্মরণ করাতে গিয়ে বলছেন যে এ পর্যন্ত তাঁকে কাফেরদের যাবতীয় আক্রমণ থেকে শুধু রক্ষাই করেছেন তা নয়, বরং ওই সমাজের শক্তিমান ব্যক্তিদেরকে একে একে টেনে এনে তার পদতলে রেখে দিয়েছেন এবং তাঁর সংগী-সাথীতে পরিণত করেছেন। অতপর সংখ্যায় তারা তুলনামূলকভাবে কম হলেও আল্লাহর রহমতধন্য হয়ে ওই সব ব্যক্তি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে গেছেন ইস্পাত কঠিন প্রাচীরের মতো—অপর দিকে মোশরেকদের ওপর এসেছে দুনিয়া ও আখেরাতের আযাব হারিয়েছে তাদের সমর্থক ও সাহায্যকারীদেরকে এবং তারা ক্রমান্বয়ে নেমে এসেছে।

মোশরেকরা যখন রসূল (স.)-কে তাদের কথা মেনে নিতে বাধ্য করতে পারলো না তখন তাঁকে নানাভাবে ভয় দেখাতে শুরু করলো যেন তিনি মক্কা ছেড়ে পালিয়ে যান। কিন্তু তিনি তাদের ভয়ে বা তাদের খাহেশ মতো মক্কা ত্যাগ করলেন না। দীর্ঘ তের বছর অবিরাম গতিতে দাওয়াতী কাজ চালাতে থাকলেন। তারপর যখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিলেন, তখন সেই নির্দেশ পালনের জন্যে তিনি মদীনায় হিজরত করে চলে গেলেন, গেলেন যখন তিনি জানতে পারলেন যে কোরায়শরা কখনোই তাকে ধ্বংস করতে পারবে না। কারণ সর্বান্তকরণ তিনি চাইছিলেন যেন কোরায়শরা সামগ্রিকভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়। তিনি জানতেন যে, তাঁর দেশবাসী তাঁকে দেশ থেকে বের করে দিলে তারা সামগ্রিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে, যেহেতু পূর্ববর্তী উম্মতরা নবীদেরকে বহিষ্কার করার কারণে একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো। আরও তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে তিনি হিজরত করে চলে গেলে তাঁর দেশবাসী ধীরে ধীরে এবং অচিরেই ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়বে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ কথার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলছেন,

'আর তখন তোমার বিরোধী লোক (মক্কার বুকে) খুবই কম সময়ই থাকতে পারতেন।'এটাই হচ্ছে আল্লাহর নিয়ম; যা অবশ্যই একদিন চালু হবে,

'(হে রসূল) তোমার পূর্বে, আমি, যে রসূলদেরকে পাঠিয়েছি তাদেরও নিয়ম ছিলো এটাই; আর তোমরা আমার এ নিয়মের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না।'

আল্লাহর নবীকে বহিষ্কার করলে আযাব নাযেল হওয়া এক আল্লাহরই এমন এক নিয়ম যা চিরদিন একই অবস্থায় এবং অপরিবর্তিত অবস্থাতেই আছে ও থাকবে।এ নিয়মের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হবার নয়। কারণ রসূলদের ঘরছাড়া করা—এমন এক মহান অপরাধ যার চূড়ান্তও সমুচিত শাস্তি হওয়াই বাঞ্ছনীয় (কেননা রসূলরা বিশ্ব সম্রাটের বিশিষ্ট প্রতিনিধি। তাঁদেরকে দেশান্তর করার অর্থ হচ্ছে খোদা আল্লাহকে তাঁর রাজ্যের মধ্যে অপমান করা—যেহেতু রসূলদেরকে স্বার্থান্ধরা আল্লাহর খাস প্রতিনিধি বলে জানতো ও বুঝতো তা সত্তেও তাঁদের প্রতি ওই অরিণামদর্শী ও অহংকারী কাফেররা ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের কারণে দুর্ব্যবহার করতে দ্বিধা করতো না—এমতাবস্থায় তাদেরকে সাজা না দেয়ার অর্থ হত আল্লাহর ক্ষমতার কথা প্রমাণ করা। সুতরাং এ মহাবিশ্বে আল্লাহর অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম অপ্রতিহতভাবে চলবেই চলবে; কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্যে বা বিশেষ কারণে যে নিয়ম থেমে যেতে পারে না—এমন কেউ নেই, বা কোথাও এমন কিছু নেই যা এ নিয়ম-বিধানের স্বাভাবিক গতির মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে। এখন আখেরী নবীর মোহব্বতেই হোক বা শেষ ও চূড়ান্ত নবীর উম্মতদেরকে শেষ সুযোগ দেয়ার জন্যেই হোক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা চাননি যে সর্বগ্রাসী আযাব এসে নবী (স.)-এর জাতিকে সামগ্রিকভাবে ধ্বংস করে দিক। যে মহান নবী শুধু তাঁর নিজ জাতির জন্যেই কাঁদেন নাই, তিনি

কেঁদেছেন বিশ্ব মানবতার জন্যে যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তায়েফের পথ-প্রান্তরে রক্তাক্ত অবস্থায় আসন্ন আযাব নাযেল হওয়ার আশংকায় নবী (স.)-এর বারবার কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে দোয়া করার মধ্যে দিয়ে–তখনও ওই নিরাশার আঁধারে জোরালো আশার আলো তাঁর হৃদয়ে প্রদীপ্ত ছিলো যে ওরা যদি ঈমান না-ই আনে– হয়তো ওদের বংশধররা ঈমান আনবে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন–তিনি রহমানুর রহীম, তাঁর দরবার থেকে তাঁর প্রিয়তম রসূলের এ আকুল আবেদন ঠোকর খেয়ে ফিরে আসতে পারে না। আবার তাঁর চিরন্তন নিয়মও গতি হারাতে পারে না। এ জন্যে যে তাৎক্ষণিক কারণে অতীতে আযাব নাযেল হয়েছে–সেই কারণটিকেই তিনি দূরে সরিয়ে রাখলেন, অর্থাৎ রসূল (স.)-কে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মোজেযা দিলেন না; অর্থাৎ মোজেযা হচ্ছে আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতার সরাসরি বহিঃপ্রকাশ–কাফেরদের দাবী অনুসারে এ মোজেযা প্রদর্শন করার পরও যদি জনপদ একে উপেক্ষা করে তখন এ মহামারীর ওষুধ আযাব ছাড়া আর কিছু থাকে না। তাই, আল্লাহ রব্বুল আলামীন সুকৌশলে মহানবী (স.)-কে মদীনায় হিজরত করিয়ে দিলেন। এ হিজরত ছিলো আল্লাহর ফয়সালা, নচেৎ কোরায়শদেরকে আল্লাহ তায়ালা এমন শক্তি-ক্ষমতা দেন নাই যে তারা শক্তি বলে তাঁকে বহিষ্কার করতে পারতো বা দেশ ত্যাগ করার জন্যে রসূলুল্লাহ (স.)-এর নিজেরও কোনো ফয়সালা ছিলো না বা তিনি কোনো ভয়ও পান নাই। তায়েফে গমন-সে তো ছিলো দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের প্রচেষ্টার এক নমুনা মাত্র।

আল্লাহর সান্নিধ্যে

এরপর, আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন তাঁর প্রিয় রসূল (স.) তাঁর কাছে সান্নিধ্যে আগমন করুক, তাঁর মধুর পরশে ধন্য হোক আখেরী নবীর জীবন-মন-প্রাণ, বিশ্বপতির ক্ষমতা রাজ্যের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত মহান মালিকের শক্তি-ক্ষমতা সন্দর্শনে হৃদয় তাঁর সর্বোচ্চ শক্তিতে ভরপুর হয়ে যাক, যেন মালিকের রাজ্যে তাঁর বিজয় কেতন উড্ডীন করার প্রশ্নে তিনি আপোসহীন হতে পারেন সারা দুনিয়ার সম্মিলিত বিরোধী শক্তিও তাঁর বিজয়াভিযানের সামনে -তৃণসম তুচ্ছজ্ঞানে পরিত্যক্ত ও উপেক্ষিত হয়ে যায় । তাই দেখা যায় বজ্র-নির্ঘোষে উত্থিত মহানবী (স.)-এর ঘোষণা, 'সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী ও মিথ্যার পরতন অলংঘণীয়।' এরপর আসছে বিশ্ব বিজয়ের মূল চালিকা শক্তি কর্মসূচী, যা মানুষের ধমনীতে চিরদিন এক অমিত তেজ যোগাতে থাকবে, যার বলে বলীয়ান হয়ে আল্লাহর সৈনিকরা জাহেলিয়াতের নিশ্চিদ্র অমানিশায় চলতে থাকবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'নামায কায়েম করো সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার সময় থেকে নিয়ে রাত্রিতে অন্ধকার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত। .... কিন্তু যালেমদের জন্যে বৃদ্ধি করে এ পাক কালাম শুধু ক্ষতিই ক্ষতি।' (আয়াত ৭৮-৮২)

সূর্য ঢলে পড়া বলতে বুঝায় মধ্যাহ্ন কাল অতিক্রম করার পর সূর্যের পশ্চিম দিগন্তের দিকে ঢলে পড়া। এখানে বিশেষভাবে রসূল (স.)-কে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলা হয়েছে; বিশেষ করে ফরয নামাযগুলোর ওয়াক্ত নির্দেশ করতে গিয়ে একথাগুলো এসেছে–এবং মোতাওয়াতের হাদীসের মাধ্যমে তাঁর বাস্তব কাজ সম্পর্কে এ কথাগুলো জানা গেছে। আবার দেখুন, কোনো কোনো মোফাসসের বলেন, 'দুলুকিশ শামস্' বলতে মধ্য আকাশের অবস্থান থেকে সূর্যের পশ্চিম দিগন্তের দিকে ঝুঁকে পড়াকে বুঝায়। আর রাত্রির প্রথম ভাগকেই 'গাসাক' বলা হয়েছে এবং ফজরের সময়ে কোরআন পড়তে হবে বলে বুঝানো হয়েছে, বলা হয়েছে ফজরের নামাযে অবশ্যই সশব্দে কোরআন এমনভাবে পড়তে হবে যেন মানুষ সহজেই কোরআনের শব্দ ও ভাব বুঝতে পারে। এরপর, ফজরের সময়ে কোরআন পাঠ বলতে ফজরের নামাযকেই বুঝানো হয়েছে।

তারপর দেখুন তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালা শুধুমাত্র একজনকেই হুকুম দিয়েছেন। এ হচ্ছে সেই নিভৃত নামায যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-এর জন্যে খাস করে দিয়েছেন। যার কারণে তাঁর জন্যে ছিলো এ নামায অতিরিক্ত এক ফরয, আর অন্যদের জন্যে হচ্ছে এ নামায নফল। কেউ কেউ এ নামাযকে রসূলের জন্যে নফল মনে করেন, কিন্তু প্রথমে বর্ণিত কথা, অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (স.)-এর জন্যে এ নামায এক বিশেষ ও অতিরিক্ত হুকুম বিধায় তাঁর জন্যে ছিলো এটা ফরয। আল কোরআনে নামাযের ওয়াক্তগুলোকে সরাসরি আয়াতের মাধ্যমে নিরূপণ করা হয়নি, বরং হাদীস শরীফে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কথা ও বাস্তব ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিটি নামাযের সময় সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, এরশাদ হচ্ছে,

'কায়েম কর নামায সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে নিয়ে রাতের অন্ধকার ঘনীভূত হওয়া পর্যন্ত।'

অথবা অস্তমিত হওয়ার জন্যে সূর্য যখন পশ্চিম আকাশের দিকে ঝুঁকে পড়ে সেই সময় ও রাতের ঘন অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত সময়ে নামায পড়ো এই প্রান্তিক সময়ের মধ্যে নামায কায়েম করো।

আর, পড় ফজরের সময় কোরআনে করীম। 'নিশ্চয়ই ফজরের সময় কোরআন পাঠ শ্রুত হয় (দলবদ্ধভাবে)'

এই দুটি সময়ের উল্লেখের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটি বুঝা যায় তা হচ্ছে, দিন শেষে ও রাতের আগমনে এবং রাতের শেষে ও দিনের আগমনে নামাযের ওয়াক্তগুলো আবর্তিত হতে থাকে। আয়াত দুটির দিকে একটু খেয়াল করলে পাঠকের অজান্তেই তার হৃদয়ের ওপর এক গভীর আবেগ সৃষ্টি হয়।

দেখুন, প্রথমত হচ্ছে রাতের আগমন, অতপর ধীরে ধীরে গভীর অন্ধকার ছেয়ে যাওয়া। এ অবস্থা অনুরূপভাবে স্নিগ্ধ আলোর উন্মেষ ও অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। দুটি সময়ে অন্তর নরম হয় এবং উভয় সময়েই বিশ্ব প্রকৃতির রহস্য রাশি ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে মোমেনের অন্তরে এমনভাবে চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক করে যা এক মুহূর্তের জন্যেও দূর হতে চায় না বা একটিবারের জন্যেও সে চিন্তামুক্ত হয় না। নামাযের জন্যে মোমেন-দিল উদগ্রীব হয়ে থাকে, তেমনি উন্মুখ হয়ে থাকে কোরআন শোনা বা পড়ার জন্যেও। ভোরের আলো প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে যখন প্রভাতী সমীরণ মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হতে শুরু করে, গোটা পরিবেশে নেমে আসে মিষ্টি মধুর সরস সজীবতা, পাখীকুল শুরু করে মধুর কলরব, তখন আল্লাহপ্রেমিক মানুষ মোহব্বতের আবেগে আপ্লুত হয়ে যায়। ভোরের আলোর আগমনে তার অন্তরের দুয়ার যেমন খুলে যায়, জেগে উঠে নব জীবনের স্পন্দন। এরশাদ হচ্ছে,

'আর রাতের কিছু অংশে তাঁর সান্নিধ্য লাভের বাসনায় (কোরআনের আয়াতসমূহ দ্বারা) তাহাজ্জুদ পড়-এটা তোমার জন্যে অতিরিক্ত (এক কর্তব্য) ......'

আর তাহাজ্জুদ পড়ার উপযুক্ত সময় হচ্ছে প্রথম রাতে ঘুমের কিছু পর। আয়াতটির মধ্যে 'বিহী'তে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে তারই ইংগিত হচ্ছে আল কোরআন, কারণ কোরআনই নামাযের প্রাণ এবং মুসলমানদের মাথা সমুন্নত রাখার জন্যে উদ্দীপক শক্তি হিসাবে নিয়োজিত। এরশাদ হচ্ছে,

'হয়ত তোমার রব তোমাকে মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন।'........

ওই স্থানে পাঠাবেন আল্লাহ তায়ালা তাহাজ্জুদ গোযার ওই নেক লোকদেরকে, যারা তাহাজ্জুদ

ও পবিত্র কোরআনের কারণে এবং নির্জনে নিভৃতে আল্লাহর সান্নিধ্যে হাযির হওয়ার সময়ে অপূর্ব এক ঘনিষ্ট সম্পর্ক সৃষ্টি হয়-সেই মোহব্বতপূর্ণ সম্পর্কের কারণে(১)।

এই তাহাজ্জুদের কারণে কোনো মানুষ আল্লাহর বাছাইকৃত মানুষের মর্যাদা লাভ করবে এবং সে হবে তার পরওয়ারদেগারের পছন্দনীয় বান্দা। সুতরাং অন্য কারও পক্ষে এ মর্যাদার অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে বিশেষ মর্যাদা লাভের একমাত্র পথ এটাই। এই তাহাজ্জুদই সর্বাধিক মর্যাদা লাভের পথে সর্ব প্রধান পাথেয়।

এর করুনাময় আল্লাহ তায়ালা শিখিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে তাকে ডাকতে হবে।

'(আর হে রসূল তুমি) বলো, হে আমার রব, আমাকে সত্যের পতাকা হাতে নিয়ে সত্য-সঠিক গন্তব্যস্থলে ....আমার জন্যে কোনো ক্ষমতাবান ব্যক্তিকে সাহায্যকারী।'

এ হচ্ছে এমন একটি দোয়া যা আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাঁর নবীকে শিখিয়েছেন যেন নবী এই দোয়ার দ্বারা তাঁকে ডাকেন এবং আল্লাহকে ডাকার জন্যে তাঁর উম্মতকেও যেন তিনি দোয়াটি শিখিয়ে দেন এবং জানিয়ে দেন কেমন করে করুণাময় পরওয়ারদেগারকে ডাকতে হবে। লক্ষ্য করুন এ দোয়াটির মধ্যে দুটি কথা আছে, এক. এমন সত্য সুন্দর দেশে প্রবেশ করাও যার অধিবাসীরা হবে সত্যানুসন্ধিৎসু ও সত্যপ্রিয়; আর বের করে আনো এমন এক সত্য-সঠিক স্থান দিয়ে যেখানকার পরিবেশ হয় বের হওয়ার জন্যে উপযোগী ও অনুকূল। একথায় যে ইংগিত পাওয়া যায় তা হচ্ছে, সফরটা যেন হয় নিরাপদ এবং এ সফরের সংগী যা বা যারাই হোক না কেন তারাও যেন হয় সত্য-সঠিক দ্বীন-এর জন্যে নিবেদিত। এ সফরের শুরু-শেষ , প্রথম ও পরবর্তী অবস্থা এবং সফর শুরু করা থেকে নিয়ে পরবর্তী অবস্থার মধ্যের যে সময়টি রয়েছে তাও যেন হয় সুন্দর ও সম্মানজনক। এখানে বুঝানো হয়েছে যে সত্যের জন্যে অবশ্যই উপযুক্ত মূল্য রয়েছে, যা খতম করে দেওয়ার জন্যে মোশরেকেরা নানাভাবে চেষ্ট করেছিলো। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য অনেককেই নিজেদের পূজনীয় বানিয়ে নবী (স.)-কে ঘাবড়ে দিতে চেয়েছিলো। অনুরূপভাবে সত্যের জন্যে রয়েছে সমাজের বুকে এক বিশেষ স্থান; আর তা হচ্ছে, যেখানেই সততা-সত্যবাদিতা ও পরোপকারিতা আছে সেখানেই দৃঢ়তা, প্রশান্তি, পরিচ্ছন্নতা ও নিষ্ঠা আছে। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী আমাকে একটি সাহায্যকারী রাষ্ট্রশক্তি দাও।'

অর্থাৎ, এমন সাহায্যকারী বানিয়ে দাও যার শক্তি ও ক্ষমতার দাপট পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত থাকবে মোশরেকদের ওপর যারা হবে প্রভাবশালী। তারপরের কথাটি খেয়াল করুন, 'দোয়াকারী আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ককে এতো ঘনিষ্ঠ ও গভীর মনে করে যে, তার ভাষার মধ্যে একটা দাবী ও নৈকট্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং সে সরাসরি বলে ফেলে-অন্য কারও পক্ষ থেকে নয়, আর কারও মাধ্যমেও নয়-একমাত্র তোমার কাছ থেকেই আমি চাই, আমার চাওয়া-পাওয়ার বিষয় ও বস্তু এবং শুধু তোমার কাছে আমি আশ্রয় চায় চাই-সাহায্য চাই জীবনের সর্ববিষয়ে।

আর এটাও একটা বাস্তব সত্য বটে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে দোয়া করতে থাকে সে অবশ্যই বিশ্বাস করে যে ক্ষমতার মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই এবং

---

(১) কোরআন হাদীসের অনেকগুলো বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সবাই যখন ঘুমিয়ে, সেই প্রিয় বিছানা ত্যাগ করে মোমেন যখন একমাত্র আল্লাহর মোহব্বতে দন্ডায়মান হয় তখন অবশ্যই সে আল্লাহর কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে যে তাকে নিয়ে আল্লাহ তায়ালা গৌরব করেন, আর এই নামাযই কেয়ামতের দিনে তার জন্যে শাফায়াত করতে এগিয়ে আসবে।

একথাও বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারও কিছু দেয়ার মতো ক্ষমতা নেই। তার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি ছাড়া আশ্রয় বা সুখ-শান্তি দেয়ার ক্ষমতা আর কারও নেই। তিনি চাইলে সাহায্য করেন অথবা সাহায্য পাওয়ার সকল পথ বন্ধ করে দেন এবং এটা অতীব সত্য কথা, যতো দিন পর্যন্ত তার মনোযোগ আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট না হয় ততোদিন আল্লাহর সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়। কাকুতি-মিনতি বা আবেদন-নিবেদন করা এমন একটি বিষয় যা একটি দাবী হিসাবে যে কোনো ক্ষমতাবান মানুষের কাছে বিবেচনাযোগ্য হয়। তখন তারা ওই ক্ষমতাধরদের সেনাবাহিনী বা খাদেম হিসাবে স্বীকৃতি পায়, যার ফলে তারা নানাভাবে সফলতাও অর্জন করে; কিন্তু কেউ কোনো বাদশাহের সেনাদলের সদস্য বা তার নওফর-চাকর হলেই যে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই; কারণ কারও কিছু পাওয়া সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর হুকুমের ওপর নির্ভর করে। অনুরূপভাবে কেউ দুনিয়ার কোনো শাসকের কাছে সাহায্য চাইলে বা কোনো শাসক সাহায্য করতে চাইলেই যে কেউ সাহায্যপ্রাপ্ত হবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নাই।

সত্য সমাগত মিথ্যা দুরিভূত

ইতিহাস সাক্ষ দেয়, সত্য যখন স্বমহীমায় হাযির হয় মিথ্যা তখন দুরিভূত হতে বাধ্য। এরশাদ হচ্ছে,

'আর বল, সত্য সমাগত হয়েছে এবং মিথ্যার অবসান হয়েছে; নিশ্চয়ই মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন যে, সত্যকে জয়ী করার সুদূর প্রসারী ও সর্বব্যাপক ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই হাতে। অতএব হে রসূল, ঘোষণা করে দাও যে সত্য তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে, এবং সততা পরিপূর্ণ দৃঢ়তা নিয়ে সমাগত হয়েছে এবং সাথে সাথে হয়েছে মিথ্যার পরাজয় ও বিপর্যয়। সত্যের প্রদীপ্ত বাতির সামনে মিথ্যা ম্লান হয়ে গেছে, পর্দার আড়ালে ফিরে গিয়ে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে।

'মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।' ....এ হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি-ক্ষমতার অমোঘ দাবী কোরআনে করীমে যার জোরদার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যদিও আপাত দৃষ্টিতে মিথ্যার জোর দেখা যায় এবং মিথ্যার মাধ্যমে অনেক সুখ-সম্পদ আহরণ করা যায় বলে মনে হয়, কিন্তু অবশেষে তা পরাজিত হতে বাধ্য। অবশ্যই অনেক সময় বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায় সাময়িকভাবে হলেও বাতিল শক্তি ফুলে ফেঁপে উঠেছে; কিন্তু এর স্থায়িত্ব নাই। কারণ তা কোনো স্থায়ী বুনিয়াদের ওপর এটা প্রতিষ্ঠিত নয়। এ জন্যে মিথ্যার দাপট সাময়িকভাবে চোখকে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিতে চায়। কিন্তু এর সফলতাকে যতোই বিরাট ও প্রভাবপূর্ণ মনে হোক না কেন, মিথ্যার শক্তি ও তার অভ্যন্তরে ভাগ হচ্ছে অত্যন্ত দুর্বল ও অবশ্যই খুব শীর্ঘ তা ধ্বংস হতে বাধ্য, যেমন শুকনা খড়ের গাদায় আগুন ধরে গেলে তা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে এবং খোলা মাঠে সে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যায়, বাতাসের চাপে হঠাৎ করে বহু ওপরে উঠে গেছে; কিন্তু অতি অল্প সময়েই সে আগুন নিশেষে নিভে যায়, থেকে যায় ছাইয়ের এক স্তূপ, অপর দিকে কয়লার ডগভগে আগুন যেমন হয় উত্তপ্ত অনেক বেশী, তেমনি তার স্থায়িত্বও অনেক দীর্ঘ। একইভাবে মিথ্যা ও অন্যায় শক্তির প্রাবল্য সাময়িকভাবেও হঠাৎ করে অপ্রতিরোধ্য বলে মনে হলেও তার দাপট বেশীক্ষণ থাকে না; কিন্তু কয়লার আগুনের মতো সত্যের আলো জ্বলতে সময় লাগলেও তার আগুন দীর্ঘ সময় ধরে মানুষকে তাপ দিতে থাকে; আবার মিথ্যাকে তুলনা করা যায় পানির ওপরে উত্থিত বুদবুদের সাথে, যা বাতাসের সামান্য দোলায় পানির সাথে মিশে যায় এবং ঢেউয়ের লাগাতার আছড়ে পড়ার কারণে

ওপরে ছেয়ে থাকা বুদবুদ বা ফেনা সাময়িকভাবে পানিকে ঢেকে রাখলেও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তা মিলিয়ে যায় এবং অবশেষে স্বচ্ছ পানি থেকে যায়। তাই বলা হচ্ছে, 'অবশ্যই মিথ্যা ধ্বংস হতে বাধ্য' ......

কারণ এর মধ্যে স্থায়ীভাবে টিকে থাকার কোনো উপাদানই নেই। এর সাময়িক অস্তিত্ব বাহ্যিক কোনো কিছুর প্রভাবে নযরকে ধাঁধিয়ে দেয় বটে, কিন্তু এটা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কৃত্রিম কিছু জিনিসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু কৃত্রিম ওই সব উপায় উপকরণ এবং নির্ভর করার মতো ব্যক্তি বা বিষয়গুলো অতি শীঘ্রই দুর্বল হয়ে যায় এবং পরিশেষে ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে যায়, সত্যের প্রকৃতিই হচ্ছে এই যে তার মধ্যে অবস্থিত উপায়-উপাদানগুলো দীর্ঘস্থায়ী ও মযবুত বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু এর বিরুদ্ধে মানুষের সাময়িক আবেগ প্রবণতা বাধার প্রাচীর খাড়া করে দেয় এবং এর বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থবাদী শাসক ও শোষক শ্রেণী দাঁড়িয়ে যায় .... এসত্তেও সত্য দৃঢ়তার সাথে ও নিরুদ্বেগে নিজ গতিতে এগিয়ে চলে, নিজের মযবুত ঘাঁটি রচনা করে নেয় এবং তার স্থায়িত্বকে নিশ্চিত করে, কেননা এতো আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছ থেকে আগত ব্যবস্থা যাকে তিনি 'সত্য' -রূপে বানিয়েছেন এবং এ সত্যকে তার চিরন্তন নাম ও চিরস্থায়ী অস্তিত্বের সাথে বিজড়িত করেছেন, যা কোনো দিন শেষ হয়ে যাবার নয়। অপর দিকে ঘোষণা আসছে

'নিশ্চয়ই মিথ্যার পরাজয় অনিবার্য'...... কারণ এর পেছনে রয়েছে শয়তান ও তার ক্ষণস্থায়ী শক্তি ...... রয়েছে বর্তমান পৃথিবীর শাসক পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার সহায়তা..... কিন্তু যে-ই তাদের পেছনে শক্তি যোগাক না কেন এবং যতো ক্ষমতা নিয়েই তাদেরকে সহায়তা দান করুক না কেন সত্যকে বিজয়ী করার জন্যে আল্লাহর দেয়া ওয়াদা আরও বড় সত্য, তাঁর শক্তি-ক্ষমতা আরও বেশী জোরালো। আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর ওপর যে ব্যক্তিই ঈমান এনেছে সে অবশ্যই মহান আল্লাহর দেয়া এ ওয়াদার মিষ্টি-মধুর স্বাদ পেয়েছে এবং অনুভব করেছে আল্লাহর ওয়াদার সত্যতাকে। আর সবারই চিন্তা করা উচিত কে আছে এমন যে আল্লাহ রব্বুল ইযযত থেকে বেশী ওয়াদাপূরণকার, কে আছে এমন যার কথা তাঁর থেকে অধিক সত্য?

কোরআন মোমেনদের জন্যে রহমত ও নিরাময়

এরপর আলোচনা এসেছে মহাগ্রন্থ আল কোরআন সম্পর্কে– বলা হয়েছে,

সংশয়-সন্দেহ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উপসম হয় পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে। কারণ এই কোরআন আল্লাহর সাথে মানব-হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন করে। ফলে হৃদয়ে প্রশান্তি আসে, নিরাপত্তাবোধ জন্ম নেয়। আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি ও আস্থা বোধ জন্ম নেয়। তখন মানুষ জীবনের প্রতি আগ্রহ খুঁজে পায়। আমরা জানি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা হচ্ছে একটি রোগ। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হচ্ছে এক প্রকার মানসিক প্রবঞ্চনা। অপর দিকে সংশয় সন্দেহ হচ্ছে একটা কঠিন ব্যাধি। এসব মানসিক রোগ-ব্যাধির ক্ষেত্রে মোমেন বান্দাদের জন্যে পবিত্র কোরআন হচ্ছে সত্যিই এক খোদায়ী রহমত।

চিন্তা-চেতনার বৈকল্যের নিরাময়ও রয়েছে এই পবিত্র কোরআনেই। কারণ, পবিত্র কোরআন মানব মস্তিষ্ককে অলীক ধ্যান-ধারণার কবল থেকে রক্ষা করে। যা কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ সেসব বিষয়ে চিন্তা-ফেকের করার পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে, আর যেসব বিষয় অনর্থক ও অনাকাঙ্খিত সেগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকতে বারণ করে। চিন্তার ক্ষেত্রে একটি সুষ্ঠু ও যথার্থ পদ্ধতির অধীনে মস্তিষ্ককে পরিচালনা করে। ফলে এর প্রতিটি কর্মকান্ড হয় অর্থপূর্ণ ও গঠনমূলক। এতে অলীক

ধ্যান-ধারণা ও আকাশ-কুসুম চিন্তা-চেতনার কোনো অবকাশ থাকে না। চিন্তা শক্তিকে একটা নিয়মের অধীনে এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করতে নির্দেশ দেয় বলেই তা সুস্থ ও সবল থাকে, অর্থপূর্ণ ও কল্যাণকর কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। কাজেই পবিত্র কোরআন এদিক থেকেও মোমেন বান্দাদের জন্যে রহমত স্বরূপ।

কাম-ক্রোধ, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ ও শয়তানী প্ররোচনার চিকিৎসাও রয়েছে এই পবিত্র কোরআনেই। কারণ, এগুলো হচ্ছে অন্তরের রোগ। এই রোগে আক্রান্ত হলে মানুষের অন্তর দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কাজেই পবিত্র কোরআন এদিক থেকেও মোমেন বান্দাদের জন্যে রহমত স্বরূপ।

যে সকল সামাজিক ব্যাধি সমাজের ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দেয় এবং সমাজের শান্তি শৃংখলা ও নিরাপত্তাকে বিনষ্ট করে দেয় সে সব ব্যাধির চিকিৎসাও এই পবিত্র কোরআনেই রয়েছে। কারণ, কোরআনভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের অধীনে মানব গোষ্ঠী সুখে-শান্তিতে বাস করতে পারে, নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। কাজেই পবিত্র কোরআন এদিক থেকেও মোমেন বান্দাদের জন্যে রহমত স্বরূপ।

তবে যারা অত্যাচারী ও সীমালজ্ঞনকারী, তারা এই পবিত্র কোরআন থেকে কোনো ভাবেই উপকৃত হতে পারে না। বরং এর দ্বারা তাদের ক্ষতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। এ কথাই আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে,

'(দেখো) আমি কোরআনে যা কিছু নাযিল করি তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে (সমস্ত মানসিক রোগের) উপসমকারী ও রহমত (স্বরূপ;) কিন্তু এসত্তেও তা যালেমদের জন্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।'

অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের রহমত ও বরকত এবং এর কল্যাণকর প্রভাব থেকে এরা বঞ্চিত। শুধু তাই নয়, বরং এই কোরআনের বদৌলতে মোমেনরা যে বিজয় ও সফলতা লাভ করে তার কারণে ওরা ভীষণ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। হিংসা-বিদ্বেষ ও আত্মগরিমার বশবর্তী হয়ে ওরা যুলুম-অত্যাচার, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হয়। কারণ, পৃথিবীর বুকে তারা এই পবিত্র কোরআনের ধারক ও বাহকদের দ্বারা পরাস্ত। তারা ক্ষতিগ্রস্ত। পরকালেও তারা নিজেদের কুফুরী, নাফরমানী এবং অনাচার ও অবিচারের কারণে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। কাজেই তারা সব দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত।

মানুষ যখন পবিত্র কোরআনের রহমত, বরকত এবং এর কল্যাণকর প্রভাব থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজের নফ্‌স বা খেয়াল-খুশীর হাতে বন্দী হয়ে পড়ে তখন সে সুখ-সাচ্ছন্দে অহংকারী হয়ে ওঠে আল্লাহকে ভুলে যায় এবং তাঁর নেয়ামতকে অস্বীকার করে। আর যখন বিপদে পড়ে এবং দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয় তখন হতাশ হয়ে পড়ে, চোখের সামনে অন্ধকার দেখতে থাকে, জীবনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ে। এ কথাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে,

'যখন আমি মানুষদের ওপর কোনোরকম অনুগ্রহ করি তখন তারা কৃতজ্ঞতার বদলে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং (অহংকারে) দূরে সরে যায় আবার যখন (কোনোরকম) কষ্ট মুসিবত তাকে স্পর্শ করে তখন সে (একেবারে) নিরাশ হয়ে পড়ে।' (আয়াত ৮৩)

অর্থাৎ সুখ-সাচ্ছন্দ ও নেয়ামত লাভ করার পর যদি মানুষ প্রকৃত দাতা আল্লাহকে স্মরণ না করে, তাঁর শোকর আদায় না করে তাহলে এই সুখ-সাচ্ছন্দই থাকে অহংকার ও অনাচারে লিপ্ত করে। তদ্রূপ আল্লাহর সাথে যদি কারো সম্পর্ক না থাকে, তাঁর প্রতি যদি কারও দৃঢ় বিশ্বাস ও

আস্থা না থাকে তাহলে বিপদে পড়লেই সে অধৈর্য হয়ে পড়বে, হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়বে। কিন্তু আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থাকলে, তাঁর প্রতি দৃঢ় আস্থা থাকলে বিপদের মুহূর্তে মানুষ আশার আলো দেখতে পায়, মনে সাহস খুঁজে পায়, আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে আশাবাদী হয়। ফলে সে বিচলিত না হয়ে অধৈর্য না হয়ে বরং শান্ত থাকে এবং দুশ্চিন্তামুক্ত থাকে।

এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, সুখ-সাচ্ছন্দে এবং বিপদে-আপদে ঈমানের মূল্য কতোটুকু, এর গুরুত্ব কতটুকু।

মানুষের বোধশক্তির সীমাবদ্ধতা

আলোচনা প্রসংগে এখানে আর একটি কথা বলা হচ্ছে। আর তা হলো এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নিজস্ব মত ও পথ অনুযায়ীই কাজ করে থাকে। কিন্তু কারা সঠিক পথ ও মতের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে, তার বিচারের ভার এক মাত্র আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত। সে কথাই এখানে বলা হয়েছে। (আয়াত ৮৪)

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যে কর্ম ও মতাদর্শের চূড়ান্ত পরিণতির ব্যাপারে একটা প্রচ্ছন্ন সতর্কবাণী রয়েছে। ফলে মানুষ যেন এসব ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে এবং এমন মত ও পথের অনুসরণ করে যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভে সহায়ক হয়।

কেউ কেউ রসূলুল্লাহ (স.) 'রুহ' বা আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বসে। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে পবিত্র কোরআন একটা সুন্দর ও সুষ্ঠু নীতিমালা অবলম্বন করে থাকে। এই নীতিমালার আলোকে পবিত্র কোরআন কেবল ততোটুকুই উত্তর দেয় যতোটুকু মানুষের বাস্তব প্রয়োজন এবং যতোটুকু অনুধাবন করার মতো শক্তি ও প্রজ্ঞা তার রয়েছে। অনর্থক ও বেহুদা বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা করে আল্লাহ প্রদত্ত মেধা ও বুদ্ধির অপচয় করা হোক এটা পবিত্র কোরআনের আদৌ কাম্য নয়। সে কারণেই যখন রসূলুল্লাহ (স.) আত্মার পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তাঁকে কেবল এতোটুকু বলতে নির্দেশ দেয়া হলো যে, এটা মহান আল্লাহর আদেশ বিশেষ এবং এর সঠিক পরিচয় ও প্রকৃতি সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। এ বিষয়েই এখানে বলা হয়েছে। (আয়াত ৮৫)

এ জাতীয় উত্তর প্রদানের মাধ্যমে মানুষের মেধা, চিন্তাশক্তি ও মননশীলতাকে বিকল করে ফেলা নয়; বরং এর মাধ্যমে মানুষের মেধা ও মননশীলতাকে তার নিজস্ব সীমারেখার মধ্যে থেকে কাজ করার শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। যে সকল বিষয় মানুষের চিন্তা ও বোধশক্তির আওতার বাইরে সে সব বিষয় নিয়ে মানুষ, মাথা ঘামিয়ে নিজের মেধা ও শ্রমের অপচয় করুক-এটা যুক্তিযুক্ত নয়। আত্মাও ঠিক তেমনি একটি অদৃশ্য ও অতিন্দ্রীয় রহস্য। এই রহস্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। তিনিই আত্মা নামক এই অতিন্দ্রীয় রহস্যটিকে মানুষসহ আরও অজানা বহু প্রাণীর দেহে স্থাপন করেছেন। আর আমরা সকলেই জানি যে, আল্লাহর অসীম ও নিরংকুশ জ্ঞানের তুলনায় মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত ও নগণ্য। কাজেই এই গোটা বিশ্ব চরাচরের অসংখ্য রহস্য ও ভেদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা মানুষের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। এই বিশাল জগতের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ভার মানুষের হাতে ন্যস্ত নয়। কারণ তার শক্তি ও সামর্থ এই গুরুদায়িত্ব পালনে সক্ষম নয়। মানুষকে তার সীমিত-শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী এবং তার আওতাধীন বিষয়াদির ব্যাপারেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কাজেই সে তার সীমিত জ্ঞান ও সামর্থ অনুযায়ীই আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ মোতাবেক দুনিয়ার বুকে খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করে যাবে।

এই পৃথিবীর বুকে মানুষ অনেক কিছুই আবিষ্কার করেছে, সৃষ্টি করেছে। কিন্তু 'রুহ' বা আত্মার সঠিক পরিচয় উদ্ঘাটন করতে গিয়ে সে খেই হারিয়ে ফেলেছে। এই সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য বস্তুটি কিভাবে আসে এবং কিভাবে যায়, এটা কোথায় ছিলো এবং কোথায় যাবে এসব জটিল প্রশ্নের উত্তর সে কোথাও খুঁজে পায়নি, আর সেটা সম্ভবও নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে আত্মার পরিচয় যতোটুকু ও যেভাবে দিয়েছেন ততোটুকুই মেনে নেয়া ব্যতীত অন্য কোনো উপায় নেই। কারণ, পবিত্র কোরআনের দেয়া তথ্যই নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য। এই তথ্য স্বয়ং মহান আল্লাহর জ্ঞান হতে উৎসারিত। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে মানবজাতিকে এই তথ্য হতে বঞ্চিতও রাখতে পারতেন। এমনকি রসূল (স.)-কে ওহীর মাধ্যমে যেসব বিষয়াদি ও তথ্যাদি জানানো হয়েছে, সেগুলোও তিনি ছিনিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর পরম দয়া ও করুণার ফলে এমনটি করা হয়নি।

এই দয়া ও করুণার বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং বলছেন যে, ওহীর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় অবগত করন, সে বিষয়গুলো স্থির ও অপরিবর্তিত রাখা নবীর জন্যে এবং গোটা মানব জাতির জন্যে একটা বিরাট খোদায়ী করুণা। কারণ এই ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত কোরআনের বদৌলতেই যুগে যুগে মানব জাতি ঐশী রহমত, হেদায়াত ও নেয়ামত লাভে ধন্য হয়েছে।

মানুষ ও জ্বীনের প্রতি আল্লাহর চ্যালেঞ্জ

আত্মার প্রকৃত রহস্যের জ্ঞান যেরূপ কেবল আল্লাহর মাঝেই সীমাবদ্ধ, তদ্রূপ কোরআন সৃষ্টির ব্যাপারটিও তাঁর একক সত্তার মাঝেই সীমাবদ্ধ। কোনো প্রাণীই এমন সৃষ্টির অনুকরণ করার ক্ষমতা ও শক্তি রাখে না। মানুষ ও জ্বীন এই দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান উভয় শ্রেণীর প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয় এমন একটি বাণী রচনা করে দেখানো। এমনকি তারা সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালালেও তাদের পক্ষে সেটা সম্ভবপর হবে না। এ কথাই এখানে বলা হয়েছে, তুমি এদের বলো যদি সমস্ত মানুষ ও জ্বীন এ কাজের জন্যে একত্রি হয় যে, তারা এই কোরআনের মতো কিছু রচনা করবে ....'

এই পবিত্র কোরআন কেবল কিছু শব্দ আর বাক্যের সমষ্টির নামই নয় যে, তা মানুষ বা জ্বিন জাতি অনুকরণ করতে সক্ষম হবে। এই কোরআন হচ্ছে আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টিরই অন্যতম সৃষ্টি যা গোটা জগতবাসীর জন্যে অসাধ্য ও অসম্ভব। এটা আত্মার মতোই একটা খোদায়ী নির্দেশ যার পূর্ণ রহস্য উদঘাটন করা কোনো সৃষ্টির পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে এর কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য বা গুণ বা প্রভাব সম্পর্কে কেউ কিছুটা অনুধাবন করে থাকলে করতেও পারে।

এই গুণটির সাথে সাথে পবিত্র কোরআনের আরও একটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য আছে। সেটা হচ্ছে পবিত্র কোরআন একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এই জীবন বিধানে প্রাকৃতিক নিয়ম নীতির প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা হয়েছে যা মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে এবং প্রতিটি পর্যায়ে কার্যকর; যা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ও বিভিন্ন পর্যায়ে মানব সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, পবিত্র কোরআন ব্যক্তি সমস্যারও সমাধান করে এবং আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িত সামাজিক সমস্যারও সমাধান করে। আর এই সমাধান করতে গিয়ে পবিত্র কোরআন এমন কিছু নিয়ম নীতি ও বিধি বিধানের আশ্রয় নেয় যা মানব সমাজের গভীরে প্রোথিত স্বভাব প্রকৃতির সাথে সকল দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সময়োচিত। এই সমাধান দিতে গিয়ে কোরআনী বিধানের দৃষ্টির আড়ালে এমন সব বিষয়াদি থাকে না যা ব্যক্তি জীবনে এবং সামষ্টিক জীবনে দেখা দিতে পারে। কারণ যিনি

এই বিধানের প্রবর্তক ও স্রষ্টা তিনি জীবন ও প্রকৃতির প্রতিটি স্তর ও অবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল।

অপর দিকে মানব রচিত আইনে এই বৈশিষ্ট্য নেই। এতে মানবীয় ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এ কারণেই মানব রচিত আইন একই সময় সকল সম্ভাবনা সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা রাখতে পারে না। ফলে এই আইন কোনো ব্যক্তি সমস্যা বা সামাজিক সমস্যার সমাধানে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করে যা পরবর্তীতে বহু নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে এবং সে গুলোর জন্যে পুনরায় নতুন সমাধানের প্রয়োজন দেখা দেয়।

শব্দ, অর্থ এবং বিষয়বস্তু সব দিক থেকেই পবিত্র কোরআন একটি অতুলনীয় ও অননুকরণী গ্রন্থ। অনুরূপ কোনো গ্রন্থ রচনা করা বা এর সমতুল্য বাণী সৃষ্টি মানুষ এবং জ্বিন জাতির সাধ্যাতীত ব্যাপার। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কোরআনের অনুরূপ কোনো জীবন ব্যবস্থা ও বিধি-বিধান রচনা করাও এই উভয়ই শ্রেণীর মখলুকের পক্ষে সম্ভব নয়।

কাফেরদের অমূলক দাবী

'আমি এই কোরআনে মানুষদের বোঝানোর জন্যে ....পড়তে পারবো। (হে নবী,) তুমি (এদের এসব উদ্ভট কথার উত্তরে) বলো, মহান পবিত্র (আমার) আল্লাহ তায়ালা, আমি তো কেবল একজন মানুষ (একজন) রসূল বৈ কিছুই নই।' (আয়াত নং ৮৯-৯৩)

পবিত্র কোরআনের অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করার চ্যালেঞ্জ এর মোকাবেলা করতে না পেরে তারা অদ্ভূত সব অলৌকিক কর্মকান্ডের দাবী জানাতে আরম্ভ করে দেয়। এসব দাবী দাওয়ার ব্যাপারে তাদের অনমনীয়তা ও কঠোরতার দ্বারা দুটো বিষয় প্রমাণিত হয়।

এক. তাদের বালখিল্যতা,

দ্বিতীয়. আল্লাহর প্রতি তাদের অশ্রদ্ধা। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বিভিন্নভাবে ও বিচিত্র দৃষ্টান্তসহ পবিত্র কোরআনের স্বরূপ তাদের সামনে পেশ করেছে। এর দ্বারা পবিত্র কোরআনের স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং বাস্তবতা উপলব্ধি করা যে কোনো বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু এতোসব সত্তেও মক্কার মোশরেকরা এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেনি, রসূলকে সত্য বলে স্বীকার করেনি, বরং রসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণের পূর্বশর্ত স্বরূপ তারা দাবী জানায়, রসূল যেন শুষ্ক ভূমি থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত করে দেখান, অথবা তাঁর কাছে খেজুর ও আঙুরের এমন একটি বাগান থাকতে হবে যার মধ্য দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে, অথবা তিনি আকাশ থেকে আযাব নামিয়ে আনবেন, সে আযাবের ফলে আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে তাদের ওপর পতিত হবে যেমনটি কেয়ামতের দিন অথবা তিনি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ও ফেরেশতাদেরকে তাদের মুখোমুখী এনে হাযির করবেন এবং তারা স্বগোত্রীয় লোকদের যেভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে ঠিক সেভাবেই আল্লাহ তায়ালা ও ফেরেশতারাও রসূলকে সাহায্য করবেন, রক্ষা করবেন। অথবা তার এমন একটি বাড়ী থাকতে হবে যা প্রস্তুত করা হবে মূল্যবান সব মনি মুক্তা উঠলেই চলবে না বরং সাথে লিখিত একখানা বাণীও আনতে হবে সেটা তারা স্বয়ং পড়ে দেখবে।

এসব অযৌক্তিক ও হাস্যকর দাবী দাওয়া দ্বারা ওদের চিন্তা ও বুদ্ধি বিবেচনায় দৈন্যদশাই প্রমাণিত হয়। সাথে সাথে ওদের গোয়ার্তুমীও প্রমাণিত হয়। কি অদ্ভূত ওদের বিচার বুদ্ধি। ওরা একটি সজ্জিত ঘর ও উর্ধ্বলোকে গমনকে এক করে দেখে! ওরা শুষ্ক ভূমি থেকে ঝর্ণার প্রবাহন আর আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাদের ভূমিতে অবতরণকে এক করে দেখে। এসব উদ্ভট দাবী দাওয়া পেশ করার পেছনে একটিই কারণ বিদ্যমান, আর তা হচ্ছে এই যে, এগুলো অলৌকিক অসাধারণ

ব্যাপার। কাজেই এই অসাধারণ কাজগুলো যদি নবী করে দেখাতে পারেন তাহলেই ওরা ঈমান গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবে!

কিন্তু ওরা বেমালুম ভুলে যায় যে, পবিত্র কোরআনই হচ্ছে স্বয়ং একটি অলৌকিক ও অসাধারণ বস্তু। এর অসাধারণ রচনাশৈলী, এর অসাধারণ বক্তব্য এবং এর অসাধারণ বিধি-বিধানের অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করে দেখানো ওদের সাধ্যের সম্পূর্ণ বাইরে। এরপরও ওরা নবীর কাছে অলৌকিক ও অসাধারণ কাজের ফরমায়েশ জানায়। কারণ, পবিত্র কোরআনের অলৌকিকতা ও অসাবধানতার বিষয়টি চাক্ষুষ নয়। কাজেই ওরা চাক্ষুষ অলৌকিক ঘটনা দেখতে আগ্রহী!

এই সত্যটি মনে রাখা উচিত যে, অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করা নবী রসূলদের আওতাধীন নয়। তাঁরা এসব কাজের জন্যে প্রেরিতও নন, বরং গোটা বিষয়টিই হচ্ছে একান্ত আল্লাহর ইচ্ছা ও বিবেচনা নির্ভর।

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এসব অসাধারণ ঘটনাবলী প্রদর্শনের ক্ষমতা প্রদান না করে থাকলে তা কামনা করাও নবী-রসূলদের জন্যে অশোভনীয়। নবুওত ও রেসালাতের অন্যতম দাবীই হচ্ছে এই যে, যা করার অনুমতি নেই, তা আল্লাহর কাছে কামনা না করা। এ ক্ষেত্রে একজন নবী ও রসূল তাঁর মানবীয় সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ করবেন এবং তা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে জানিয়েও দেবেন। এই নির্দেশই আল্লাহ তাঁর রসূলকে দিয়েছেন। (আয়াত ৯৩)

অর্থাৎ মানবীয় সীমাবদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই একজন নবী তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাবেন। নিজের সাধ্যের বাইরে অথবা রেসালাতের দায়িত্বের বাইরে কোনো কিছুর জন্যে যেন আল্লাহর কাছে আরযি পেশ না করেন।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর আগমনের আগে ও পরে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়কে যে বদ্ধমূল ধারণাটি নবীদের প্রতি ঈমান গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে সেটা হচ্ছে, কোনো মানুষ নবী হতে পারে না, বরং এই মহান দায়িত্ব ফেরেশতা ব্যতীত অন্য কোনো মখলুক পালন করতে পারে না। তাদের সেই বদ্ধমূল ধারণার বিষয়টি সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা বলছেন। (আয়াত ৯৪)

আসলে মনুষ্যত্বের প্রকৃত মর্যাদা ও মূল্য অনুধাবন করতে অক্ষম বলেই ওদের মাঝে এ জাতীয় ভুল ধারণা জন্ম নিয়েছে। তদ্রূপ জীবন ও জগতের প্রকৃতি এবং ফেরেশতাদের সঠিক পরিচিতি সম্পর্কে অজ্ঞ বলেও ওদের মাঝে এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা জন্ম নিয়েছে। ওদের ধারণাই নেই যে, ফেরেশতাদেরকে পৃথিবীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি। তাছাড়া ফেরেশতারা কখনও তাদের আসল আকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করে না। তাহলে একজন মানব ও ফেরেশতার মাঝে ওরা কিভাবে পার্থক্য করবে। এতোসব সত্তেও একজন মানুষ নবীকে বিশ্বাস করতে ওদের বড়ই কষ্ট হয়। এরই উত্তরে বলা হয়েছে।

'(হে নবী) তুমি (তাদের) বলো যে, (যদি এমন হতো যে,) যমীনে (মানুষের বদলে) ফেরেশতারাই (বসবাস করতো এবং মানুষের মতোই তারা) নিশ্চিন্তভাবে (এখানে) ঘুরে বেড়াতো তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্যে আসমান থেকে কোনো ফেরেশতাকেই নবী করে পাঠাতাম।' (আয়াত ৯৫)

ফেরেশতাদেরকে পৃথিবীতে আবাদ করার ইচ্ছা যদি আল্লাহর থাকতো, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই তিনি মানুষের আকৃতি দান করতেন। কারণ পৃথিবীর প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্যে সেটাই উপযুক্ত। অন্য একটি আয়াতে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে,

আমি যদি কোনো ফেরেশতাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করতাম তাহলে তাকে পুরুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম। আল্লাহর জন্যে এটা আদৌ অসম্ভব নয়। কারণ, তিনি সব কিছুই করতে পারেন। কিন্তু তিনি প্রত্যেক বস্তুকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরই কুদরত ও ইচ্ছায় প্রত্যেক বস্তু স্ব স্ব ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য নিয়েই টিকে আছে। এতে কোনো ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন সচরাচর ঘটেনা। কিন্তু অবিশ্বাসী সম্প্রদায় এই সত্যটুকু উপলব্ধি করতে চায় না।

এই সহজ সরল বিষয়টি যারা বুঝতে চেষ্টা করে না, তাদের সাথে অহেতুক বাক-বিতন্ডা ও তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে না পড়ার জন্যে রসূলুল্লাহ (স.)-কে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন। তাঁকে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি যেন এসব বিষয়ের ফয়সালার ভার স্বয়ং তাঁর হাতেই ছেড়ে দেন। তিনিই এসব বিষয়ের চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন। কারণ, তিনি সব বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল। নিচের আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে। (আয়াত ৯৬)

কাফেরদের লজ্জাজনক পরিণতি

আলোচ্য আয়াতে এক ধরনের সতর্কবাণীর আভাস পাওয়া যায়। কারণ, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের শেষ পরিণতি সম্পর্কে নিচের আয়াতে সুস্পষ্ট রূপে যা বলা হয়েছে তা থেকে অবিশ্বাসীদের কঠিন পরিণতির বক্তব্যই প্রতিভাত হয়ে উঠে। (আয়াত ৯৭-৯৯)

হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু নিয়ম-নীতি নির্ধারিত করা আছে। এই নিয়ম-নীতি অনুযায়ী চলার ব্যাপারে মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এই স্বাধীনতার ফলাফল ও শেষ পরিণতিও তাকেই ভোগ করতে হবে। উক্ত নীতির একটি হচ্ছে এই যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে হেদায়াত ও গোমরাহী উভয়টির জন্যেই প্রস্তুত। সে নিজ আগ্রহ ও চেষ্টায় এর যে কোনো একটি গ্রহণ করতে পারে। তাই যখন কোনো মানুষ নিজ চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা হেদায়াতের উপযুক্ত বলে আল্লাহর কাছে বিবেচিত হয়, তখনই আল্লাহ তায়ালা তাকে হেদায়াত দান করেন, আর এরূপ ব্যক্তিই সত্যিকার অর্থে হেদায়াতপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। কারণ সে আল্লাহর নির্দেশের অনুসরণ করেছে। পক্ষান্তরে যারা হেদায়াত বা আল্লাহর নির্দেশিত পথের বিভিন্ন প্রমাণ ও চিহ্ন দেখেও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তারাই গোমরাহী বা ভ্রান্ত পথের পথিক হয়ে থাকে। এ জাতীয় মানুষকে আল্লাহর আযাব থেকে কেউই রক্ষা করতে পারে না। পরকালে তাদেরকে অত্যন্ত লজ্জাকর ও বিব্রতকর আকৃতিতে উপস্থিত করা হবে। অন্ধ, বোবা ও বধির করে তাদেরকে কেয়ামতের ময়দানে সবার সামনে হাযির করা হবে। শুধু তাই নয়, এর পর তাদেরকে জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হবে। সেটাই হবে তাদের সর্বশেষ ও স্থায়ী ঠিকানা। এ কথাই বলা হয়েছে নিচের আয়াতে,

'যাকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত দান করেন, সে-ই মূলত হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়, আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন এমন লোকদের (হেদায়াত দানের) জন্যে তুমি আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কাউকেই সাহায্যকারী পাবে না, এমন সব গোমরাহ লোকদের আমি কেয়ামতের দিন মুখের ওপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্রিত করবো, এরা তখন হবে অন্ধ বোবা ও বধির। এদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। এই জাহান্নামে প্রতিবার যখন (আগুন) স্তিমিত হয়ে আসবে তখন আমি (তাকে) তাদের জন্যে আরো প্রজ্জ্বলিত করে দেবো।' (আয়াত ৯৭)

এটা নিসন্দেহে একটা ভয়ানক পরিণতি এবং বিভীষিকাময় শাস্তি। এই পরিণতি ও শাস্তি তাদের নিজেদেরই কৃতকর্মের ফল। কারণ ওরা আল্লাহর সুস্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করেছে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। শুধু তাই নয়, বরং তারা পরকালকেও অস্বীকার

করেছে, পুনরুত্থানের বিষয়টিকেও অস্বীকার করেছে। এগুলোকে অসম্ভব বলে আখ্যায়িত করেছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে,

যখন আমরা (মৃত্যুর পর গলে) হাড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবো তখনও কি আমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবো?' (আয়াত ৯৮)

পরকালে যা ঘটবে সেটাকে চাক্ষুস এবং প্রত্যক্ষ একটা ঘটনার রূপ দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে মনে হচ্ছে, সে পৃথিবীতে ওই সকল কাফেরদের বাস ছিলো সেটা যেন বিলীন হয়ে গেছে এবং অতীতের গহ্বরে তলিয়ে গেছে। এটা হচ্ছে পবিত্র কোরআনের বর্ণনাভংগিরই একটা অন্যতম রূপ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কোনো ঘটনাকে চাক্ষুস ঘটনার রূপে উপস্থাপন করেন। এর ফলে মানুষের মনে গভীর একটা প্রভাব সৃষ্টি হয়। এর দ্বারা মানুষ সতর্ক হয়।

এরপর আল্লাহ তায়ালা ওই কাফের গোষ্ঠীর সাথে যুক্তি ও তর্কের ভাষায় কথা বলছেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন। (আয়াত ৯৯)

অর্থাৎ এই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা যদি আল্লাহ তায়ালাই হয়ে থাকেন এবং এটা তারা বিশ্বাসও করে থাকে তাহলে তাদের মতো মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে আল্লাহর অসুবিধা কোথায়? মৃত্যুর পর আল্লাহ তায়ালা পুনরায় মানুষকে জীবিত করে কেয়ামতের ময়দানে একত্রিত করবেন। এতে বিস্ময়ের কী আছে? কারণ, এই বিশাল সৃষ্টি জগত ও জড় জগত তো তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনি তো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কাজেই, মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত করার বিষয়ে কোনোই সন্দেহ সংশয় থাকা উচিত নয়। এর পরও যদি ওরা বিশ্বাস করতে না চায়, তাহলে তুমি ওদের শেষ পরিণতির জন্যে অপেক্ষা করো। ওদের জন্যে সময় নির্ধারিত আছে। সে সময় অনুযায়ীই ওদের বিচার হবে। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

কোরআনের কাঠগড়ায় নির্লজ্জ ইহুদী জাতি

যারা রসূলুল্লাহ (স.)-কে মনি মুক্তা খচিত ঘর, খেজুর ও আঙুরের বাগান এবং প্রবল বেগে উৎসারিত ঝর্ণা সৃষ্টি করে দেখানোর মতো আজগুবী প্রস্তাব পেশ করে থাকে, তারা কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত কৃপণ। এরা যদি আল্লাহর অনুগ্রহের ফলে গোটা খোদায়ী ভান্ডারের মালিকও হয়ে যায়, তবুও তারা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তা নিজেদের কাছে আটকিয়ে রাখবে, কুক্ষিগত করে রাখবে। অথচ আল্লাহর রহমতের ভান্ডার হচ্ছে বিশাল যার কোনো শেষ নেই। সে কথাই নীচের আয়াতে বলা হয়েছে,

'আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলোম অতএব (হে নবী) তুমি স্বয়ং বনি ইসরাঈলীদের কাছেই জিজ্ঞেস করো, যখন সে তাদের কাছে (নবী হয়ে) এসেছিলো তখন ফেরাউন তাকে বলেছিলো হে মূসা, আমি মনে করি তুমি হচ্ছো একজন যাদুগ্রস্ত (মানুষ)।' (আয়াত ১০০)

আলোচ্য আয়াতে ওদের কার্পণ্যের চিত্রটি অত্যন্ত গভীরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ওদের জানা উচিত যে, আল্লাহর রহমতের কোনো সীমা নেই, কোনো শেষ নেই। এই রহমতের কোনো হ্রাস নেই, কোনো ক্ষয় নেই। কিন্তু এ সত্তেও ওরা নিজেদের স্বভাবজাত কার্পণ্যের বশবর্তী হয়ে এই বিশাল রহমতের ভান্ডারও কুক্ষিগত করে রাখবে।

মোট কথা, অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করলেই যে, কঠিন হৃদয়ের লোকগুলো ঈমান গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবে, এমনটি মনে করার কোনো কারণ নেই। এই তো মূসা (আ.) নয় নয়টি প্রকাশ্য

ও জাজ্বল্যমান নিদর্শন উপস্থাপন করেও ফেরাউন ও তার দলবলের আস্থা অর্জন করতে পারেননি। তারা তাঁকে নবী হিসাবে বিশ্বাস করেনি। ফলে তাদের সকলের ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসে, তারা ধ্বংস হয়ে যায়। সেই ঘটনার বর্ণনাই নিচের আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে,

'আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম অতএব (হে নবী) তুমি..... অতপর আমি বনি ইসরাঈলীদের বললাম, (এবার) তোমরা এ যমীনে (নির্বিবাদে) বসবাস করো এরপর যখন আখেরাতের প্রতিশ্রুতি (বাস্তবায়নের সময়) আসবে তখন আমি তোমাদের সবাইকে সংকুচিত করে (আমার সামনে) নিয়ে দাঁড় করাবো।' (আয়াত ১০১-১০৪)

আলোচ্য আয়াতে মূসা (আ.)-এর ঘটনা এবং বনী ইসরাঈলের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, প্রসঙ্গক্রমে কারণ আলোচ্য সূরার মূল ঘটনার সাথে এর সংগতি রয়েছে। সূরার সূচনায় মাসজিদে আকসা ও বনী ইসরাঈলের ঘটনার আংশিক বর্ণনা এসেছে। সাথে সাথে মূসা (আ.)-এর প্রসংগও স্থান পেয়েছে। পরিশেষে কেয়ামতের ও কাফেরদের পরিণতির বর্ণনা দিতে গিয়ে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের প্রসংগও এসেছে। কারণ, কেয়ামতের বর্ণনার সাথে এটি সংগতি পূর্ণ।

আলোচ্য আয়াতে যে নয়টি নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, শ্বেত হস্ত, লাঠি, ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের জীবনে ঘটে যাওয়া দুর্ভিক্ষ, ফসলহানি, ঝড়-তুফান, পংগপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত। এসব ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হচ্ছে স্বয়ং বনি ইসরাঈল। কাজেই তাদেরকে জিজ্ঞেস করে এর সত্যতা যাচাই করে নাও।

ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে জাদুগ্রস্ত বলে প্রত্যাখ্যান করে দেয়। আসলে আল্লাহর একত্ববাদের কথা যারা বলেন, যুলুম, অত্যাচার ত্যাগ করার আহ্বান যাঁরা জানান, তাঁরা যুলুম বাজ ও স্বেচ্ছাচারী শাসকদের চোখে জাদুগ্রস্তই। কারণ, ফেরাউন এবং তার মতো অন্যান্য অত্যাচারী শাসকদের পক্ষে এসব নিগুঢ় তথ্যপূর্ণ বিষয়াদির তাৎপর্য অনুধাবন করা কখনোই সম্ভব নয়। জ্ঞান থাকা অবস্থায় মাথা উঁচু করে এ জাতীয় কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করার মতো ক্ষমতা ওদের নেই।

কিন্তু, মুসা (আ.)-এর ব্যাপার হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও মদদপ্রাপ্ত। তিনি সত্যের বাহক। তিনি সঠিক পথের দিশারী। তিনি আল্লাহর সাহায্যের ব্যাপারে আশাবাদী। তিনি অত্যাচারী শাসকদের ধ্বংসের ব্যাপারে পূর্ণ আস্থাশীল। তাই তিনি ফেরাউনের সামনে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উত্তর দিতে গিয়ে বলতে পেরেছেন। (আয়াত ১০২)

অর্থাৎ হে ফেরাউন তুমি এসকল সুস্পষ্ট খোদায়ী নিদর্শনগুলো অস্বীকার করে নিজের ধ্বংসই ডেকে এনেছো। কারণ, তোমার ভালো করেই জানা আছে, এসব অলৌকিক ঘটনা জন্ম দেয়ার ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নেই। এগুলো এতোই স্পষ্ট ও প্রকাশ্য যে, তা চোখকে কখনও ফাঁকি দিতে পারে না। বরং এগুলো যেন স্বয়ং দৃষ্টিশক্তি যা অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করে তোলে, অজানা সত্যকে উদ্ঘাটন করে দেয়।

যুক্তি ও সত্যের সামনে হেরে গিয়ে যুলুমবাজরা সব সময়ই তাদের বস্তুনির্ভর শক্তির আশ্রয় নেয় এবং সত্যের ধারক ও বাহকদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়। সত্যের বাণীকে ওরা এভাবেই দমিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা ওদের বিরুদ্ধে চলে যায়। ফলে ওরাই এই ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে, ধ্বংস হয়ে পড়ে। আর যারা সত্যের ধারক অথচ ওদের সামনে ছিলো দূর্বল ও অসহায় সেই দৃঢ়চিত্তের লোকদেরই বিজয় ঘটে। ওরাই পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কথাই উপরের আয়াতে বলা হয়েছে। (আয়াত ১০৩-১০৪)

যারা আল্লাহর সত্য নিদর্শনগুলো অস্বীকার করে তাদের পরিণতি এমনই হয়ে থাকে। আর এভাবেই আল্লাহ তায়ালা দুর্বল ও অসহায় লোকদেরকে পৃথিবীর মালিকানা দান করেন, তাদেরকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করেন। এর পেছনে ওদের কর্মকান্ড ও আচার-আচরণই দায়ী। ইতিপূর্বে আলোচ্য সূরার গোড়াতে ওদের অবস্থা কী ছিলো তা আমরা দেখেছি। আর এখন উভয় দলকেই পরকালের বিচারের সম্মুখীন হতে হবে বলে জানতে পারছি। (আয়াত ১০৪)

কোরআন নাযিলের পদ্ধতি ও তার তাৎপর্য

এই আলোচনা দ্বারা আমরা অলৌকিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে কাফের সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত হলাম। সাথে সাথে জানতে পেলাম যে, ওই সকল কাফেরদের সাথে আল্লাহর আচরণ কি হয়। আমরা এটাও জানতে পেলাম যে, কোরআন হচ্ছে সত্যের বাহক। তাই এই পবিত্র বাণী চিরকালই সত্যের প্রতীক হিসাবে বিদ্যমান থাকবে। এই পবিত্রবাণী বিক্ষিপ্ত সময়ে পৃথক পৃথকভাবে অবতীর্ণ করা হয়েছে যেন দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মানুষ তা ধীরস্থিরভাবে পাঠ করতে পারে এবং এর মর্ম অনুধাবন করতে পারে। এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে। (আয়াত ১০৫)

এই পবিত্র কোরআনের আগমন ঘটেছে একটি জাতিকে দীক্ষিত করার জন্যে, তাদেরকে গড়ে তোলার জন্যে এবং তাদের জন্যে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। তারা পরবর্তীতে এই জীবন ব্যবস্থা ও শিক্ষার আলো গোটা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বহন করে নিয়ে যাবে এবং মানব জাতিকে এর আলোকে আলোকিত করে তুলবে। একটা পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবমুখী পদ্ধতির মাধ্যমে এই জীবন ব্যবস্থার প্রচার ও প্রসার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। সে কারণেই তাদের বাস্তব প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিক্ষিপ্তভাবে এই কোরআন নাযিল করা হয়। কারণ, একটি জাতিকে গড়ে তুলতে হলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়, দীর্ঘ ও বাস্তবমুখী অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে একটি কার্যকর ও বাস্তবমুখী জীবন ব্যবস্থার গোড়া পত্তনের জন্যে। তাই এর প্রস্তুতি লগ্নে কোরআনের আগমন ঘটেছে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে। এটা কোনো আইন বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনা বা বিমূর্ত কোনো মতবাদের সমাহার নয় যে, তা কেবল চিন্তার খোরাক হিসাবে পাঠ করার জন্যে একই সময়ে এবং একই খন্ডে প্রকাশ করা হবে।

বস্তুত পবিত্র কোরআনকে একই সময় একটি পূর্ণাংগ গ্রন্থ আকারে নাযিল করার পরিবর্তে বিক্ষিপ্তভাবে নাযিল করার পেছনে এটাই হচ্ছে মূল কারণ ও রহস্য।

প্রথম যুগের মুসলমানরা এই রহস্যটি অনুধাবন করতে সক্ষম হন। তারা পবিত্র কোরআনকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করতেন। এর প্রতিটি বিধি নিষেধ, এর প্রতিটি শিক্ষা দীক্ষা এবং এর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ তারা নিজেদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতেন। কোনো সাহিত্যধর্মী গ্রন্থের ন্যায় পবিত্র কোরআনকে তাঁরা নিছক মানসিক তৃপ্তি লাভের উপায় হিসাবে পাঠ করতেন না। কেসসা কাহিনী বা অতীত রূপকথার ন্যায় তাঁরা কেবল চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসাবেও পাঠ করতেন না। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে কোরআনের প্রতিটি বিধি-বিধান ও আদেশ নিষেধ বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করতেন। ফলে তাঁদের চিন্তা চেতনায়, তাদের আচার আচরণে এবং তাদের জীবন যাপনে এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে। মোট কথা, তারা পবিত্র কোরআনকে তাদের জীবন বিধান হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এ কারণেই তাদের পূর্বের সকল রীতি নীতি, প্রথা প্রচলন ও বিধি বিধানকে তারা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন।

বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ দশটি আয়াত শিখলে ততোক্ষণ পর্যন্ত আগে বাড়তো না যতোক্ষণ না সে এগুলোর অর্থ অনুধাবন করতো এবং সে অনুযায়ী কাজ করতো।

সত্যের বাহক হিসাবে এই পবিত্র কোরআনের অবতরণ ঘটেছে সত্যকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং প্রমাণিত করতে। কাজেই, সত্যই হচ্ছে এর বিষয়বস্তু, সত্যই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য, সত্যই হচ্ছে এর উপাদান এবং সত্যই হচ্ছে এর বিবেচ্য বিষয়। সেই মহাসত্য যা গোটা সৃষ্টি জগতের মাঝে কার্যকর ও বিদ্যমান। সেই মহাসত্য যার ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে আসমান ও যমীন, যার ওপর ভিত্তি করে টিকে আছে এই বিশাল জগত। পবিত্র কোরআন তো এই সৃষ্টি জগতের পেছনে কার্যকর অদৃশ্য সত্ত্বার সাথেই সম্পৃক্ত, সেই সত্ত্বারই পরিচয়বাহক, সেই সত্ত্বারই ইংগিতবাহক, সেই সত্ত্বা থেকেই উৎসারিত। কাজেই গোটা কোরআনই হচ্ছে সত্যের আলোকবর্তিকা, সত্যের সন্ধানদাতা। রসূল এই সত্যের মাধ্যমেই মানুষকে সুসংবাদ দান করেন, তাদেরকে সতর্ক করেন।

এখানে রসূল (স.) কে বলা হচ্ছে তিনি যেন এই সত্যের বাহক কোরআনকে তাঁর জাতির সামনে তুলে ধরেন এবং তাদেরকে নিজেদের পথ স্বাধীনভাবে বেছে নেয়ার সুযোগ দেন। যদি তাদের ইচ্ছা হয় তাহলে কোরআনকে বিশ্বাস করবে, আর যদি ইচ্ছা না হয় তাহলে করবে না। এরপর তাদের শেষ পরিণতি তাদের এই গ্রহণ বর্জন অনুসারেই হবে। এ ক্ষেত্রে রসূল (স.) অবশ্য ওদের সামনে পূর্ববর্তী সেসব আসমানী কেতাবপ্রাপ্ত ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের লোকদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরবেন যারা এই কোরআনের প্রতি ঈমান এনেছে। ফলে ওই সব ঈমানপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা মক্কা নিরক্ষর লোকগুলোর জন্যে আদর্শ ও অনুসরণীয় নমুনা হিসাবে গণ্য হবে এবং এক সময় হয়তো এরাও ঈমান গ্রহণ করতে উৎসাহিত হবে। এই বিষয়টিই এখানেই বলা হয়েছে। (আয়াত ১০৭)

এটা যেন বিবেককে নাড়া দেয়ার মতো একটা জীবন্ত দৃশ্য। এই দৃশ্যে আমরা খোদায়ী জ্ঞান প্রাপ্ত পূর্ববর্তী ধর্মের কিছুসংখ্যক অনুসারীদেরকে দেখতে পাচ্ছি যারা পবিত্র কোরআনের মধুরবাণী শুনে ভক্তিতে মহান আল্লাহর সম্মুখে সেজদায় পড়ে যায়, তারা আত্মহারা হয়ে পড়ে, ভয় ও ভক্তির আতিশয্যে নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে পড়ে। ফলে কেবল সেজদাই নয়, বরং নতমস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে। এরপর মহান আল্লাহর বড়ত্ব এবং তাঁর ওয়াদার সত্যতা সম্পর্কে তাদের মনের গভীরে লুকায়িত অনুভূতি ভাষার রূপ ধারণ করে তাদের কণ্ঠে এইভাবে উচ্চারিত হয়। (আয়াত ১০৮) তারা এতে প্রভাবিত হয়ে পড়ে, এতোই বিমোহিত হয়ে পড়ে যে, কেবল ভাষার মাধ্যমেই নিজেদের হৃদয়ের আকুতি জানিয়ে ক্ষান্ত হচ্ছে না, কারণ মনের এই অনুভূতি এই আকুতি ভাষায় ব্যক্ত করার মতো নয়। তাই তাদের চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসছে ওই অব্যক্ত অনুভূতি ব্যক্ত করার প্রয়াসে। ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে নিজেদের মনের অবস্থা ব্যক্ত করছে ওরা। ফলে ওদের ভয় ও ভক্তি আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, ওদের গোটা সত্তাকে প্লাবিত করে তুলছে। এটা একটা অভাবনীয় দৃশ্য যার মাধ্যমে হৃদয়ের দু'কূল ছাপিয়ে ওঠা বাঁধনমুক্ত অনুভূতি চিত্রায়িত হয়েছে। এই হৃদয়স্পর্শী দৃশ্যের মাধ্যমে সংশয় ও দ্বিধামুক্ত মনের ওপর পবিত্র কোরআনের বিস্ময়কর প্রভাবের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রভাব কেবল সেই সকল লোকদের ওপরই হতে পারে যারা জ্ঞানের অধিকারী। যারা ঐশী বাণীর মর্ম বুঝে, যারা এর মূল্যও বুঝে। তবে জ্ঞান বলতে যে কোনো জ্ঞান নয় বরং ঐশী জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, এই জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহপ্রদত্ত। কাজেই তা নির্ভুল ও সত্য।

পূর্ববর্তী জ্ঞানপ্রাপ্ত লোকদের এই দৃশ্যের বর্ণনা এসেছে পবিত্র কোরআনকে বিশ্বাস করা বা না করার স্বাধীনতা প্রদানের বক্তব্যের পর। এখন বলা হচ্ছে যে, ওরা যেভাবে ইচ্ছা ও যে নামে ইচ্ছা

আল্লাহকে ডাকুক। উল্লেখ্য যে, মক্কার মোশরেক বাসিন্দারা নিজেদের কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে আল্লাহকে 'রহমান' নামে ডাকতো না। ওদের ধারণা ছিলো যে, এ ধরনের কোনো নাম আল্লাহর হতে পারে না। তাই ওদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, 'রহমান' ও 'রহীম' এবং অন্যান্য আরো অনেক সুন্দর নামে আল্লাহকে ডাকা যায়। কাজেই এসব নামের যে কোনো নামেই তারা আল্লাহকে ডাকতে পারে। এ কথাই নিচের আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে।

'তুমি (আরো) বলো তোমরা (আল্লাহকে) আল্লাহ (বলে) ডাকো কিংবা রহমান বলে (ডাকো)-(মূলত) তোমরা (তাঁকে) যে নামেই ডাকো-তাঁর সবকটি নামই উত্তম, (হে নবী) চীৎকার করে নামায পড়ো না, আবার অতিশয় ক্ষীণ করেও নয়। বরং (নামায পড়ার সময়) এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করো।' (আয়াত ১১০)

অর্থাৎ ওরা যা বিশ্বাস করতো তা নিছকই কুসংস্কার ও পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণার ফল। এর পেছনে কোনো বলিষ্ঠ যুক্তি নেই, বোধগম্য কোনো কারণও নেই।

পরবর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ (স.)-কে নামায আদায় করার সময় উচ্চ ও নিম্ন স্বরের মাঝামাঝি স্বর গ্রহণ করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কারণ, উচ্চ স্বরে নামায আদায় করলে কাফের মোশরেকরা ঠাট্টা বিদ্রুপ করতো, তাঁকে কষ্ট দিতো অথবা তারা আরো উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতো। তাছাড়া মহান আল্লাহর দরবারে মধ্যম স্বরে ও বিনয়ের সাথে মনের আরযী পেশ করাই উত্তম ও উচিত।

আলোচ্য সূরাটি যে ভাবে শুরু হয়েছিলো সে ভাবেই আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর একত্ববাদ বা লা-শরীক সত্ত্বার বর্ণনার মাধ্যমেই শেষ হচ্ছে। এতে বলা হয়েছে, তিনি সন্তান বিহীন, তিনি অংশীদারবিহীন। তিনি কারো সাহায্য বা সহায়তার মুখাপেক্ষী নন। তিনি মহামহিম, তিনি মহান সত্তার অধিকারী। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, গোটা আলোচ্য সূরা যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তা হচ্ছে আল্লাহর মাহাত্ম্য ও একত্বের বিষয়টি। তাই বলা হচ্ছে,

'(আরো), বলো-সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, যিনি কখনো কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, তার বিশাল সার্বভৌমত্বের কোনোই শরীক নেই। তিনি কখনো দুর্দশাগ্রস্তও হন না যে, তার কোনো অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে (তিনি সব কিছুর চাইতে উর্ধে,) তুমি (শুধু) তাঁরই মাহাত্ম ঘোষণা করো, (তাও আবার) পরমতম মাহাত্ম!'

সূরা আল কাহ্ফ

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

কেসসা কাহিনীই হচ্ছে এই সূরার প্রধান উপাদান। এর শুরুতেই রয়েছে 'আসহাবুল কাহাফের' ঘটনা। এরপর দুটো বাগিচার কেসসা। তারপর ইবলীস ও হযরত আদমের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, মাঝখানে হযরত মূসা (আ.) ও আল্লাহর জনৈক সৎ বান্দার ঘটনা এবং সবার শেষে যুলকারনায়নের ঘটনা। এই সূরার অধিকাংশ ঘটনাগুলোই বিস্তৃত। সূরার মোট একশো দশ আয়াতের মধ্য থেকে ৭১ আয়াত জুড়েই রয়েছে এসব কাহিনী। বাদ-বাকী আয়াতগুলোরও বেশীর ভাগ এসব কাহিনীসংক্রান্ত মন্তব্যে পরিপূর্ণ। এই কেসসা কাহিনীর পাশাপাশি কেয়ামতের কিছু দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। আরো রয়েছে জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ কিছু দৃশ্য, যা দৃশ্যের মাধ্যমে বক্তব্য প্রকাশের কোরআনী রীতির স্বাভাবিক প্রতিফলন।

তবে সূরার যে কেন্দ্রীয় বিষয়টির সাথে তার আলোচ্য বিষয়গুলো সম্পৃক্ত এবং তার গোটা আলোচনা যে বিষয়টির ওপর কেন্দ্রীভূত, তা হলো মানুষের আকীদা বিশ্বাস, চিন্তা ও দৃষ্টিভংগির সংশোধন এবং এই আকীদা বিশ্বাসের নিরীখে মূল্যবোধগুলোর সংশোধন।

আকীদা বিশ্বাসের সংশোধনমূলক বক্তব্য সূরার শুরুতেও রয়েছে, শেষেও রয়েছে।

শুরুতে রয়েছে, 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, যিনি তার বান্দার ওপর কেতাব নাযিল করেছেন ...।' (আয়াত ১-৫)

আবার সূরার শেষে রয়েছে, 'বলো, আমি তোমাদের মতোই মানুষ, আমার কাছে ওহী আসে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ।........'

এভাবে আল্লাহর একত্ব প্রমাণে, শেরেক বাতিল করণে, ওহীর সত্যতা প্রতিষ্ঠায় এবং আল্লাহর অবিনশ্বর সত্তা ও তাবত সৃষ্টির নশ্বর সত্তার মধ্যে চূড়ান্ত বৈপরীত্য প্রমাণে এ সূরার প্রথম ও শেষ আয়াতগুলোর সমতান অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন।

সূরার একাধিক জায়গায় এ বিষয়টা বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে।

'আসহাবুল কাহফের' ঘটনায় আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী যুবকদের এ বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে, 'আমাদের প্রভু হচ্ছেন আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু। আমরা কখনো তাকে ছাড়া অন্য কোনো সত্ত্বাকে মাবুদ মানবো না। তখন যা বলেছি, ভুল বলেছি।'

এরপর এই কেসসার উপসংহারে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ ছাড়া তাদের আর কোনো অভিভাবক নেই। তার শাসনে আর কারো অংশীদার হবার অধিকার নেই।'

দুটো বাগিচা সংক্রান্ত ঘটনায় ঈমানদার ব্যক্তিটি তার সংগীর সাথে কথা বলার সময় বলেছিলো, 'যিনি তোমাকে প্রথমে মাটি থেকে এবং পরে এক ফোঁটা পঁচা পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর একজন পূর্ণাংগ ব্যক্তিতে পরিণত করেছেন। তাঁকে তুমি অস্বীকার করলে?'

আর এই ঘটনার উপসংহারে মন্তব্য করা হয়েছে, 'তাকে সাহায্য করতে পারে এমন কোনো দল তার ছিলো না এবং সেও সাহায্য গ্রহণ করতে সক্ষম ছিলো না। সেখানে অভিভাবকত্ব একমাত্র আল্লাহর-যিনি পরম সত্য। তিনি উত্তম প্রতিদান দাতা ও উত্তম শাস্তিদাতা।'

কেয়ামতের একটা দৃশ্য তুলে ধরে এক জায়গায় বলা হয়েছে,

'যেদিন আল্লাহ বলবেন, আমার সাথে যাদেরকে তোমরা শরীক বানিয়েছিলে, তাদেরকে ডাকো। তখন তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা ডাক শুনবে না, আর আমি তাদের মাঝে রেখে দেবো একটা ধ্বংসকূপ।'

অন্য একটা দৃশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'তবে কি কাফেররা ভেবেছে যে, আমাকে বাদ দিয়ে তারা আমার বান্দাদেরকে অভিভাবক মেনে নেবে? আমি জাহান্নামকে কাফেরদের আপ্যায়নের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি।'

এরপর আসে চিন্তা পদ্ধতি ও দৃষ্টিভংগি সংশোধনের প্রসংগ। এ বিষয়টা মোশরেকদের প্রমাণহীন ও অজ্ঞতাপ্রসূত বক্তব্য প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে, মানুষকে ভালোভাবে জেনে শুনে কথা বলা ও অজানা কথা না বলার নির্দেশ দানের মধ্য দিয়ে এবং অজানা বিষয় আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করার নির্দেশ দানের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন সূরার শুরুতে বলা হয়েছে,

'এবং তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করবে, যারা বলেছে যে, আল্লাহ একজন পুত্র গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে তাদেরও কোনো জ্ঞান নেই, তাদের বাপদাদারও নেই।'

আর গুহাবাসী (আসহাবুল কাহফ) তরুণরা বলেছে,

'এই হচ্ছে আমাদের স্বজাতির অবস্থা। তারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যান্যকে উপাস্য মেনে নিয়েছে। সেই উপাস্যদের পক্ষে ওরা কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসে না কেন?' তারা নিজেদের অবস্থানকাল নিয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় এ সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে। 'তারা বললো, তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন তোমরা কতোদিন অবস্থান করেছ।'

ঘটনার বিবরণ দান প্রসংগে এক জায়গায় যারা তাদের সংখ্যা বিষয়ে অনুমান নির্ভর কথা বলে, তাদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, 'কেউ কেউ বলবে, তারা ছিলো তিন জন, তাদের চতুর্থটা তাদের কুকুর। কেউ কেউ বলবে, তারা ছিলো পাঁচজন, তাদের ৬ষ্ঠটা তাদের কুকুর.... (আয়াত ২২) আর আল্লাহর সৎ বান্দার সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনায় রয়েছে যে, তার যে সব কার্যকলাপে মূসা (আ.) অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, তার আসল রহস্য যখন তিনি স্বয়ং উদঘাটন করলেন। তখন বললেন, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ এটা করা হয়েছে। আমি এগুলো নিজ উদ্যোগে করিনি।' (আয়াত ৮২) এখানেও বিষয়টাকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আকীদা বিশ্বাসের আলোকে মূল্যবোধের পরিশুদ্ধির বিষয়টাও এখানে বিভিন্ন জায়গায় আলোচিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ঈমান ও সৎ কাজকে। এছাড়া অন্য যেসব জড়বাদী মূল্যবোধ ও ধ্যান ধারণা রয়েছে, তাকে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে যতো সাজসজ্জা ও ভোগবিলাসের সামগ্রী রয়েছে তা নিছক পরীক্ষার জন্যে। সেগুলোর শেষ পরিণতি ধ্বংস ও বিলীন হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়, 'আমি পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল জিনিসকে পৃথিবীর সৌন্দর্যবর্ধক বানিয়েছি, যেন পরীক্ষা করতে পারি মানব জাতির মধ্যে কে অধিকতর সৎ কর্মশীল। পৃথিবীর যাবতীয় জিনিসকে আমি উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত করবো।' (আয়াত ৭-৮)

এই পর্যায়ে আরো বলা হয়েছে যে, মানুষ যতো কঠিন ও সংকীর্ণ পর্বতগুহায় আশ্রয় নিক না কেন, আল্লাহর আশ্রয়টাই অধিকতর প্রশস্ত। গুহাবাসী মোমেন যুবকরা তাদের স্বজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরকে বলেছিলো, 'ওদের ও আল্লাহ ছাড়া অন্য যেসব উপাস্যকে ওরা পূজা করে তাদের সংশ্রব যখন তোমরা ত্যাগ করেছো, তখন চলো, পর্বতগুহায় আশ্রয় নাও। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ওপর রহমত বিস্তার করবেন এবং তোমাদের কাজকে ফলপ্রসূ করবেন।' (আয়াত ১৬)

অন্য এক জায়গায় রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যেন তিনি মোমেনদের সাথে ধৈর্য সহকারে অবস্থান করেন এবং দুনিয়ার ভোগ বিলাস ও উদাসীন দুনিয়া-পুজারীদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করেন। (আয়াত ২৮-২৯)

দুটো বাগান সংক্রান্ত ঘটনায় দেখানো হয়েছে—কিভাবে একজন মোমেন অর্থ সম্পদ, পদ মর্যাদা ও জাঁকজমক ছাড়াই কেবল ঈমানী সম্পদ দ্বারা সম্মানিত হয়ে থাকে, কিভাবে সে দর্পিত ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির মোকাবেলা করে এবং আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার জন্যে তাকে ভর্ৎসনা করে। (আয়াত ৩৭-৪১)

পার্থিব জীবন এবং তার সমৃদ্ধির পর ত্বরিত ধ্বংস প্রাপ্তির উদাহরণ দিয়ে এই কেসসার ওপর মন্তব্য করা হয়েছে। (আয়াত ৪৫)

অনুরূপভাবে ধ্বংসশীল মূল্যবোধ ও চিরঞ্জীব মূল্যবোধের বিবরণও দেয়া হয়েছে এই ঘটনার উপসংহারে। (আয়াত ৪৬)

একজন সম্রাট বলে নয়, বরং একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি হিসাবে আলোচিত হয়েছেন যুল কারনায়ন। দুটো বাঁধের মাঝখানে বসবাসকারী একটা জাতি যখন তাকে ইয়াজুজ ও মাজুজের কবল থেকে তাদেরকে রক্ষার নিমিত্তে একটা বাঁধ নির্মাণের অনুরোধ জানালো এবং সেজন্যে তারা তাকে টাকা পয়সা দিতে রাযী হলো, তখন তিনি টাকা পয়সা নিতে অস্বীকার করলেন। তিনি জানালেন যে, তাদের টাকা পয়সার চেয়ে আল্লাহ তায়ালা তাকে যা দিয়েছেন, তা ঢের ভালো। (আয়াত ৯৫)

যখন বাঁধ নির্মাণ শেষ হলো, তখন ওই কাজের জন্যে নিজের মানবীয় ক্ষমতার কৃতিত্ব যাহির করলেন না, বরং এটা আল্লাহর রহমাতের অবদান বলে ঘোষণা করলেন। (আয়াত ৯৮)

সূরার শেষে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তারাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহর কোনো নিদর্শন বা কোনো বাণীকে অগ্রাহ্য করেছে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনিবার্যতাকে অস্বীকার করেছে। বলা হয়েছে যে, এ জাতীয় লোকেরা নিজেদের অন্যান্য কাজ কর্মকে যতোই ভালো মনে করুক, আসলে তার কোনো গুরুত্ব বা মূল্য নেই। (আয়াত ১০৩-১০৫)

এভাবে আমরা দেখতে পাই, এ সূরাটার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো আকীদা বিশ্বাস, চিন্তা পদ্ধতি ও দৃষ্টিভংগি সংশোধন এবং আকীদা বিশ্বাসের আলোকে মূল্যবোধ ও ধ্যান ধারণার পরিশুদ্ধি।

কয়েকটা অধ্যায়ে এই বিষয়গুলো নিয়ে এই সূরায় আলোচনা করা হয়েছে।

সূরাটা শুরুই হয়েছে আল্লাহর প্রশংসা, যিনি মোমেনদেরকে সুসংবাদ দান এবং আল্লাহর পুত্র আছে-এই মিথ্যা উক্তিকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। সেই সাথে পৃথিবীর সাজসজ্জার সামগ্রীগুলোকে পরীক্ষার সরঞ্জাম বলে আখ্যায়িত এবং তার শেষ পরিণতি ধ্বংস বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এরপরই শুরু হয়েছে আসহাবুল কাহাফ তথা গুহাবাসী যুবকদের ঘটনার বিবরণ। এ কেসসা আসলে পার্থিব সম্পদ ও জাঁকজমকের ওপর ঈমানকে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দানের একটা নমুনা মাত্র, এটা ঈমান বাঁচানোর জন্যে গুহায় আশ্রয় নিয়ে আল্লাহর রহমত কামনারও দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়টা শুরু হয়েছে রসুল (স.)-কে ধৈর্য সহকারে মোমেনদের সাথে অবস্থান করার আদেশ দানের মধ্য দিয়ে। এরপর এসেছে দুই বাগানের মালিকদের ঘটনা, যার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে মোমেনের মনে ঈমানের গৌরববোধ কত জোরদার এবং তার মোকাবেলায় দুনিয়ার সহায় সম্পদকে সে কতো মূল্যহীন মনে করে। আসল ও চিরস্থায়ী মূল্যবোধগুলো সংক্রান্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে সূরার এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে কেয়ামত সংক্রান্ত কিছু দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। তবে এর মাঝখানে রয়েছে আদম ও ইবলীসের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। শেষে এসেছে যালেমদেরকে ধ্বংস করার ব্যাপারে আল্লাহর অনুসৃত নীতির বর্ণনা। সেখানে এ কথাও জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা পাপীদের ওপরও যথেষ্ট দয়ালু এবং তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়টা পুরোপুরিই ব্যয়িত হয়েছে হযরত মূসা (আ.) ও জনৈক সৎ বান্দার ঘটনা বর্ণনায়। পঞ্চম অধ্যায় যুল কারনাইনের কেসসার বিবরণ দানে। আর উপসংহারে আলোচিত হয়েছে সূরার সূচনা পর্বের বিষয়গুলো। যথা মোমেনদেরকে সুসংবাদ দান, কাফেরদেরকে ভীতি প্রদর্শন, ওহীর সত্যতা প্রতিপাদন এবং আল্লাহকে শেরেক থেকে পবিত্র ঘোষণা।

এবার আমরা সূরার প্রথম অধ্যায়ের ব্যাখ্যার প্রবৃত্ত হব।

সূরা আল কাহ্ফ

আয়াত ১১০ রুকু ১২

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۟ؕ ﴿١﴾ قَیِّمًا لِّیُنْذِرَ بَاْسًا شَدِیْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَیُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾ مَّاكِثِیْنَ فِیْهِ اَبَدًا ﴿٣﴾ وَّیُنْذِرَ الَّذِیْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ﴿٤﴾ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ یَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰۤی اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ یُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِیْثِ اَسَفًا ﴿٦﴾ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَی الْاَرْضِ زِیْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَیُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَاِنَّا

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

১. সব তা'রীফ আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি তাঁর (একজন বিশেষ) বান্দার প্রতি (এ) গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তার কোথাও তিনি কোনোরকম বক্রতা রাখেননি; ২. (একে তিনি) প্রতিষ্ঠিত করেছেন (সহজ সরল একটি পথের ওপর), যাতে করে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সে (নবী তাদের জাহান্নামের আযাবের ব্যাপারে) সতর্ক করে দিতে পারে এবং যারা ঈমানদার, যারা নেক কাজ করে, তাদের সে (এ মর্মে) সুসংবাদ দিতে পারে (যে), তাদের জন্যে আল্লাহর দরবারে উত্তম পুরস্কার রয়েছে, ৩. যেখানে তারা চিরকাল থাকবে, ৪. এবং সেসব লোকদেরও ভয় দেখাবে যারা (মূর্খের মতো) বলে, আল্লাহ তায়ালা সন্তান গ্রহণ করেছেন। ৫. (অথচ এ দাবীর পক্ষে) তাদের কাছে কোনো জ্ঞান (-সম্মত দলীল প্রমাণ) নেই, তাদের বাপ দাদাদের কাছেও (এ ব্যাপারে কোনো যুক্তি) ছিলো না; এ সত্যিই বড়ো একটি কঠিন কথা, যা তাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে; (আসলে) তারা (জঘন্য) মিথ্যা ছাড়া কিছুই বলে না। ৬. (হে নবী,) যদি এরা এ কথার ওপর ঈমান না আনে তাহলে মনে হয় দুঃখে-কষ্টে তুমি এদের পেছনে নিজেকেই বিনাশ করে দেবে। ৭. যা কিছু এ যমীনের বুকে আছে আমি তাকে তার জন্যে শোভা বর্ধনকারী (করে) পয়দা করেছি, যাতে করে তাদের আমি পরীক্ষা করতে পারি যে, তাদের মধ্যে (কাজকর্মের দিক থেকে) কে বেশী উত্তম। ৮. (আজ)

لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۝٨ اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ
وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ۝٩ اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا
رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۝١٠ فَضَرَبْنَا عَلٰٓى
اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۝١١ ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ
اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا اَمَدًا ۝١٢ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّهُمْ
فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ۝١٣ وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا
فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَاۡ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ
اِذًا شَطَطًا ۝١٤ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ؕ لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ

যা কিছু এর ওপর আছে, (একদিন ধ্বংস করে দিয়ে একে) আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করে দেবো। ৯. (হে নবী,) তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও পাহাড়ের (উপত্যকার) অধিবাসীরা আমার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি বিস্ময়কর নিদর্শন ছিলো? ১০. (ঘটনাটি এমন হয়েছিলো,) কতিপয় যুবক যখন গুহায় আশ্রয় নিলো, অতপর তারা (আল্লাহর দরবারে এই বলে) দোয়া করলো, হে আমাদের মালিক, একান্ত তোমার কাছ থেকে আমাদের ওপর তুমি অনুগ্রহ দান করো, আমাদের কাজকর্ম (আঞ্জাম দেয়ার জন্যে) তুমি আমাদের সঠিক পথ দেখাও। ১১. অতপর আমি গুহার ভেতরে তাদের কানে বহু বছর ধরে (ঘুমের) পর্দা লাগিয়ে রাখলাম। ১২. তারপর (এক পর্যায়ে) আমি তাদের (ঘুম থেকে) উঠিয়ে দিলাম, যাতে করে আমি একথা জেনে নিতে পারি (তাদের) দু'দলের মধ্যে কোন্ দলটি ঠিক করে বলতে পারে যে, তারা কতোদিন সেখানে অবস্থান করেছিলো।

রুকু ২

১৩. (হে নবী,) আমিই তোমার কাছে তাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি; (মূলত) তারা ছিলো কতিপয় নওজোয়ান ব্যক্তি, যারা তাদের মালিকের ওপর ঈমান এনেছিলো, আমি তাদের হেদায়াতের পথে এগিয়েও দিয়েছিলাম। ১৪. আমি তাদের অন্তকরণকে (ধৈর্য দ্বারা) দৃঢ়তা দান করেছি, যখন তারা (আল্লাহর পথে) দাঁড়িয়ে গেলো এবং ঘোষণা করলো, আমাদের মালিক তো হচ্ছেন তিনি, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের মালিক, আমরা কখনো আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকে ডাকবো না, যদি (আমরা) এমন (অযৌক্তিক) কথা বলি তাহলে (তা হবে মারাত্মক) দ্বীন বিরোধী কাজ। ১৫. এরা হচ্ছে আমাদের স্বজাতির (লোক, যারা) তাঁকে বাদ দিয়ে অসংখ্য মাবুদ (-এর গোলামী) গ্রহণ করেছে; (তারা যদি সত্যবাদীই হয় তাহলে) তারা স্পষ্ট দলীল নিয়ে আসে না কেন? তার

بِسُلْطٰنٍۢ بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾ وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ﴿١٦﴾ وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾ وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ۖۗ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖۗ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ؕ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾ وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ؕ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ؕ قَالُوْا

চাইতে বড়ো যালেম আর কে, যে আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে! ১৬. (অতপর জোয়ানরা পরস্পরকে বললো,) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের যারা মাবুদ বানায় তাদের কাছ থেকে তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেই গেলে, তখন তোমরা (এখান থেকে বের হয়ে বিশেষ) একটি গুহায় গিয়ে আশ্রয় নাও, (সেখানে) তোমাদের মালিক তোমাদের ওপর তাঁর রহমতের (ছায়া) বিস্তার করে দেবেন এবং তোমাদের বিষয়গুলো তোমাদের জন্যে সহজ করে দেবেন। ১৭. (হে নবী,) তুমি যদি (সে গুহা দেখতে, তাহলে) দেখতে পেতে, তারা তার (মধ্যবর্তী) এক প্রশস্ত চত্বরে অবস্থান করছে, সূর্য (তার) উদয়কালে তাদের গুহার দক্ষিণ পাশ দিয়ে হেলে যাচ্ছে, (আবার) যখন তা অস্ত যায় তখন তা গুহার বাম পাশ দিয়ে অতিক্রম করে (সূর্যের প্রখরতা কখনো তাদের কষ্টের কারণ হয় না); আসলে এ সবই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার (কুদরতের) নিদর্শন, (এ সব নিদর্শনের মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা যাকে হেদায়াত দান করেন সে-ই একমাত্র হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়, আর (যাকে) তিনি গোমরাহ করেন সে কখনো কোনো পথ প্রদর্শনকারী ও অভিভাবক পেতে পারে না।

রুকু ৩

১৮. (হে নবী, তুমি যদি দেখতে তাহলে) তুমি তাদের ভাবতে, তারা বুঝি জেগেই রয়েছে, অথচ তারা কিন্তু ঘুমন্ত, আমি তাদের (কখনো) ডানে (কখনো) বামে পরিবর্তন করে দিতাম, তাদের কুকুরটি (গুহার) সামনে তার হাত দুটি প্রসারিত করে (পাহারারত অবস্থায় বসে) ছিলো, তুমি যদি তাদের দিকে (সত্যি) উঁকি মেরে দেখতে, তাহলে তুমি অবশ্যই তাদের কাছ থেকে পেছনে ফিরে পালিয়ে যেতে এবং তাদের (এ আজব দৃশ্য) দেখে তুমি নিসন্দেহে ভয়ে (তাদের থেকে) আতংকিত হয়ে যেতে। ১৯. এ ভাবেই তাদের আমি (ঘুম থেকে) উঠিয়ে দিলাম, যাতে করে তারা (তাদের অবস্থান সম্পর্কে) নিজেরা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে; (কথা প্রসংগে) তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো (বলো তো),

لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۚ فَابْعَثُوْٓا

اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ

بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ﴿١٩﴾ اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ

يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿٢٠﴾ وَكَذٰلِكَ

اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ

اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ۚ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ۚ

قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾ سَيَقُوْلُوْنَ

ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا ۢ بِالْغَيْبِ ۚ

তোমরা এ গুহায় কতোকাল অবস্থান করেছো; তারা বললো, (বড়ো জোর) একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ আমরা (এখানে) অবস্থান করেছি; অতপর (যখন তারা একমত হতে পারলো না তখন) তারা বললো, তোমাদের মালিকই এ কথা জানেন, তোমরা (এ গুহায়) কতো কাল অবস্থান করেছো; এখন (সে বিতর্ক রেখে বরং) তোমরা তোমাদের একজনকে তোমাদের এ মুদ্রাসহ শহরে পাঠাও, সে (বাজারে) গিয়ে দেখুক কোন খাবার উত্তম, অতপর সেখান থেকে কিছু খাবার তোমাদের কাছে নিয়ে আসুক, সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে এবং সে যেন কোনো অবস্থায় কাউকে তোমাদের ব্যাপারে কিছু জানতে না দেয়। ২০. তারা হচ্ছে (এমন) সব লোক যদি তাদের কাছে তোমাদের (কথাটি) তারা প্রকাশ করে দেয়, তাহলে তারা তোমাদের প্রস্তরাঘাত (করে হত্যা) করবে কিংবা তোমাদের (জোর করে) তারা তাদের দ্বীনে ফিরিয়ে নেবে, (আর একবার) তেমনটি হলে কখনোই তোমরা মুক্তি পাবে না। ২১. আর এভাবেই আমি (একদিন) তাদের ব্যাপার (শহরবাসীদের) জানিয়ে দিলাম, যাতে করে তারা (এ কথা) জানতে পারে, (মৃতকে জীবন দেয়ার ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা (আসলেই) সত্য এবং কেয়ামতের (আসার) ব্যাপারেও কোনো রকম সন্দেহ নেই, যখন তারা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে বিতর্ক করে যাচ্ছিলো, (তখন) কিছু লোক বললো, (তাদের সম্মানে) তাদের ওপর একটি (স্মৃতি-) সৌধ নির্মাণ করে দাও; (আসলে) তোমাদের মালিকই তাদের সম্পর্কে সর্বাধিক খবর রাখেন; (অপর দিকে) যেসব মানুষ তাদের কাজের ওপর বেশী প্রভাবশালী ছিলো তারা বললো (স্মৃতিসৌধ বানানোর বদলে চলো)– আমরা তাদের ওপর একটি মাসজিদ বানিয়ে দেই। ২২. কিছু লোক বলে, (গুহার অধিবাসীরা ছিলো) তিন জন, ওদের মধ্যে চতুর্থটি (ছিলো) ওদের (পাহারাদার) কুকুর, (আবার) কিছু লোক বলে, (তারা ছিলো) পাঁচ জন,

وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا

قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ

أَحَدًا ﴿٢٢﴾ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ

وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا

رَشَدًا ﴿٢٤﴾ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ

اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ

مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ وَاتْلُ مَا

তাদের ষষ্ঠটি (ছিলো) ওদের কুকুর, (আসলে) অজানা অদেখা বিষয়সমূহের প্রতি এরা (খামাখা) অনুমান নিক্ষেপ করেই (এ সব কিছু) বলছে, তাদের কেউ বলে (ওরা ছিলো) সাত জন এবং অষ্টমটি ছিলো তাদের কুকুর; (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো (হ্যাঁ), আমার মালিক ভালো করেই জানেন ওদের (আসল) সংখ্যা কতো ছিলো, তাদের সংখ্যা খুব কমসংখ্যক লোকই বলতে পারে। তুমিও এদের ব্যাপারে সাধারণ আলোচনার বাইরে বেশী বিতর্ক করো না এবং তাদের সম্পর্কে (খামাখা অন্য) মানুষদের কাছেও জিজ্ঞাসাবাদ করো না।

রুকু ৪

২৩. (হে নবী,) কখনো কোনো কাজের ব্যাপারে এ কথা বলো না, (এ কাজটি) আমি আগামীকাল করবো, ২৪. (হ্যাঁ,) বরং (এভাবে বলো,) আল্লাহ তায়ালা যদি চান (তাহলেই আমি আগামীকাল এ কাজটা করতে পারবো), যদি কখনো (কোনো কিছু) ভুলে যাও তাহলে তোমার মালিককে স্মরণ করো এবং বলো, সম্ভবত আমার মালিক এর (কাহিনীর) চাইতে নিকটতর কোনো কল্যাণ দিয়ে আমাকে পথ দেখাবেন। ২৫. তারা তাদের (এ) গুহায় কাটিয়েছে মোট তিনশ বছর, তারা (এর সাথে) যোগ করেছে আরো নয় (বছর)। ২৬. (হে নবী,) তুমি বলো, (বস্তুত) একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সঠিক করে বলতে পারেন, ওরা (গুহায়) কতো বছর কাটিয়েছে, আসমানসমূহ ও যমীনের (যাবতীয়) গায়ব বিষয়ের জ্ঞান তো একমাত্র তাঁর (জন্যেই নির্দিষ্ট রয়েছে); কতো সুন্দর দ্রষ্টা তিনি, কতো সুন্দর শ্রোতা তিনি! তিনি ছাড়া তাদের দ্বিতীয় কোনোই অভিভাবক নেই, আল্লাহ তায়ালা নিজের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় অন্য কাউকে কখনো শরীক করেন না। ২৭. (হে নবী,) তোমার ওপর

أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾

তোমার মালিকের যে কেতাব নাযিল করা হয়েছে তা তুমি তেলাওয়াত করতে থাকো; তাঁর (কেতাবে বর্ণিত) কথাবার্তা রদবদল করার কেউই নেই, তিনি ছাড়া তুমি আর কোনোই আশ্রয়স্থল পাবে না।

তাফসীর

আয়াত ১-২৭

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর ....। *(আয়াত ১-৪৬)*

অত্যন্ত দৃপ্ত, বলিষ্ঠ ও আপোষহীন বক্তব্য দিয়ে সূরার সূচনা করা হয়েছে। একই বলিষ্ঠতা সহকারে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে 'নিজ বান্দার' ওপর এমন এক কেতাব নাযিল করার কারণে, যাতে কোনো বক্রতা, অস্পষ্টতা, বা পক্ষপাতিত্ব নেই। 'যাতে তিনি তার পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তির ভয় দেখাতে পারেন।'

প্রথম আয়াত থেকেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বক্তব্য রাখা হয়েছে। ফলে আকীদা বিশ্বাসে কোনো অস্পষ্টতা থাকার অবকাশ নেই। আল্লাহ তায়ালা কেতাব নাযিলকারী। কেতাব নাযিল করার জন্যে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে।' আর মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর বান্দা। আসলে সমগ্র সৃষ্টিজগতই আল্লাহর বান্দা ও গোলাম। কোথাও কেউ তার সন্তান নয় এবং শরীকও নয়।

আর এ কেতাবে কোনো বক্রতা নেই। 'কাইয়িমান' অর্থাৎ অকাট্য ও বলিষ্ঠ। একবার বক্রতা নেই বলা এবং আর একবার বলিষ্ঠতা ব্যক্ত করার মাধ্যমে এই কেতাবের স্থীতিশীলতাকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বারবার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

কেতাব নাযিল করার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন, 'যেন তিনি নিজের পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তির ভয় দেখাতে পারেন এবং সৎ কর্মশীল মোমেনদেরকে আশ্বাস দিতে পারেন যে, তাদের জন্যে উত্তম পুরস্কার রয়েছে।

আকীদা গ্রহণে কাফেরদের ভ্রান্তনীতি

সমগ্র বক্তব্যে কঠোর ভীতি প্রদর্শনের মনোভাবটা প্রবল। প্রথমে একবার সংক্ষেপে এই মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে এভাবে, 'যেন তিনি নিজের পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করতে পারেন।'

তারপর পুনরায় বিশেষভাবে বলা হয়েছে, 'এবং যারা বলে যে আল্লাহ একজন পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে সাবধান করার জন্যে।' এরই মাঝখানে এসেছে সৎকর্মশীলদের পুরস্কারের সুসংবাদ। 'যারা সৎকর্মশীল' এই কথাটা যুক্ত করার মাধ্যমে ঈমানের প্রকাশ্য বাস্তব প্রমাণ তুলে ধরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ সৎকর্মশীলতাই যে ঈমানের বাস্তব প্রমাণ, সে কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এরপর শুরু হয়েছে সেই ভ্রান্ত নীতির সমালোচনা যা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে বড় বিষয় আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে কাফেররা অনুসরণ করে থাকে। বলা বাহুল্য, সেই ভ্রান্ত নীতিটা হলো, না জেনে শুনে একেবারেই অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলা, আল্লাহ তায়ালা কাউকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেছেন কিনা সে বিষয়ে তাদেরও কোনো জ্ঞান নেই, তাদের বাপদাদারও নেই।'

পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে যে, এ ধরনের অজানা বিষয়ে অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলা বড়ই জঘন্য ও ভয়ংকর অপরাধ-

'তাদের মুখ থেকে বের হওয়া এ কথাটা বড়ই সাংঘাতিক। তারা মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই বলে না।'

'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন'— এ কথাটা যে অত্যন্ত সাংঘাতিক, তা বোঝানোর জন্যে উপরোক্ত আয়াতাংশের ভাব ও ধ্বনি দুটোই সমভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর প্রথম শব্দটা 'কাবুরাত' অর্থ বড়ই সাংঘাতিক। এ শব্দটার উচ্চারণে এমন ধ্বনির সৃষ্টি হয় যে, শ্রোতা তা শোনামাত্রই তার ভয়াবহতা উপলব্ধি করে আঁতকে ওঠে এবং গোটা পরিবেশেই আতংকের ছাপ পড়ে যায়। এরপর 'কালেমাতান' শব্দটা এই উপলব্ধিকে আরো তীব্র ও শাণিত করে। তাদের মুখ থেকে বের হওয়া। এ কথা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, কথাটা তাদের মুখ থেকে বিচার বিবেচনা ছাড়াই যেন বেরিয়ে আসে এবং কোনো ভাবনা চিন্তা ও জ্ঞান বুদ্ধি প্রয়োগ ছাড়াই তা নিছক ঝোকের বশেই যেন বলা হয়। 'আফওয়াহেহিম' শব্দটার বিশেষ ধ্বনিগত ব্যঞ্জনা এই কথার সাংঘাতিক ও ভয়াবহ রূপটাকে আরো ভয়াবহ করে প্রকাশ করে। কেননা এই শব্দটা উচ্চারণকারীকে প্রথমে মুখ খুলে হা করতে হয়, তারপর ক্রমাগত দুটো 'হা' (আরবী বর্ণ মালার 'হা) থাকায় এর 'ধ্বনিতে মুখটা সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে যায় এবং শব্দের শেষে 'মিম' এর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত মুখ ভর্তি থাকে। এভাবে এই শেরেকমূলক বক্তব্যের ভয়াবহতাকে অর্থ ও ধ্বনি উভয় দিক দিয়েই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অতপর আয়াতের শেষ ভাগে, 'তারা মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই বলে না' এই বাক্য দ্বারা এই সমালোচনাকে আরো জোরদার করা হয়েছে এবং এই ভ্রান্ত অসার ও অসত্য কথাকে আরো নিকৃষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে।

পরবর্তী আয়াতে এমন ভাষায় রসুল (স.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, যা দ্বারা তার বর্তমান দুশ্চিন্তাকে অপছন্দ করা হয়েছে। রসূল (স.)-এর জাতি কর্তৃক কোরআনকে ক্রমাগত অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করতে থাকায় এবং সুনিশ্চিত ধ্বংসের পথে ধাবিত হতে থাকায় তিনি এত মর্মাহত ছিলেন যে, তিনি যেন আত্মঘাতী হতে চলেছেন। এই অবস্থার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তবে মনে হয়, তুমি তাদের পেছনে ঘুরে ঘুরে আক্ষেপে নিজেকে ধ্বংস করে ছাড়বে, যদি তারা এই বাণীকে গ্রহণ না করে।'

অর্থাৎ মর্মবেদনায় ও দুঃখে তুমি বুঝি মরেই যাবে—যদি তারা কোরআনের প্রতি ঈমান না আনে। অথচ তাদের নিয়ে দুঃখ করা ও মর্মাহত হওয়া তোমার পক্ষে বেমানান। এটা তুমি বন্ধ করো। কারণ আমি তো পৃথিবীর যাবতীয় সহায় সম্পদ ও সন্তান সন্তুতিকে পরীক্ষার সামগ্রী হিসাবে সৃষ্টি করেছি। ৭ নং আয়াতটি লক্ষ্য করুন-

'আমি পৃথিবীতে বিদ্যমান সব কিছুকে তার সৌন্দর্যোপকরণ হিসাবে বানিয়েছি, যাতে মানুষকে পরীক্ষা করতে পারি যে, কে বেশী সৎকর্মশীল।'

কে বেশী সৎকর্মশীল তা আল্লাহ তায়ালা এমনিই জানেন। কিন্তু তিনি তাঁর বান্দাদেরকে শুধু সেই কাজের ফল দেন, যা তারা বাস্তবিক পক্ষেই করে। এখানে অসৎ কর্মশীলদের সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কেননা না বললেও বিষয়টা সুস্পষ্ট।

পৃথিবীর এই রূপসৌন্দর্য নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবী একদিন এসব হারিয়ে ফেলবে। কেয়ামতের আগে ভূ-পৃষ্ঠের সব কিছু ধ্বংস হয়ে তা একটা বিরান উন্মুক্ত প্রান্তরে পরিণত হবে। ৮নং আয়াতে একথাই বলা হয়েছে।

'আর আমি ভূ-পৃষ্ঠকে একটা বিরান প্রান্তর বানাবো।'

এ আয়াতের ভাষায় ও এতে উপস্থাপিত দৃশ্যে একটা ভয়াবহ অবস্থা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'জুরুযান' শব্দটার ধ্বনিগত ব্যঞ্জনা থেকেই একটা নির্জলা ভূমির দৃশ্য ফুটে ওঠে। আর 'সঈদান' শব্দটা থেকে ফুটে ওঠে সমতল ও প্রস্তরময় চিত্র।

আসহাবে কাহাফের ঘটনা

এরপর শুরু হয়েছে আসহাবুল কাহফের ঘটনা। নিষ্ঠাবান মোমেনদের অন্তরে ঈমান কতো দৃঢ় ও মযবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তার একটা নমুনা এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। মোমেনের হৃদয় কিভাবে তার ঈমান নিয়ে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকে, কিভাবে পার্থিব সহায় সম্পদ ও ভোগবিলাসের ওপর ঈমানকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। ঈমান নিয়ে সমাজে তিষ্টাতে না পারলে কিভাবে তা নিয়ে প্রয়োজনে পর্বতগুহায় গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে যাবতীয় বিপদ থেকে রক্ষা করেন এবং কিভাবে তাদের ওপর নিজের করুণার ছায়া বিস্তার করেন, তা এ কাহিনীতে সুস্পষ্ট।

এ কাহিনী সম্পর্কে বহু বর্ণনা ও বহু জনশ্রুতি রয়েছে। কতিপয় প্রাচীন পুস্তকে ও উপকথায় বিভিন্নভাবে এ কাহিনীর বিবরণ পাওয়া যায়। তবে আমরা সেসব বিবরণকে হুবহু গ্রহণ করতে পারি না। আমাদেরকে একমাত্র কোরআনের বিবরণেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। কেননা এটাই একমাত্র নির্ভুল উৎস। বিভিন্ন তাফসীরে বিশুদ্ধ সূত্রের বরাত ছাড়া যেসব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তা আমরা বর্জন করেছি। কেননা কোরআন নিজেই আমাদেরকে তার বাইরের অপ্রামাণ্য তথ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে এবং অনুমাননির্ভর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করতে বলেছে।

এই কেসসা ও যুলকারনায়নের কেসসা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, ইহুদীরা মক্কাবাসীকে রসূল (স.)-এর কাছে এই দুটো ঘটনা ও আত্মা কী জিনিস, তা জিজ্ঞেস করতে প্ররোচনা দিয়েছিলো। আবার কিছু কিছু বর্ণনায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, মক্কাবাসীই ইহুদীদের কাছে এমন কিছু প্রশ্নের ফিরিস্তি চেয়েছিলো, যা দ্বারা তারা রসূল (স.)-এর সত্যবাদিতা পরীক্ষা করবে। এসব বর্ণনা পুরোপুরি বা আংশিক সত্য হতে পারে। যুলকারনায়নের ঘটনার শুরুতে বলা হয়েছেঃ

'তারা তোমাকে যুলকারনায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।'..... কিন্তু আসহাবুল কাহফের ঘটনার শুরুতে এ ধরনের প্রশ্নের কোনো উল্লেখ্য নেই। এবার আমরা এই ঘটনা নিয়ে কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা করছি। আমরা আগেই বলে এসেছি যে এই সূরার কেন্দ্রীয় বক্তব্যের সাথে এ ঘটনার সুস্পষ্ট সংযোগ রয়েছে।

এই ঘটনা উপস্থাপনে শৈল্পিক দিক দিয়ে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, তা হলো প্রথমে সংক্ষিপ্ত সার এবং পরে বিশদ বিবরণ দানের পদ্ধতি। এতে ঘটনার কিছু কিছু দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে এবং কিছু কিছু দৃশ্য শূন্য রাখা হয়েছে, যা আয়াতের ভাষা থেকেই বুঝা যায়। কাহিনীটা শুরু হয়েছে এভাবে,

'তুমি কি ভেবে দেখেছো যে, গুহা ও 'রকীমের' অধিবাসীদের কথা? তারা ছিলো আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর! যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিলো, তখন বললো, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করো....' (আয়াত ৯-১২)

এখানে গোটা কাহিনীর সংক্ষিপ্ত সার দেয়া হয়েছে এবং এর সুদূরপ্রসারী রূপরেখা চিহ্নিত করা হয়েছে। এ থেকে আমরা যা জানতে পারি তা হলো, গুহাবাসীরা ছিলো কতিপয় যুবক। তবে তাদের সংখ্যা অজ্ঞাত। তারা ঈমানদার অবস্থায় গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলো। গুহার ভেতরে অবস্থানকালে তাদের কানে তালামারা ছিলো। অর্থাৎ তারা ঘুমন্ত ছিলো এবং কতো বছর যাবত ঘুমন্ত ছিলো তা আমাদের অজানা। পরে এক সময় তারা তাদের দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলো। তাদের দুটো দল ঘুমের সময় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলো। অতপর তারা গুহায় অবস্থান করার পর আবার জেগে ওঠে, যাতে কোন্ পক্ষের তথ্য অধিকতর সঠিক তা জানা যায়। তাদের ঘটনাটা বিরল হলেও আল্লাহর নিদর্শন হিসাবে বিস্ময়কর নয়। বিশ্বপ্রকৃতিতে ও তার আশ পাশের সৃষ্টি জগতে গুহা ও রকীমবাসীর চেয়েও বিস্ময়কর জিনিস অনেক রয়েছে।(১)

কাহিনীটার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিকারী এই সংক্ষিপ্ত সার তুলে ধরার পর এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া শুরু হয়েছে। এই বিস্তারিত বিবরণের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা এ কাহিনী সম্পর্কে যা বলছেন, সেটাই সকল পরস্পর বিরোধী তথ্যসমূহের মধ্যে সঠিক, চূড়ান্ত ও নিশ্চিত তথ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি তোমার কাছে তাদের প্রকৃত তথ্য ব্যক্ত করছি।'....... (আয়াত ১৩-১৬)

এ চারটা আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে এই কাহিনীর প্রথম দৃশ্য।

'তারা ছিলো এমন কতিপয় যুবক, যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিলো এবং আমি তাদেরকে আরো বেশী হেদায়াত দিয়েছিলাম।'

অর্থাৎ তাদের কী কর্মপন্থা অবলম্বন করা উচিত, তা আমি তাদের মগযে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।

'আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম।'

ফলে তাদের মন শান্ত হয়ে গেলো, যে সত্যের পথে তারা আছে, সে সম্পর্কে সংশয়মুক্ত হয়ে গেলো এবং ঈমানদার হওয়াকেই তারা গর্ব ও সম্মানের ব্যাপার বলে মনে করলো। 'যখন তারা দাঁড়ালো',

বস্তুত দাঁড়ানো হলো দৃঢ় সংকল্প ও স্থিরতার লক্ষণ।

'তারা বললো, আমাদের প্রভু তিনিই, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু।'

অর্থাৎ তিনি গোটা বিশ্বজগতের প্রভু ও অধিপতি।

'আমরা তাকে ছাড়া আর কোনো মাবুদকে ডাকবো না।'

কেননা তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরীক নেই।' (যদি ডাকি) তবে আমরা হবো অসত্য ভাষী।'

অর্থাৎ আমরা তাহলে বিপথগামী হয়ে যাবো ও সঠিক পথ হারিয়ে ফেলবো।

অতপর তারা তাদের জাতির অনুসৃত পথের দিকে দৃষ্টি দিলো এবং তার সমালোচনা করে বললো,

---

(১) 'কাহফ' হচ্ছে পর্বতের গুহা বা ফাঁকা স্থান। আর 'রকীম' সাধারণত সেই ফলককে বলা হয় যাতে গুহাবাসীর নামের তালিকা রয়েছে। সম্ভবত এই ফলকটা ঐ গুহার দরজায় ঝুলন্ত পাওয়া গিয়েছিলো।

'এই হলো আমাদের জাতি। তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে ইলাহ মেনে নিয়েছে। তারা নিজেদের সম্পর্কে কোনো বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ আনেনা কেন?'

বস্তুত আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক কর্মপন্থা যে, মানুষের হাতে নির্ভরযোগ্য ও অন্যদের মনমগযে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম যুক্তিপ্রমাণ থাকা চাই। নচেত তা হবে নিকৃষ্ট ধরনের মিথ্যাচার। কেননা এটা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কেই মিথ্যাচার।

'যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, তার চেয়ে অত্যাচারী আর কে আছে?'

এ পর্যন্ত এসে যুবকদের নীতিগত অবস্থান সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে জানা যায়। কোনো সন্দেহ সংশয় ও অস্পষ্টতার অবকাশ থাকে না। তারা ছিলো যুবক। শারীরিকভাবে শক্ত সমর্থ, ঈমানের দিক দিয়ে অটুট ও অবিচল এবং আপন জাতির অনুসৃত নীতির বিরোধিতায় আপোষহীন।

এ দুটো পথ ও মতাদর্শ পরস্পর বিরোধী। কাজেই উভয়ের মধ্যে আপোষ ও সমঝোতার অবকাশ নেই। তাই আপন আদর্শ নিয়ে পালানো ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় নেই। তারা স্বজাতির কাছে প্রেরিত কোনো রসূল নয় যে, নিজেদের নির্ভুল আদর্শ দিয়ে তাদের বাতিল আদর্শের মোকাবেলা করবে, তাদেরকে নিজেদের আদর্শের দিকে আহ্বান জানাবে এবং নবী ও রসূলদের ন্যায় ভাগ্য বরণ করবে। একটা যালেম ও কাফের সমাজে তারা এমন ক'জন যুবক, যাদের সামনে নির্ভুল আদর্শ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সেই আদর্শের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ্যে ঘোষণা করলে সেখানে তাদের জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়, আবার স্বজাতির সাথে আপোষ করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব। তারা যে েবেদেবীর পূজা করে, তারা যেভাবে নেতৃস্থানীয় লোকদের দাসত্ব করে– জীবনের নিরাপত্তার খাতিরে প্রকাশ্যে সেই দেবদেবীর পূজা করবে, তাদের বানানো আইন কানুন মেনে নেবে এবং গোপনে আল্লাহর এবাদাত করবে–এ ফর্মূলা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলো না। খুব সম্ভবত তাদের আদর্শিক স্বাতন্ত্র ওই জাতির কাছে ফাঁস হয়ে গিয়েছিলো। তাই নিজেদের দ্বীন ও ঈমানকে বাঁচাতে তাদের পালিয়ে যাওয়া অনিবার্য হয়ে পড়েছিলো। পর্বতের গুহাকে জীবন পথের একটা সোপান হিসাবে গ্রহণ না করে তাদের উপয়ান্তর ছিলো না। তাই পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে তারা পর্বতগুহায় আত্মগোপন করার সিদ্ধান্ত নিলো,

'তোমরা যখন আপন জাতিকে ও আল্লাহ ছাড়া তারা যার পূজা করে তাকে পরিত্যাগ করেছো, তখন পর্বতগুহায় আশ্রয় নাও.......'

এখানে মোমেনদের হৃদয়ের এক বিস্ময়কর অবস্থা উদঘাটিত হয়েছে। সেটা হলো, আপন জনগণ, ঘরবাড়ী, আত্মীয় স্বজন এবং পার্থিব ভোগবিলাসের যাবতীয় উপকরণ পরিত্যাগকারী এই যুবকরা সংকীর্ণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কষ্টকর গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে এবং এই অনুগ্রহকে অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী মনে করে।

'তোমাদের প্রভু তোমাদের ওপর অনুগ্রহ বিস্তার করবেন'.....

এই বিস্তার করবেন কথাটার ভেতরে ব্যাপকতা ও প্রশস্ততার ভাব প্রতিফলিত হয়েছে। তাই সংকীর্ণ হওয়া সত্তেও ওই পর্বতগুহাই তাদের জন্যে এক সুপরিসর স্থানে পরিণত হয়, যেখানে আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ ছড়িয়ে পড়ে, সেই সংকীর্ণ, কষ্টকর ও শ্বাসরুদ্ধকর দেয়াল ঘেরা গুহাটাও তাদের জন্যে সহনীয়, কোমল ও আনন্দময় স্থানে পর্যবসিত হয়।

যে উপকরণটি এমন কষ্টকর স্থানকেও সুখময় বানায়, তা হচ্ছে ঈমান।

এর মোকাবেলায় পার্থিব উপকরণাদির মূল্য কতোটুকু? পার্থিব জীবনে মানুষের কাছে যে সব উপকরণ, সাজসরঞ্জাম ও মূল্যবোধ পরম আদরের সামগ্রী, তার কী মূল্য আছে এই ঈমানের সামনে? ঈমানের সম্পদে সমৃদ্ধ ও করুণাময় আল্লাহর সাথে পরিচিত হৃদয়ের কাছে স্বতন্ত্র একটা জগত রয়েছে, যা আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ, সন্তোষ ও প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ এবং তা মোমেনের কাছে পার্থিব জগতের চেয়ে ঢের বেশী সুখময়।

এই দৃশ্যের বিবরণ সংক্ষেপে এই যে, যুবকরা গুহার অভ্যন্তরে অবস্থান নিয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন। এরপর দৃশ্যান্তরে যাওয়ার জন্যে এ দৃশ্যের যবনিকাপতন ঘটলো।

'তুমি দেখতে পেতে, তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থানকালে সূর্য তাদের গুহার দক্ষিণ পাশে হেলে যায় এবং অস্তকালে বাম পাশ দিয়ে অতিক্রম করে ....। (আয়াত ১৭-১৮)

একটা বিস্ময়োদ্দীপক বিমূর্ত চিত্র শব্দের তুলিতে এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গুহাবাসী যুবকদের অবস্থার এ ছবি ঠিক যেন একটা ভিডিও ক্যাসেটে তোলা ছবির মতোই। পর্বত গুহার ওপর সূর্যের আলো যাতে না পড়ে, সে জন্যে সূর্য যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই একদিকে হেলে গিয়েছে। 'তাযাওয়ারু' শব্দটার অর্থ (হেলে যায়) ইচ্ছাকৃতভাবে কাজ করার অর্থবোধক। অনুরূপভাবে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় গুহার উত্তর দিক দিয়ে চলে যাওয়াটাও একই ধরনের অর্থবোধক।

এই বিস্ময়কর দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার আগে কোরআন যুবকদের অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেছে। এটা কোরআনের একটা সুপরিচিত মন্তব্য যা দ্বারা বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনাকালে মাঝে মাঝে উপযুক্ত স্থানে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। মন্তব্যটা হলো,

'এ হচ্ছে আল্লাহর একটা নিদর্শন।'

অর্থাৎ যুবকদেরকে পর্বতগুহায় এমনভাবে রাখা, যাতে সূর্য তাদের কাছে গিয়ে আলো দিলেও তার তীব্র কিরণ দ্বারা তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় না, অথচ তারা যথাস্থানে নিশ্চল কিন্তু জীবিতাবস্থায় অবস্থান করে এটা নিসন্দেহে আল্লাহর একটা নিদর্শন।

'যাকে আল্লাহ হেদায়াত করেন, সে হেদায়াত পায়। আর তিনি যাকে বিপথগামী করেন, তার জন্যে তুমি কখনো কোনো পথ প্রদর্শক পাবে না।'

হেদায়াত ও গোমরাহীর জন্যে একটা শাশ্বত নিয়ম আছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সাহায্যে আল্লাহর পথ চিনে নেয় ও অনুসরণ করে, তাকে আল্লাহ তায়ালা ওই নিয়ম অনুসারে হেদায়াত করেন এবং সে সুনিশ্চিতভাবে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়, আর যে ব্যক্তি হেদায়াতের উপকরণের সদ্ব্যবহার করে না সে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়ে যায়। তার এই বিভ্রান্তি ও আল্লাহর সেই শাশ্বত নিয়ম অনুসারেই সংঘটিত হয়। আল্লাহ তায়ালা তাকে বিপথগামী করে দেন। এরপর তার জন্যে কোনো পথপ্রদর্শক পাওয়া যাবে না।

এরপর এই বিস্ময়কর দৃশ্য পূর্ণতা লাভ করে ১৮ নং আয়াতে। তারা তাদের দীর্ঘস্থায়ী ঘুমে পাশ ফিরে ঘুমাতেও থাকে। যে তাদেরকে দেখে সে ভাবে, ওরা জাগ্রত। অথচ তারা ঘুমন্ত। তাদের কুকুরটা গুহার দরজার পাশেই প্রহরী হিসাবে থাবা মেলে অবস্থান করতে থাকে কুকুরের স্বভাব অনুসারেই। সে তার অজান্তেই এভাবে দর্শকদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে যাতে কেউ তাদেরকে উত্যক্ত করার সাহস না পায়। তাই তাদেরকে জাগ্রত মানুষের মতো নড়তে চড়তে ও পাশ ফিরতে দেখা গেলেও আসলে তারা জাগ্রত নয়।

অকস্মাৎ তাদের মধ্যে স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসে। 'এভাবে আমি তাদেরকে জাগিয়ে তুললাম.....।' (আয়াত ১৯-২০)

ঘটনা বর্ণনায় আকস্মিকতার বিষয়টি আয়াতে উহ্য রেখেই এই দৃশ্যটা তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, যুবকরা একদিন জেগে উঠলো। কিন্তু যখন ঘুম এসেছিলো তারপর থেকে তারা ওখানে কতোদিন কাটিয়েছে, তা তারা বুঝতেই পারলো না। তারা নিজেদের চোখ কচলিয়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কিহে আমরা কতোক্ষণ ঘুমালাম? দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে ওঠার পর এ ধরনের প্রশ্ন যে কেউ জিজ্ঞেস করে থাকে। তা ছাড়া দীর্ঘ ঘুমের কিছু আলামতও তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে। তারা বললো, একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি।

এরপর তারা ভেবে দেখলো যে, এ প্রশ্নে বেশী মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তাই এ ব্যাপারটি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করাই উত্তম। আসলে অজানা বিষয়ে অনর্থক মাথা না ঘামিয়ে আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করা প্রত্যেক ঈমানদারেরই কর্তব্য। তারা মনে করলো, এ সব বিষয় বাদ দিয়ে আসল প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। তারা তখন ক্ষুধার্ত। তাদের কাছে রৌপ্য মুদ্রা ছিলো। তা নিয়ে তারা বাজারে চলে গেলো।

'তারা বললো, এখানে কতোদিন অবস্থান করা হয়েছে, সেটা তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন। অতএব, তোমাদের কোনো একজনকে এই মুদ্রা দিয়ে শহরে পাঠাও। সে গিয়ে দেখুক কোন শহরে ভালো খাবার পাওয়া যায়। তার কিছু নিয়ে আসুক।'

অর্থাৎ শহর থেকে সবচেয়ে উৎকৃষ্টমানের খাবার বাছাই করে নিয়ে আসুক।

এ সময় তারা তাদের গোপনীয়তা যাতে প্রকাশ না পায় এবং তাদের অবস্থান স্থল কেউ জেনে না ফেলে, এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করছিলো। কেননা তাহলে শহরের ক্ষমতাসীন লোকেরা তাদেরকে পাকড়াও করে মেরে ফেলবে। কারণ তারা তাদেরকে ধর্মত্যাগী বলে আখ্যায়িত করবে। পৌত্তলিক দেশে এক খোদার পূজারীদেরকে তারা স্বভাবতই সহ্য করবে না। হয়তো বা কঠিন শাস্তি দিয়ে তাদেরকে স্বধর্ম পরিত্যাগে বাধ্য করবে। এ কারণেই তারা সতর্কতা অবলম্বন করছিলো। তাই খাবার কিনতে যাকে পাঠানো হচ্ছিলো তাকে সতর্ক থাকতে তাগিদ দেয়া হলো এভাবে,

'সে যেন নম্র আচরণ করে এবং কাউকে তোমাদের পরিচয় জানতে না দেয়। তারা জানতে পারলে তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে, অথবা জোর করে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। এরূপ ঘটলে তোমরা আর কখনো কল্যাণ পাবে না।'

বস্তুত যে মোমেন মুরতাদ হয়ে মোশরেকে পরিণত হয়, সে কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না। এটা বরং সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

এভাবে আমরা দেখতে পাই, যুবকরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পরস্পরে সলাপরামর্শ করছে। অথবা তারা জানেনা, ইতিমধ্যে বহু বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং সময় পাল্টে গেছে। ইতিমধ্যে বহুপ্রজন্ম একের পর এক অতিবাহিত হয়ে গেছে। তারা যে শাসকগোষ্ঠী সম্পর্কে শংকিত ছিলো যে, তারা তাদের ধর্মবিশ্বাস পাল্টাতে বাধ্য করতে পারে, তাদের পতন ঘটেছে, যুলুমবাজ রাজার আমলে যে ক'জন মোমেন যুবক নিজেদের ঈমান বাঁচাতে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলো, তাদের কাহিনী দেশের জনগণের মুখে মুখে। বয়োবৃদ্ধ প্রবীণদের কাছ থেকে শুনে নবীনরা এ কাহিনী পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পরম ভক্তি সহকারে প্রচার করে চলেছে। ওই যুবকদের পরিচিতি, আকীদা ও বিশ্বাস এবং

তাদের আত্মগোপনের সময়কাল নিয়ে দেশে পরস্পর বিরোধী মতামত প্রচলিত। দেশের এই বিরাট পরিবর্তন সম্পর্কে যুবকদের কিছুই জানা ছিলো না।

এই পর্যায়ে গুহার অভ্যন্তরে তাদের দৃশ্যের যবনিকাপাত ঘটে এবং দৃশ্যান্তরে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। আয়াতের বর্ণনায় উভয় দৃশ্যের মাঝে কিছু শুন্যতা রেখে দেয়া হয়েছে। আমরা বুঝতে পারি যে, খাবার কিনতে যাওয়ার সময়কার শহরবাসী সবাই মুসলমান। খাবার কিনতে যাওয়া ব্যক্তি যে বহু বছর আগে ঈমান নিয়ে পালানো যুবকদেরই একজন, তা টের পাওয়ার পর শহরবাসী তাদের প্রতি ভক্তির আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলো।

আমরা এও কল্পনা করতে পারি যে, গুহাবাসী যুবকরা কী সাংঘাতিক ধরনের আকস্মিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলো যখন তাদের সহকর্মী নিশ্চিত হলো যে, এই শহর থেকে তাদের পলায়নের পর বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে, যখন সে জানতে পারলো যে, তাদের চার পাশের পৃথিবীতে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাই তাদের জানা বা অজানা কোনো কিছুরই অস্তিত্ব সে দেখতে পায়নি। সে বুঝতে পেরেছিলো যে, সে ও তার সাথী গুহাবাসীরা বহু শতাব্দী পূর্বের এক প্রাচীন প্রজন্মের লোক। জনগণের দৃষ্টিতে ও অনুভূতিতে তারা এক মহাবিস্ময়। তাই তাদের সাথে সাধারণ মানুষের মতো আচরণ ও লেন দেন করা তার পক্ষে সম্ভব হলো না। আপন প্রজন্মের সাথে ওই যুবকদের যে সম্পর্ক ছিলো, যে রীতি প্রথা, আত্মীয়তা ও আবেগ অনুভূতির যোগসূত্র ছিলো, তা সবই ছিন্ন হয়ে গেছে। বর্তমান প্রজন্মের সাথে তাদের মেলামেশা ও লেনদেন করার কোনো মাধ্যমই আর অবশিষ্ট নেই। তাই এসব কিছু থেকে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে প্রয়োজন শূন্য করে দেন এবং তাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দেন।

ঘটনার শেষ দৃশ্য ও আমাদের শিক্ষা

এ সবই আমরা কল্পনা করতে পারি। কিন্তু কোরআন এ সবের মধ্য থেকে কেবল শেষ দৃশ্যটা উপস্থাপন করে। এই দৃশ্যটা হচ্ছে তাদের মৃত্যুর দৃশ্য জনগণ এ সময় গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে গুহাবাসী যুবকদের নিয়ে মত বিনিময় করতে থাকে যে, যুবকরা কোন ধর্মাবলম্বী ছিলো, কিভাবে পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে তাদের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখা যায়। অতপর এই বিস্ময়কর ঘটনা থেকে অর্জিত শিক্ষাটা সরাসরি তুলে ধরা হয়।

'এভাবে আমি জনগণকে তাদের সন্ধান দিয়েছিলাম, যাতে তারা জানতে পারে যে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কেয়ামত নিসন্দেহে অবধারিত। (আয়াত ২১)

এই যুবকদের জীবনাবসানের শিক্ষা এই যে, এ দ্বারা কেয়ামতের সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং একটা বাস্তব ও অনুভবযোগ্য উদাহরণ দ্বারা তা প্রমাণ করা হয়। পরকালে মানুষের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার ব্যাপারটা এ দ্বারা সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। মানুষ বুঝতে পারে যে, পরকালের পুনরুজ্জীবনের যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য এবং কেয়ামত অবধারিত। আল্লাহর এই পরকালীন পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়ার আওতায়ই ঘটেছে যুবকদেরকে ঘুম থেকে জাগানো ও জনগণকে তাদের সন্ধান দানের ঘটনা।

কিছু লোকে বললো, ওদের ধর্মবিশ্বাস যখন জানা যাচ্ছে না,

'তখন তাদের ওপর একটা সৌধ নির্মাণ করো। 'আল্লাহ তায়ালাই তাদের সম্পর্কে অধিক অবগত।'

অর্থাৎ তারা কী আকীদা বিশ্বাস পোষণ করতো তাও তিনিই ভালো জানেন। তৎকালীন শাসকরা বললো,

'আমরা অবশ্যই তাদের জায়গায় একটা মসজিদ নির্মাণ করবো।'

মাসজিদ দ্বারা আসলে উপাসনালয় বুঝানো হয়েছে, যা ইহুদী ও খৃষ্টানদের অনুকরণে নির্মাণ করা হতো। তারা নবী ও মহৎ ব্যক্তিদের কবরে উপাসনালয় বানাতো। আজকের যুগে বহু মুসলমানও তাদের অনুকরণে রসূল (স.)-এর শিক্ষার বিপরীতে এ কাজ করে থাকে। অথচ রসূল (স.) বলেছেন, ইহুদী ও খৃষ্টানদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ হোক, যারা তাদের নবী ও মহান ব্যক্তিবর্গের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।' (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

এই দৃশ্যের সমাপ্তি টানা হয়েছে এখানে। এরপর পরবর্তী আয়াতে পুনরায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আসহাবুল কাহাফ বা গুহাবাসী যুবকদের সম্পর্কে যে বিতর্ক রয়েছে, তার উল্লেখ রয়েছে এ আয়াতে। আসলে বহু শতাব্দী আগের ঘটনা নিয়ে এ ধরনের মতভেদ ঘটা স্বাভাবিক। কারণ এ ধরনের ঘটনার বিবরণ একজনের মুখ থেকে আর একজনের মুখে মুখান্তরিত হতে গিয়ে তথ্যাবলীতে পরিবর্তন ও সংখ্যায় কমবেশী হয়ে থাকে। ২২নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'লোকেরা বলাবলি করবে, গুহাবাসী যুবকরা ছিলো তিনজন, চতুর্থ ছিলো তাদের কুকুর। কেউ বলবে, পাঁচজন ছিলো, ৬ষ্ঠ ছিলো তাদের কুকুর। এ সবই অনুমানভিত্তিক কথা। আবার কেউ বলবে, ওরা ছিলো সাতজন, ৮ম ওদের কুকুর। তুমি বলো, তাদের সংখ্যা আমার প্রভুই ভালো জানেন। ....'

বস্তুত যুবকদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক করা অর্থহীন। তারা তিনজনই হোক। পাঁচজনই হোক, সাতজনই হোক বা বেশী হোক সবই সমান। তাদের যাবতীয় বিষয় এবং সঠিক সংখ্যার জ্ঞান কেবল আল্লাহ তায়ালাই রাখেন। সঠিক তথ্য জানা লোকের সংখ্যাও খুবই কম। কাজেই তাদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের সংখ্যা কম হোক বা বেশী হোক তাদের ঘটনার শিক্ষা একই। তাই কোরআন রসূল (স.)-কে এই বিতর্ক পরিহার করার নির্দেশ দিচ্ছে। আর বিতর্কে লিপ্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে এ বিষয় জানারও কোনো দরকার নেই। নিরর্থক ও অনুপকারী বিষয়ে বুদ্ধি খরচ না করাই ইসলামের বিধান। সুনিশ্চিত তথ্য না জেনে কোনো ব্যাপারে অনুমান করে কথা বলাও ইসলামে নিষিদ্ধ ও অবাঞ্ছিত। বহুকাল আগে ঘটে যাওয়া এ ঘটনা সম্পর্কে সুনিশ্চিত ও বিশুদ্ধ তথ্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। তাই এ বিষয়ে আল্লাহর ওপর ন্যস্ত রাখাই সমীচীন।

অতীতের অজানা বিষয় নিয়ে তর্ক করতে নিষেধ করার সূত্র ধরে ভবিষ্যতের বিষয় নিয়ে মতামত বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতেও নিষেধ করা হয়েছে ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে। কেননা ভবিষ্যতে কী ঘটবে। মানুষ তা জানে না। তাই সে সম্পর্কে তার কোনো দৃঢ় মত ব্যক্ত করা সমীচীন নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তুমি কখনো কোনো ব্যাপারে বলো না যে, 'আমি আগামীকাল এটা করবো 'আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে' এ কথা যুক্ত করা ছাড়া।........'

মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটা তৎপরতা, নড়াচড়া, এমনকি জীবিত প্রাণীর প্রতিটা শ্বাস প্রশ্বাস পর্যন্ত আল্লাহর ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন। মানুষ চলতি মুহূর্তটার ওপাশে কী আছে তা জানে না। পর্দার আড়ালে কী আছে, তা চোখ দিয়ে দেখতে পায় না। তার বিবেক বুদ্ধি যতো তথ্যই সংগ্রহ করুক, সে আসলেই খুবই সীমিত জ্ঞানের অধিকারী। কাজেই কোনো মানুষের বলা উচিত নয় যে, আগামীকাল আমি অমুক কাজ করবো। কেননা আগামীকাল কী হবে না হবে তা শুধু আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

তবে এর অর্থ এটা নয় যে, মানুষ ভবিষ্যত নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা ও পরিকল্পনা না করে অলসভাবে বসে থাকবে এবং তার জীবনের অতীতের সাথে বর্তমানের কোনো সংযোগ থাকবে না। বরং এর অর্থ হলো, অজানা ও অদৃশ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সেই অনুসারেই চিন্তা ভাবনা করতে হবে, নিজের সংকল্প ও পরিকল্পনায় আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে যার ইচ্ছার আওতায় সব কিছুই সংঘটিত হয়ে থাকে এবং মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর হাত সব সময় মানুষের হাতের ওপর থাকে। তাই এটা বিচিত্র নয় যে, মানুষ যা পরিকল্পনা করে, আল্লাহ তায়ালা তার বিপরীত পরিকল্পনা করে থাকতে পারেন। যদি আল্লাহ তায়ালা তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাহায্য করেন, তাহলে তো ভালো কথা। যদি আল্লাহর ইচ্ছা তার পরিকল্পনার বিপরীত হয়, তাহলে দুঃখ ও পরিতাপ করার প্রয়োজন নেই এবং হতাশ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা যাবতীয় বিষয় আগাগোড়াই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। সুতরাং মানুষকে চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা করতেই হবে। তবে তার একথা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা ক্ষমতা দিলেই সে চিন্তা ও পরিকল্পনা করতে পারে। তাই বলে তার উদাসীন ও অলস হয়ে বসে থাকার কোনো অবকাশ ও যুক্তি নেই। নিজে দুর্বল ও অক্ষম মনে করে নিষ্ক্রিয় থাকাও চলবেনা। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমতা, সংকল্প ও আস্থা দিয়েছেন। কিন্তু যখন মানুষ বুঝতে পারবে যে, আল্লাহর পরিকল্পনা তার পরিকল্পনার বিপরীত, তখন আল্লাহর ফয়সালার কাছে সন্তুষ্টচিত্তে ও স্থির মনে আত্মসমর্পণ করতে হবে কেননা এটাই তার ক্ষমতার মূল উৎস, যা এতদিন অজ্ঞাত ছিলো। এখন যখন তা জানা গেলো, তখন সেটাই মেনে নেয়া কর্তব্য।

বস্তুত ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানের মনে এই পদ্ধতিই বদ্ধমূল করে। কাজেই সে চিন্তা ও পরিকল্পনা করার সময় একাকীত্ব ও নিসংগতা বোধ করবে না। সাফল্য লাভ করলে সে অহংকারী ও দাম্ভিক হবে না, আর ব্যর্থ হলে হতাশার শিকার হবে না, সর্বাবস্থায় সে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখবে, তাঁর ওপর নির্ভরশীল হয়ে নিজেকে শক্তিশালী মনে করবে, পরিকল্পনায় সফল হলে আল্লার শোকর করবে, এবং অহংকার ও হতাশা ছাড়াই আল্লাহর ফয়সালা মেনে নেবে।

'যখন তোমার ভুল হয়ে যাবে, তখন তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করবে।'

অর্থাৎ এই নির্দেশ যখন ভুলে যাবে, তখন দ্রুত আল্লাহকে স্মরণ ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

'আর বলো, আশা করি অর্থাৎ প্রতিপালক আমাকে এর চেয়েও নিকটতর সুপথ দেখাবেন।' অর্থাৎ এই পদ্ধতির চেয়েও যা মনকে সব সময় আল্লাহর সাথে যুক্ত করে। 'আছা' (আশা করি) এবং 'লেআকরাবা' (নিকটতর)-এই দুটো শব্দ দ্বারা এই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানো হয়েছে এবং সর্বাবস্থায় এই চেতনা জাগ্রত থাকার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি, ওই যুবকরা গুহার মধ্যে কতোদিন থেকেছে। এক্ষণে সেই বিষয়টা সুনিশ্চিতভাবে জানা গেলো।

'তারা তাদের গুহায় তিনশো নয় বছর অবস্থান করেছে। বলো, আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন, তারা কতোদিন থেকেছে। তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য জ্ঞান রাখেন। তিনি কতোই না বড় দর্শক ও শ্রোতা?..... (আয়াত ২৫-২৬)

এ হচ্ছে তাদের ব্যাপারে শেষ কথা। আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী এই চূড়ান্ত কথা জানলেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রষ্টা ও শ্রোতা। কাজেই এরপর আর বিতর্ক থাকা চাই না।

এবার এই কাহিনী নিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে। এই কাহিনীর উপসংহারে দ্ব্যর্থহীনভাবে আর একবার আল্লাহর একত্বকে ঘোষণা করা হয়েছে,

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদের আর কোনো অভিভাবক নেই। তার কর্তৃত্বে আর কাউকে শরীক করা উচিত নয়।'

সবার শেষে রসূল (স.)-কে 'আল্লাহর ওহীকৃত বাণী পড়ে শোনানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা এতে রয়েছে চূড়ান্ত নির্ভুল বক্তব্য। এতে রয়েছে নির্ভেজাল অকাট্য সত্য। এতে রয়েছে একমাত্র আল্লাহমুখী হওয়ার নির্দেশ। কেননা তাঁর নিরাপদ আশ্রয় ছাড়া আর কোনো আশ্রয় নেই। তাঁর আশ্রয়েই আশ্রয় নিয়েছিলো আসহাবুল কাহাফ গুহাবাসী যুবকেরা। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অনুগ্রহ ও হেদায়াত দান করেছেন,

'তোমার কাছে তোমার প্রভুর যে কেতাব ওহী করা হয়েছে, তা পড়ে শোনাও.........' (আয়াত ২৭)

এ পর্যন্ত এসে কাহিনীর সমাপ্তি টানা হয়েছে। এর ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু নির্দেশও দেয়া হয়েছে, যা কোরআনের কেসসা কাহিনীর মূল লক্ষ্য। সাথে সাথে আয়াতের ধর্মীয় বিধি ও শৈল্পিক উপস্থাপনায় সুন্দর সমন্বয়ও সাধন করা হয়েছে। (আয়াত ২৮-৪৬)

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ
وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ
اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ
رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ
اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي
الْوُجُوْهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ۚ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ
عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ
وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى
الْاَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ ۚ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

২৮. (হে নবী,) তুমি নিজেকে সদা সে সব মানুষদের সাথে রেখে চলবে, যারা সকাল সন্ধ্যায় তাদের মালিককে ডাকে, তারা একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে এবং কখনো তাদের কাছ থেকে তোমার (স্নেহের) দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না, (তোমার অবস্থা দেখে এমন যেন মনে না হয় যে,) তুমি এই পার্থিব জগতের সৌন্দর্য্যই কামনা করো, কখনো এমন কোনো ব্যক্তির কথামতো চলো না, যার অন্তকরণকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, আর যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির গোলামী করতে শুরু করেছে এবং যার কার্যকলাপ (আল্লাহ তায়ালার) সীমানা লংঘন করেছে। ২৯. (হে নবী,) তুমি বলো, এ সত্য (দ্বীন) তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে এসেছে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে (এর ওপর) ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা সে (তা) অস্বীকার করুক, আমি তো এ (অস্বীকারকারী) যালেমদের জন্যে এমন এক আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদের পুরোপুরিই পরিবেষ্টন করে রাখবে; যখন তারা (পানির জন্যে) ফরিয়াদ করতে থাকবে তখন এমন এক গলিত ধাতুর মতো পানীয় তাদের দেয়া হবে, যা তাদের সমগ্র মুখমন্ডল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে, কী ভীষণ (হবে সে) পানীয়; আর কী নিকৃষ্ট হবে তাদের আশ্রয়ের স্থানটি! ৩০. আর যারাই আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে (তাদের কোনো আশংকা নেই), আমি কখনো তাদের বিনিময় বিনষ্ট করি না যারা নেক কাজ করে, ৩১. এদের জন্যে রয়েছে এমন এক স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, তাদের সেখানে সোনার কাঁকন দ্বারা অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের পোশাক, (উপরন্তু) তারা সমাসীন হবে (এক) সুসজ্জিত আসনে, কতো সুন্দর (তাদের এ) বিনিময়; কতো চমৎকার (তাদের) আশ্রয়ের (এ) স্থানটি!

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ
وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا
وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا لا وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾ وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ج فَقَالَ
لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ
وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ج قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ
قَآئِمَةً وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهٗ
صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ
ثُمَّ سَوّٰكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴿٣٨﴾

রুকু ৫

৩২. (হে নবী,) তাদের জন্যে তুমি দু'জন লোকের উদাহরণ পেশ করো, যাদের একজনকে আমি দুটো আংগুরের বাগান দান করেছিলাম এবং তাকে দুটো (কতিপয়) খেজুর গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত করে রেখেছিলাম, আবার এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানকে (পরিণত) করেছিলাম একটি সুফলা শস্যক্ষেত্রে। ৩৩. উভয় বাগানই (এক পর্যায়ে) যথেষ্ট ফল দান করলো, (ফলদানে) বাগান দুটো কোনোরকম ত্রুটি করেনি, উভয় বাগানে আমি পানির ঝর্ণাধারাও প্রবাহিত করে রেখেছিলাম। ৩৪. (এক পর্যায়ে) তার অনেক ফল হয়ে গেলো, অতপর (একদিন) সে তার সাথীকে কথা প্রসংগে বললো, দেখো, আমি ধন-সম্পদের দিক থেকে তোমার চাইতে (যেমন) বড়ো, (তেমনি) জনবলেও আমি তোমার চাইতে বেশী শক্তিশালী। ৩৫. নিজের (শক্তি সামর্থের) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে করতে সে নিজের বাগানে গিয়ে প্রবেশ করলো এবং বললো, আমি ভাবতেই পাচ্ছি না, এ বাগান (-এর সৌন্দর্য কোনো দিন) নিশেষ হয়ে যাবে! ৩৬. আমি (এও) মনে করি না, একদিন (এসব ধ্বংস হয়ে) কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং (কেয়ামতের পর) আমাকে যদি আমার মালিকের সামনে ফিরিয়ে নেয়াও হয়, তাহলে এর চাইতে উৎকৃষ্ট কোনো কিছু আমি (সেখানে) পাবো। ৩৭. (তার) সে (গরীব) সাথীটি– যে তার সাথে কথা বলছিলো, বললো, (এ পার্থিব সম্পদ দেখে) তুমি কি সত্যিই সে মহান সত্তাকে অস্বীকার করছো, যিনি তোমাকে (প্রথমত) মাটি থেকে অতপর শুক্রকণা থেকে পয়দা করেছেন, পরিশেষে তিনি তোমাকে (একটি) মানুষের আকৃতিতে পূর্ণাংগ করেছেন; ৩৮. কিন্তু (আমি তো বিশ্বাস করি,) সেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন আমার মালিক এবং আমার মালিকের (কোনো কাজের) সাথে আমি কাউকে শরীক করি না।

وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ

أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ

وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ أَوْ يُصْبِحَ

مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُۥ طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ

عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ

أُشْرِكْ بِرَبِّىٓ أَحَدًا ﴿٤٢﴾ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا

كَانَ مُنتَصِرًا ﴿٤٣﴾ هُنَالِكَ ٱلْوَلَٰيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ

৩৯. কতো ভালো হতো তুমি যখন তোমার (ফলবতী) বাগানে প্রবেশ করলে, তখন যদি তুমি (একথাটি) বলতে, আল্লাহ তায়ালা যা চেয়েছেন তাই হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতিরেকে কারোই (কিছুই ঘটানোর) শক্তি নেই, যদিও তুমি আমাকে ধনে জনে তোমার চাইতে কম দেখলে (কিন্তু আমি আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান রাখি)। ৪০. সম্ভবত আমার মালিক আমাকে তোমার (এ পার্থিব) বাগানের চাইতে আখেরাতে উৎকৃষ্ট (কোনো বাগান) দান করবেন এবং (অকৃতজ্ঞতার জন্যে) তার ওপর আসমান থেকে এমন কোনো বিপর্যয় নাযিল করবেন, ফলে তা (উদ্ভিদ-) শূন্য (এক বিরান) ভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে। ৪১. কিংবা তার পানি তার (যমীনের) নীচেই অন্তর্হিত হয়ে যাবে, (তেমন কিছু হলে) তুমি কখনো তা (আবার) খুঁজে আনতে পারবে না। ৪২. (অতপর তাই ঘটলো,) তার (বাগানের) ফলফলাদিকে বিপর্যয় এসে ঘিরে ফেললো, তখন সে ব্যক্তি সেই ব্যয়ের ওপর– যা সে বাগানের (শোভাবর্ধনের পেছনে) করেছিলো, হাতের ওপর হাত রেখে আক্ষেপ করতে লাগলো (বাগানের অবস্থা এমন হলো যে), তা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো এবং সে (নিজের ভুল বুঝতে পেরে) বলতে লাগলো, কতো ভালো হতো যদি আমি আমার মালিকের (ক্ষমতার সাথে) অন্য কাউকে শরীক না করতাম! ৪৩. (যারা বাহাদুরী করেছে তাদের) কোনো দলই (আজ) তাকে আল্লাহর (এ প্রতিশোধের) মোকাবেলায় সাহায্য করার জন্যে (অবশিষ্ট) রইলো না– না সে নিজে কোনো রকম প্রতিশোধ নিতে পারলো! ৪৪. (কেননা) এখানে রক্ষা করার যাবতীয় এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, যিনি একমাত্র সত্য, পুরস্কারদানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই উত্তম।

রুকু ৬

৪৫. (হে নবী,) তুমি এদের কাছে দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ পেশ করো (এ জীবনটা হচ্ছে) পানির মতো আমি তাকে আকাশ থেকে বর্ষণ করি, যার কারণে যমীনের ওদ্ভিদ ঘন

نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ﴿٤٦﴾

(সুশোভিত) হয়ে ওঠে, অতপর এক সময় বাতাস তা উড়িয়ে নিয়ে ফিরে; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর প্রচন্ড ক্ষমতাবান। ৪৬. (আসলে) ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি হচ্ছে (তোমাদের) পার্থিব জীবনের কতিপয় (অস্থায়ী) সৌন্দর্য মাত্র, চিরস্থায়ী বিষয় হচ্ছে (মানুষের) নেক কাজ, (আর তা হচ্ছে) তোমার মালিকের কাছে পুরস্কার পাওয়ার জন্যে অনেক ভালো, আর কোনো (কল্যাণময়) কিছু কামনা করতে গেলেও তা হচ্ছে উত্তম।

তাফসীর

আয়াত-২৮-৪৬

এই সমগ্র অধ্যায়টা জুড়ে ইসলামী আকীদা ও আদর্শভিত্তিক মূল্যবোধের বিবরণ রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত সম্পদ অর্থ, সম্পত্তি, পদমর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নয়। অনুরূপভাবে তা পার্থিব জীবনের ভোগবিলাসও নয়। এসবগুলোই নশ্বর ও কৃত্রিম সম্পদ। এগুলোর মধ্যে যা পবিত্র তাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করে না। তবে সেগুলোকে মানব জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করে না। এ সব পার্থিব সম্পদকে যদি কেউ ভোগ করতে চায়, তবে তাতে আপত্তি নেই। যতো খুশী ভোগ করতে পারে। কিন্তু সেই ভোগও হওয়া চাই ওই সম্পদ যে আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন তাকে স্মরণ করা ও সৎ কাজের মাধ্যমে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে। কেননা সৎ কাজই সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী সম্পদ।

ইসলামের আপোষহীন মুল্যবোধ

এই অধ্যায়ের শুরুতে রসূল (স.)-কে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর ভক্ত ও অনুগত বান্দাদের সাথে যেন ধৈর্যের সাথে অবস্থান করেন এবং যারা আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে ও উদাসীন থাকে, তাদেরকে যেন এড়িয়ে চলেন। এরপর এই উভয় শ্রেণীর মানুষের জন্যে উদাহরণ হিসাবে দুই ব্যক্তিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। একজন ধন সম্পদ ও পদমর্যাদাকে গৌরব ও সম্মানের উপকরণ মনে করে। অপর জন খালেছ ঈমানের সম্পদ দ্বারাই নিজেকে গৌরবান্বিত ও ঐশ্বর্যশালী মনে করে এবং আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম প্রতিদানের প্রত্যাশা করে। তারপর উপসংহারে গোটা পার্থিব জীবনের জন্যে একটা উদাহরণ দেয়। এই উদাহরণে দেখানো হয়েছে যে, পার্থিব জীবন হচ্ছে সেই ক্ষণস্থায়ী শুকনো তৃণলতার মতো, যাকে বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায়। সর্বশেষে তুলে ধরে চিরস্থায়ী ও শাশ্বত সত্যকে।

ধনসম্পদ ও সন্তান সন্তুতি পার্থিব জীবনের অলংকার বিশেষ। কিন্তু চিরস্থায়ী সৎ কাজগুলো তোমার প্রতিপালকের কাছে উৎকৃষ্টতম ফলপ্রসূ এবং উৎকৃষ্টতম আশা ব্যঞ্জক।' *(আয়াত ৪৬)*

'যারা সকাল বিকাল তাদের প্রভুকে ডাকে ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের সাথে তুমি ধৈর্য ধারণ করো ....। *(আয়াত ২৮ ও ২৯)*

বর্ণিত আছে, কোরায়শ সরদাররা যখন রসূল (স.)-কে অনুরোধ জানালো যে, তিনি যদি চান কোরায়শ সরদাররা ঈমান আনুক, তাহলে তিনি যেন তার কাছ থেকে বেলাল, সোহায়েব, আম্মার, খাব্বাব ও ইবনে মাসউদের ন্যায় দরিদ্র মুসলমানদেরকে তাড়িয়ে দেন কিংবা সরদারদের জন্যে পৃথক বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। কেননা ওই সব গরীব মুসলমানদের পোশাক পরিচ্ছদ থেকে ঘামের গন্ধ আসে, যা কোরায়শ সরদারদের জন্যে বিরক্তিকর।

আরো বর্ণিত আছে যে, রসূল (স.) ওই সরদারদের ঈমান আনার প্রতি খুবই আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং তাদের দাবী মেনে নেয়ার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। এই অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা এ দুটো আয়াত নাযিল করেন। এ আয়াতদ্বয় নাযিল হয়ে প্রকৃত সম্পদ ও প্রকৃত মূল্যবোধ কী, তা চিহ্নিত করে এবং জীবনের নির্ভুল মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করে।

'এরপর যার ইচ্ছা হয়, সে ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা হয় কুফুরি করুক।'

বস্তুত ইসলাম কাউকে তোষামোদ বা সাধাসাধি করে না, মানুষকে সে আদিম জাহেলিয়াতের মানদন্ডেও বিচার করে না, কিংবা ইসলামের বিপরীত মানদন্ডধারী অন্য কোনো জাহেলিয়াতের মানদন্ডেও সে মানুষকে পরিমাপ করে না।

'তুমি ধৈর্যধারণ করো'......

অর্থাৎ ক্লান্ত, বিরক্ত ও অস্থির হয়ো না এবং তাড়াহুড়ো করো না।

'তাদের সাথে, যারা সকালে বিকালে তাদের প্রতিপালককে ডাকে, তারা তাঁর সন্তোষ কামনা করে।'

কেননা আল্লাহই তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এজন্যে সকালে ও বিকালে তাঁর দিকে মনোনিবেশ করে, তাঁর দিক থেকে কখনো ফিরে দাঁড়ায় না এবং তাঁর সন্তুষ্টি ছাড়া তারা আর কিছুই কামনা করে না। আর তারা যা কামনা করে, তা দুনিয়া পূজারীরা যা কামনা করে তার চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠতর।

তাদের সাথে ধৈর্যধারণ করতে বলার অর্থ হলো তাদের সাথে অবস্থান করতে থাকো ও তাদেরকে শিক্ষা দিতে থাকো। কেননা তাদের মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ ও সততা এবং তাদের মতো লোকদের দ্বারাই দাওয়াত সফল হয়। যারা দাওয়াত বিজয়ী হবে মনে করে তা গ্রহণ করে, যারা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব পাবে মনে করে তা গ্রহণ করে, যারা নিজেদের পার্থিব লোভ ও কামনা বাসনা চরিতার্থ হবে মনে করে তা গ্রহণ করে এবং যারা এ দ্বারা ব্যবসা করে লাভবান হবে মনে তা গ্রহণ করে, তাদের দ্বারা দাওয়াত সফল হয় না। দাওয়াত সফল ও বিজয়ী হয় কেবল এই সব নিষ্ঠাবান লোকদের দ্বারা, যারা খালেছ মনে আল্লাহর দিকে রুজু হয়, যারা সম্মান চায় না, পদ চায় না কিংবা পার্থিব লাভ চায় না তারা চায় শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি।

'তোমার চোখ দুটো যেন তাদের দিক থেকে ফিরে না যায় ......,

অর্থাৎ তুমি এই দরিদ্র নিষ্ঠাবান মোমেনদের প্রতি গুরুত্ব কম দিয়ে ভোগবিলাসী লোকদের ভোগের উপকরণগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ো না। কেননা পার্থিব জীবনের এসব বিলাস ও সাজসজ্জা সেই উচ্চ মার্গে উপনীত হতে পারে না, যেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সকালে বিকালে আল্লাহকে স্মরণকারীদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত।

'আনুগত্য করো না তাদের যাদের মনকে আমি আমার স্মরণ থেকে উদাসীন করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসারী এবং সীমা অতিক্রমকারী।'.......

অর্থাৎ এ ধরনের লোকদের অন্যায় দাবী মেনে নিও না যে, তাদের মাঝে ও দরিদ্রদের মাঝে পার্থক্য ও বৈষম্য সৃষ্টি করা হোক। তারা যদি আল্লাহকে স্মরণ করতো, তাহলে তারা তাদের অহংকারকে সংযত করতো, আল্লাহর বড়ত্বকে উপলব্ধি করতো যার অধীনে সবাই সমান এবং আকীদা বিশ্বাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করতো যা গ্রহণ করার পর সবাই ভাই হয়ে যায়। কিন্তু তারা তা করে না। তারা কেবল নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে, নিজেদের জাহেলী প্রবৃত্তির আনুগত্য করে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজেদের জাহেলী মানদন্ডে পরিমাপ ও মূল্যায়ন করে। তাই তারা ও তাদের কথাবার্তা এমন নির্বোধসুলভ, যে তা অবজ্ঞারই যোগ্য। আর এটা আল্লাহ তায়ালা স্মরণ থেকে তাদের উদাসীন থাকারই শাস্তি।

ইসলাম এসেছে আল্লাহর চোখে তাঁর সকল বান্দাকে সমান করে দিতে। তাই বংশ, পদমর্যাদা ও ধন সম্পদের ভিত্তিতে কাউকে কারো ওপর প্রাধান্য দেয়ার সুযোগ নেই। ধন সম্পদ, পদমর্যাদা, বংশীয় আভিজাত্য ইত্যাদি হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী বৈশিষ্ট্য। প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর অবস্থান কিরূপ, তার ওপর নির্ভরশীল। এই বৈশিষ্ট্যগুলো কতোখানি আল্লাহমুখী ও আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধনে নিবেদিত, তা দ্বারাই নির্ণিত হবে আল্লাহর কাছে তার অবস্থান। আল্লাহমুখী আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধনে নিবেদিত নাহলে ওগুলো নিছক নির্বুদ্ধিতা, বাতিল উপসর্গ ও অর্থহীন ভাবাবেগ ছাড়া আর কিছু নয়।

'তার আনুগত্য করো না, যার মনকে আমি উদাসীন করে দিয়েছি.........'

মানুষ যখন নিজের দিকে, নিজের সম্পত্তির দিকে, নিজের সন্তানাদির দিকে, নিজের ভোগবিলাস, আমোদ প্রমোদ ও আনন্দ উল্লাসের দিকে ঝুকে পড়ে, তখনই আল্লাহ তায়ালা তার মনকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে দেন। কেননা তখন আর তার মনে আল্লাহর জন্যে কোনো স্থান থাকে না। যার মন এসব জিনিসের মধ্যে ডুবে যায় এবং এগুলোকে জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করে, সে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না হয়ে পারে না। তখন আল্লাহ তায়ালা তার উদাসীনতা আরো বাড়িয়ে দেন, তাকে আরো শিথিল করে দেন, শেষ পর্যন্ত তার আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যায় এবং তার মতো অপরাধীদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে পরিণতি নির্ধারণ করে রেখেছেন সেই পরিণতির সম্মুখীন হয়।

'আর বলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য উপস্থিত। অতএব যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, যার ইচ্ছা কুফরি করুক।'

সর্বাত্মক তেজস্বীতা, স্পষ্টবাদিতা ও আপোষহীনতা সহকারে এ ঘোষণা দেয়া উচিত। কেননা সত্য কখনো মাথা নোয়ায় না, আপোষ করে না। সে তার সোজা পথে চলে নির্ভিক চিত্তে ও জোর কদমে। কাউকে তোয়াজ ও তোষামোদ করে চলে না। যা বলার তা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে। যার ঈমান আনতে ইচ্ছা হয় আনুক, যার কুফরি করতে ইচ্ছা হয় করুক–তার কোনোই পরোয়া

নেই। সত্য যার মনকে মুগ্ধ করে না, সে যেখানে ইচ্ছা চলে থাকো। যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা আকাংখাকে আল্লাহর দেয়া বিধানের অনুগত করে না। তার সাথে আকীদা বিশ্বাস ও আদর্শের প্রশ্নে কোনো আপোষ নেই। আল্লাহর প্রতাপ ও পরাক্রমের সামনে যে নিজের অহংকারকে দমন করে না। তার কোনো আকীদা বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই।

আকীদা বিশ্বাস কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় যে, তার ব্যাপারে কারো সাথে আপোষ করা যাবে। এটা আল্লাহর সম্পত্তি। তিনি জগতের কোথাও কারো মুখাপেক্ষী নন। যারা ইসলামী আদর্শকে আন্তরিকভাবে চায় না এবং তা অবিকৃতভাবে গ্রহণ করে না, তাদের ইসলাম গ্রহণে ইসলাম সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হয় না। যারা খোদাভীরু একনিষ্ঠ মোমেনদের চেয়ে নিজেদেরকে উচ্চতর, শ্রেষ্ঠত্বর ও অভিজাত মনে করে, তাদের দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের কোনো কল্যাণ আশা করা যায় না।

জান্নাত জাহান্নামের চিত্র

এরপর আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্যে দোজখে কী শাস্তি এবং মোমেনদের জন্যে কী পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন তা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে।

'আমি অপরাধীদের জন্যে আগুন তৈরী করে রেখেছি.......।'

অর্থাৎ তৈরী করে উপস্থিত করে রেখেছি আগুনকে। আগুনকে জ্বালাতে কোনো কষ্ট হয় না এবং খুব বেশী সময়ও লাগেনা। যদিও কোনো কিছু সৃষ্টি করতে আল্লাহর শুধু 'কুন' (হও) শব্দটা বলার প্রয়োজন হয়, তথাপি 'প্রস্তুত করে রেখেছি' বাক্যটা দ্রুততার অর্থ বুঝায়। অর্থাৎ তাদেরকে গ্রহণ করার জন্যে জাহান্নামকে উদগ্রীব করে রাখা হয়েছে এবং সেখানে তাদেরকে ত্বরিত গতিতে সরাসরি পাঠিয়ে দেয়া হবে।

জাহান্নাম হচ্ছে চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত। অপরাধীদেরকে তা দিয়ে ঘিরে রাখা হবে। তাই তারা সেখান থেকে পালাতে ও অব্যাহতি লাভ করতে পারবে না।

জাহান্নামের প্রচন্ড দহন ও পিপাসায় কাতর হয়ে তারা যদি সাহায্য চায়, তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা হবে ফুটন্ত তেলের মতো বা উত্তপ্ত পুঁজের মতো নোংরা পানি খেতে দিয়ে। সে পানির ধারের কাছে গেলেই মুখমন্ডল ঝলসে যাবে। এরপরও যারা তা মুখে নেবে ও গিলবে, তাদের কী অবস্থা হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'কী জঘন্য পানীয়।' যা দিয়ে দোযখে দগ্ধীভূত লোকদেরকে আপ্যায়ন করা হবে! আর জাহান্নাম ও তার প্রাচীরই বা আশ্রয়ের স্থল হিসাবে কতো নিকৃষ্ট! জাহান্নামের প্রাচীরকে আশ্রয় হিসাবে উল্লেখ করা তিক্ত শ্লেষাত্মক। কেননা জাহান্নামবাসী সেখানে বসবাস করতে নয়, বরং ভুনা হতে যাবে। তবে এটা সৎকর্মশীল মোমেনদের জান্নাতে বসবাসের বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুই বসবাসে যে আকাশ পাতালের ব্যবধান, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তারা যখন জাহান্নামে ভুনা হতে থাকবে, এখন সৎকর্মশীল মোমেনরা চিরস্থায়ী সুখের নিবাস জান্নাতে অবস্থান করবে। আর জান্নাতের আবাসভূমিকে পানি সিঞ্চনের মাধ্যমে চির শ্যামল রাখা, সেখানকার দৃশ্যকে মনোরম করে রাখা এবং বাতাসকে আরামদায়ক রাখার জন্যে তাদের নীচ দিয়ে নদনদী বইতে থাকবে। জান্নাতবাসী সেখানে যথার্থই বসবাসের জন্যে থাকবে। বালিশে হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে। রকমারি রেশমের পোশাক পরে তারা গর্বে বুক ফুলিয়ে চলবে। কখনো হালকা মোলায়েম সুনদুস এবং কখনো ঘন মোটা মখমল জাতীয় পোশাক পরবে। সেই সাথে যুক্ত হবে অধিকতর সৌন্দর্যমন্ডিত ও অধিকতর বিলাসময় স্বর্ণালংকার।

'কতোই না সুন্দর প্রতিদান এবং চমৎকার বাসস্থান।'

যার ইচ্ছা গ্রহণ করুক। যার মনে চায় ঈমান আনুক, যার মনে চায় কুফরি করুক। যার ইচ্ছা দরিদ্র মোমেনদের সাথে ওঠাবসা করুক, যার ইচ্ছা দরিদ্র মোমেনদের জামা থেকে ঘামের গন্ধ বেরুনোর কারণে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকুক। আল্লাহর স্মরণে পবিত্র হয়ে যাওয়া ওই সৎলোকদের জামার ঘামের গন্ধ যাদের সহ্য হয় না, তারা জাহান্নামের ওই প্রাচীর বেষ্টনীতে আশ্রয় নিক এবং সেখানকার তেলের বা পুঁজের নোংরা গন্ধ পেয়ে ধন্য হোক।

আরো একটি চমকপ্রদ ঘটনা

এরপর দুই ব্যক্তি ও দুটি বাগানের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এ কাহিনীর মধ্য দিয়ে ক্ষণস্থায়ী জীবন ও চিরস্থায়ী জীবনের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে, তুলে ধরা হয়েছে পার্থিব জীবনের ঐশ্বর্য ধন্য এক ব্যক্তি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সাধনায় গৌরব বোধকারী অপর এক ব্যক্তির সুস্পষ্ট দুটো নমুনা। তারা উভয়ে দুটো মানব শ্রেণীর চরিত্রের প্রতিনিধি। যে ব্যক্তি দুটো বাগানের মালিক, সে এমন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যাকে সম্পদ ও প্রাচুর্যের আধিক্য দিশেহারা করে দিয়েছে এবং মানুষের জীবন ও ভাগ্যের নিয়ন্তা সর্বোচ্চ শক্তিমান সত্ত্বার কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। সে পৃথিবীর এই সম্পদকে চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর মনে করে। সে ভাবে, পৃথিবীর কোনো শক্তি বা প্রতাপশালী ব্যক্তিই যেন তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর তার বন্ধু এমন এক ধরনের মানুষের নমুনা, যে নিজের ঈমান নিয়েই যথেষ্ট গৌরব বোধ করে, যে সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, সকল নেয়ামত নেয়ামতদাতার প্রশংসা ও স্মরণকে অপরিহার্য করে তোলে বলে বিশ্বাস করে এবং তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাকে অস্বীকার করার কোনো অবকাশ রাখে না।

বিপুল সমৃদ্ধি ও সমারোহে পরিপূর্ণ দুটো বাগানের দৃশ্য বর্ণনার মাধ্যমে এ কাহিনী শুরু হয়েছে,

'তাদের কাছে তুমি সেই দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত তুলে ধরো, যাদের একজনকে আমি আংগুরের দুটো বাগান দিয়েছিলাম এবং সেই দুটোকে আমি খেজুরের বাগান দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলাম। আর এ দুটোর মধ্যে শস্যখামারও তৈরী করে রেখেছিলাম ....। (আয়াত ৩২-৩৩)

খেজুরের বাগানে ঘেরা দুটো ফলবান আংগুরের বাগান, তার মাঝে ফসলের ক্ষেত এবং এগুলোর মধ্যদিয়ে বয়ে গেছে নদী—এ এক মনোরম দৃশ্য, এক চমৎকার প্রণোচ্ছল পরিবেশ, মনোমুগ্ধকর সম্পদের বিবরণ,

'উভয় বাগানই নিজ নিজ ফল পূর্ণরূপে দিতো এবং ফলদানে মোটেই যুলুম করতো না।'

'যুলুম করতো না' কথাটার অর্থ হলো, ফল কম দিতো না। 'যুলুম' শব্দটা ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো বাগান দুটো ও তাদের মালিকের চরিত্র যে সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী তা দেখানো। কেননা বাগানের মালিক অহংকার করে ও অকৃতজ্ঞ হয়ে নিজের ওপর যুলুম করেছিলো।

বাগানের মালিক বাগান দেখে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সে মোরগের মতো লম্ফ ঝম্প করে, ময়ূরের মতো দম্ভে মেতে ওঠে এবং তার দরিদ্র বন্ধুর ওপর আভিজাত্য ফলায়,

'সে তার বন্ধুকে বললো, আমি তোমার চেয়ে ধন সম্পদেও বড়, জনশক্তিতেও পরাক্রমশালী।'

এরপর সে তার বন্ধুকে সাথে নিয়ে একটা বাগানে প্রবেশ করে, অহংকারে মত্ত হয়ে আল্লাহকে এবং আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায় করতে ভুলে যায়। সে ভাবে যে, এই সব ফলবান বাগান কখনো ধ্বংস হবে না এবং কেয়ামত কখনো হবে না। তবে যদি তা হয়েই বসে,

তবে সেখানে সে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা পাবে। সে যখন পৃথিবীর একজন জমীদার, তখন আখেরাতে তার সম্মান ও মর্যাদার দিকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখতে হবে।

'সে নিজের ওপর যুলুম করতে থাকা অবস্থায় নিজের বাগানে ঢুকলো।....' (আয়াত ৩৫-৩৬)

আসলে অহংকারের বশেই সম্পদশালী ও পরাক্রমশালীরা মনে করে যে, তারা নশ্বর দুনিয়ার অধিবাসীদের ওপর যে কর্তৃত্ব ও আধিপত্য চালিয়ে যাচ্ছে, তা পরকালেও তাদের জন্যে সংরক্ষিত থাকবে।

পক্ষান্তরে তার দরিদ্র বন্ধু, যার ধনবল, জনবল, ক্ষেতখামার, ফসল ইত্যাদি কিছুই নেই, সে দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পদ ঈমানের অধিকারী বলে গৌরবান্বিত এবং নিজের প্রতিপালক আল্লাহর আনুগত্য করতে পেরে গর্বিত। সে তার বন্ধুর দম্ভ ও অহংকারকে অপছন্দ করে এবং তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে মাটি ও পানির ন্যায় তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তু থেকে সৃষ্ট। তাকে মনে করিয়ে দেয় যে, তার সকল সম্পদের দাতা মহান আল্লাহর প্রতি তার অধিকতর সম্মান ও আদব প্রদর্শন করা উচিত। তাকে অহংকারের পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে দেয় এবং নিজের জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বাগান ও ফসলের চেয়ে উৎকৃষ্ট জিনিস।

'তার বন্ধু তার সাথে আলাপ প্রসংগে তাকে বললো, যিনি তোমাকে প্রথমে মাটি থেকে এবং পরে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন..... তাকে তুমি অস্বীকার করলে।.....' (আয়াত ৩৭-৪১)

এভাবে ঈমানদার মানুষ নিজের ঈমানকে নিয়ে গৌরব বোধ করে, ধনবল ও জনবলের পরোয়া করে না, বিত্তবৈভব ও অহংকারকে প্রশ্রয় দেয় না, সত্যের ব্যাপারে আপনজনদের সাথেও আপোষ করে না। সম্পদশালী পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির চেয়ে নিজেকে ক্ষমতাশালী ও প্রতাপশালী মনে করে, আল্লাহর কাছে তার জন্যে যে প্রতিদান রক্ষিত আছে, তাকে সে দুনিয়ার যাবতীয় সম্পত্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে, আল্লাহর অনুগ্রহকে সে সর্বোত্তম জিনিস মনে করে এবং সে আল্লাহর অনুগ্রহই কামনা করে। সে জানে যে, আল্লাহর প্রতিশোধ অত্যন্ত ভয়ংকর এবং অহংকারীদের কাছ থেকে তার এই প্রতিশোধ গ্রহণে বেশী দেরী নেই।

এরপরই সহসা আমরা সমৃদ্ধি ও উৎপাদনের দৃশ্য থেকে ধ্বংসের দৃশ্যে উপনীত হই। উপনীত হই অহংকারের অবস্থা থেকে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার অবস্থায়। বাস্তবিকই মোমেন ব্যক্তিটি যা আশংকা করেছিলো, সেটাই কার্যকরী হলো,

'তার ফসল বিপদে ঘেরাও হয়ে গেলো........।' (আয়াত ৪২)

এখানে একটা পূর্ণাংগ দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। সমগ্র উৎপন্ন ফসল ধ্বংস হয়ে গেছে। সর্বদিক থেকে তা দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে বিনষ্ট হয়েছে এবং কিছুই অক্ষত থাকেনি। গোটা বাগান বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আর তার মালিক অনুশোচনায় হাত কচলাচ্ছে যে তার সমস্ত চেষ্টা নস্যাত ও সমস্ত ফসল বরবাদ হয়ে গেলো। সে আল্লাহর সাথে শরীক করার জন্যে অনুতপ্ত। এখন সে স্বীকার করছে যে, তিনিই একমাত্র প্রতিপালক। সে যদিও স্পষ্ট ভাষায় শেরেকের কথা উচ্চারণ করেনি, কিন্তু ঈমানের চেয়ে পার্থিব সম্পদকে বেশী মূল্যবান মনে করা ও তার জন্যে অহংকারে মত্ত হওয়াই শেরকের পর্যায়ভুক্ত ছিলো, যাকে সে এখন অস্বীকার করছে, যার জন্যে অনুতাপ করছে এবং যা থেকে আশ্রয় চাইছে-যদিও সময় গড়িয়ে যাওয়ার পর।

এই পর্যায়ে সে আল্লাহর একক প্রভুত্ব ও একক ক্ষমতা মেনে নেয়। সে স্বীকার করে যে, আল্লাহর শক্তি ও সাহায্যের কোনো বিকল্প নেই, তার প্রতিদানই উৎকৃষ্টতম প্রতিদান এবং আল্লাহর কাছে মানুষের যা সংরক্ষিত থাকে, তাই শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। (আয়াত ৪৩-৪৪)

এখানেই যবনিকাপাত ঘটে বিধ্বস্ত বাগানের দৃশ্যের, বাগানের মালিকের অনুশোচনা এবং আল্লাহর প্রতাপ ও পরাক্রমের সামনে মানুষের চরম অক্ষমতার বর্ণনার।

ক্ষণিকের জীবন

এ দৃশ্যের মোকাবেলায় বর্ণনা করা হচ্ছে সমগ্র ইহকালীন জীবনের জন্যে আরেকটা উদাহরণ। এখানেও দেখানো হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবন ওই বাগানের মতোই নিতান্ত ক্ষুদ্র, নগণ্য ও স্থীতিশীল।

'তাদের কাছে দুনিয়ার জীবনের একটা উদাহরণ দাও......'।(আয়াত ৪৫)

এ দৃশ্যটা অত্যন্ত সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে শ্রোতার মনে ধ্বংসের ছাপ বসে যায়। পানি বর্ষিত হয় আকাশ থেকে তা কোথাও প্রবাহিত হয় না। তবে তা পৃথিবীর উদ্ভিদের সাথে মিশ্রিত হয়। এ দ্বারা উদ্ভিদ বাড়েও না, পরিপক্কও হয় না। বরং তা শুকনো খড়ে পরিণত হয়, যাকে বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এই তিনটে ক্ষুদ্র বাক্যের মধ্যেই জীবনের টেপ শেষ হয়ে যায়। দৃশ্যগুলো অতি সংক্ষেপে উপস্থাপনের জন্যে 'ফা' অর্থাৎ অতপর অব্যয়টি কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে,

'আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, অতপর তার সাথে পৃথিবীর উদ্ভিদ মিশ্রিত হয়, অতপর তা খড়কুটোয় পরিণত হয়ে যায় যা বাতাসে উড়িয়ে নেয়।'

এভাবে বুঝানো হয়েছে যে, পৃথিবীর জীবনটা কতো ক্ষুদ্র এবং কতো নগণ্য।

ক্ষণস্থায়ী জীবনের দৃশ্য তুলে ধরার পর আয়াতে ইসলামী আদর্শের মানদন্ডে দুনিয়ার জীবনের মূল্য ও আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের মূল্যায়ন করা হয়েছে এভাবে, 'ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা। আর চিরস্থায়ী সৎ কর্মগুলো তোমার প্রভুর কাছে প্রতিদানের দিক দিয়ে উত্তম ও আশার দিক দিয়ে উৎকৃষ্টতর।' (আয়াত ৪৬)

বস্তুত সম্পদ ও সন্তান জীবনের শোভা বটে। আর ইসলাম মানুষকে পবিত্র জিনিসের সীমার মধ্যে শোভা উপভোগ করতে নিষেধ করে না। তবে দুনিয়ার এসব শোভা স্থায়ীত্বের মাপকাঠিতে যতোটুকু মূল্য পাওয়ার যোগ্য, ঠিক ততোটুকু মূল্যই দেয় তার চেয়ে বেশী নয়।

সন্তান ও সম্পদ শোভা ঠিকই, কিন্তু মানদন্ড নয় যে, তা দিয়ে মানুষের মর্যাদা নির্ণয় করা যাবে কিংবা মানুষ তার ভিত্তিতে দুনিয়ার জীবনের সব কিছুকে মূল্যায়ন করবে। প্রকৃত মূল্য হলো শাশ্বত সৎ কাজের, সৎ কথার ও এবাদাতের। যেহেতু সম্পদ ও সন্তানকে ঘিরেই মানুষ দুনিয়ায় আশার জাল বুনে থাকে, তাই তাকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, শাশ্বত সৎ কাজগুলো যদি সে আন্তরিকতার সাথে, উচ্চ আশা ও পরকালের উত্তম প্রতিদান লাভের আশায় করে, তবে ওগুলোই সওয়াব ও আশার দিক দিয়ে উত্তম।

আল্লাহর সন্তুষ্টির ঐকান্তিক উদ্দেশ্যে সকাল সন্ধ্যা আল্লাহকে আহ্বানকারী নিষ্ঠাবান মোমেন বান্দাদের সাথে ধৈর্যধারণ করে অবস্থান করা ও তাদেরকে কোরায়শ নেতাদের পরামর্শে দূর করে না দেয়ার যে আদেশ দেয়া হয়েছে। সেই আদেশকে এভাবে দুই বাগানের কাহিনীর সাথে, দুনিয়ার জীবন সংক্রান্ত উদাহরণের সাথে এবং সর্বশেষে ইহকালীন ও পরকালীন মানদন্ডের সাথে সমন্বিত করা হয়েছে। এ সবগুলোর মূল বক্তব্য একটাই, আকীদা ও আদর্শের দাঁড়িপাল্লায় মেপে যাবতীয় মূল্যবোধ ও মানদন্ডকে সংশোধন করতে হবে। কোরআনের শৈল্পিক সমন্বয়ের মূলনীতি অনুযায়ী সূরার সমগ্র আলোচনাকেই সুসমন্বিত করা হয়েছে।

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٧﴾ وَعُرِضُوا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ۗ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۢ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾ وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَّلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ۗ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهٖ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۗ بِئْسَ لِلظّٰلِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

৪৭. যেদিন আমি পাহাড়সমূহকে চলমান করে (সরিয়ে) দেবো এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে, (তা) একটি শূন্য প্রান্তর, (সেদিন) আমি তাদের (মানবকুল)-কে এক জায়গায় জড়ো করবো, তাদের কোনো একজনকেও আমি বাদ দেবো না। ৪৮. তাদের (সবাই)-কে তোমার মালিকের সামনে সারিবদ্ধভাবে এনে হাযির করা হবে; (অতপর আমি বলবো, আজ তো) তোমরা সবাই আমার কাছে এসে গেছো– (ঠিক) যেমনি করে আমি তোমাদের প্রথম বার পয়দা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা (অনেকেই) মনে করতে, আমি তোমাদের (দ্বিতীয় বার আমার কাছে হাযির করার) জন্যে কোনো সময় (-সূচী) নির্ধারণ করে রাখিনি! ৪৯. (অতপর তাদের সামনে) আমলনামা রাখা হবে, (তখন) নাফরমান ব্যক্তিদের তুমি দেখবে, সে আমলনামায় যা কিছু লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তারা (খুবই) আতংকগ্রস্ত থাকবে, তারা বলতে থাকবে, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, এ (আবার) কেমন গ্রন্থ! এ তো (দেখছি আমাদের জীবনের) ছোটো কিংবা বড়ো প্রত্যেক বিষয়েরই হিসাব রেখেছে, তারা যা কিছু করেছে তার প্রতিটি বস্তুই তারা (সে গ্রন্থে) মজুদ দেখবে, তোমার মালিক (সেদিন) কারো ওপর বিন্দুমাত্র যুলুমও করবেন না।

রুকু ৭

৫০. (স্মরণ করো), যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা সবাই আদমকে সাজদা করো, তখন তারা সবাই সাজদা করলো, কিন্তু ইবলীস ছাড়া, (সে সাজদা করলো না); সে ছিলো (আসলে) জ্বিনদেরই একজন, সে তার মালিকের আদেশের নাফরমানী করলো; (যে এতো বড়ো নাফরমানী করলো) তোমরা কি তাকে এবং তার বংশধরদের আমার বদলে তোমাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে, অথচ (প্রথম দিন থেকেই) সে তোমাদের (প্রকাশ্য) দুশমন; (চেয়ে দেখো,) যালেমদের কি নিকৃষ্ট বিনিময় (দেয়া হয়েছে)।

مَآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ
مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥١﴾ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا۟ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ
زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾ وَرَءَا
ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا۟ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ
أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا۟ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ
وَيَسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّهُمْ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ
قُبُلًا ﴿٥٥﴾ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَٰدِلُ ٱلَّذِينَ
كَفَرُوا۟ بِٱلْبَٰطِلِ لِيُدْحِضُوا۟ بِهِ ٱلْحَقَّ ۖ وَٱتَّخَذُوٓا۟ ءَايَٰتِى وَمَآ أُنذِرُوا۟ هُزُوًا ﴿٥٦﴾

৫১. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় আমি তাদের কাউকে ডাকিনি, এমনকি স্বয়ং তাদের নিজেদের বানানোর সময়ও (তো আমি তাদের ডাকিনি, আসলে আমি তো অক্ষম ছিলাম না যে, তাদের পরামর্শ আমার দরকার), অন্যদের যারা গোমরাহ করে আমি তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করি না। ৫২. যেদিন তিনি (এদের) বলবেন, তোমরা তাদের ডাকো যাদের তোমরা (আমার শরীক) মনে করতে, অতপর ওরা তাদের ডাকবে (কিন্তু) তারা তাদের এ ডাকে কোনোই সাড়া দেবে না, আমি এদের উভয়ের মাঝখানে এক (মরণ) ফাঁদ রেখে দেবো। ৫৩. (এ) নাফরমান লোকেরা যখন (জাহান্নামের) আগুন দেখতে পাবে তখন তারা বুঝে যাবে, তারা (এক্ষুণি) সেখানে গিয়ে পতিত হচ্ছে, (আর একবার সেখানে পতিত হলে) ওরা তা থেকে কখনোই মুক্তির পথ পাবে না।

রুকু ৮

৫৪. আমি মানুষের (বোঝার) জন্যে এই কোরআনে সব ধরনের উপমা (ও উদাহরণ) বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু মানুষরা অধিকাংশ বিষয় নিয়েই তর্ক করে। ৫৫. হেদায়াত যখন মানুষের সামনে এসে গেলো তখন ঈমান আনা ও (গুনাহের জন্যে) তাদের মালিকের কাছে ক্ষমা চাওয়া থেকে তাদের কোন্ জিনিস বিরত রাখছে, তারা (সম্ভবত) পূর্ববর্তী মানুষদের অবস্থা তাদের কাছে এসে পৌঁছানোর কিংবা (আমার) আযাব তাদের সামনে এসে হাযির হবার অপেক্ষা করছে। ৫৬. আমি তো রসূলদের পাঠাই যে, তারা (মানুষদের জন্যে জান্নাতের) সুসংবাদবাহী ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী (হবে), কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা (ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে) ঝগড়া শুরু করে, যাতে তারা সত্যকে ব্যর্থ করে দিতে পারে, (মূলত) তারা আমার আয়াতসমূহকে এবং যেসব বিষয় দিয়ে তাদের (জাহান্নাম থেকে) সতর্ক করা হয়েছিলো তাকে বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত করে নিয়েছে।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ط

اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط وَاِنْ

تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو

الرَّحْمَةِ ط لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ط بَلْ لَّهُمْ

مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا

ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾

৫৭. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে যাকে তার মালিকের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং সে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, (সর্বোপরি) যা কিছু (গুনাহের বোঝা) তার হাত দুটো অর্জন করেছে সে (তা) ভুলে যায়; আমি তাদের অন্তরের ওপর (জাহেলিয়াতের) আবরণ লাগিয়ে দিয়েছি, যেন তারা (সত্য দ্বীন) বুঝতে না পারে, (এমনিভাবে) তাদের কানেও (এক ধরনের) কঠিন বস্তু ঢেলে দিয়েছি (এ কারণে তারা সত্য কথা শুনতে পায় না, অতএব হে নবী); তুমি ওদের যতোই হেদায়াতের পথে ডাকো না কেন, তারা কখনো হেদায়াত পাবে না। ৫৮. (হে নবী,) তোমার মালিক বড়োই ক্ষমাশীল ও দয়াবান; তিনি যদি তাদের সবাইকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে শাস্তি দিতে চাইতেন, তাহলে তিনি (সহজেই) শাস্তি ত্বরান্বিত করতে পারতেন; বরং (এর পরিবর্তে) তাদের জন্যে (শাস্তির) একটি প্রতিশ্রুত ক্ষণ (নির্ধারিত) আছে, যা থেকে ওদের কারোরই পরিত্রাণ নেই! ৫৯. এ জনপদ (ও তাদের অধিবাসীরা) যখন (আল্লাহ তায়ালার) সীমা লংঘন করেছিলো তখন আমি তাদের নির্মূল করে দিয়েছি, তাদের ধ্বংসের জন্যেও আমি একটি দিন ক্ষণ নির্দিষ্ট করে রেখেছি।

তাফসীর

আয়াত ৪৭-৫৯

পূর্ববর্তী অধ্যায়টা সমাপ্ত হয়েছে শাশ্বত মূল্যের অধিকারী সৎ কর্মসমূহের উল্লেখের মধ্য দিয়ে। এখানে ওই বিষয়টাকে সেই দিনের বর্ণনার সাথে যুক্ত করা হয়েছে, যেদিন ওই সব শাশ্বত সৎ কর্মের ওযন থাকবে এবং হিসাব নিকাশ নেয়া হবে। এটাকে কেয়ামতের একটা দৃশ্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর অব্যবহিত পরে আলোচিত হয়েছে ইবলীসের ঘটনা। আদমকে সেজদা করতে ইবলীসকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু সে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছিলো। অথচ আদমের সন্তানরা সেই ইবলীস ও তার বংশধর শয়তানদেরকে অভিভাবক ও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করলো। এ জন্যে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা তারা আগেই জেনেছে যে, ওরা মানুষের শত্রু। এ জন্যেই তারা কেয়ামতের দিন আযাব ভোগ করবে। আর যাদেরকে তারা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছে তাদের কাছেই তাদের পূজারীরা যাবে। অথচ সেই প্রতিশ্রুত দিনে তাদের কোনো প্রার্থনাই মঞ্জুর হবে না।

আর স্মরণ করে দেখো ওই দিনের অবস্থাকে যখন আমি, আল্লাহ তায়ালা চালিয়ে দেবো পর্বতসমূহকে এবং দেখতে পাবে তোমরা পৃথিবীকে পরিণত করা হয়েছে এক উন্মুক্ত প্রান্তরে....... আর পাবে তারা সে সব কিছু যা তারা করেছে, আর তারা দেখবে, তাদের সামনে সব কিছু হাযির (অবস্থায়) আর তোমার রব কোনো যুলুম করবেন না কারো ওপর।

কেয়ামতের জীবন্ত চিত্র

এখানে এমন একটি দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে যা মানব প্রকৃতির পক্ষে বুঝতে পারাটা খুবই সহজ। যে ভয়ানক দৃশ্য এ বর্ণনায় ফুটে উঠেছে তাতে মানব হৃদয়ে এক প্রচন্ড প্রকম্পন সৃষ্টি হয়। সেই মহা প্রলয় যখন শুরু হবে তখন পৃথিবীর সব কিছু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণ হারিয়ে ফেলার কারণে একেবারেই ওযনবিহীন হয়ে পড়বে। সুউচ্চ পর্বতরাশি যা আজকে জমাট পাথর রূপে আমরা পৃথিবীর মধ্যে দৃঢ়বদ্ধভাবে প্রোথিত দেখতে পাচ্ছি সেগুলো সব স্থানচ্যুৎ হয়ে মাটির উপরিভাগে ভাসাভাসাভাবে চলতে থাকবে, সেগুলোর মধ্যে অবস্থিত অনু-পরমাণুগুলো পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে ধুলিকণা সম উড়তে থাকবে। চিন্তা করে দেখনু, এ অবস্থার মধ্যে পতিত হয়ে মানব হৃদয়ের কী অবস্থা হতে পারে। গোটা পৃথিবীর সব কিছু ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে এবং নযরে পড়বে দিগন্ত ব্যাপী প্রসারিত এক ধূধূ মহা প্রান্তর। সেখানে কাউকে আপনজন হিসাবে পাওয়া যাবে না। আর না থাকবে সেখানে পথ দেখানোর মতো কেউ, না কোনো উঁচু নীচু ভূমি, পাহাড় পর্বত, না কোনো শস্য শ্যামল ভূমি আর না পানির প্রশ্রবন সম্বলিত কোনো উপত্যকা। এ সময়ে মানুষের মনে লুকায়িত যাবতীয় গোপন রহস্য খুলে যাবে, সেদিন কেউ কোনো কথা লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

আরো চিন্তা করে দেখুন, এই কঠিন দিনে সমান্তরাল এ পৃথিবীর মধ্যে কোনো কিছুই আর গোপন থাকবে না। কোনো মানুষকেও গোপন থাকতে দেখা যাবে না। তাই এরশাদ হচ্ছে, একত্রিত করবো সবাইকে, ওদের কাউকেই আমি ছাড়ব না।'

ওই মহাসমাবেশের দিনে কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না–সবাই হাযির হয়ে যাবে ওই মহা প্রান্তরে তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ আমল কাজ কর্ম ও ব্যবহার সহ সবাইকে হাযির করা হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তাদেরকে হাযির করা হবে তোমার রব এর সামনে সারিবদ্ধভাবে।'............

হাযির করা হবে গোটা মানবমন্ডলীকে যাদের কোনো সীমাসংখ্যা থাকবে না, অর্থাৎ অগণিত হবে তাদের সংখ্যা। পৃথিবীর বুকে মানব জাতির বসতি শুরু হওয়া থেকে পৃথিবীর মহা প্রলয় পর্যন্ত যতো মানুষ দুনিয়ায় পয়দা হয়েছে তারা সবাই ওই হাশরের ময়দানে হাযির হয়ে যাবে, কোনো এক ব্যক্তিও বাকি থাকবে না। পৃথিবীর কোনো অংশও আর গোপন থাকবে না সব অংশই মানবমন্ডলীর সামনে উপস্থিত থাকবে।

এই পর্যায়ে এসে বর্ণনাভংগির পরিবর্তন হয়ে সম্বোধনসূচক বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, যেন ওই দিনের সমাবেশের সকল জনতা উপস্থিত রয়েছে এবং তাদেরকে সরাসরি সম্বোধন করে কথা বলা হচ্ছে। এ বর্ণনাভংগি পাঠকের সামনে ওই কঠিন দিনের দৃশ্যকে এমন জীবন্ত ছবির মতো তুলে ধরেছে যেন পাঠক অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছে হয়রান পেরেশান ওই বিশাল জনসমুদ্রকে। কল্পনায় ওই ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকনে দৃষ্টি যেন পাথর হয়ে যেতে চাইছে, আমরাও

যেন দেখছি ওই কঠিন অবস্থা আমাদের চোখের সামনে ভাসছে, শুনছি জনতার ওই বিভীষিকাময় কোলাহলকে, দেখছি ওই সব নাফরমান লোকদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত লজ্জিত অবস্থায়, যারা এ দিনের আগমনকে অস্বীকার করেছিলো। এমনই এক অবস্থাকে সামনে নিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলছেন, 'হাঁ, অবশ্যই আজ তোমরা সেই অবস্থায় আমার কাছে ফিরে এসেছো যেমন করে প্রথম বারে আমি, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা, তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম।' কিন্তু তোমরা তো ভেবেছিলে এই ওয়াদাকৃত দিবস কখনই আসবে না।'

এই সম্বোধনসূচক বাক্যটি ওই অবস্থাকে জীবন্ত রূপ দিয়েছে এবং কেয়ামতের ওই ভয়াবহ দৃশ্যকে এমন ছবির মতো ফুটিয়ে তুলেছে যেন এখনই আমাদের সামনে ওই ছবিটা ভাসছে, মনে হচ্ছে এটা ভবিষ্যতের অনুষ্ঠিতব্য এবং অজানা অচেনা কোনো কেয়ামত নয়।

আর অবশ্যই আমরা ওই ভয়ানক দৃশ্যের মধ্যে অপরাধী, পাপিষ্ঠ ও আল্লাহর হুকুম অমান্যকারীদেরকে নানা প্রকার অপমান সইতে দেখছি, বর্ণনা প্রসংগে বাহ্যিক যে দৃশ্য আমাদের নযরে পড়ছে তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওই নাফরমানদের লাঞ্ছনার গ্লানি অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। আল্লাহর সতর্কতা তাঁর কালামে যেভাবে ধ্বনিত হয়েছে তাতে ওদের প্রতি কঠিন ধমকের সুর ফুটে উঠেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই তোমরা সেই (অসহায় অবস্থায়) আমার কাছে এসেছো যেমন অতি (দুর্বল অবস্থায়) আমি তোমাদেরকে প্রথম বারে সৃষ্টি করেছিলাম।' অথচ তোমরা মনে করছো .... ।'

ওই সময়কার দৃশ্যের জীবন্ত ছবি আমাদের সামনে হাযির করার পর, পরবর্তী অবস্থা কি হবে সে বিষয়ে আমাদেরকে জানানো হচ্ছে,

'হাযির করা হবে (মানুষের সামনে) তাদের জীবনের কার্যতালিকা রেকর্ড বুক তখন অপরাধী ব্যক্তিরা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখতে পাবে ওই কেতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ তাদের জীবনের সকল বিষয়গুলো।'

অর্থাৎ, তারা দেখতে পাবে তাদের সামনে রেখে দেয়া হয়েছে তাদের জীবনের সকল কাজ কর্মের পূর্ণাংগ তালিকা। এ সময় তারা চিন্তা করতে থাকবে এবং পেছনের কাজগুলো স্মরণ করে দেখতে পাবে, যা কিছু লিপিবদ্ধ রয়েছে তার প্রতিটি কথাই সত্য। তখন, তাদের জীবনের সকল দুষ্কর্মের অবশ্যম্ভাবী শাস্তির কথা চিন্তা করে তারা তাদের বুক সংকুচিত হয়ে যাবে, কেননা তারা দেখবে এ রেকর্ড বই তো ছোটো বড়ো কোনোটাই বাদ দেয়নি। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যা কিছু তারা করেছে তার প্রতিটি কথা গুণে গুণে এ কর্ম তালিকার মধ্যে লিখে রাখা হয়েছে। সুতরাং তাদের মন বলে উঠবে কি করে তারা রেহাই পাবে এর অনিবার্য শাস্তি থেকে।

'তখন তারা বলে উঠবে, হায় আফসোস! কী আশ্চর্য কেতাব এটা, ছোট বড় কোনো অপরাধের কথাই এ কেতাব লিখতে ছাড়েনি, সবই গুণে গুণে এর মধ্যে ভরে রেখে দিয়েছে?'

নিজের ওপর রাগ ও লজ্জা তাদেরকে এমনভাবে ঘিরে ফেলবে যে, ওই কঠিন শাস্তির ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় স্বগতোক্তি করতে করতে নিজেদের অজান্তেই উপরোক্ত কথাগুলো তারা উচ্চারণ করতে থাকবে চাইবে তারা পালিয়ে যেতে কিন্তু কোথায় যাবে তারা? আল্লাহর রাজ্য ছাড়া কোথাও তো কোনো আশ্রয় থাকবে না! তারা কাউকে তাদের সম্পর্কে ভুলিয়ে দিতে পারবে না বা কারো চোখে ধুলো দিয়ে সরেও যেতে পারবে না যেমনটি আজ ওই চতুর লোকেরা মনে করে, তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তারা যা কিছু করেছে সবই হাযির পাবে।'

অর্থাৎ, যা কিছু করে এসেছে তার সমুচিত শাস্তি অবশ্যই তারা পাবে,

'এবং তোমার রব কারো ওপর যুলুম করবেন না।' অর্থাৎ কাউকে তার পাওনা শাস্তি থেকে মোটেই বেশী দেবেন না-কিন্তু পাওনা শাস্তি কম দিলে তাঁকে ঠেকায় কে? এ প্রশ্ন যখন আসে তখন বুঝতে হবে তাঁর হক কেউ নষ্ট করে থাকলে তা মাফ করে দেয়ায় তাঁকে কেউ বারণ করতে পারে না বা পারবে না কিন্তু কোনো বান্দার হক নষ্ট করে থাকলে তাকে তার পাওনা ওই অপরাধীদের কাছ থেকে অবশ্যই তিনি বুঝে দেবেন, যেহেতু তাদের পাওনা আদায় করে না দিলে পাওনাদারদের প্রতি যুলুম করা হবে, অবশ্যই তিনি এ যুলুম করবেন না বা কিছুতেই তিনি এ যুলুম হতে দেবেন না। এটাই তাঁর ইনসাফের দাবী। এমতাবস্থায় বান্দার হক কতো কঠিন তা সহজেই অনুমেয়।

শয়তান যখন বন্ধু ...... !

এই অবস্থানে পৌছানোর পরই ওই অপরাধীরা বুঝতে পারবে যে মরদূদ শয়তান তাদের কতো বড় দুশমন। কিন্তু হায়, জীবদ্দশায়, না বুঝে তারা তারই

অনুসরণ করেছে, আর সেও তাদেরকে অবলীলাক্রমে চালিয়েছে ভুল পথে তাদের দুনিয়ার লোভে মেতে থাকার কারণে। যার ফলে তাদেরকে এই কঠিন দিনের দিকে এগিয়ে নেয়ার সুযোগ সে পেয়ে গেছে...... এর থেকে আশ্চর্যের বিষয় আর কী হতে পারে, মানুষ জানে যে মরদূদ এই ইবলিস শয়তানই তো তাদের আদি পিতা আদম (আ.) ও বিবি হাওয়াকে বিপথগামী করেছিলো-এতদসত্তেও তাকেই তারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে ইবলিসকে তো মানুষ দেখতে পারে না সে অবস্থায় তাকে কিভাবে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে? জওয়াব হচ্ছে, মানুষকে সঠিক পথে চালানোর জন্যে আল্লাহ তায়ালা সর্বযুগেই এবং সকল দেশে তাঁর নবীদের পাঠিয়েছেন, তাদের পথই আল্লাহর পথ। এ পথ বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো পথই শয়তানের পথ। এই জ্বিন শয়তান কখনও মানুষ রূপে এসে তাকে আল্লাহর পথের বাইরে অন্য পথে চালায়, আবার কখনও জ্বিন শয়তান নিজে এসে অন্য পথে নিয়ে যায়। এরশাদ হচ্ছে,

'আর স্মরণ করে দেখো ওই সময়ের কথা যখন আমি, আল্লাহ তায়ালা বললাম ফেরেশতাদেরকে সেজদা করো আদমকে, তখন সেজদা করলো তারা ইবলিস ছাড়া..... নিকৃষ্ট প্রতিদান রয়েছে সীমালংঘনকারী (যালেমদের) জন্যে।'

এখানে পেছনের ঘটনার দিকে ইশারা করে বনি আদমকে স্মরণ করানো হচ্ছে যে, 'বাবা আদম ও মা হাওয়াকে বিপথগামী করার পূর্বে ইবলিস যে প্রতিজ্ঞা করেছিলো যে, আদম ও তার বংশের পেছনে সে সর্বদা লেগে থাকবে'-একথা সে এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যায় না। এমতাবস্থায় চির দুশমন যে ইবলিস শয়তানের চির দুশমনির প্রতিজ্ঞার কথা মানুষ কেমন করে ভুলে যায় এবং কেমন করে তাকে ও তার চেলাচামুন্ডাদেরকে মানুষ কল্যাণকামী বা বন্ধু-রূপে গ্রহণ করতে পারে!-একথা বলে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ভ্রান্ত বনী আদমের আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করছেন।

ইবলিস ও তার বংশধরদেরকে বন্ধু বা কল্যাণকামী মনে করার অর্থ হচ্ছে তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে অন্যায় ও বিবেক বিরুদ্ধ কাজ করতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া।

এখানে প্রশ্ন জাগে, কেন মানুষেরা তাদের এহেন নিকৃষ্ট দুশমনের ডাকে সাড়া দিতে যায়, অথচ তাদের কাছে না আছে সঠিক কোনো জ্ঞান অথবা কোনো স্থায়ী শক্তি, যার দ্বারা জোর করে কারো দ্বারা কিছু তারা করাতে পারে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদেরকে আসমান যমীনের সৃষ্টি কৌশল দেখাননি বা তাদের নিজেদের সৃষ্টি রহস্যের কথাও তাদেরকে জানাননি, যার কারণে তারা আল্লাহর গায়েবী রহস্যাবলী সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে পারে! আর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাঁর সহকারীও বানাননি, যার কারণে তাদের কিছু শক্তি থাকতে পারে। এরশাদ হচ্ছে,

'আমি তাদেরকে আসমান যমীনের সৃষ্টি কৌশল বা তাদের নিজেদের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কেও তো কিছু জানাইনি। আর আমি ওই পথভ্রষ্ট ব্যক্তিদেরকে কোনো সাহায্যকারী হিসাবেও গ্রহণ করিনি।

প্রকৃতপক্ষে এটাই তো হচ্ছে বাস্তব সত্য যে ওরা আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে একটি সৃষ্টি মাত্র, যারা কোনো গায়েব বা অদৃশ্য জিনিস সম্পর্কে কিছুই জানেনা বা পবিত্র আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে কোনো সাহায্যও চান না।

আয়াতের শেষ অংশটুকুর দিকে আবারও খেয়াল করুন,

'আর আমি ওই ভুল পথের পথিকদেরকে কখনও সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না।'

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, তাহলে কি যারা পথভ্রষ্ট নয় তাদেরকে তিনি সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করেন?

এর জওয়াব হচ্ছে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনই সকল শক্তি ক্ষমতার মালিক। তাঁর ক্ষমতার মধ্যে এমন কোনো কমতি নেই যে, কারো সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন হবে, অর্থাৎ যে সব দুর্বলতার কারণে কারো কাছে সাহায্য চাওয়ার দরকার হতে পারে সে সব কমতি থেকে তিনি বহু বহু উর্ধে। তাঁর শক্তি ক্ষমতার কোনো শেষ নেই–নেই কোনো স্থায়ীত্বের অভাব...... মোশরেকদের কাল্পনিক নানা প্রকার মিথ্যা শক্তি নির্ভরতা দূর করার জন্যে বিবেকবান মানুষের কাছে আল্লাহ তায়ালা সব থেকে উপযুক্ত পদ্ধতিতে তাঁর ক্ষমতা উপস্থাপনা করেছেন এবং তাঁর শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে সকল কিছুর শক্তির দম্ভ চূর্ণ করে দিয়েছেন। সুতরাং, যেসব নির্বোধ ও অপরিণামদর্শী লোকেরা শয়তানকে বন্ধু ও পরিচালক মনে করে এবং আল্লাহর শক্তি ক্ষমতায় তাকে অংশীদার মনে করে, নিছক অলীক কল্পনার ওপরেই তারা এটা মনে করে, তারা ভাবে শয়তানের গোপন কিছু বিদ্যাবুদ্ধি আছে এবং সে বেশ কিছু অত্যাশ্চার্য শক্তির অধিকারী, অথচ (এটা সে হিসাব করে না যে) শয়তান নিজে পথভ্রষ্ট এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা ভুল পথ ও এই ভুল পথের পথিককে অপছন্দ করেন না এবং তাকে চরমভাবে ঘৃণা করেন।

আসলে এই আনুমানিক কথাটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানুষের বুঝ শক্তির কাছে শুধু একটা উদাহরণ বা ব্যাখ্যা হিসাবে আয়াতগুলো পেশ করা হয়েছে।

মোশরেকদের করুণ পরিণতি

এরপর কেয়ামতের দৃশ্যাবলীর মধ্য থেকে সেই দৃশ্যটি দেখানো হচ্ছে যার মধ্যে দেখা যাচ্ছে ওইসব শরীকদারকে যাদেরকে আল্লাহর ক্ষমতার অংশীদার মনে করা হয়েছিলো এবং সেখানে ওই সব অপরাধীদের ছবিও ফুটে উঠেছে যারা জেনে বুঝে অন্যায় কাজে লিপ্ত ছিলো। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করে দেখো ওই সব শরীকদারদেরকে যাদেরকে তোমরা আমার .... ওই অপরাধীরা দোযখের আগুন দেখবে এবং ভাবতে থাকবে যে তাদেরকে তো ওখানেই নিক্ষেপ করা হবে এবং ওই বিপদ দূর করার কোনো উপায় তারা খুঁজে পাবে না।' (৫২-৫৩)

তারা এমন এক অবস্থানে থাকবে যেখানে কোনো দলীল প্রমাণ ছাড়া কোনো কথা গ্রহণ করা হবে না এবং তাদেরকে ডাক দিয়ে তাদের কাল্পনিক শরীকদারদেরকে হাযির করতে বলা হবে........ কিন্তু এমন পেরেশানীর মধ্যে তারা থাকবে যে তাদের মনেই হবে না যে তারা আখেরাতের যিন্দেগীতে উপনীত হয়েছে, এজন্যে তারা দিশেহারাভাবে তাদের ওই সব মুরুব্বী বা দেব-দেবীদেরকে সাহায্যের জন্যে ডাকতে থাকবে যাদের কথামতো তারা চলতো বা যাদের পূজা অর্চনা করতো। কিন্তু আল্লাহর ক্ষমতায় যাদেরকে তারা অংশীদার মনে করতো তারা কেউ সে দিন তাদেরকে সামান্যতম সাহায্য করার জন্যেও এগিয়ে আসবে না। এরা ওই কঠিন দিনে অপরকে কি সাহায্য করবে, নিজেদেরকেই তারা কোনো সাহায্য করতে পারবে না।

সেদিন ওই উপাস্য ও উপাসকদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা এমনই ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন যা অতিক্রম করা ওদের কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না....... সে অবস্থা হবে দোযখের ডগডগে আগুন। তারই কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'আমি তাদের মধ্যে এক ধ্বংসাত্মক ব্যবধান-, আগুনের উপত্যকা বানাবো।'

অপরাধীরাই এই কঠিন অবস্থা প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের অন্তর প্রচন্ড ভয়-ভীতিতে ভরে যাবে, প্রতি মুহূর্তে তাদের মনে হতে থাকবে যে এখনই বোধ হয় তাদেরকে ওখানে নিক্ষেপ করা হবে। আসলে যে আযাবের দৃশ্য তাদের সামনে তারা দেখতে পাবে, তার মধ্যে পতিত হওয়ার এই সার্বক্ষণিক আশংকা মোটেই কম বেদনাদায়ক নয় এবং তারা পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত থাকবে যে ওই কঠিন দোযখ থেকে তাদের বাঁচার কোনো উপায় নেই, বা কেউ নাই তাদেরকে উদ্ধারকারী। একথাটাই ফুটে উঠেছে নীচের আয়াতাংশে,

'আর, দেখবে অপরাধীরা দোযখের ওই ভয়ানক আগুনকে এবং ভাবতে থাকবে যে ওখানে অবশ্যই তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে-আর ওই কঠিন আযাব থেকে বাঁচানেওয়ালা কাউকে তারা খুঁজে পাবে না।' (৫৩)

ওরা সবাই ভালো করেই জানে যে এ জীবন চিরস্থায়ী নয় এবং যে কোনো অন্যায় কাজের প্রতিক্রিয়া তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এই জীবদ্দশাতেই যদি তারা বিবেকের ডাকে সাড়া দেয় এবং নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে তাহলেই তারা আসন্ন ওই কঠিন পরিণতি থেকে বাঁচতে পারে– আযাব থেকে বাঁচার এক উপায় তাদের অবশ্যই ছিলো; যদি তারা আল-কোরআনের দিকে মুখ ফেরাতো এবং তাদের কাছে আগত সত্যের বিরুদ্ধাচার না করতো–তাহলেই তারা ওই দিনের আযাব থেকে বাঁচতে পারতো। ওই দিনের আযাব সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা বহু প্রকার উদাহরণ দিয়ে তাদেরকে বুঝিয়েছেন; এরশাদ হচ্ছে,

অবশ্যই আমি, মহান আল্লাহ, এই কোরআনের মধ্যে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে মানুষকে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়েছি, কিন্তু মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে শুধু তর্কই করেছে। (আয়াত ৫৪)

এই বুঝানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন মানুষ নিজের অহংকারকে দমন করে এবং আত্মম্ভরিতাকে প্রশমিত রাখে, আর চিন্তা করে যে তারা অন্যান্য সৃষ্টির মতোই এক নশ্বর সৃষ্টি মাত্র–তবুও তাদের

অধিকাংশ বিষয়ের ওপর তর্কের এই প্রবণতা কি কখনও শোভা পায়! কোরআনের মধ্যে সব কিছু সম্পর্কে এত বিস্তারিত উদাহরণ দেয়া সত্ত্বেও কি তাদের বুঝা উচিত নয়?

দ্বীন গ্রহণে প্রধান দুটি বাধা

এরপর, যারা কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা বিশ্বাস করেনি এবং প্রকৃতপক্ষে সকল নবী রসূলদের যামানায় তাদের সংখ্যাই বেশী, ওই সব অবিশ্বাসীদের কথা পেশ করতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

হেদায়েত যখন এসে গেলো তখন ওই সকল মানুষকে পেছনের রীতি নীতি অনুসরণের মানসিকতা ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বা অন্য কোনো বুঝ ঈমান আনতে এবং তাদের রবের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধা দেয়নি অথবা তাদেরকে ঈমান আনতে বাধা দিয়েছিলো এই চিন্তা যে 'আযাব আসুক' তারপর দেখা যাবে ঈমান আনা প্রয়োজন কিনা। (আয়াত ৫৫)

তাদের কাছে তো হেদায়াতের কথা এমন স্পষ্টভাবে এসেছিলো যে, খেয়াল করলে এবং হেদায়াতের কথাগুলো বুঝার চেষ্টা করলে সঠিক পথ গ্রহণ করা তাদের জন্যে মোটেই কঠিন ছিলো না, কিন্তু আফসোস, এমনই হঠকারী ছিলো তারা যে হেদায়াতের পথের যে বর্ণনা তারা আল্লাহর পয়গম্বরদের কাছে শুনেছে তাতে তারা কান দেয়নি, চিন্তা করেনি। বুঝারও চেষ্টা করেনি এবং অতীত জাতিসমূহের ওপর কোনো কারণে আযাব নাযিল হয়েছিলো তাও বুঝার চেষ্টা করেনি। যার ফলে তাদের ওপর আযাব নাযিল হওয়াকে তারা হালাল বানিয়ে ফেললো। তাদের মনকে তারা ঠাট্টা মস্কারি ও উপহাস বিদ্রূপ দ্বারা হেদায়াতের পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলো অথবা তারা চাইলো যে আযাব সামনাসামনি এসে গেলে তখন ঈমান আনাটা সমীচীন হবে এবং বিশ্বাসটা পাকাপোক্তা হবে।

কিন্তু রসূলদের কাজের ধারা এটা ছিলো না, যার ফলে সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারীদের ওপর, অতীতের মতো ধ্বংস নেমে এল। অতীতে যেমন করে রসূলদের কাছে আসা মোজেযা দেখা সত্ত্বেও ঈমান না আনার কারণে আযাব নাযিল হয়েছিলো, তেমনি এদের ওপরও আযাব নাযিল হয়ে গেলো। এসব কিছুর সিদ্ধান্ত তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছিলো রসূলরা তো শুধু সুসংবাদ দানকারী অথবা আযাব সম্পর্কে সতর্ককারী মাত্র; এরশাদ হচ্ছে,

'আমি রসূলদেরকে একমাত্র সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী হিসাবেই পাঠিয়েছি। আর কাফেররা তো তাদের সাথে অন্যায়ভাবে তর্কবিতর্ক করেছে এবং ....আল্লাহর আয়াতগুলোকে উপহাস বিদ্রূপের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং নবীদেরকেও তারা বিদ্রূপ করেছে। (আয়াত ৫৬)

আর সত্য তো সুস্পষ্ট ও সকল প্রকার সন্দেহমুক্ত, কিন্তু কাফেররা সত্যকে পরাভূত করে এবং সত্যের ওপর জয়ী হওয়ার অসৎ উদ্দেশ্যেই অন্যায়ভাবে এবং খামাখা তর্ক করে, আর এজন্যে তারা অলৌকিক কোনো ক্ষমতা দেখানোর দাবী করে এবং আযাব নিয়ে আসার জন্যে ব্যস্ততা দেখায়। এর অর্থ অবশ্যই এটা নয় যে আযাব এসে গেলে তারা খুব ধৈর্যের সাথে আযাব সহ্য করে যেতে পারবে; বরং এসব ব্যস্ততা দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে আযাব সম্পর্কিত আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করা ও সেগুলোকে মিথ্যা মনে করে বিদ্রূপ করা। তারা বলে– রাখো তোমার আযাবের ভয় দেখানো, পারলে নিয়ে এসো না দেখি কেমন আযাব আনতে পার। অর্থাৎ তোমার ওসব ভুয়া কথা রেখে দাও! তাই এরশাদ হচ্ছে,

'ঐ ব্যক্তি থেকে বড় যালেম আর কে হতে পারে যাকে তার রবের পক্ষ থেকে আসা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু সেগুলো থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং .... আর যখন তাদেরকে হেদায়াতের দিকে তুমি ডাক তখন তারা কিছুতেই সে পথ গ্রহণ করে না।' (আয়াত ৫৭)

এরা হচ্ছে ওইসব মানুষ যারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে উপহাস-বিদ্রূপ করে প্রত্যাখ্যান করেছে, আমিও তাদেরকে ঢিল দিয়ে রেখেছি, আসলে এমনই হতভাগ্য তারা যে তারা এ কোরআনের কথা শুনবে বলে আশা করা যায় না বা এর থেকে কোনো ফায়দাও তারা হাসিল করতে পারবে বলে মনে হয় না। এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরের ওপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন যার কারণে তাদের বুঝ শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে এবং তাদের কানের ওপর এমন কিছু বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন যার কারণে তারা বধিরের মতো হয়ে গেছে সত্যের আহ্বান তারা কিছুই শুনতে পায় না এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, আর এই কারণে আল্লাহ তায়ালা গোমরাহীকেই তাদের ভাগ্য লিখন বানিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে তারা আর কোনোদিন সঠিক পথে ফিরে আসতে পারবে না, কেননা হেদায়াত গ্রহণ করার জন্যে প্রয়োজন এমন খোলা মন যা সত্যকে গ্রহণ করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকে। এহেন হৃদয়বানদের জন্যে আল্লাহর আশ্বাস বাণী,

'আর তোমার রব বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই করুণাময় তিনি ওদের অপরাধগুলোর জন্যে ওদেরকে পাকড়াও করতে চাইলে তো শীঘ্রই তাদের ওপর আযাব এসে যেতো। (আয়াত ৫৮) কিন্তু না, তিনি সাথে সাথে পাকড়াও করেন না, বরং তিনি বড় মেহেরবানী করে তাদেরকে সময় দিয়ে রাখেন এবং 'ধ্বংস নেমে আসুক' বলে তারা যে ব্যস্ততা দেখাচ্ছে তাকে তিনি বিলম্বিত করেন; অবশ্য এর অর্থ মোটেই এমন নয় যে তিনি তাদেরকে একেবারেই ছেড়ে দিচ্ছেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই তাদের জন্যে রয়েছে ওয়াদা করা একটি নির্দিষ্ট সময়, যার থেকে সরে যাওয়ার কোনো জায়গা তারা খুঁজে পাবে না।' (আয়াত ৫৮)

অর্থাৎ, ওয়াদা করা এসময় দুনিয়াতেই আসবে যখন তাদের ওপর কিছু না কিছু আযাব হালাল হয়ে যাবে। এরপর আখেরাতের ওয়াদাকৃত চিরস্থায়ী আযাব তো আছেই সেখানে হিসাব নিকাশ করে যার যা পাওনা তাদেরকে তা পুরোপুরিই দেয়া হবে।

তারা যুলুম করেছিলো, এজন্যে পূর্ববর্তীদের মতো তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে অথবা আযাবের হকদার হয়ে গেছে যদি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে ঢিল দেয়ার জন্যে পূর্বেই সিদ্ধান্ত না হয়ে থাকতো, তাহলে অবশ্যই তাদের জঘন্য আচরণের শাস্তি অচিরেই তাদের ওপর নেমে আসতো। তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত এটা আল্লাহর এক হেকমত যার তাৎপর্য একমাত্র তিনিই জানেন। তাই দেখা যায়, তাদের এতো হঠকারিতা, এতো সত্য বিরোধিতা, এতো যুলুম এবং এতো নিষ্ঠুরতা সত্তেও আল্লাহ তায়ালা অতীতের জাতিসমূহের ওপর আগত সর্বাত্মক শাস্তির মতো শাস্তি মোহাম্মদ (স.)-এর কওমের ওপর নাযিল করেননি; বরং, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে আর একটি সময়ের ওয়াদা করে রেখেছেন এবং ওয়াদাকৃত সেই দিনটিতে আযাব দানের কথা আর কিছুতেই খেলাফ হবে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর ঐসব এলাকাবাসীদেরকে আমি তখনই ধ্বংস করে দিয়েছি যখন তারা যুলুম করেছে, কিন্তু এদের ধ্বংসের জন্যে আমি, একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছি। (আয়াত ৫৭)

অতএব, তাদেরকে ঢিল দেয়ায় এবং তাদের ওপর আযাব নাযিল করার ব্যাপারে বিলম্বিত করায় তারা যেন কোনো ধোঁকার মধ্যে না পড়ে। নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাওয়ার পর তাদের জন্যে ওয়াদাকৃত আযাবের দিনটি অবশ্যই আসবে–এবং অবশ্যই এটা সত্য কথা যে চিরাচরিত নিয়ম কখনই বদলাবে না। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিয়মকে কখনই পরিবর্তন করেন না।

এরপর কোরআন আমাদেরকে নিয়ে যায় ইতিহাসের অন্য একটি অধ্যায়ে। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করে দেখো ওই সময়ের কথা যখন মূসা তার যুবক সংগীকে বললো, দুটি সাগরের সংগম স্থল বা মোহনায় না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি চলতেই থাকবো এমন কি মোহনা না পাওয়া পর্যন্ত জীবনভর চলতে হলেও চলতে থাকবো .... এই হচ্ছে ব্যাখ্যা সেই সব রহস্যপূর্ণ ঘটনাবলীর যার ব্যাখ্যা দান করার জন্যে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করতে পারনি।' (আয়াত ৬০-৬২)

পরবর্তী অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ এই ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা করবো।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰىٓ اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ
اَمْضِىَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى
الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ز لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ
سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾ قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ
الْحُوْتَ ز وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ج وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى
الْبَحْرِ ق عَجَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ق فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾
فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾
قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

রুকু ৯

৬০. (হে নবী, তুমি এদের মূসার ঘটনা শোনাও,) যখন মূসা তার খাদেমকে বললো, যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি দুটো সাগরের মিলনস্থলে না পৌঁছবো, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি (আমার পরিকল্পনা থেকে) ফিরে আসবো না, কিংবা (প্রয়োজনে এ জন্যে) দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমি চলা অব্যাহত রাখবো! ৬১. যখন তারা উভয়ে (সেই প্রত্যাশিত) দুটো সাগরের সংগমস্থলে এসে পৌঁছলো তখন তারা উভয়েই তাদের (খাবাবের জন্যে রাখা) মাছটির কথা ভুলে গেলো, অতপর সে মাছটি (ছুটে গিয়ে) সুড়ংয়ের মতো (একটি) পথ করে (সহজেই) সাগরে চলে গেলো। ৬২. যখন তারা আরো কিছু দূর এগিয়ে গেলো তখন সে তার খাদেমকে বললো, (এবার) আমাদের নাশতা নিয়ে এসো, আমরা আজকের এ সফরে সত্যিই ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ৬৩. সে বললো, তুমি কি দেখোনি, আমরা যখন শিলাখন্ডের পাশে বিশ্রাম করছিলাম, সত্যিই আমি মাছের কথাটি ভুলেই গিয়েছিলাম, (আসলে) শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে যে, আমি তার কথাটা স্মরণ রাখবো, আর সে (মাছটি)ও কি আশ্চর্যজনক পদ্ধতিতে নিজের পথ ধরে সাগরের দিকে নেমে গেলো। ৬৪. সে বললো (হাঁ), এই তো হচ্ছে সে (জায়গা,) যার আমরা সন্ধান করছিলাম (মাছটি চলে যাওয়ার জায়গাই হচ্ছে সাগরের সেই মিলনস্থল), অতপর তারা নিজেদের পথের চিহ্ন ধরে ফিরে চললো। ৬৫. এরপর তারা (সেখানে পৌঁছলে) আমার বান্দাদের মাঝ থেকে একজন (পুণ্যবান) বান্দাকে (সেখানে) পেলো, যাকে আমি আমার অনুগ্রহ দান করেছি, (উপরন্তু) তাকে আমি আমার কাছ থেকে (বিশেষ) জ্ঞান শিখিয়েছি। ৬৬. মূসা তাকে বললো, আমি কি তোমার অনুসরণ করতে পারি, যাতে করে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে যে জ্ঞান তোমাকে শেখানো হয়েছে তার কিছু অংশ তুমি আমাকে শেখাতে পারো।

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ
بِهِ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٩﴾
قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾
فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ
أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ
مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي
عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا
زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ
لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾

৬৭. সে বললো (হাঁ পারো), তবে আমার সাথে থেকে (তো) তুমি কখনো ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। ৬৮. (অবশ্য এটাও ঠিক), যে বিষয় তুমি (জ্ঞান দিয়ে) আয়ত্ব করতে পারোনি তার ওপর তুমি ধৈর্য ধরবেই বা কি করে? ৬৯. সে বললো, আল্লাহ তায়ালা যদি চান তাহলে তুমি আমাকে ধৈর্যশীল (হিসেবেই) পাবে, আমি তোমার কোনো আদেশেরই বরখেলাফ করবো না। ৭০. সে বললো, আচ্ছা যদি তুমি আমাকে অনুসরণ করোই তাহলে (মনে রাখবে) কোনো বিষয় নিয়ে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না, যতোক্ষণ না সে কথা আমি (নিজেই) তোমাকে বলে দেবো!

রুকু ১০

৭১. অতপর তারা দু'জন পথ চলতে শুরু করলো। (নদীর পাড়ে এসে) উভয়েই একটি নৌকায় আরোহণ করলো, (নৌকায় ওঠেই) সে তাতে ছিদ্র করে দিলো; সে (মূসা) বললো, তুমি কি এজন্যে তাতে ছিদ্র করে দিলে যেন এর আরোহীদের তুমি ডুবিয়ে দিতে পারো, তুমি সত্যিই এক গুরুতর (অন্যায়) কাজ করেছো! ৭২. (মূসার কথা শুনে) সে বললো, আমি কি তোমাকে একথা বলিনি, আমার সাথে থেকে তুমি কখনো ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। ৭৩. সে বললো, আমি যে ভুল করেছি সে ব্যাপারে তুমি আমাকে পাকড়াও করো না এবং (এ ব্যাপারে) আমার ওপর বেশী কঠোরতাও আরোপ করো না। ৭৪. আবার তারা পথ চলতে শুরু করলো। (কিছু দূর গিয়ে) তারা উভয়ে একটি (কিশোর) বালক পেলো, (সাথে সাথে) সে তাকে হত্যা করে ফেললো, (এ কাজ দেখে) সে বললো, তুমি তো কোনোরকম হত্যার অপরাধ ছাড়াই একটি নিষ্পাপ জীবনকে বিনাশ করলে! তুমি (সত্যিই) একটা গুরুতর অন্যায় কাজ করে ফেলেছো! ৭৫. সে বললো, আমি কি তোমাকে একথা বলিনি যে, তুমি আমার সাথে (থেকে) কখনো ধৈর্য ধরতে পারবে না।

قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّي
عُذْرًا ﴿٧٦﴾ فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰى إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ
يُّضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُّرِيدُ أَنْ يَّنْقَضَّ فَأَقَامَهٗ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ
لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ
بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِينَ
يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ
سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَأَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ أَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَنْ يُّرْهِقَهُمَا
طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَأَرَدْنَآ أَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

৭৬. সে বললো, যদি এরপর আর একটি কথাও আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তাহলে তুমি আমাকে তোমার সাথে রেখো না, (অবশ্য এখন তো) তুমি আমার পক্ষ থেকে ওযর পেশ করার (প্রান্ত)-সীমায় পৌঁছে গেছো। ৭৭. আবার তারা চলতে শুরু করলো। (কিছুদূর এগিয়ে) তারা জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছলো, (সেখানে পৌঁছে) তারা (সেই জনপদের) অধিবাসীদের কাছে কিছু খাবার চাইলো, কিন্তু তারা তাদের উভয়ের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো, অতপর সেখানে তারা একটি পতনোন্মুখ (পুরনো) প্রাচীর (দেখতে) পেলো, সে প্রাচীরটা সোজা করে দিলো, সে (মূসা) বললো, তুমি চাইলে তো (এদের কাছ থেকে) এর ওপর কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতে! ৭৮. সে বললো (বেশ), এখানেই তোমার আমার মধ্যে বিচ্ছেদ (হয়ে গেলো কিন্তু তার আগে) যেসব কথার ব্যাপারে তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারোনি–তার ব্যাখ্যা আমি তোমাকে বলে দিতে চাই। ৭৯. (প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে,) নৌকা সম্পর্কিত, (মূলত) তা ছিলো কয়েকজন গরীব মানুষের (মালিকানাধীন), তারা (এটা দিয়ে) সমুদ্রে (জীবিকা অন্বেষণের) কাজ করতো, কিন্তু আমি (নৌকাটিতে ছিদ্র করে) তাকে ত্রুটিযুক্ত করে দিতে চাইলাম, (কারণ) তাদের পেছনেই ছিলো (এমন) এক বাদশাহ, যে (ত্রুটিবিহীন) যে নৌকাই পেতো, তা বল প্রয়োগে ছিনিয়ে নিতো। ৮০. (আর হ্যাঁ, সে) কিশোরটি (-র ঘটনা!) তার পিতামাতা উভয়েই ছিলো মোমেন, আমি আশংকা করলাম, (বড়ো হয়ে) সে এদের দু'জনকেই (আল্লাহর) নাফরমানী ও কুফুর দ্বারা বিভ্রান্ত করে দেবে, ৮১. আমি চাইলাম তাদের মালিক তার বদলে তাদের (এমন) একটি সন্তান দান করবেন, যে দ্বীনদারী ও রক্তের সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে তার চাইতে অনেক ভালো (প্রমাণিত) হবে।

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَٰلِحًا ۚ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُۥ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

৮২. (সর্বশেষ ওই যে) প্রাচীরটি (-র ব্যাপার! আসলে) তা ছিলো শহরের দুটি এতীম বালকের, এর নীচেই তাদের জন্যে (রক্ষিত) ছিলো গুপ্ত ধনভান্ডার, ওদের পিতা ছিলো একজন নেককার ব্যক্তি, (এ কারণেই) তোমার মালিক চাইলেন ওরা বয়োপ্রাপ্ত হোক এবং তাদের (সে ভান্ডার থেকে তারা) সম্পদ বের করে আনুক (এ প্রাচীরটাকেই আমি তাদের বড়ো হওয়া পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম), এ ছিলো (মূলত) তোমার মালিকের অনুগ্রহ (দ্বারা সম্পাদিত কতিপয় কাজ), এর কোনোটাই (কিন্তু) আমি আমার নিজে থেকে করিনি; আর এ হচ্ছে সেসব কাজের ব্যাখ্যা, যে ব্যাপারে তুমি (আমার সাথে থেকে) ধৈর্য ধারণ করতে পারছিলে না!

তাফসীর

আয়াত-৬০-৮২

এটিই হচ্ছে মূসা (আ.)-এর জীবনীর মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনা, যার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় এই সূরার মধ্যে এবং এ প্রসংগের বর্ণনা যেমন বিস্তারিতভাবে এ সূরার মধ্যে এসেছে এতো বিস্তারিতভাবে আর কোথাও আসেনি আর আল কোরআনও সুনির্দিষ্টভাবে সাগর সংগম-এর স্থলটিকে চিহ্নিত করেনি, শুধু বলেছে, 'দুটি সমুদ্রের সংগম স্থল' এবং মূসা (আ.)-এর জীবনের কোন্ অধ্যায়ে এই ঘটনাটি ঘটেছিলো তারও কোনো নিশ্চিত খবর আল কোরআনে দেয়া নেই। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, মিশর থেকে বনী ইসরাঈলদেরকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে কি মিশরে থাকাকালে খিজির (আ.)-এর সাক্ষাতের এ ঘটনাটা ঘটেছিলো, না পরে? পরে ঘটে থাকলেই বা কখন ঘটেছিলো? বনী ইসরাঈলদেরকে নিয়ে পবিত্র (ফিলিস্তিন) ভূমির দিকে যাওয়ার সময়ে কি এ ঘটনা ঘটেছিলো? না ওখানে পৌঁছে যাওয়ার পর? তাঁর জাতিকে নিয়ে যখন তিনি লজ্জাবনতভাবে ফেলিস্তিনের দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষমান ছিলেন তখন কি এ ঘটনাটি ঘটেছিলো? এ সময়ে কি সেখানে বাস করতো এক অহংকারী ও শক্তিমান জাতি অথবা সেখানে যখন এক দল থেকে অপর দলকে বিচ্ছিন্ন করার এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছিলো তখন কি এ ঘটনা ঘটেছিলো? এসব বহু প্রশ্ন জাগে।

এমনি করে যে নেক ব্যক্তিটির সাথে মূসা (আ.)-এর সাক্ষাত ঘটেছিলো তার সম্পর্কে আল কোরআন তেমন কোনো বিবরণ দেয়া হয়নি। তিনি কে ছিলেন? তাঁর নাম কী ছিলো? তিনি কি নবী ছিলেন, না রসূল? না আলেম, অলী কী ছিলেন? এসব কোনো কিছুর জবাব আল কোরআনে পাওয়া যায় না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আরো কয়েকজন সাহাবা থেকে এ বিষয়ে সামান্য কিছু রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। তবে আমরা শুধু আল কোরআনের মধ্যে বর্ণিত তথ্যগুলো নিয়ে আলোচনা করবো, যাতে করে আমরা 'আল কোরআনের ছায়াতলে' আছি বলে মনে করতে পারি, আর আমরা বিশ্বাস করি, আল কোরআনে বর্ণিত তথ্যের মধ্যে থাকাই সব থেকে ভালো, এর

থেকে বেশী জানার বাস্তব কোনো প্রয়োজন নেই। কোন্ স্থানে এবং কোন্ সময়ে তিনি এসেছিলেন, তার নাম কি ছিলো ইত্যাদি না জানলেও কোনো অসুবিধা নেই এবং এতো তথ্য না জানানোর পেছনেও অবশ্যই কোনো যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে। সুতরাং, আমরা কোরআনের তথ্যের মধ্যেই থাকাটা পছন্দ করছি।(১) এরশাদ হচ্ছে,

মুসা ও খিজির (আ.)-এর ঘটনা

'স্মরণ করে দেখো ওই সময়ের কথা যখন মূসা (আ.) তাঁর যুবক সংগীকে বললো, আমি চলতেই থাকবো সমুদ্রের মোহনাটা না পাওয়া পর্যন্ত। অথবা নাই যদি সেই সংগমস্থল মেলে তাহলে যুগ যুগ ধরে চলতেই থাকবো।'

এখানেই উল্লিখিত এ দুটি কোনো কোনো সাগর তা আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন, তবে বেশীর ভাগ লোকের ধারণা এ দুটি হচ্ছে লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগর........ এবং এ দুটির সংগম স্থল হচ্ছে সেই স্থানটি যেখনে এ দুটি সাগর মিলিত হয়েছে,

অর্থাৎ কৃষ্ণসাগরের হ্রদসমূহ ও কুম্ভীর হ্রদের মিলন স্থলে অথবা লোহিত সাগরের মধ্যে অবস্থিত সাগরের বিচ্ছিন্ন অংশ হ্রদ ও সুয়েজ খালের সংযোগ স্থল। মিশর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর বনী ইসরাঈল কওমের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়। যাই হোক আল কোরআন এ বিষয়টিকে সংক্ষেপে আলোচনা করে ছেড়ে দিয়েছে বিধায় আমরাও এ বিষয়ে বেশী মাথা ঘামাবো না এবং ওই ঘটনার প্রতি ইংগিত করেই ক্ষান্ত হবো।(২)

এ কাহিনীর বর্ণনা প্রসংগে পরবর্তিতে আমাদের কাছে যে কথাটা গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে তা হচ্ছে মূসা (আ.) যে যাত্রা শুরু করেছিলেন তার পেছনে একটা উদ্দেশ্য ছিলো, এজন্যে এ সফর যতো কষ্টকর এবং যতো দীর্ঘস্থায়ীই হোক না কেন ওই উদ্দেশ্য হাসিল না হওয়া পর্যন্ত ওই সফর সমাপ্ত করার তার কোনো অভিপ্রায় ছিলো না; এজন্যে তিনি তার সফর দৃঢ়তার সাথে চালিয়ে যাবেন বলে তাঁর স্থির সিদ্ধান্তের কথা ওই যুবকের সামনে ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর এই দৃঢ় সংকল্পের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে আল কোরআন বলছে

'অথবা আমি চলতে থাকবো যুগযুগ ধরে।'

কেউ কেউ 'হুকবুন' শব্দটির অর্থ করেছেন 'বছরের পর বছর ধরে' কেউ বলেছেন এ শব্দটির অর্থ আশি বছর। যাই হোক, একথাটি দ্বারা উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত তার প্রচেষ্টা ও সফর অবিরাম চালিয়ে যাওয়ার অংগীকার ব্যক্ত হয়েছে-এই শব্দটি দ্বারা এখানে বিশেষ কোনো সময়সীমা বেঁধে দেয়াই বড় কথা নয়। এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর যখন সে পৌঁছুলো ওই দুই উপসাগরের সংগম স্থলে, তখন তারা উভয়েই তাদের মাছটির কথা ভুলে গেলো, অতপর মাছটি সাগরের মধ্যে একটি সুড়ং পথ রচনা করে চলে গেলো,.... .আর মাছটি বিস্ময়করভাবে সাগরের মধ্যে একটি পথ তৈরী করে চলে গেলো।' (আয়াত ৬১-৬৩)

---

(১) ইমাম বোখারী, কোরআনে বর্ণিত এই কেসসার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, সাঈদ ইবনে জুবায়ের এর ভাষ্যে জানা যায়, তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, নওফ আল বুকালি মনে করে যে, মূসা (আ.) খিজির আলাইহিস সালামের সাথী ছিলেন, তিনি এবং বনী ইসরাঈলের মূসা এক ব্যক্তি নন। তখন ইবনে আব্বাস বললেন, আল্লাহর ঐ দুশমন মিথ্যা কথা বলেছে। আমাদেরকে উবাই এবনে কা'ব (রা.) জানিয়েছেন যে তিনি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছেন, 'একদিন মূসা (আ.) দাঁড়িয়ে বনী ইসরাঈলদেরকে সম্বোধন করে এক ভাষণ দিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন ব্যক্তি বেশী জ্ঞানী? তিনি বললেন, 'আমি'। এতে আল্লাহ তায়ালা তাকে তিরষ্কার করলেন, কারণ তার উচিত ছিলো 'আল্লাহ তায়ালাই বেশী জ্ঞানী' একথাটা

(২) বর্ণিত হয়েছে যে কাতাদা এবং আরো কয়েকজন বলেছেন, এ দু'টি সাগর হচ্ছে, পারস্য সাগর এর পূর্বাংশের সাথে ভূমধ্য সাঘরের পশ্চিমাংশের সংযোগ স্থল। আর মোহাম্মদ ইবনে কা'ব আল কুরাযী বলেন, দু'টি সাগরের মোহনা হচ্ছে তান্জাহর কাছে ইউরোপরে দূর অভ্যন্তরে অবস্থিত .... এসব মতভেদের কারণে আমরা উভয় বর্ণনা থেকেই দূরে থাকাটাই পছন্দ করেছি।

আর একইভাবে আমাদের কাছে একথাটিই বেশী গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে যে মাছটি ভাজা অবস্থায় ছিলো; এমতাবস্থায় জীবিত হয়ে সাগরের মধ্যে সুড়ং পথ রচনা করে চলে যাওয়া এ উভয় কাজই ছিলো মূসা (আ.)-কে দেখানোর জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত তাঁর ক্ষমতার বিশেষ নিদর্শন। এ দুটি নিদর্শন দ্বারা আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর বিশেষ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটালেন এবং মূসা (আ.)-এর সংগী ওই খাদেম যুবকটিও সাগরের মধ্যে মাছটির জীবিত হয়ে চলে যাওয়ার দৃশ্যে চরমভাবে বিস্মিত হলো। যদি এমন হতো যে মাছটি হঠাৎ করে পানির মধ্যে পড়ে গিয়ে গায়েব হয়ে যেতো তাহলে তেমন বিস্ময়ের কিছু থাকতো না, বরং আরো বড় সত্য হচ্ছে যে মূসা (আ.)-এর এ যাত্রাটির সব কিছুই ছিলো নানা প্রকার বিস্ময়ে ভরা, যেগুলোর মধ্যে মাছ জীবিত হয়ে সাগরের বুকে সুড়ং পথ তৈরী করে উধাও হয়ে যাওয়াটা অন্যতম বিষয়। যুবকের কথাটি শুনে মূসা (আ.) বুঝলেন, যে স্থানটিতে উপরে বর্ণিত নেক বান্দাটির সাথে তার সাক্ষাত হবে বলে তাঁকে জানানো হয়েছিলো সে স্থানটি পেছনে ফেলে আসা হয়েছে এবং সে স্থানটি নিশ্চয়ই ওই ছেড়ে আসা শিলা খন্ডের কাছেই হবে, কাজেই ওখান থেকে আবার তারা পেছন দিকে কিছু দূরে এসে ওই বাঞ্ছিত মানুষটিকে পেয়ে গেলেন। এই তথ্যটিই আল-কোরআন পেশ করতে গিয়ে বলছে,

'সে বললো হাঁ হাঁ, ওই স্থানটিকেই তো আমরা তালাশ করছিলাম, তারপর তারা উভয়ে পেছনের দিকে ফিরে চলতে শুরু করলো। অতপর তারা আমার অনুগত বান্দাদের মধ্য থেকে এমন এক বিশেষ বান্দাকে পেয়ে গেলো, যাকে আমি (আমার নিজের পক্ষ থেকে খাস রহমত দান করেছিলাম এবং দিয়েছিলাম তাকে আমার নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান।'

এ ঘটনায় এ কথা প্রকাশ পাচ্ছে যে এই সাক্ষাতকারের ঘটনাটির কথা শুধুমাত্র মূসা (আ.) ও তার রবের মধ্যেই এক বিশেষ গুপ্ত রহস্য আকারে সীমাবদ্ধ ছিলো, ওই ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত ওই যুবকটি এ বিষয়ে কিছুই জানতো না। আর তাঁর সাথে সাক্ষাত হয়ে যাওয়ার পর যুবকটিকে বিদায় দিয়ে মূসা (আ.) একাকী ওই ব্যক্তির সাথে থেকে গেলেন, যার পূর্ণাংগ বিবরণী নীচে প্রদত্ত হলো।

'তাকে মূসা বললো, আপনি যে জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন, তার থেকে আমাকে কিছু শেখাবেন কি এবং এজন্যে কি আমি আপনার অনুসরণ করবো?'

দেখুন অনুমতি চাওয়ার এই যে বিশেষ আদবের ভাষা ব্যবহার এবং এমন বিনম্র অনুরোধ–এটা অবশ্যই একজন নবীর যোগ্য শিষ্টাচার। তিনি নম্রতার সাথে অনুরোধ করছেন ঠিকই, কিন্তু একান্ত জরুরী বলে অনুনয় বিনয় করছেন না। তিনি ওই নেক ও পারদর্শী আলেমের কাছ থেকে সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্যে শুধু আবেদন জানাচ্ছেন। কিন্তু এখানে লক্ষ্যযোগ্য, উল্লেখিত এক ব্যক্তির জ্ঞান, আসলে তার নিজস্ব কোনো জ্ঞান নয়, এটা সাধারণ মানবীয় জ্ঞান হলে তার পরিণাম সম্পর্কে এভাবে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হতো না। এ জ্ঞান অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা জ্ঞান। একমাত্র তিনি যাকে এ জ্ঞান দিতে চান সেই এ জ্ঞান পেতে পারে, একারণেই নবী ও রসূল হওয়া সত্তেও অস্বাভাবিক ও অসাধারণ যেসব আচরণ মূসা (আ.)-এর সামনে সংঘটিত হলো তার রহস্য আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জানাননি বলেই তিনি ধৈর্য্য সহকারে শেষ অবধি ওই অসাধারণ অবস্থাগুলো সহ্য করতে পারলেন না, বিশেষ করে, বাহ্যিকভাবে একাজগুলো ছিলো চরম যুক্তি বিরোধী এবং সাধারণ নিয়ম কানুনের সম্পূর্ণ খেলাফ। অবশ্যই, এসব রহস্য বুঝার জন্যে গায়েবী জ্ঞান প্রয়োজন, তা না হলে কোনো মানুষের পক্ষে ওই অদ্ভুত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করার পর অধিকক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকা সম্ভব নয়। এজন্যেই বিশেষ জ্ঞানে ভূষিত আল্লাহর ওই নেক বান্দা, আশংকা করছিলেন যে মূসা তাঁর সংগে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না। কারণ যে সব সৃষ্টি ছাড়া কাজও ব্যবহার সামনে আসবে তা হবে মানুষের যুক্তি বুদ্ধির বাইরে। তাই যে কথাটা তিনি বললেন আল কোরআন তা উদ্ধৃত করছে,

'সে বললো, কিছুতেই তুমি আমার সাথে সবর করে থাকতে পারবে না, আর পারবেই বা কেমন করে, বিষয়টি তো তোমার জ্ঞানের সীমার বাইরে?'

কিন্তু মূসা (আ.) তো মনকে পুরোপুরিভাবেই বেঁধে এসেছিলেন তাঁর সাথে থাকার জন্যে, এজন্যে দেখুন তিনি সবর করবেন আনুগত্য করবেন বলে দৃঢ়সংকল্প হচ্ছেন এবং আল্লাহর কাছে সবর করার যোগ্যতা লাভ করার জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করছেন তাঁর দৃঢ় ইচ্ছাকে ব্যক্ত করতে গিয়ে বলছেন,

'সে বলল ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই আপনি আমাকে সবরকারী (ধৈর্যশীল) হিসাবে দেখতে পাবেন, আর (কথা দিচ্ছি), কোনো ব্যাপারে আপনার বিরোধিতা করবো না।'

অতপর, দেখুন, ওই ব্যক্তি জোর দিয়ে বলছেন এবং মূসা (আ.)-এর সবর করাটা কেন কঠিন তা খুলে বলছেন, তারপর সফর শুরু করার পূর্বেই, সংগে থাকলে কি কি শর্ত মেনে চলতে হবে, তা পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন, জানাচ্ছেন– যে কোনো ঘটনা সামনে আসুক না কেন কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা যাবে না এবং কোনো ব্যাপারেই, তিনি নিজে না বলা পর্যন্ত কোনো কিছু জানতে চাওয়া যাবে না, এ কথাটার উদ্ধৃতি দিয়ে আল কোরআন বলছে,

'সে বললো, যদি তুমি আমার সাথে থাকতেই চাও তাহলে, আমি না বলা পর্যন্ত খবরদার কিছু জিজ্ঞাসা করবে না।'

এ কথায় মূসা (আ.) রাযি হয়ে গেলেন এবং এরপর যাত্রা হলো শুরু....... কিন্তু তারপরই আমরা মুখোমুখি হচ্ছি যাত্রাকালের প্রথম দৃশ্যটির,

'দু'জনে এগিয়ে চলল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'জন এক নৌকায় আরোহণ করলো, আর উঠেই নৌকাটিকে ছেঁদা করে দিলো,...........

যে নৌকাটিতে তারা চড়েছিলেন আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাতে আরো কিছু যাত্রীও রয়েছে। নৌকাটি যখন গভীর সমুদ্র দিয়ে অতিক্রম করছে ঠিক সেই সময়েই আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহর ওই নেক বান্দাটি নিজ আসন থেকে উঠে আসছে এবং গুঁতো মেরে নৌকাটি ছিদ্র করে দিচ্ছে। আপাত দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওই ভালো মানুষটি এমন এক কাজ করছে যাতে নৌকাটি বিপদগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে এবং গোটা নৌকার সকল যাত্রীর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ছে, প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি নৌকাটি ডুবে যাবে, আর এ অবস্থা সৃষ্টির জন্যে লোকটির ওই অপকর্মই (?) দায়ী। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কেন লোকটি এমন জঘন্য ও কাজ করতে উদ্যত হলো?

এমনই এক নাজুক মুহূর্তে মূসা (আ.) ভুলে গেলেন সেই কথাটি যা তিনি সফরের শুরুতে বলেছিলেন। ভুলে গেলেন যা বলেছিলেন তাঁর সংগী ওই নেক ব্যক্তিটি। আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এমন এক অদ্ভুত ব্যাপার সামনে ঘটতে দেখে তাঁর যুক্তি বুদ্ধি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে! স্বভাবতই মানুষ সকল কিছুর অর্থ বুঝতে চায় এবং তাৎক্ষণিকভাবে ওই ভালো মানুষটির এমন অদ্ভুত আচরণের কোনো যৌক্তিকতা তাঁর বুঝে আসছে না! বাস্তবে তিনি যা ঘটতে দেখছেন তার কোনো বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তিই তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। তার সামনে এক দিকে রয়েছে এ বিষয়টির কাল্পনিক তাৎপর্য আর অন্যদিকে রয়েছে বাস্তব কাজ ও তার ফলাফলের অভিজ্ঞতা–এ দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে তার মানবীয় বুদ্ধি খেই হারিয়ে ফেলছে–এইটিই সেই কঠিন অবস্থা যা সামনে আসবে বলে তাকে আগে ভাগেই বলে দেয়া হয়েছিলো এবং বলা হয়েছিলো, যে বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে তার কিছু জানা নেই, সেই বিষয়ে তিনি কি করে সবর করবেন? তিনি সবর করবেন বলে দৃঢ় সংকল্প নিয়েছিলেন সত্য, ইচ্ছাতে দৃঢ় থাকবেন বলে আল্লাহর সাহায্যও কামনা করেছিলেন, ওয়াদা করেছিলেন কোনো প্রশ্ন করবেন না বলে এবং তার কাছে দাবীকৃত সব শর্তই তিনি মেনে নিয়েছিলেন, এসবই সত্য কিন্তু তাঁর যুক্তি বুদ্ধি ও বাস্তব কাজের এতো দিনকার

অভিজ্ঞতা সব কিছুর সাথে যখন ওই প্রবীণ ও সৎ লোকের আচরণের সংঘর্ষ বেধে গেলো তখন তিনি ভীষণভাবে ওই অন্যায় (?) কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলেন।(১)

হাঁ, অবশ্যই এটা সত্য, মূসা (আ.)-এর প্রকৃতিই ছিলো অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রতিবাদমুখর, যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই ছিলো তাঁর স্বভাব–এমনই এক গরম মেযাজের মানুষের পক্ষে এহেন যুক্তিহীন (?) কাজ বরদাশত করা সম্ভব ছিলো না, তাই তিনি এই সৃষ্টি ছাড়া কাজ সামনে ঘটতে থেকে তাঁর যাবতীয় সংকল্প, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শর্তমালা ইত্যাদি সব কথাই ভুলে গিয়ে চীৎকার করে উঠছেন, তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কাঙ্খিত যৌক্তিকতার দাবীর কারণে তিনি প্রচন্ড আবেগে ফেটে পড়ছেন;

'তিনি বলে উঠলেন, 'আপনি কি এই যাত্রীদেরকে ডুবিয়ে মারার জন্যে নৌকাটি ছিদ্র করে দিলেন, অবশ্যই আপনি একটি মারাত্মক অন্যায় কাজ করেছেন।'

কিন্তু দেখুন, কী চমৎকার ধৈর্যের সাথে আল্লাহর ওই নেককার বান্দা জবাব দিচ্ছেন। ডগমগে আবেগে ভরপুর ওই যুবক নবীর কথার জবাবে প্রবীণ ওই নেক লোকটি প্রশান্ত বদনে ও ধীরস্থিরভাবে যাত্রার সময় করা ওয়াদা স্মরণ করাতে গিয়ে বলছেন, দেখুন আল্লাহর বাণী,

'সে বলছে, বলেছিলাম না, কিছুতেই তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না?'

দেখুন, একথা শোনার সাথে সাথে মূসা (আ.)-এর চেতনা ফিরে আসছে, তার ওয়াদার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে এবং তিনি তার ওয়াদার কথা ভুলে যাওয়ার কারণে ওযর খাহী করে ও ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে অনুনয় বিনয় করে বলছেন যেন তার মিনতি কবুল করা হয় এবং তার তারুণ্যের দিকে খেয়াল করে তাকে অপদস্ত না করা হয় ও তাকে ফিরে যেতে বাধ্য না করা হয়। তাই তিনি,

'বললেন, 'যে বিষয়টি আমি ভুলে গিয়েছিলাম, দয়া করে আমাকে সে বিষয়ে ধরবেন না এবং মেহেরবানী করে, আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করবেন না।'

দেখুন, মহান ওই প্রবীণ ভাল মানুষটি সস্নেহে তার ওযরটি কবুল করছেন এবং আমরা দ্বিতীয় দৃশ্যের দিকে ফিরে যাচ্ছি, দেখছি।

'দুজন তারা পুনরায় যাত্রা শুরু করলো। অনতিকাল পরেই তারা পথে পেলো এক বালককে আর অমনি ওই লোকটি আকস্মিকভাবে আঘাত করে তাকে হত্যা করলো।

প্রথম তো ঘটলো জাহাজটির ছিদ্র করার ঘটনা। যার কারণে সমদ্র যাত্রীদের সলিল সমাধির সমূহ আশংকা দেখা দিয়েছিলো। এবারে এই দ্বিতীয় ঘটনাটিতে ঘটলো ইচ্ছাকৃতভাবে এক বালককে হত্যা করার ঘটনা এটা তো কোনো আকস্মিক ঘটনা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু ছিলো না, এটা ছিলো সম্পূর্ণ সজ্ঞানে বিনা দোষে ও বিনা উস্কানিতে এক বালক হত্যা। অবশ্যই এটা ছিলো এক মহা ও জঘন্য অপরাধ, মূসা (আ.)-এর পক্ষে এটা সহ্য করা কিছুতেই সম্ভব ছিলো না তা তিনি যতোই প্রতিজ্ঞা করে থাকেন না কেন তার ধারণায় বিনা বাধায় বিনা প্রতিবাদে এ মহা অন্যায় মেনে নেয়াও হবে এক সাংঘাতিক অপরাধ তাই তিনি বলে উঠলেন,

'তিনি বলে উঠলেন, আপনি কি এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে সে কাউকে হত্যা না করা সত্ত্বেও তাকে হত্যা করলেন? না, আপনি তো বড়ই মারাত্মক কাজ করে বসলেন।'

নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গিয়ে ওই বুযর্গ ব্যক্তির কাজের প্রতিবাদ ভুলক্রমে করলেন বা বে-খেয়ালিতে, আপত্তি জানালেন তাও নয়। এমন যুক্তিহীন কাজের প্রতিবাদ করাকে কর্তব্য মনে করেই তিনি সোচ্চার হয়ে উঠলেন। ছেলেটি ত তাঁর নযরে সম্পূর্ণ নির্দোষ, তাকে হত্যা করার কোনোই কারণ থাকতে পারে না, বরং সেতো এমন বয়স্কও হয়নি যার কারণে তার কোনো আচরণের শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

---

(১) দেখুন, 'আত্তাসবীরুল ফান্নিউ ফিল কোরআন' কেতাবটির মধ্যে 'আল কিসসাতু ফিল কোরআন' অধ্যায়ে।

কিন্তু দেখুন, ওই নেক ব্যক্তি তাকে আবার ও তার প্রতি প্রদত্ত শর্ত ও তার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাচ্ছেন, স্মরণ করাচ্ছেন তার সেই কথাকে যা তিনি প্রথমবারে বলেছিলেন, তার পরবর্তী অভিজ্ঞতা পূর্বের অভিজ্ঞতাকে সত্যায়িত করছে, বলা হচ্ছে,

'সে বললো, তোমাকে কি বলিনি, যে তুমি আমার সংগে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না....... ।'

এবারে তিনি নির্দিষ্ট করে বলে দিচ্ছেন যে তিনি তাকে পরিষ্কার করেই বলেছিলেন,

'তোমাকে কি আমি বলিনি'

অর্থাৎ সুনির্দিষ্টভাবেই তো তোমাকে আমি বলেছিলাম যে তুমি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না, তা সত্তেও তুমি সকল শর্ত কবুল করেই তো আমার সাথে থাকার জন্যে আবেদন নিবেদন করেছিলে।

এবারে দেখা যাচ্ছে মূসা (আ.) তার পূর্বের সকল প্রতিজ্ঞা এবং শর্ত কবুল করার কথা মনে করে চরমভাবে লজ্জিত হচ্ছেন এবং বুঝতে পারছেন যে তিনি দু দুবার ওয়াদা খেলাফ করে বসেছেন এবং অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখলেন যে সব শর্ত মেনে নিয়ে তিনি চুক্তি করেছিলেন, তা সবই তিনি ভংগ করেছেন, কাজেই তার বলার মতো আর কোনো কথাই নেই। এজন্যে শেষবারের মতো আর একটি সুযোগ দেয়ার জন্যে আবেদন করছেন।

'সে বললো, ঠিক আছে, এরপর পুনরায় যদি কোনো প্রশ্ন করি, তাহলে আর কিছুতেই আমাকে সাথে রাখবেন না, অবশ্যই আমার সকল ওযর আপত্তির সুযোগ শেষ হয়ে আছে।'

এরপর ঘটনা প্রবাহ এগিয়ে চলেছে এবং তৃতীয় বারের মতো আমরা আর একটি ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছি,

'তারপর তাঁরা দুজন আবার এগিয়ে চললো, যেতে যেতে তারা পৌঁছে গেলো একটি নিভৃত পল্লীতে। সেখানে পৌঁছে তারা গ্রামবাসীর কাছে কিছু খাবার চাইলো কিন্তু তারা কোনো খাবার দিতে বা কোনো মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো। অতপর তারা পড় পড় অবস্থায় একটি দেয়াল পেয়ে সেটাকে (সারারাত ধরে) মেরামত করে মযবুতভাবে দাঁড় করিয়ে দিলো। দেখুন এই দুই ব্যক্তির দিকে, ভীষণ ভুখা তারা, আর তারা উপনীত এমন এক গাঁয়ে যার অধীবাসীরা বড়ই কৃপণ, কোনো অভুক্তকে তারা খেতে দেয় না, কোনো মেহমানকেও তারা আপ্যায়ন করে না। এরপর তারা দেখতে পাচ্ছেন একটি দেয়াল, যা ভেংগে পড়ে যাচ্ছিলো প্রায়। এখানে এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যা জীবন্ত কারো জন্যে ব্যবহার করা হয়, বলা হচ্ছে, 'পড়ে যেতে চাইছে।' এমনই সময় ওই আজব মানুষটি তার সাথীকে বাদ দিয়ে, একাই দেওয়ালটি খাড়া করার কাজে লেগে যাচ্ছেন!

এ সময় মূসা (আ.) এ কাজটাকে ভীষণভাবে বেখাপপা ভাবছেন। তার অন্তরের মধ্যে প্রচন্ডভাবে এ প্রশ্নটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, কোন্ কারণে এই লোকটি এই পড় পড় দেওয়ালটিকে মেরামত করার জন্যে এমনভাবে আত্মনিয়োগ করলো? অনাহার ক্লিষ্ট এই মানুষটি এমন এক গাঁয়ের মধ্যে অবস্থিত দেয়াল মেরামত করার কাজে লেগে যাচ্ছে যার অধিবাসীরা এই দু'জন ভুখা মানুষকে এক ওয়াক্ত খানা খাওয়াতেও প্রস্তুত নয়, বরং তাদের মেহমানদারী করতে ওরা পরিষ্কার অস্বীকার করলো? এ সময়ে এ লোকটা কি অন্ততপক্ষে তার কাজের মজুরীটাও চাইতে পারতো না, যার দ্বারা কিছু খাবারের ব্যবস্থা করা যেতো? তাই প্রতিবাদী কণ্ঠ মুসা (আ.) অস্থির হয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন না করে পারলেন না যে, এরশাদ হচ্ছে,

'সে বললো, চাইলে তো অবশ্যই আপনি আপনার কাজের মজুরী নিতে পারতেন।'

ব্যস, একথার পর এই দুই ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে গেলো, কারণ এখন মূসা (আ.)-এর ওযর পেশ করার মতো আর কোনো উপায় থাকলো না এবং তার এবং ওই লোকটির এক সাথে থাকা এখন অসম্ভব হয়ে গেলো। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'সে বললো, আমার ও তোমার মধ্যে এবারে বিচ্ছিন্নতা এসে গেলো, কাজেই শীঘ্রই আমি তোমাকে জানাব ওই বিষয়ের ব্যাখ্যা যার ওপর তুমি ধৈর্য ধরে থাকতে পারলেন।(১)

এ পর্যন্ত মূসা (আ.) ও আমরা আল কোরআনের বর্ণনা প্রত্যক্ষ করলাম, কিন্তু মূসা (আ.)-এর মতো আমরাও বিস্ময়ে হতবাক যে এহেন অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক কার্যাবলী কেন সংঘটিত হলো এবং আমরা ওই ব্যক্তি সম্পর্কে আরো বেশী অজ্ঞ যার দ্বারা এই অদ্ভুত ঘটনাগুলো ঘটানো হলো। আল কোরআন আমাদেরকে ওই ব্যক্তির নাম বলছে না, যা হয়তো আমাদের কৌতুহল দমনে কিছুটা সহায়তা করতে পারতো, বা তার নামের কিছু তাৎপর্যও বুঝতে পারতাম। আসলে এ সব ঘটনা সংঘটিত করে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর মহাবিস্ময়কর রহস্যভান্ডার থেকে আমাদেরকে যৎকিঞ্চিত অবহিত করতে চেয়েছেন, জানাতে চেয়েছেন এমন নতুন কিছু যা দৃশ্য জগতের বাইরে আমাদের (সাধারণ মানুষের) বোধগম্য নয় এবং আমাদের চিন্তা শক্তিরও উর্ধে। কিন্তু তবুও, আমাদের দৃষ্টি ও চিন্তা শক্তির বাইরের এসব রহস্য আমাদের সামনে তুলে ধরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বহু বহু দূরের কিছু রহস্য আমাদেরকে জানাতে চেয়েছেন, দেখাতে চেয়েছেন এমন কিছু সূক্ষ্ম জিনিস, যা আমাদের সাধারণ মানুষের চোখ আয়ত্ত করতে পারে না। আর ওই নেক ব্যক্তির উল্লেখ না করার পেছনেও অবশ্যই রয়েছে অনুরূপ কোনো হেকমত। কেসসাটির শুরু থেকে যা কিছু ঘটেছে তা আমাদের সামনে বিস্ময়ের এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। একটু খেয়াল করে দেখুন, আল্লাহর ওয়াদাকৃত এই ব্যক্তির সাথে তিনি চাইছেন মূসা (আ.)-এর সাক্ষাত হোক, এজন্যে মূসা (আ.) নেমে পড়ছেন পথে, কিন্তু তার সংগী যুবকটি শিলাখন্ডের কাছে এসে তাদের মধ্যাহ্ন ভোজের কথা বেমালুম ভুলে যাচ্ছে এ ভুলটি করানো হচ্ছে যেন তারা আবার ফিরে আসেন এবং ওই কাংখিত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হয়ে যায়, কিন্তু তার অবস্থানক্ষেত্র এবং আগমন পথ সবই যেন থেকে যায় রহস্যের অন্তরালে ঢাকা। মূসা (আ.) যদি জিজ্ঞাসা না করতেন এবং যুবকটির ভুল যদি ধরা না পড়তো তাহলে তো তাঁরা চলতেই থাকতেন এবং মূসা (আ.)-এর এ সফরের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতো। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে কোরআনের প্রতিটি পদক্ষেপই অজানা এক রহস্যে ভরা। একইভাবে বুঝা যাচ্ছে কোরআনে কারীমে ওই নেক ব্যক্তির নাম উল্লেখিত না হওয়াও অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ।

এরপর ওই গোপন রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করা হচ্ছে যার জন্যে মূসা (আ.)-এর মনটা উন্মুখ হয়েছিলো। এরশাদ হচ্ছে,

'ওই যে জাহাজের ব্যাপারটি—এটা কিছু কিছু গরীব লোকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তৈরী এক নৌযান। ওরা সমুদ্রে কাজ করতো (এর সাহায্যে মাছ ধরতো ও বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতো) অতএব একে ত্রুটিপূর্ণ বানিয়ে দিতে চাইলাম, কারণ ওদের অপর পারে ছিলো এক (যালেম) বাদশাহ যে প্রত্যেকটি জাহাজ জোর করে কেড়ে নিতো।'

অতপর, দেখুন, ওই নেক লোকটি জাহাজের মধ্যে যে খুঁতটি বানিয়ে দিলেন তাই ওই জাহাজটিকে যুলুমবাজ রাজার আগ্রাসী হাত থেকে রেহাই দিলো, আর এই ছোট্ট ক্ষতিটি জাহাজটির মালিকদেরকে বড় ক্ষতির হাত থেকে বাঁচালো এটা গায়েবের মালিক আল্লাহ রব্বুল

(১) এ পর্যন্ত এসে ১৫ পারা শেষ হয়ে গেলো, কিন্তু আমরা কেসসাটির শেষ অবধি পৌছে এ প্রসংগের বর্ণনা শেষ করার মনস্থ করেছি।

আলামীনের জ্ঞান ভান্ডারে নিহিত ছিলো, যা এই সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ বুঝতে অক্ষম। এর শিক্ষা হচ্ছে একটু ক্ষতি হওয়াতে যদি বৃহত্তর বিপদ থেকে বাঁচা যায় তাহলে অবশ্য অবশ্যই অপেক্ষাকৃত ছোটো বিপদকে আলিংগন করতে হবে। আবার এরশাদ হচ্ছে,

'ওই যে বালকটি (কে হত্যা করা হলো), সে বিষয়টির রহস্য হচ্ছে, ওই বালকটির পিতা মাতা ছিলো নিষ্ঠাবান মোমেন। এমতাবস্থায়, আমরা ভয় করতে লাগলাম, ওই বালকটি তার পিতামাতাকে অহংকারী এবং কাফের বানিয়ে ফেলবে, তখন আমরা চাইলাম, ওই বাচ্চার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা ওর থেকে আরো ভালো এক বাচ্চা দেবেন যে হবে অধিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সে পবিত্র জীবন যাপন করবে এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে সে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।'

আপাত দৃষ্টিতে এ ছেলেটির এমন কোনো ত্রুটি ধরা পড়ছিলো না, যার জন্যে তাকে হত্যা করা যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই নেক বান্দার কাছে গায়েবের যে খবর পৌঁছে দিয়েছিলেন তার মাধ্যমেই এ ব্যক্তি বুঝতে পেরেছিলেন যে ওই ছেলেটি অচিরেই তার পিতামাতাকে বিপথগামী করে ছাড়বে, অর্থাৎ তার মধ্যে অন্যায় কাজের যে প্রবণতা নিহিত ছিলো তার কারণে সে নিজে বিপথগামী হতো কুফুরী করতো, বিদ্রোহী হতো ও অপরকে বিপথগামী করতো। তার পিতামাতা, অপত্য স্নেহের কারণে তাকে সামাল দিতে ব্যর্থ হতো, অথচ ব্যক্তিগতভাবে তারা ছিলো বড়ই নেককার। আল্লাহর এমনই নেক বান্দারা পুত্রের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেননি, যার কারণে তাঁরই নির্দেশে বালকটিকে হত্যা করা হয়েছিলো। গায়েবের এ রহস্য তো সেই বুঝতে পারে যাকে আল্লাহ তায়ালা বুঝবার তৌফিক দেন। নবীদেরকে তিনি অনেক কিছু অজানা তথ্য জানিয়েছেন একথা যদিও সত্য, কিন্তু এটাও সত্য যে যাকে যতোটা তিনি জানাতে চেয়েছেন সে ততোটাই জেনেছে। নবীদের সকলকে যেমন একইভাবে জানাননি, তেমনি নবী ছাড়া আর কাউকে তাঁর রহস্য সম্পর্কে কিছুই জানাবেন না তাও ঠিক নয়। নবীদের বৈশিষ্ট্য যে তাদের কাছে জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে ওহী আসে, কিন্তু যাকে তিনি চান, কোনো মাধ্যম ছাড়াই তাকে তাঁর রহস্য ভান্ডার থেকে, নিজ ক্ষমতা বলে অতীতে কিছু দিয়েছেন, ভবিষ্যতেও দিতে পারেন, এটা তাঁর নিজস্ব এখতিয়ার। কেউ নিজে নিজে এমন জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার দাবী করতে পারে না। অবশ্য এটাও সত্য যে এক বিশেষ কারণে মূসা (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা কোনো বিশেষ ব্যক্তির কাছে পাঠিয়েছিলেন। অন্য কোনো নবীকে এভাবে নবী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে জ্ঞান অর্জন করার জন্যে যেতে বলা হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নযির দ্বিতীয়টি আর পাওয়া যায় না।

যদি মানুষের বাহ্যিক জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে এ ব্যাপারটিকে বুঝার চেষ্টা করা হতো তাহলে ওই বালাকটিকে হত্যা করার কোনো যুক্তিই পেশ করা যেতো না, আর এ ঘটনাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে এ ধরনের হত্যাকে পরবর্তীতে জায়েয বলা হয়নি এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এমন হত্যাকান্ডকে কেউ কোনো দিন মেনে নেয়নি, তবে আল্লাহ তায়ালা এর যৌক্তিকতা যাকে জানিয়েছেন একমাত্র তিনিই এটা বুঝেছেন, পরবর্তীকালের কোনো নবীর শরীয়াতেও এমন কাজকে বৈধ বলা হয়নি। এটা একমাত্র আল্লাহর হুকুমে বিশেষ এক সময়ে এবং বিশেষ এক ঘটনার প্রেক্ষাপটের জন্যেই বিশেষিত ছিলো। অপর ঘটনা সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে,

'আর দেওয়াল মেরামতের ব্যাপারটা? হাঁ ওটা ছিলো শহরে বসবাসরত দু'জন ইয়াতীম বালকের। এ দেওয়ালের নীচে সংরক্ষিত ছিলো তাদের কিছু সম্পদ, আর তাদের বাপ ছিলো বড় ভাল মানুষ, অতপর তোমার রব চাইলেন যে তারা বয়োপ্রাপ্ত হোক, তাহলে তারা তাদের সম্পদ উদ্ধার করতে সক্ষম হবে, প্রকৃতপক্ষে এটা তোমার রবের পক্ষ থেকে বিশেষ এক রহমত এটা

আমার ইচ্ছায় আমি করিনি। হাঁ, এই হচ্ছে সেই ব্যাখ্যা যার ওপর ধৈর্য ধরা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।'

এই হচ্ছে সেই দেয়াল যাকে খাড়া রাখার জন্যে ওই ব্যক্তিটি নিজেকে এতোখানি কষ্ট দিয়েছিলেন এবং ওই পল্লীবাসীদের কাছে কোনো মজুরীও দাবী করেননি, যদিও ওঁরা দু'জনেই ছিলেন দারুণ ভুখা এবং এক্ষুধার কথা জানিয়ে খাবার চাওয়া সত্তেও ওই পল্লীবাসীরা তাদের দু'জনকে খাওয়াতে রাযি হয়নি। ওই প্রাচীরের নীচে গুপ্তধন তো ছিলোই এবং সাধারণ গ্রামবাসীদের দৃষ্টির আড়ালে দেয়ালের পেছনে দুর্বল দুই ইয়াতীম বালকের বেশ কিছু সম্পদও ছিলো। যদি দেওয়ালটাকে মেরামত না করে ছেড়ে দেয়া হতো তাহলে ওই সব সম্পদ প্রকাশ হয়ে পড়তো এবং এতিম বালকদ্বয় কিছুতেই এটা পেতো না। অচিরেই এ সম্পদ চলে যেতো অন্যদের হাতে যেহেতু এদের বাপ মা নেককার লোক ছিলেন এজন্যে এদের শৈশবকালে ও দুর্বলতার সময়ে এদেরকে সাহায্য করার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিজেই নিয়েছিলেন, তাই তিনি চেয়েছেন যে তারা বড় হোক ও তাদের সম্পদ তারা নিজেরা দেখে শুনে খুঁজে বের করে নিক।

এরপর ওই ব্যক্তি এ কাজের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলছেন যে এসব কাজে তাঁর কোনো হাত নেই, যা কিছু করেছেন আল্লাহর হুকুমেই করেছেন। তিনি একথা পরিষ্কার করে জানাচ্ছেন যে দেয়ালটা মেরামত হয়ে যাওয়াটা এটা আল্লাহরই রহমত এটা আল্লাহরই কাজ, তাঁর নিজস্ব কোনো কাজ নয়। এসময়ে এবং এর পূর্বে তিনি যা জেনেছেন এবং যা করেছেন এটা অবশ্যই অন্য কোনো মানুষের জানার বিষয় নয় আল্লাহ তায়ালা তাকে জানিয়েছেন বলে তিনি জানতে পেরেছেন। আল্লাহ তায়ালাই তাকে এসব কাজে নিয়োগ করেছিলেন এবং ওই কাজগুলো সম্পাদন করার তৌফিক তিনিই তাকে দিয়েছিলেন যার জন্যে তার পক্ষে ওগুলো করা সম্ভব হয়েছে। তাই এরশাদ হচ্ছে, (এগুলো ছিলো মূলত) তোমার মালিকের অনুগ্রহ (দ্বারা সম্পাদিত কতিপয় কাজ এর) কোনোটাই কিন্তু আমার নিজের থেকে করিনি।

অতপর, ওই অস্বাভাবিক কাজের রহস্য এখন প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে যে এটা আল্লাহরই রহমতের এক নিদর্শন–এ নিদর্শন তিনি দেখান তাকে যাকে তিনি দেখাতে চান।

এই মহা রহস্য দ্বার যখন উন্মোচিত হয়ে গেলো তখন ওই ব্যক্তি তেমন করেই আত্মগোপন করে ফেললেন যেমন তিনি ইতিপূর্বে ছিলেন জনচক্ষুর আড়ালে। তিনি আবারও পৃথিবীবাসীর কাছে অজানা অচেনা হয়ে গেলেন যেমন ইতিপূর্বে ছিলেন। এখন এঘটনাটি এক বিরাট জ্ঞান ভান্ডারের দরজা খুলে দিচ্ছে, আর এসব রহস্য নিজে নিজে আত্মপ্রকাশ করে না, ততোটুকু করে যতোটুক আল্লাহ তায়ালা চান। তারপর আবার আল্লাহর জ্ঞান ও রহস্যের আড়ালে এসব গুপ্ত জ্ঞান লুকিয়ে যায়।

আর এভাবে এই সূরাটির মধ্যে মূসা (আ.) ও ওই নেক বান্দাটির ঘটনা এক বিশেষ উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছে, যা আসহাবে কাহাফের ঘটনার সাথে বেশ মিল দেখা যায়। কারণ তারাও আজ অজানা রহস্যের অন্তরালে লুক্কায়িত রয়েছেন এবং একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে তাদের খবর, যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। এসব ঘটনা এক বিশেষে তাৎপর্যবাহী এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অসীম জ্ঞান ভান্ডারের অংশ বিশেষ, এগুলো মানব সাধারণের জানা শোনার পরিধির উর্ধের বিষয়। আল্লাহর জ্ঞান ভান্ডারের সামনে বহু বহু পর্দা রয়েছে, রয়েছে বহু বাধা, সেগুলো অতিক্রম করে ওই জ্ঞান রাশি থেকে কেউ কিছু পেতে পারে না তাঁর মেহেরবানী ছাড়া–আর যা তিনি মানুষকে দিয়েছেন তা ওই ভান্ডারের মধ্য থেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ একটি কনা মাত্র।....... (১)

---

(১) এ পর্যন্ত এসে ১৫ পারার তাফসীর শেষ হলো।

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا۟ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾ إِنَّا مَكَّنَّا

لَهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَٰهُ مِن كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا

بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ۗ

قُلْنَا يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾

قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾

وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ

أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا

تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذَٰلِكَ ۖ وَقَدْ أَحَطْنَا

রুকু ১১

৮৩. (হে নবী,) এরা তোমার কাছে যুলকারনায়ন সম্পর্কে জানতে চায়, তুমি (তাদের) বলো, (হ্যাঁ) আমি (আল্লাহর কেতাবে যা আছে) তা থেকে (সে) বিবরণ তোমাদের কাছে এক্ষুণি (পড়ে) শোনাচ্ছি। ৮৪. (আল্লাহ তায়ালা বলছেন,) আমি যমীনের বুকে তাকে (বিপুল) ক্ষমতা দান করেছিলাম এবং আমি তাকে (এর জন্যে প্রয়োজনীয়) সব উপায় উপকরণও দান করেছিলাম, ৮৫. (একবার) সে অভিযানে বেরোবার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো, ৮৬. (চলতে চলতে) এমনিভাবে সে সূর্যের অস্তগমনের জায়গায় গিয়ে পৌঁছুলো, সেখানে গিয়ে সে সূর্যকে (সাগরের) কালো পানিতে ডুবতে দেখলো, তার পাশে সে একটি জাতিকেও (বাস করতে) দেখলো, আমি বললাম, হে যুলকারনায়ন (এরা তোমার অধীনস্থ), তুমি ইচ্ছা করলে (তাদের) শাস্তি দিতে পারো অথবা তাদের সাথে তুমি সদয় ভাবও গ্রহণ করতে পারো। ৮৭. সে বললো (হ্যাঁ), এদের মাঝে যে (আল্লাহর সাথে) বিদ্রোহ করবে তাকে আমি অবশ্যই শাস্তি দেবো, অতপর তাকে (যখন) তার মালিকের সামনে ফিরিয়ে নেয়া হবে (তখন) তিনি তাকে (আরো) কঠিন শাস্তি দেবেন। ৮৮. (অপরদিকে) যে ব্যক্তি (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে, তার জন্যে (আখেরাতে) থাকবে উত্তম পুরস্কার, আর আমিও তার সাথে আমার কাজকর্ম সম্পাদনের সময় একান্ত বিনম্র ব্যবহার করবো; ৮৯. অতপর সে আরেক (অভিযানে) পথে বেরুলো। ৯০. এমনকি (চলতে চলতে) সে সূর্যোদয়ের স্থানে গিয়ে পৌঁছুলো, তখন সে সূর্যকে এমন একটি জাতির ওপর (দিয়ে) উদয় হতে দেখলো; যাদের জন্যে তার (প্রখর তাপ) থেকে (আত্মরক্ষার) কোনো অন্তরাল আমি সৃষ্টি করে রাখিনি। ৯১. (যুলকারনায়নের ঘটনা

بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ

مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ

يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ

أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ

فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ

حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا

قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا

لَهُ نَقْبًا ﴿٩٧﴾ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ

ছিলো) এ রকমই; আমার কাছে সে সম্পর্কিত পুরোপুরি খবরই (মজুদ) আছে। ৯২. অতপর সে আরেক (অভিযানে) পথে বেরুলো। ৯৩. এমনকি (পথ চলতে চলতে) সে দুটো প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে গিয়ে পৌঁছলো, দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে (পৌঁছে) সে এমন এক সম্প্রদায়ের লোকদের পেলো, যারা (যুলকারনায়নের) কোনো কথাই (তেমন) বুঝতে পারছিলো বলে মনে হলো না। ৯৪. তারা (বিভিন্নভাবে তাকে) বললো, হে (বাদশাহ) যুলকারনায়ন, নিসন্দেহে ইয়াজুজ মা'জুজ হচ্ছে (নামক দুটো সম্প্রদায়) এ যমীনে (নানারকম) বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, (এমতাবস্থায় তাদের থেকে বাঁচার জন্যে) আমরা কি তোমাকে (এ শর্তে কোনোরকম) একটা 'কর' দেবো যে, তুমি আমাদের এবং তাদের মাঝে একটি প্রাচীর বানিয়ে দেবে। ৯৫. সে বললো (কোনো কর নেয়ার প্রয়োজন নেই, কেননা), আমার মালিক আমাকে যা কিছু দিয়ে রেখেছেন তাই (আমার জন্যে) উত্তম, হ্যাঁ, (শারীরিক) শক্তি দ্বারা তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারো, আমি তোমাদের এবং তাদের মাঝে এক মযবুত প্রাচীর বানিয়ে দেবো। ৯৬. তোমরা আমার কাছে (এ কাজের জন্যে) লোহার পাতসমূহ নিয়ে এসো (অতপর সে অনুযায়ী তা আনা হলো এবং প্রাচীর তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেলো); যখন মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানটি (পূর্ণ হয়ে লৌহ স্তূপগুলো দুটো পর্বতের) সমান হয়ে গেলো, তখন সে (তাদের) লক্ষ্য করে বললো, তোমরা (হাঁপরে) দম দিতে থাকো; অতপর যখন তা আগুনকে (উত্তপ্ত) করলো, (তখন) সে বললো, (এখন) তোমরা আমার কাছে (কিছু) গলানো তামা নিয়ে এসো, আমি তা এর ওপর ঢেলে দেবো। ৯৭. (এভাবেই এমন একটি মযবুত প্রাচীর তৈরী হয়ে গেলো যে,) অতপর তারা তার ওপর উঠতে (আর) সক্ষম হলো না– না তারা তা ভেদ করে (বাইরে) আসতে পারলো। ৯৮. (যুলকারনায়ন বললো,) এই যা কিছু হয়েছে তা সবই আমার মালিকের অনুগ্রহে (হয়েছে), কিন্তু যখন আমার মালিকের ওয়াদা (-মতো কেয়ামত) আসবে, তখন তিনি তা চূর্ণ বিচূর্ণ করে

وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ﴿٩٨﴾ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ

فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾ وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضَا ﴿١٠٠﴾

الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ۚ اِنَّآ

اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ

صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ

فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا

وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ﴿١٠٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

একাকার করে দেবেন, আর আমার মালিকের ওয়াদা হচ্ছে সত্য ওয়াদা; ৯৯. (কেয়ামতের আগে) আমি তাদের দলে দলে ছেড়ে দেবো, তারা (সমুদ্রের) ঢেউয়ের আকারে একদল আরেক দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে, যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন তাদের সবাইকে আমি (হাশরের ময়দানে) একত্রিত করবো, ১০০. (সেদিন) আমি জাহান্নামকে (তার) অবিশ্বাসীদের জন্যে (সামনে) এনে হাযির করবো, ১০১. যাদের চোখের মধ্যে আমার স্মরণ থেকে আবরণ পড়েছিলো, তারা (হেদায়াতের কথা) শুনতেই পেতো না।

রুকু ১২

১০২. কাফেররা কি এ কথা মনে করে নিয়েছে যে, তারা আমার বদলে আমারই (কতিপয়) গোলামকে অভিভাবক বানিয়ে নেবে; (আর আমি এ ব্যাপারে তাদের কোনো জিজ্ঞাসাবাদই করবো না!) আমি তো জাহান্নামকে কাফেরদের মেহমানদারীর জন্যে সাজিয়ে রেখেছি। ১০৩. (হে নবী, এদের) তুমি বলো, আমি কি তোমাদের এমন লোকদের কথা বলবো, যারা আমলের দিক থেকে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত (হয়ে পড়েছে); ১০৪. (এরা হচ্ছে) সেসব লোক যাদের সমুদয় প্রচেষ্টা এ দুনিয়ায় বিনষ্ট হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে মনে ভাবছে, তারা (বুঝি) ভালো কাজই করে যাচ্ছে। ১০৫. এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যারা তাদের মালিকের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে এবং (অস্বীকার করে) তাঁর সাথে ওদের সাক্ষাতের বিষয়টিও, ফলে ওদের সব কর্মই নিষ্ফল হয়ে যায়, তাই কেয়ামতের দিন আমি তাদের (নাজাতের জন্যে) জন্যে ওযনের কোনো মানদন্ডই স্থাপন করবো না। ১০৬. এটাই জাহান্নাম! (এটাই হলো) তাদের (যথার্থ) পাওনা, কেননা তারা (স্বয়ং স্রষ্টাকেই) অস্বীকার করেছে, (উপরন্তু) তারা আমার আয়াতসমূহ ও (তার বাহক) রসূলদের বিদ্রূপের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। ১০৭. (অপরদিকে) যারা আল্লাহ

كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ

كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى

اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا

صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ﴿١١٠﴾

তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) নেক আমল করেছে, তাদের মেহমানদারীর জন্যে 'জান্নাতুল ফেরদাউস' (সাজানো) রয়েছে। ১০৮. সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, (সেদিন) তারা সেখান থেকে অন্য কোথাও যেতে চাইবে না। ১০৯. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, আমার মালিকের (প্রশংসার) কথাগুলো (লিপিবদ্ধ করা)-এর জন্যে যদি সমুদ্র কালি হয়ে যায়, তাহলে আমার মালিকের কথা (লেখা) শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র শুকিয়ে যাবে, এমনকি যদি আমি তার মতো (আরো) সমুদ্রকে (লেখার কালি করে) সাহায্য করার জন্যে নিয়ে আসি (তবুও)। ১১০. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, আমি তো তোমাদের মতোই একজন (রক্ত মাংসের) মানুষ, তবে আমার ওপর ওহী নাযিল হয় (আর সে ওহীর মূল কথা হচ্ছে), তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন, অতএব তোমাদের মাঝে যদি কেউ তার মালিকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন (হামেশা) নেক আমল করে, সে যেন কখনো তার মালিকের এবাদাতে অন্য কাউকে শরীক না করে।

তাফসীর শুরু
আয়াত ৮৩-১১০

'আর ওরা জিজ্ঞাসা করছে তোমাকে যুল কারনায়েন সম্পর্কে....... সুতরাং সে যেন ভাল কাজ করে, আর তার রবের সাথে কাউকে শরীক না করে। *(আয়াত ৮২-১১০)*

নিম্নে বর্ণিত মতে যুল কারনায়েনের কেসসা শুরু হচ্ছে,

'আর ওরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে যুল কারনায়নে সম্পর্কে। বলো, আমি তার বিষয়ে শীঘ্রই তোমাকে জানাবো।'

ইবনে এসহাক এ সূরাটি নাযিল হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'মিশরের অধিবাসী এক প্রবীণ ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, ওই ব্যক্তি আমাদের কাছে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে এসেছিলেন। তিনি পর্যায়ক্রমে ইকরামা ও ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেন, কোরায়শরা নাদর ইবনে হারেস ও ওকবা ইবনে আবী মুঈতকে মদীনার ইহুদী পাদ্রীদের কাছে পাঠিয়ে তাদেরকে বলে দিলো, ওদেরকে মোহাম্মদ (স.)-এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, ওদের কাছে তাঁর গুণাবলীর কথা বলবে এবং যেসব কথা বলে সে মানুষকে

আকৃষ্ট করছে তারও কিছু কিছু বলবে, কারণ ওই ইহুদীরা পূর্বে অবতীর্ণ কেতাব তাওরাতের অনুসারী আর নবীদের আনীত জ্ঞান তাদের কাছে যা আছে তা আমাদের কাছে নেই........তারা মদীনায় পৌঁছে তাদেরকে রসূলুল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তাদেরকে মোহাম্মদ (স.)-এর বিষয় উল্লেখ করলো ও তাঁর কিছু কথা উদ্ধৃত করে বললো, 'তোমরা তো তাওরাত কেতাবের অধিকারী; আমাদের অঞ্চলের মোহাম্মদ সম্পর্কে তোমাদের কাছ থেকে কিছু জানতে পারবো বলে এসেছি। রেওয়ায়াতকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ওই পাদ্রীরা তখন বললো, হাঁ, নবুওতের দাবীদার ওই ব্যক্তিকে তোমরা তিনটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, যা আমরা তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। যদি সে ওই প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দেয় তাহলে বুঝবে যে প্রকৃতপক্ষে সে একজন নবী, আর সঠিক উত্তর দিতে না পারলে বুঝবে সে সাধারণ মানুষ এবং সে অবস্থায় তাকে তোমরা যে সাজা দিতে চাও দেবে। তাকে প্রাচীনকালের এক যুবক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে জিজ্ঞাসা করবে, তাদের কী হয়েছিলো? আসলে এই যুবকের যে বিবরণ সূরায়ে কাহাফের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে তা কোরায়শদের কাছে ছিলো একদল অতি বিস্ময়কর বিষয়। তারপর আর ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে যে পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলের ও পশ্চিমাঞ্চলের সকল দেশগুলোতে সফর করেছে, আরো জিজ্ঞাসা করবে রূহ বা আত্মা সম্পর্কে–এটা কী জিনিস (এর বিস্তারিত বিবরণ), যদি এগুলোর জবাব সে দিতে পারে তাহলে বুঝবে অবশ্যই সে আল্লাহর নবী, নির্দ্বিধায় তাঁর অনুসরণ করবে। আর সঠিক উত্তর দিতে না পারলে জানবে অবশ্যই সে একজন মিথ্যাবাদী, তার সাথে যে ব্যবহার করা যুক্তিসংগত মনে করবে তাই করবে। অতপর নাদর ও ওকবা কোরায়শদের কাছে গিয়ে বললো, হে কোরায়শ জাতি, আমরা তোমাদের ও মোহাম্মাদের মধ্যে বিবাদের চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করে দেয়ার মতো তথ্য নিয়ে এসেছি। আমাদেরকে ইহুদী পাদ্রীরা মোহাম্মাদের কাছে কিছু প্রশ্ন করতে বলেছে এরপর তারা কোরায়শদের সামনে ওই প্রশ্নগুলোর কথা উল্লেখ করলো।

এরপর কোরায়শের লোকেরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এসে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করে বললো: হে মোহাম্মাদ, আমাদেরকে এগুলো সম্পর্কে বলো দেখি, তখন রসূলুল্লাহ (স.) তাদেরকে বললেন, তোমরা আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে আমি আগামীকাল তার জবাব দেবো। কিন্তু ঘটনাক্রমে তিনি 'ইনশাআল্লাহ' বললেন না। তখন কোরায়শের ওই লোকেরা চলে গেলো। এরপর রসূলুল্লাহ ওই প্রশ্নগুলোর জবাব আল্লাহর তরফ থেকে আসবে বলে অপেক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু পনের দিনের মধ্যেও এ বিষয়ে কোনো কথা নাযিল হলো না, এতোদিনের মধ্যে জিবরাঈল (আ.) আসলেন না, যার কারণে মক্কাবাসীরা তাঁর সম্পর্কে নানা প্রকার দুর্নাম রটাতে শুরু করলো। বলতে লাগলো যে মোহাম্মাদ পরের দিন প্রশ্নগুলোর জবাব দেবে বলে অংগীকার করেছিলো, কিন্তু পনের দিন চলে গেলো সে কোনো জবাবই দিতে পারলো না। এসব কথা রসূলুল্লাহ (স.)-এর কানে আসায় তিনি খুবই দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন যেহেতু তিনি এ পর্যন্ত ওদের প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তারপর একদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে সূরায়ে কাহাফ নিয়ে জিবরাঈল (আ.) এলেন এর মধ্যে যে কথাগুলো ছিলো তা কোরায়শদের আচরণে পাওয়া তাঁর সেই দুঃখ দূর করে দিলো।

এ সূরার মধ্যে এক যুবকের ঘটনা, পূর্ব পশ্চিমে ভ্রমণকারী যুল কারনায়নের কাহিনী এর এবং রূহ সম্পর্কিত তথ্য এই তিনটি কথার জওয়াব সবই ছিলো। আবারও একবার নযর বুলিয়ে নিন ওপরে বর্ণিত আয়াত, 'আর ওরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে রূহ সম্পর্কে', এই আয়াতটির তর্জমার ওপরে। রূহ সম্পর্কে বিশেষ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এখানে আর একটি হাদীসে বলা হচ্ছে, এবং এ হাদীসটি আউফী বর্ণনা করেছেন, এতে বলা হয়েছে যে ইহুদীরা নবী (স.)-কে বললো, আমাদেরকে রুহ সম্পর্কে কিছু জানান, শরীরের মধ্যে অবস্থিত রূহকে কিভাবে আযাব দেয়া হবে, অথচ এ রূহ তো আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে? এরপর তাঁর কাছে আর কিছু নাযিল হলো না এবং তিনিও তাদেরকে কোনো কিছু বলতে পারলেন না। তারপর জিবরাঈল আসলেন এবং তাঁকে বললেন, 'বলো রূহ আমার রবের হুকুমের দাস, এ বিষয়ে তোমাদেরকে যৎসামান্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে।'.... পুরো আয়াতটির অর্থ পড়ে দেখুন।

এভাবে এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে অনেক রেওয়ায়েত এসেছে, কিন্তু আমরা আল কোরআনে বর্ণিত সুদৃঢ় বিবরণটিকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। এ আয়াতের মাধ্যমে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যুলকারনায়নের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। আমরা সুনির্দিষ্টভাবে জানিনা, তাঁকে কে বা কারা জিজ্ঞাসা করেছে এবং তাঁর সম্পর্কে জানলেও ওই কাহিনীর অবতারণা যে উদ্দেশ্যে হয়েছে সে বিষয়ে অধিক কিছু বুঝতে আমরা অক্ষম, এজন্যে আয়াতটিতে যেটুকু বলা হয়েছে তাই নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি। এর বেশী কিছু জল্পনা-কল্পনা করাটা আমরা অর্থহীন মনে করি।

ইতিহাস বনাম কোরআনের তথ্য

আল কোরআনের আয়াতে যুল কারনায়নের যে বর্ণনা এসেছে তাতে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়, তাঁর আগমন কাল ও স্থান সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আসলে কোরআনে বর্ণিত কেসসাগুলোর মধ্যে এই দিকগুলোকে পরিত্যাগ করা হয়েছে, যেহেতু কবে কোন ঘটনা ঘটেছে সেই সব তারিখ জানানোই প্রকৃতপক্ষে কোনো উদ্দেশ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ওইসব শিক্ষা যা এসব ঘটনা থেকে পাওয়া যায়। মানব জীবন ও তার সুখ শান্তির প্রয়োজন যে শিক্ষা তা চিরদিনের জন্যেই এক—এ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে যেসব ঘটনা বা কাহিনী বর্ণনা করা হয় তাও সকল যামানার জন্যে একইভাবে প্রযোজ্য বিধায় ওই সব ঘটনাকে অধিকাংশ স্থানে কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা কালের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়নি। এজন্যেই স্থান ও কালের কথার উল্লেখ নেই।

প্রচলিত ইতিহাসে সিকান্দার যুলকারনায়নের নামক যে বাদশাহ সম্পর্কে জানা যায়, সেই ব্যক্তি এবং আল কোরআনে বর্ণিত যুলকারনায়ন এক ব্যক্তি নয়, কারণ সে ব্যক্তি ছিলো একজন পৌত্তলিক গ্রীক বাদশাহ। আর যার সম্পর্কে আল কোরআন জানিয়েছে, তিনি ছিলেন এক ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী এবং পুনরুত্থান ও আখেরাতের জীবনের ওপরও ছিলো তার প্রগাঢ় বিশ্বাস।

'আর আসারুল বাক্বিয়াতু আনিল কুরূনিল খালিয়াত নামক' কেতাবে জ্যোতির্বিদ আবু রায়হান আল বিরূনী বলেন, আল কোরআনে বর্ণিত যুলকারনায়ন ছিলেন 'হিময়ারের' অধিবাসী। তার নাম থেকেই তিনি একথা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন, যেহেতু হিময়ারের বাদশাহরা 'যূ-কায়া-নুয়াস' ও 'যূ-য়্যাযান' নামক উপাধিসমূহ গ্রহণ করতেন, কিন্তু যে যুলকারনাইনের সম্পর্কে কথা এখানে

এসেছে তার মূল নাম ছিলো আবু বকর ইবনে আফরিকাশ। তিনি তার সেনাবাহিনী নিয়ে ভূমধ্য সাগরের উপকূলে পৌঁছে যান। সেখান থেকে তিনি তিউনিসিয়া মরক্কো ইত্যাদি দেশের দিকে অগ্রসর হন। তিনি আফ্রিকা মহাদেশে একটি নগরী নির্মাণ করেন এবং তার নামেই সেখানকার সকল এলাকার নামকরণ করা হয়। তাকে যুলকারনাইনের নামে অভিহিত করা হতো যেহেতু তিনি সূর্যের দুই উদয়ের স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন।'

ওপরের এ বক্তব্য সঠিক হলেও হতে পারে, কিন্তু একথা প্রমাণ করার মতো আমাদের কাছে কোনো যথেষ্ট যুক্তি বা উপায় উপাদান নেই। কোরআনে কারীমে এই যুলকারনায়নের জীবনী সম্পর্কে যে আংশিক বর্ণনা এসেছে, এর বেশী প্রচলিত ইতিহাস থেকে আমরা কোনো তথ্য পাই না। আল কোরআনে অন্যান্য যেসব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর মতোই তার সম্পর্কে সামান্য কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় মাত্র, যেমন দেখা যায় নূহ জাতি, হুদ জাতি সালেহ জাতি ইত্যাদি সম্পর্কে আল কোরআনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। আসলে আধুনিক যেসব ইতিহাস আমরা দেখতে পাই এগুলোর বেশীর ভাগই 'কেয়াস' অনুমান করে রচিত হয়েছে। প্রাক ইতিহাস যুগের বহু ঘটনা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না, সুতরাং ওই সব ঘটনাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা একেবারেই নিরর্থক। তবে যদি তাওরাত কেতাবকে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা না হতো, অর্থাৎ এ কেতাব যে অবস্থায় নাযিল হয়েছিলো সে অবস্থায় আজ পর্যন্ত বর্তমান থাকতো তাহলে এ কেতাব থেকে অতীতের রাজা বাদশাহ ও জাতিসমূহ সম্পর্কে বহু প্রামাণ্য ও সত্য সঠিক তথ্য জানা সম্ভব হতো, কিন্তু নিসন্দেহে একথা সত্য যে তাওরাত বহু কাল্পনিক বা পৌরানিক কাহিনীতে ভরপুর হয়ে রয়েছে এবং এতে এমনও অনেক বর্ণনা আছে যা আল্লাহর প্রেরিত মূল ঘটনার ওপর যথেষ্ট রং চড়িয়ে লেখা হয়েছে, যার ফলে তওরাতকে প্রামাণ্য বা ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর সঠিক উৎস বলে আর মনে করা যায় না।

আর এ কথা তো অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে দুই কারণে ইতিহাসের নিরীখে আল কোরআনকে বিচার করা যায় না,

এক, ইতিহাসের জন্ম হয়েছে অতি সম্প্রতিককালে, অথচ ইতিপূর্বে সংঘটিত মানবেতিহাসের অসংখ্য ঘটনা অজানার অন্তরালে রয়ে গেছে, যে বিষয়ে কোনো কিছুই জানা যায় না। এমতাবস্থায় আল কোরআন ওই সকল হারানো দিনের অনেক তথ্য পেশ করেছে যার কোনো খবরই ইতিহাস রাখে না।

দুই, অতীতের ঘটনাবলীর মধ্য থেকে কোনো কিছু যদি ইতিহাসে পাওয়া যায়ও তো তার কোনো গ্রহণযোগ্য ভিত্তি নেই, কারণ সেগুলো হচ্ছে সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ও অপ্রতুল জ্ঞানের অধিকারী মানুষের নিজের তৈরী এবং সেসব গ্রন্থ পরিবর্তন পরিবর্ধন ও অতিরঞ্জনের দোষ বা ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মোটেই মুক্ত নয়-এর নযির তো আমরা আমাদের এই আমলেই দেখতে পাচ্ছি। অথচ এখন তো এমনই গৌরবপূর্ণ সময় যখন অজানা ও গোপন তথ্যাদির সত্যাসত্য সহজেই জানা বা যাঁচাই করা অতি সহজলভ্য হয়ে গেছে। এখন কোনো এক ব্যক্তি কর্তৃক সরবরাহকৃত সংবাদকে একাধিকভাবে দেখা হয়, বর্ণনা করা হয়, নানা অর্থ পরিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং এসব সম্পর্কে যে বিভিন্নমুখী বিবরণ দেয়া হয়, দেখা যায় তার কোনোটা কোনোটার বিপরীত। এই ধরনের সংগ্রহের মাধ্যম থেকেই তো গ্রহণ করা হয় ইতিহাসের উপাদানসমূহ এবং

এইভাবে গড়ে উঠেছে আধুনিক ইতিহাসের ধারা। এটাই ইতিহাস সম্পর্কে আসল সত্য, তা যে যা বাগাড়ম্বর করুক না কেন।

এখন সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে, কোরআনে করীমে যে সব ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে যদি ইতিহাসের মাপকাঠিতে বিচার করা হয় তাহলে যে কথাটি আসে তা হচ্ছে এ কালাম অস্বীকার করে মানুষের উদ্ভাবিত সেসব বৈজ্ঞানিক মূলনীতিকে কার্যকর করতে হবে যা সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে পারে। এ কথা বলার সময় ওই প্রগতিবাদীরা খেয়াল করে না যে চূড়ান্ত ফয়সালা দানকারী আল কোরআনের সাথে ওই বৈজ্ঞানিক নীতি সাংঘর্ষিক হয়ে যাচ্ছে কিনা। প্রকৃত মোমেন ব্যক্তি কিছুতেই এসব তথাকথিত জ্ঞানগর্ভ বা বৈজ্ঞানিক উপায় উপাদানের বিষয়গুলো মেনে নিতে পারে না, যেহেতু এসব আবিষ্কার ও তথ্যাদির ভিত্তি হচ্ছে বেশীর ভাগ অনুমান, আর অনুমান কোনো সময় সঠিক হয় আবার পরবর্তীকালে বে-ঠিকও প্রমাণিত হয়।

যুলকারনায়নের ঘটনা

রসূল (স.)-এর কাছে এসে কিছুসংখ্যক লোক যুলকারনায়নের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। যেহেতু তারা আল্লাহর রসূলকে পরীক্ষা করার জন্যে এ প্রশ্ন করেছিলো, এজন্যে আল্লাহ রব্বুল ইযযত ওহীর মাধ্যমে তাঁকে সে বিষয়ে জানিয়ে দিলেন এবং আলোচ্য আয়াতে আমরা সেই বিবরণটাই পাচ্ছি। রসূল (স.)-এর জীবনী ও তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জানার সব থেকে নির্ভরযোগ্য উৎস হচ্ছে আল কোরআন, আর এখানে যে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে তার জবাব একমাত্র আল কোরআন ছাড়া অন্য কোনো সূত্র থেকে পাওয়ার কোনো উপায় নেই। এ বিষয়ে আমাদের কোনো জ্ঞান না থাকায়, যতোটুক কোরআনে উল্লেখ হয়েছে তার বেশী কোনো ব্যাখ্যা দেয়ার সাধ্য আমাদের নেই। এ সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীরে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে কিন্তু এসবের কোনোটাকেই নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করা যায় না। এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে চাইলে খুবই সতর্কতার সাথে গ্রহণ করতে হবে, যেহেতু সর্বত্র ইসরাঈলদের মনগড়া অনেক কথা ও বহু পৌরানিক মিথ্যা কাহিনী প্রচলিত হয়ে রয়েছে।

আল কোরআনের মধ্যে যুলকারনায়নের তিনটি সফরের কথা উল্লেখ হয়েছে, এক সফর ছিলো পশ্চিমাঞ্চলের দিকে, একটি পূর্বে এবং একটি দুই পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। সুতরাং এই সফরগুলো সম্পর্কে উল্লেখিত কথাগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে বুঝতে চেষ্টা করবো।

যুলকারনাইনের জীবনের সামান্য একটি অংশ সম্পর্কেই এখানে আলোচনা শুরু হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি, তাকে পৃথিবীতে বেশ কিছু ক্ষমতা দান করেছিলাম এবং তাকে সর্বপ্রকার উপায় উপকরণ সরবরাহ করেছিলাম।'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাকে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী বানিয়েছিলেন এবং তাঁকে এমন এক রাজত্ব দান করেছিলেন যে সকল দিক থেকে তাঁর জন্যে সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থন আসতো, আল্লাহ তায়ালা সহজ করে দিয়েছিলেন তার জন্যে শাসন ক্ষমতার সকল ব্যবস্থাদি ও সহজলভ্য বিজয়, তার সুবিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র অজস্র সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করার জন্যে নানা প্রকার উপায়-উপাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো–আর তাকে দান করা হয়েছিলো আশি বছরের এক সুদীর্ঘ বয়স, দান করা হয়েছিলো সুবিশাল সাম্রাজ ও প্রচুর ধন সম্পদ এবং পৃথিবীর জীবনে যতো প্রকার সুখ সম্পদের অধিকারী মানুষ হতে পারে তা সবই তাকে দেয়া হয়েছিলো। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর সে আর এক পথে এগিয়ে চললো,' অর্থাৎ তিনি সেই দিকেই চললেন যেপথ তাঁর কাছে সহজ বলে মনে হলো, পশ্চিম দিকে এগিয়ে চললেন। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশেষে সে যখন পৌঁছে গেলো সূর্য অস্তমিত হওয়ার স্থানে। সেখানে সে দেখতে পেলো সূর্য ডুবে যাচ্ছে একটি কর্দমাক্ত কালো পানির মধ্যে....... আর যে কোনো ব্যক্তি ঈমান আনবে ও ভালো কাজ করবে তার জন্যে রয়েছে উত্তম প্রতিদান, আর শীঘ্রই আমি মহান আল্লাহ, আমার সকল নির্দেশনা পালন করা তার জন্যে সহজ করে দেবো।'

এখানে অস্তমিত হওয়ার স্থান বলতে সেই স্থানটিকে বুঝানো হয়েছে যেখানে এসে একজন দর্শক দেখতে পায় সূর্য দিগন্ত রেখার ওপারে ডুবে যাচ্ছে। আর এ অস্তমিত হওয়ার স্থানটি বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন হয়ে থাকে কোনো জায়গায় দর্শক দেখে সূর্য পাহাড়ের পেছনে ডুবে যাচ্ছে, কোনো জায়গায় দেখে মহাসাগরের বুকে সূর্য আত্মগোপন করছে, আবার কোনো জায়গা দেখে মহাসাগরের বুকে সূর্য আত্মগোপন করছে, আবার কোনো জায়গায় দেখে সূর্য যেন তলিয়ে যাচ্ছে মরুভূমির বুকের মধ্যে, কারণ এসব মরুভূমির দিকে খোলা চোখে তাকালে তার কোনো কূল কিনারা নজরে পড়ে না। আল কোরআনের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে যুলকারনায়ন পশ্চিম দিকে চলতে চলতে গেছেন পৌঁছে আটলান্টিক সমুদ্রের কিনারায় এমন এক স্থানে যেখান থেকে তার মনে হচ্ছিলো স্থলভাগ যেন ওখানেই শেষ হয়ে গেছে। এরপর তিনি অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগলেন অতলান্ত ওই সাগরের বুকে সোনার বরণ ওই দিন ধীরে ধীরে ডুবে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আর এখানে এ সম্ভাবনাই বেশী যে তিনি কোনো বড় নদীর কিনারায় হয়তো পৌঁছে গিয়েছিলেন যেখানে ঘন ঝোপ-ঝাঁড়ের পরিমাণ খুবই বেশী এবং এর চতুর্দিকের এলাকাটা পুরোপুরি এটেল মাটির কাদায় ভরা বা বলা যায় স্থানটি ছিলো পুরো কর্দমাক্ত এলাকা। এ স্থানটি ছিলো অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এবং সকল দিক দিয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ; সম্ভবত এটা ছিলো একটা মোহনা। অতপর তিনি দেখলেন ওই পানির মধ্যে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

সে দেখতে পেলো, সূর্য ডুবে যাচ্ছে কালো বা কর্দমাক্ত পানির মধ্যে।.....

কিন্তু ঠিক কোন দেশে বা কোন স্থানে তিনি পৌঁছেছিলেন তা কারো পক্ষে নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়, যেহেতু আল কোরআনে কোনো সুনির্দিষ্ট স্থানের কথা বলা হয়নি। আর অন্য কোনো কিছুতে এমন কোনো নিশ্চিত উৎসও নেই যার মাধ্যমে ওই বাদশাহর ভ্রমণের স্থানসমূহ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানা যেতে পারে। আল কোরআন ছাড়া দুনিয়ায় অন্য কোনো গ্রন্থ নেই বা জানার এমন কোনো উপায়ও নেই যাকে চূড়ান্ত, নিরাপদ ও সুনিশ্চিত মাধ্যম বলা যেতে পারে। যেহেতু কোনোটার পেছনেই কোনো সঠিক ভিত্তি নেই।

এই কর্দমাক্ত জলাভূমির কাছে যুলকারনায়ন এক জাতিকে পেলেন যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন, 'আমি বললাম, 'হে যুলকারনায় তুমি চাইলে ওদেরকে শাস্তি দিতে পারো অথবা ওদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে পারো'

অর্থাৎ ওদের সাথে ওদের ব্যবহার অনুযায়ী যথাযথ আচরণ করার জন্যে তোমাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।'

এখন প্রশ্ন জাগে, ওপরের একথাটি আল্লাহ তায়ালা তাকে কেমন করে বললেন? একথাটা কি আল্লাহ তায়ালা তাকে ওহীর মাধ্যমে জানালেন, না ওই জাতির অবস্থার বিবরণ আলোচ্য আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে, যাদের ওপরে তাকে পূর্ণ কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছিলো এবং তাদের সাথে যে কোনো ব্যবহার করার পরিপূর্ণ অধিকারী তাকে বানানো হয়েছিলো। এতে পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে যে ওই জাতির পূর্ণাংগ দায়িত্বই তার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো। এখানে স্পষ্টভাবে না বললেও যে ইংগিতটি পাওয়া যাচ্ছে তা হচ্ছে, যুলকারনায়ন অবশ্যই নবী ছিলেন না, কিন্তু নবী না হলেও তাকে এতোটা এখতিয়ার দেয়ার পেছনে যে কথাটি বুঝা যায় তা হচ্ছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ রব্বুল আলামীন জানেন, তিনি ছিলেন পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য যথাযথভাবে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন এবং একজন সুবিচারক। তাইতো তাকে বলা হয়েছে, তাদেরকে শাস্তি দাও বা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো এ বিবেচনা তোমার! কোরআনের এ আয়াতে বুঝা যাচ্ছে, মানুষ হিসাবে যুলকারনায়নের পক্ষে তাদের সাথে ভালো বা মন্দ উভয় প্রকার ব্যবহার করা সম্ভব ছিলো। ভালো ব্যবহার বা মন্দ ব্যবহার যেটাই তিনি করেন না কেন, তার জন্যে এতে কোনো মানা ছিলো না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে যুলকারনায়ন বিজিত দেশসমূহের ব্যাপারে শুরুতেই তার নীতি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, যার কারণে তিনি ওই সব দেশের জনগণের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালাও তাকে ওই সব দেশের জনগণের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব দান করেছিলেন, এরশাদ হচ্ছে,

'সে বললো, যে ব্যক্তি যুলুম করবে আমি অচিরেই তাকে আমি ভয়ানক শাস্তি দেবো, তারপর (এই জীবন শেষে) যখন তাকে ফিরিয়ে নেয়া হবে তার প্রতিপালকের কাছে, অতপর তাকে সেখানেও নিকৃষ্ট আযাবের মধ্যে ফেলে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং ভালো কাজ করবে, অবশ্যই তার জন্যে রয়েছে বড়ই সুন্দর প্রতিদান এবং আমি একজন শক্তিশালী বাদশাহ কথা দিচ্ছি যে তাকে আমার ক্ষমতার পক্ষ থেকে জানাবো।'

ওপরে উল্লেখিত এই আয়াতটিতে জানানো হয়েছে যে, ওই বিশাল সাম্রাজের শাসনকর্তা সীমা অতিক্রমকারী ও অত্যাচারীদের জন্যে পার্থিব শাস্তি ও পরকালীন কঠিন পরিণতি প্রাপ্ত হওয়ার ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি সাধারণভাবে তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে অন্যায়কারী ও বিদ্রোহীদেরকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই কষ্ট ভোগ করতে হবে। জীবনাবসানে এদের ওপর নেমে আসবে এমন 'কঠিন ও অপ্রিয়' আযাব যার কোনো তুলনা মানুষকে দেয়া সম্ভব নয়। হাঁ, নেককার মোমেনদের জন্যে রয়েছে সুন্দর প্রতিদান এবং রয়েছে তাদের জন্যে দুনিয়াতে পবিত্র পরিচ্ছন্ন লেনদেন, সম্মান-মর্যাদা এবং সাহায্য ও সহজ-সরল অবস্থা। এই-ই হচ্ছে সুন্দর ও কল্যাণকর শাসনের আসল নীতি। এখন একজন নেককার মোমেনের কর্তব্য হচ্ছে দুনিয়ার জীবনে সম্মান-মর্যাদাও সহজ-সরল জীবন লাভ করার জন্যে সাধ্যানুযায়ী প্রচেষ্টা চালানো এবং দেশের শাসনকর্তার কাছে থেকে সুন্দর পুরস্কারের অধিকারী হওয়ার জন্যে প্রত্যাশী হওয়া। অপরদিকে সীমালংঘনকারী এবং নিষ্ঠুর যালেমদের ভাগ্য জুটে থাকে নানাপ্রকার শাস্তি ও দুঃখ কষ্ট অথচ পাশাপাশি দেখা যায় এহসানকারীরা তাদের দলের মধ্য থেকেই পেতে থাকে তার এহসানের চমৎকার বদলা, মানসম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান পায়, আরো পায় সাহায্য-সহযোগিতা এবং সহজ সরল জীবন, কিন্তু সীমালংঘনকারী বিদ্রোহী প্রকৃতির মানুষ, তার অসদাচরণ ও ক্ষতিকর ব্যবস্থার

কারণে চরম মন্দ পরিণতি এবং হীনতাও শত্রুতা লাভ করে.........এসব কথা যখন চিন্তা করে দেখে তখন সে অবশ্যই কল্যাণকর দিকগুলোর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এর ফলে লাভ করে অবশেষে সুন্দর ও শুভ পরিণতি। অপরদিকে, যখন শাসন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা হাতাছাড়া হয়ে যায়, তখন ওইসব বিদ্রোহী, অন্যায়কারী ও সীমালংঘনকারীরা পতোনন্মুখ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ হাতিয়ে নেয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কিন্তু সৎ ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন কর্মকর্তারা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যায় অথবা বিরোধীদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে ফেলে। তারপর যখন ক্ষমতার হাত বদল হয় এবং যালেম ও আগ্রাসীদের হাতে ক্ষমতা চলে যায় তখন তারা নতুন সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে যায় এবং সেই যালেম কর্তৃপক্ষের কোপানলে পড়ে তারা বহু কষ্ট পায়, সকল দিকে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে এবং দলীয় সংগঠন তখন হয়ে যায় নেতৃত্বহীন, ফলে অশান্তি নেমে আসে গোটা দেশে ও গোটা সমাজে।

তারপর যুলকারনায়ন পশ্চিমাঞ্চলের সফর শেষে পূর্বাঞ্চলের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন সেখানের মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমতা দান করায় সেখানেও সব কিছু অত্যন্ত সহজভাবে তাঁর করায়ত্ত হয়ে গেলো; এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর সে এগিয়ে চললো আর এক পথ ধরে, যেতে যেতে যখন পৌঁছে গেলো সূর্য উদয়ের স্থানে, ...

এখানে দেখা যাচ্ছে সূর্য অস্তমিত হওয়ার স্থানে যুলকারনায়নের আগমন সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তাঁর পূর্বাঞ্চলে গমন ও তৎপরবর্তী অবস্থা সম্পর্কেও সেই একইভাবে বলা হয়েছে। এখানে আসা সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই দৃশ্য উপস্থাপন করা, যা তিনি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন। এখানেও দেখুন ঠিক কোন স্থানে তিনি পৌঁছুলেন তা আল কোরআে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেনি, বরং ওই এলাকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীও তার পারিপার্শিক অবস্থার কথা উল্লেখ করেছে, আর উল্লেখ করেছে ওই এলাকায় বসবাসরত সেই জাতির অবস্থা সম্পর্কে যাদেরকে তিনি সেখানে পেয়েছিলেন। এরশাদ হচ্ছে, 'অবশেষে যখন সে পৌঁছে গেলো সূর্য উদয়ের স্থানে, সেখানে সে দেখতে পেলো সূর্য উঠছে এমন এক জাতির ওপর যাদের থেকে সূর্যের প্রখর রশ্মিকে আড়াল করার মতো কোনো ব্যবস্থা আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ বানাইনি।'

অর্থাৎ এই এলাকাটি সম্পূর্ণ এক উন্মুক্ত অঞ্চল। এখানে না আছে কোনো সুউচ্চ পর্বত শ্রেণী, আর না আছে উঁচু গাছপালা যা তাদেরকে সূর্য কিরণ থেকে ছায়া দিতে পারে। সুতরাং, ওই জাতির ওপর সূর্যের আলো বিনা বাধায় সরাসরি এসে পড়ে........... ওই স্থানের এ বৈশিষ্ট শত শত মাইল ব্যাপী বিশাল সাহারা মরুভূমি ও দিগন্ত ব্যাপী সুপ্রশস্ত সমভূমির ওপর প্রজোয্য। আসলে এ প্রশস্ত এলাকার দৈর্ঘ প্রস্থ সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। এমন সুপ্রশস্ত বৃক্ষলতাহীন সমভূমি সুদূর প্রাচ্যেই বর্তমান, যেখানে দেখা যায় শুধু বিশাল ও উন্মুক্ত সমভূমি এবং এ এলাকাটি সম্ভবত আফ্রিকার পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। এই যে 'আমি বানাইনি এর অপর প্রান্তে কোনো আড়াল বা বাধার প্রাচীর' আয়াতটি এই অঞ্চলের ওপর প্রয়োগের সমভাবনাই বেশী, কারণ এরাই এমন জাতি যারা খোলা দেহে বাস করে এবং এরা সূর্য থেকে নিজেদের শরীরকে ঢাকার দরকার মনে করে না......।

যুলকারনায়ন ইতিপূর্বে তার শাসন প্রণালীর কথা বিস্তারিতভাবে ঘোষণা করেছিলেন, যার বিবরণ ওপরে এসে গেছে, এজন্যে ওই বিজিত জাতির সাথে তিনি কি ব্যবহার করবেন এখানে

তার পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। পূর্বাঞ্চলের এই এলাকায় তার আগমনে কেউ বাধাও দেয়নি। যেহেতু তাঁর সাম্রাজ্যের পরিধি এতো বিস্তীর্ণ ছিলো যে ইতিপূর্বেই তিনি সবার কাছে পরিচিত ছিলেন আর আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মহা জ্ঞান ভান্ডারের মধ্যে তো অবশ্যই তার চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তিসমূহ নিহিত রয়েছে, যার কারণে তার রহমতেই তিনি এসব দুর্গম ও দুর্ভেদ্য এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সফর করে আল্লাহর মনোপুত কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইয়াজুজ মাজুজ

পবিত্র কোরআনের শৈল্পিক ও সুবিন্যাস্ত উপস্থাপনা ও বর্ণনা ভংগীর বিষয়টি অনুধাবন করার জন্যে এখানে আমাদেরকে একটু বিরতি নিতে হচ্ছে। আলোচ্য আয়াতে যে চিত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, তা প্রকৃতির মাঝে উন্মুক্ত ও বিকশিত হয়ে আছে। চিত্রটিতে আমরা উজ্জ্বল ও দীপ্তমান সূর্যকে দেখতে পাচ্ছি। এই সূর্যের মাঝে এবং আয়াতে বর্ণিত সম্প্রদায়ের মাঝে কোনো আড়াল নেই, কোনো বাধা নেই। তদ্রূপ যুলকারনায়নের অন্তর ও অন্তরর্নিহিত বাসনা ও ইচ্ছা আল্লাহর কাছে উন্মুক্ত। ফলে কোরআনের অপূর্ব বর্ণনাভংগীর মাধ্যমে প্রকৃতি ও হৃদয়ের অবস্থা চিত্রায়নে এক বিস্ময়কর সামঞ্জস্য আমরা দেখতে পাই।

যুলকারনায়ন কোন্ স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তার সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিচয় নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে-সম্ভব নয়। তদ্রূপ 'দুই বাঁধ' বলতে তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন তা'ও নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। পবিত্র কোরআনের বক্তব্য দ্বারা আমরা শুধু এতোটুকু বুঝতে পারছি যে, তিনি দুটো প্রাকৃতিক প্রাচীর অথবা দুটো কৃত্রিম বাঁধের মধ্যবর্তী একটা এলাকায় গিয়েছিলেন। এই উভয় প্রাচীর অথবা বাঁধের মাঝখান দিয়ে একটি পথ অথবা ফাঁকা জায়গা অতিক্রম করছিলো। সেখানে তিনি এমন এক পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের সাক্ষাত পান যারা তাঁর কথাও বুঝতে পারছিলো না।

এই সম্প্রদায় যখন যুল কারনায়নের মতো একজন দিগ্বিজয়ী ও শক্তিধর ব্যক্তিকে তাদের সামনে উপস্থিত পেলো এবং তার মাঝে ক্ষমতা ও গঠনমূলক কাজের পরিচয় পেলো তখন তারা 'ইয়াজুজ মাজুজ' এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে একটা মযবুত প্রাচীর নির্মাণ করার জন্যে প্রস্তাব পেশ করলো। কারণ ইয়াজুজ অপর প্রান্ত থেকে তাদের ওপর আক্রমণ করতো এবং তাদের শস্যাদি বিনষ্ট করে ফেলতো। ওদেরকে প্রতিহত করার মতো ক্ষমতা ও সামর্থ্য তাদের ছিলো না। তাই তারা যুল কারনায়নকে একটা প্রাচীর নির্মাণ করে দেয়ার জন্যে অনুরোধ জানালো। এ কাজের জন্যে আর্থিক সহায়তাদানের প্রস্তাবও তারা পেশ করলো।

একজন ন্যায় পরায়ন ও সৎ শাসক হিসেবে পৃথিবী থেকে সকল অন্যায় ও অবিচারের মূলোৎপাটন করায় যে মহৎ আদর্শ যুলকারনায়ন অনুসরণ করতেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ওদের আর্থিক সহায়তার প্রস্তাবটি নাকচ করে দিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিতে সম্মতি জানালেন, তবে এই কঠিন ও দুরূহ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার উদ্দেশ্যে ওদের দৈহিক শ্রম ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের জন্যে তিনি ওদেরকে পরামর্শ দেন। ফলে তারা অনেকগুলো লোহার পাত সংগ্রহ করে দুই প্রাচীরের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাটিতে স্তূপ আকারে রেখে দিলো। তখন প্রাচীর দুটো দেখতে মনে হচ্ছিলো যেন ঝিনুকের দুটো খোল। আর এই খোল দুটো স্তূপটিকে আবৃত করে রেখেছিলো। স্তূপটি যখন প্রাচীর দুটোর সমান সমান হয়ে গেলো তখন

লোহার পাতগুলো আগুনে পোড়ানোর জন্যে তাদেরকে হাপরে দম দিতে বলা হলো। এতে লোহার পাতগুলো আগুনে পরিণত হয়ে গেলো। তখন যুলকারনায়ন তাদেরকে গলিত তামা আনতে বললেন। এই তামা তিনি লোহার উত্তপ্ত পাতগুলোর ওপর ঢেলে দিলেন। ফলে লোহার প্রাচীরটি আরো দৃঢ় এবং আরো মযবুত হয়ে গেলো।

লোহাকে মযবুত করার জন্যে বর্তমান যুগেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, লোহার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে তামার সংমিশ্রণ ঘটলে তাতে লোহার দৃঢ়তা ও কাঠিণ্য বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তায়ালা এই পদ্ধতির সন্ধানই দিয়েছিলেন যুলকারনায়নকে। শুধু তাই নয়, বরং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভবের হাজার হাজার বছর আগেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর অমর গ্রন্থে এই পদ্ধতিটি উল্লেখ করেছেন।

উত্তপ্ত লোহারপাত এবং গলিত তামার সাথে প্রাচীর দুটো সেঁটে গেলো। ফলে ইয়াজুজ মাজুজদের আক্রমণের পথও বন্ধ হয়ে গেলো, এই লোহার প্রাচীর এতোই মযবুত ও উঁচু ছিলো যে, এটা অতিক্রম করা বা এটাকে ছিদ্র করার মতো শক্তি-সামর্থ্য তাদের ছিলো না। যার কারণে ওই দূর্বল ও পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ করাও তাদের জন্যে অসম্ভব হয়ে পড়লো। ফলে দুর্বল ও অসহায় লোকগুলো তাদের শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে পেলো।

এ ধরনের একটি বিরাট কাজ আঞ্জাম দিয়ে যুলকারনায়নের মনে বিন্দুমাত্র গর্ব ও অহংকারের সৃষ্টি হয়নি। শক্তি ও জ্ঞানের নেশায়ও তিনি মত্ত হননি। বরং আল্লাহর কুদরতকে স্মরণ করে তাঁর দরবারে শোকর আদায় করেছেন জনকল্যাণমূলক একটি কাজ করে তিনি বরং 'আল্লাহ প্রদত্ত শক্তির সদ্ব্যবহারই করেছেন। তিনি নিজের শক্তির পরিবর্তে আল্লাহর শক্তিকে স্বীকার করেছেন। নিজেকে তাঁর চরনেই সঁপে দিয়েছেন, একজন মোমেন বান্দার পক্ষে যা বিশ্বাস করা উচিত তাই ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছেন যে, এই সকল পাহাড়-পর্বত এই সকল নির্মিত বাঁধ ও প্রাচীর কেয়ামতের পূর্ব-মুহূর্তে-ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে। কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। গোটা পৃথিবী তখন শূন্য ও সমতল একটা ভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে। আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে।

এখানে এসে যুলকারনায়ন এর ঘটনাবহুল জীবনের একটা খন্ড চিত্রের পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি ছিলেন একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ন শাসকের বাস্তব ও জীবন্ত নমুনা। এই শ্রেণীর শাসকদেরকে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর কর্তৃত্ব দান করলে তাদের জন্যে সকল ধরনের উপায় উপকরণ সহজলভ্য করে দেন। ফলে তারা গোটা পৃথিবী জয় করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এর ফলে তারা অত্যাচারী ও অহংকারী হয়ে ওঠে না, স্বৈরাচারী ও দাম্ভিক হয়ে ওঠে না। তাদের বিজয়কে তারা নিছক আর্থিক ফায়দা লাভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে না, ব্যক্তি, সমাজ ও দেশকে শোষণ করার হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে না। বিজিত দেশের বাসিন্দাদের সাথে দাস সুলভ আচরণ করে না, তাদেরকে ব্যক্তিস্বার্থ ও লোভ-লালসা চরিতার্থ করার জন্যে ব্যবহার করে না, বরং যেখানেই তাদের আগমন ঘটে সেখানেই ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, অসহায় ও দুর্বলদের সাহায্য-সহযোগিতায় তারা এগিয়ে আসে কোনোরূপ প্রতিদান ব্যতীতই দুর্বলদেরকে সকল অনাচার ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করে, আল্লাহর দেয়া শক্তিকে তারা গঠনমূলক ও সংস্কারমূলক কাজে নিয়োজিত করে। তারা অন্যায়কে প্রতিহত করে, ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করে। আর এই সকল কল্যাণ ও মংগলজনক কাজ সমাধা করার পর তারা এর পেছনে আল্লাহর দয়া ও করুণাকেই ক্রিয়াশীল মনে করে। তারা

ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করেও আল্লাহর শক্তি, ক্ষমতা ও সামর্থ্যের কথা বিন্দুমাত্রও বিস্মৃত হয় না। তারা সর্বক্ষণ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, 'ইয়াজুজ মাজুজ' কারা? এরা এখন কোথায় আছে? অতীতে এদের অবস্থা কেমন ছিলো এবং ভবিষ্যতে কেমন হবে? এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। পবিত্র কোরআনে এবং হাদীস শরীফে যতোটুকু বলা হয়েছে ততোটুকুই আমরা জানি; এর বেশী আর কিছুই আমাদের জানা নেই।

যুলকারনাইনের বরাত দিয়ে পবিত্র কোরআনে যে বক্তব্য এসেছে তাতে বলা হয়েছে,

'যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য।'

এই বক্তব্যে নির্দিষ্ট কোনো সময়ের কথা বলা হয়নি। তাই এটাও সম্ভব হতে পারে যে, হিংসতর সম্প্রদায় যেদিন থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখন্ড আক্রমণ করে সব কিছু লন্ড-ভন্ড করে দিচ্ছিলো সেদিন থেকেই যুলকারনায়ন নির্মিত বাঁধটা ভেংগে ফেলা হয়েছিলো।

সূরায়ে আম্বিয়ার একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

'যে পর্যন্ত না 'ইয়াজুজ ও মাজুজকে' বন্ধনমুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চ ভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে, আমাদের প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হলে....'

ওই আয়াতটিতেও 'ইয়াজুজ ও মাজুজ'-এর বন্ধনমুক্ত করার কোনো নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা হয়নি। আল্লাহর প্রতিশ্রুত সময় বলতে কেয়ামতের আগমনের সময়টি বুঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের সময় নিকটবর্তী হয়েছে বা ঘনিয়ে এসেছে। কথাটি কিন্তু বলা হয়েছে হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর যুগে, অর্থাৎ আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খোদায়ী হিসাব আর মানবীয় হিসাবের মাঝে বিস্তর তফাৎ রয়েছে। মানুষের হিসাব অনুযায়ী যা কোটি বছর, আল্লাহর কাছে তা একটা নগণ্য মুহূর্ত মাত্র। সে কারণেই কেয়ামত সংঘটিত হতে সম্ভবত এখনও কোটি কোটি বছর বাকী থাকা সত্তেও আল্লাহর হিসাব অনুযায়ী তা নিকটবর্তী।

কাজেই কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সময় এবং আমাদের বর্তমান সময়ের মধ্যবর্তী যে কোনো এক সময়ে আলোচ্য বাঁধটি উন্মুক্ত হয়ে গিয়ে থাকলে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। যদি তাই হয়, তাহলে তা তার ও মংগোলীয়গোষ্ঠীর লোকদেরকে ইয়াজুজ ও মাজুজ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে যাদের হিংস্র ও দানবীয় তান্ডবলীলা গোটা প্রাচ্যের দেশগুলোকে লন্ড-ভন্ড করে দিয়েছিলো।

ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে জানা যায় রসূলুল্লাহ (স.)-এর স্ত্রী যয়নব বিনতে জাহ্‌ল বলেন যে, একদিন রসূল (স.) ঘুম থেকে জেগে ওঠেন এবং তাঁর চেহারা রক্তিম দেখাচ্ছিলো। তিনি বললেন 'আরবদের সর্বনাশ হয়ে গেছে! এক মহাবিপদ তাদের জন্যে ঘনিয়ে এসেছে। আজ বাঁধের বন্ধন থেকে ইয়াজুজ ও মাজুজকে এভাবে মুক্ত করা হয়েছে।' তিনি তাঁর শাহাদাতের আংগুল এবং বৃদ্ধাংগুলি দুটো দ্বারা কড়ার ন্যায় বানিয়ে দেখালেন। আমি বললাম, 'সৎ লোকগুলো আমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা সত্তেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো?' তিনি উত্তরে বললেন, 'হাঁ, যদি অনাচার বেড়ে যায়।'

এই স্বপ্নটি আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে রসূল (স.) দেখেছিলেন। আর তাতার গোষ্ঠীর ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয় এর বেশ কয়েক যুগ পর। হালাকুখানের হিংস্র সেনাদলের আক্রমণে আব্বাসীয় বংশের সর্বশেষ খলিফা আল মোতাসেস-এর শাসনাধীন গোটা আরব সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়, আর এটাই সম্ভবত রসূল (স.)-এর স্বপ্নের প্রতিফলন। তবে এ সংক্রান্ত সঠিক তথ্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। আমরা যেটা বলছি সেটা চূড়ান্ত বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে নয়; বরং দৃঢ় অনুমানের ওপর নির্ভর করে বলছি।

এখন পুনরায় আলোচ্য সূরার মূল প্রসংগে ফিরে যাই। ৯৯-১০১ আয়অতে আমরা যুলকারনায়নের বক্তব্যে কেয়ামতের কয়েকটি চিত্র পাই।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত চিত্রটিতে আমরা এমন একটি চলমান মানব সমাজকে দেখতে পাই যারা বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন প্রজন্মের, বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন যুগের। তাদেরকে কবর থেকে উঠিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে রাখা হয়েছে। তাদের মাঝে কোনো শৃংখলা নেই, তারা পরস্পরের মাঝে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের ন্যায় তারা পরস্পরের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ছে। কারও কোনো দিকের খেয়াল নেই। এক চরম অরাজকতাপূর্ণ পরিস্থিতি তাদের মাঝে বিরাজ করছে। এরপরই সুশৃংখল হওয়ার জন্যে শিংগারে ফুৎকার দেয়া হবে। তখন তারা সবাই সুশৃংখল হয়ে দাঁড়াবে। আয়াত নং ৯৯ এর 'ওয়ানুফেখা থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত এ কথাই বলা হয়েছে।

তখন অবিশ্বাসী ও খোদাদ্রোহী লোকেরা অনুভব করবে যেন তাদের চোখের ওপর পর্দা রাখা হয়েছে এবং তাদের শ্রবণ শক্তি লোপ পেয়েছে। তাদের সামনে জাহান্নাম এনে রাখা হবে। কিন্তু তারা এই জাহান্নাম থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না যেমনটি তারা পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে করতো। হঠাৎ করে যখন তাদের চোখের সামনে থেকে পর্দা উঠিয়ে নেয়া হবে তখন তারা তাদের কৃতকর্মের যথার্থ ও উপযুক্ত শাস্তি স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

দ্বীনকে বর্জন করার শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামকে বরণ করে নেয়ার চিত্রটি পবিত্র কোরআনের নিজস্ব ও ব্যতিক্রমধর্মী শৈল্পিক বর্ণনা ভংগিতে অত্যন্ত চমৎকারভাবে চিত্রায়িত হয়েছে।

এরপর ওদের এই করুণ পরিণতির বিষয়টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও ব্যাংগাত্মক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

ওরা কি ভেবেছিলো যে, আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁরই নির্দেশের দাস কিছু সংখ্যক মখলুক আল্লাহর বিরুদ্ধে ওদেরকে সাহায্য করবে, ওদেরকে তাঁর কবল থেকে রক্ষা করবে। যদি তাই মনে করে থাকে তাহলে এই ভ্রান্ত ধারণার শাস্তি আভা ওরা নিজেরাই দেখে নিক। আমি ওদের অভ্যর্থনার জন্যে জাহান্নামকে প্রস্তুত রেখেছি। ওরা আসুক! ওদের অভ্যর্থনার জন্যে স্বয়ং জাহান্নামই প্রস্তুত রয়েছে। এখানে প্রবেশ করতে ওদের কোনো বেগ পোহাতে হবে না, কোনো কষ্ট করতে হবে না।

যাদের সকল আমল মূল্যহীন

আলোচ্য সূরাটি শেষ করার আগে এখানে কয়েকটি নিগূঢ় তত্ত্বের প্রতি আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রথম তত্ত্বটি হচ্ছে মানদন্ড ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত। বিশেষ করে কর্ম ও ব্যক্তির মূল্য নির্ধারণের মানদন্ড। কারণ, এ সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত মতবাদ রয়েছে। পবিত্র কোরআনের ভাষায় কর্ম ও ব্যক্তির মূল্যায়ন এভাবে এসেছে। (আয়াত ১০৩ ও ১০৪)

অর্থাৎ তারাই ব্যর্থ, তারাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত, জাগতিক জীবনের সকল সাধনাই যাদের ব্যর্থ। কারণ, তাদের সাধনা তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেনি, তাদেরকে কোনো চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে পৌঁছাতে পারেনি। এই সাধনা তাদের জন্যে কোনো ফলাফল বয়ে আনেনি। তা সত্ত্বেও তারা মনে করে যে, তারা যা করছে তা ঠিকই করছে। কারণ, তারা গাফলতি ও অজ্ঞতার মাঝে ডুবে আছে। তাদের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে। ফলে তারা বুঝতেই পারছে না যে, তাদের সকল চেষ্টা সাধনা বৃথা ও ফলাফল শূন্য। এই ব্যর্থ ও ভ্রান্ত সাধনার পেছনেই নিজেদের জীবন যৌবন নষ্ট করে চলছে।

এরা কারা? এদের পরিচয়টা আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব? তাহলে শোনো! এরা হচ্ছে তারা যারা নিজেদের পালনকর্তার কোনো আয়াতকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টিকে অস্বীকার করেছে। ফলে তাদের সব আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে। এ প্রসংগটিই নিচের আয়াতে বলা হয়েছে, (আয়াত ১০৫)

'আল হুবুত' শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে বিষাক্ত ঘাস খাওয়ার ফলে পশুর পেট ফেঁপে যাওয়া। যার ফলে পশুটি মারা যায়। এই শব্দটি দ্বারা 'আমল বিনষ্ট' হওয়ার অর্থটি যথার্থ রূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কারণ, ভ্রান্ত পথের পথিক আর খোদাদ্রোহী লোকদের কাজগুলো ফুলে ফেঁপে যখন তাদের সামনে প্রকাশ পায় তখন তারা এগুলোকে সঠিক, সার্থক এবং ফলপ্রসূ মনে করে। কিন্তু পরিণামে এগুলো ব্যর্থ ও ভ্রান্ত বলেই প্রমাণিত হয়। ফলে আল্লাহর কাছে এগুলোর কানাকড়িও মূল্য হয় না। কেয়ামতের দিন ভাল মন্দের চূড়ান্ত মানদন্ডে এগুলোর কোনো স্থান নেই, কোনো মূল্য নেই। তাই এ সবের কর্তাদের পরিণতি জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই হবে না। সে কথাই নিচের আয়াতটিতে বলা হয়েছে। (আয়াত ১০৬)

পক্ষান্তরে মোমেনদের পরিণতি হবে সম্পূর্ণ বিপরীত ও ভিন্ন প্রকৃতির। আয়াতে বলা হয়েছে, (আয়াত ১০৭ ও ১০৮)

মোমেনের চিরস্থায়ী ঠিকানা

দুটো শ্রেণীর লোকদের জন্যে দুই ধরনের অভ্যর্থনার কথা আমরা জানতে পেলাম। মোমেনদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হবে জান্নাতুল ফেরদৌসে, আর কাফের মোশরেকদের অভ্যর্থনা জানানো হবে জাহান্নামে। উভয় অভ্যর্থনার মাঝে কতো বিরাট তফাত! (আয়াত ১০৮)

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য লক্ষণীয়। এখানে মানবীয় আবেগ অনুভূতি এবং গভীর মনস্তাত্তিক প্রবণতার প্রতি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, মোমেনরা চিরকালের জন্যে জান্নাতুল ফেরদৌসে বসবাস করবে, আর আমরা জানি যে, মানুষ হচ্ছে অস্থির চিত্তের প্রাণী। বৈচিত্র্যের পিয়াসী এক জাতি। তার পক্ষে একই স্থানে এবং একই অবস্থায় টিকে থাকা বিরক্তিকর। অপরদিকে কোনো বস্তু যদি অপর্যাপ্ত পরিমাণে হয় এবং তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলেও মানুষ এর প্রতি নিজের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। আর যদি একই অবস্থা দীর্ঘ দিন চলতে থাকে তাহলেও সেটা তার জন্যে হয় বিরক্তিকর। শুধু তাই নয়, বরং বিরক্তি ও অস্বস্তির কারণে সে এমন অবস্থা থেকে পলায়ন করতেও উদ্যত হয়।

এই হচ্ছে মানবীয় স্বভাব। আর এই স্বভাবের অধিকারী করেই আল্লাহ তায়ালা মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। এর পেছনে গভীর রহস্য লুকায়িত আছে। কারণ আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর বুকে

তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি পালন করার মতো উপযোগী স্বভাব যোগ্যতা দিয়েই তাকে সৃষ্টি করা ছিলো বাঞ্ছনীয়। আর তাই তিনি তাকে সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন। যেমন তার স্বভাবের মাঝে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের স্পৃহা দান করেছেন, অসুসন্ধিৎসা বা অজানাকে জানার আগ্রহ দান করেছেন। এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থা, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্য এবং এক ব্যবস্থা থেকে অন্য ব্যবস্থায় উত্তরণের আগ্রহও তার মাঝে সৃষ্টি করেছেন। এর ফলে মানুষ জীবনের গতিকে পাল্টিয়ে দেয়, সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন সাধন করতে পারে। জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে পারে। আর এই পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে ব্যক্তি ও সমাজ উন্নতি ও অগ্রগতির সিঁড়ি বেয়ে আল্লাহ পাকের নির্ধারিত ও কাংখিত পরিপূর্ণতার চরম পর্যায় গিয়ে পৌঁছে যায়।

এটা ঠিক যে, মানুষ অভ্যাসের দাস, সে চিরাচরিত রীতি-নীতির প্রতি যত্নশীল ও আপোষহীন। কিন্তু তাই বলে সেটা এমন পর্যায়ের নয় যে, এর ফলে জীবনের গতি থেমে যাবে, উন্নতি ও অগ্রগতির ধারা ব্যাহত হবে এবং মানুষের চিন্তা-চেতনায় স্থবিরতা এসে যাবে। বরং মানুষের এই যত্নশীলতা ও আপোসহীনতা হচ্ছে এক প্রকার প্রতিরোধ যার ফলে গতির মাঝে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয়। এই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে তখন বিশেষ একটি পরিস্থিতি এসে স্থবিরতা গোটা সমাজকে গ্রাস করে নেয়। ফলে বিপ্লব ও পরিবর্তনের প্রচন্ড ধাক্কায় সমাজের চাকা আবার এত দ্রুত ঘুরতে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত তা সীমা অতিক্রম করে যায়। কাজেই ব্যক্তি ও সমাজের জন্যে মংগলজনক হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ পরিবর্তন ও উত্তরণ।

তবে সমাজ জীবনে বন্ধ্যাত্ব ও স্থবিরতা চেপে বসলে তখন বুঝতে হবে যে, জীবনের গতি স্তিমিত হয়ে পড়েছে, আর সেটা হবে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির জন্যে মৃত্যুরই নামান্তর।

পৃথিবীর বুকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করার জন্যে এ জাতীয় স্বভাব ও প্রকৃতিই হচ্ছে মানুষের জন্যে অধিক উপযোগী। তবে জান্নাত যেটা হবে চিরস্থায়ী বাসস্থান এখানে আবার সে ধরনের স্বভাবের কোনোই স্থান নেই। কারণ, মানুষ যদি পরকালেও পৃথিবীর স্বভাব নিয়েই বেঁচে থাকে এবং অপরিবর্তনশীল ও বৈচিত্রহীন ও অফুরন্ত বিলাস সামগ্রী দ্বারা পরিপূর্ণ একই ধরনের জান্নাতেই তাকে অনন্ত অসীমকালের জন্যে বসবাস করতে হয়, তাহলে এরূপ জান্নাতবাস তার জন্যে নরকবাসেরই সমতুল্য হয়ে পড়বে, তার জীবনটা হয়ে পড়বে দূর্বিষহ। এমন পরিস্থিতির কবল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে এবং বৈচিত্রের স্বাদ গ্রহণের জন্যে তখন সে এরূপ জান্নাত ত্যাগ করে কিছু দিনের জন্যে হলেও জাহান্নামে অবস্থান করার আগ্রহ প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করবে না।

কিন্তু মানুষের হৃদয়ের চাবিকাঠি যার হাতের মুঠোয় সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা হৃদয়ের এই অবস্থা পরিবর্তন করে দেবেন। ফলে জান্নাত থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হওয়ার বাসনা তার হৃদয়ে আর জাগবে না। অনন্ত অসীমকালের জন্যে সে জান্নাতেই বসবাস করতে আগ্রহী থাকবে।

মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

দ্বিতীয় যে নিগূঢ় তত্ত্বটির প্রতি আলোচ্য সূরায় ইংগিত করা হয়েছে সেটা হচ্ছে মানব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞানের তুলনায় মানুষের জ্ঞানের পরিধি খুবই সীমিত ও সংকীর্ণ। বিস্তৃতির চিত্রটি মূর্ত করে তুলে ধরার জন্যে পবিত্র কোরআনের নিজস্ব বর্ণনাভংগীতে এভাবে বলা হয়েছে, (আয়াত ১০৯)

সমুদ্রের ন্যায় গভীর এবং বিশাল আর কী হতে পারে? মানুষ তো কালীর সাহায্যেই লিখে থাকে। এই সামান্য ও নগণ্য পরিমাণের কালির সাহায্যে যে জ্ঞান সংরক্ষণ করা হয় তা কি সত্যিই গভীর ও বিশাল হতে পারে?

অপরদিকে আল্লাহর জ্ঞানের বিশালতার ব্যাপারটি অনুমান করার জন্যে সমুদ্রের প্রসংগ উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহর জানা বিষয়গুলো যদি কেউ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে বিশাল ও গভীর সমুদ্রের পানিকে কালি হিসাব ব্যবহার করে তাহলেও তা লিখে শেষ করা যাবে না এমন কি একের পর এক সমুদ্র শেষ হতে থাকবে কিন্তু আল্লাহর কথা ও বক্তব্য শেষ হবে না।

এই চাক্ষুষ এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ পাক অসীম এবং সসীমের ধারণা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এর মাধ্যমে এ কথাও বুঝানো হয়েছে যে, সসীম বাহ্যিকভাবে যতোই বিশাল মনে হোক, যতোই বিস্তৃত মনে হোক অসীমের তুলনায় তা সব সময়ই নগণ্য ও সংকীর্ণ।

মানুষ সীমিত জ্ঞানের অধিকারী বলেই অদৃশ্য, পরোক্ষ ও বিমূর্ত সে কোনো বিষয় অনুধাবন করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। এর জন্যে তার প্রয়োজন হয় চাক্ষুষ দৃষ্টান্তের দৃশ্যমান অস্তিত্বের অথচ ওইসব বিষয়ের পরিধি ইচ্ছে অত্যন্ত সীমিত। যদি তাই হয়, তাহলে অনন্ত ও অসীম তত্ত্বপূর্ণ বিষয়াদি অনুধাবন করতে গিয়ে তার কি অবস্থা দাড়াবে?

এ জন্যেই পবিত্র কোরআন এসব জটিল বিষয়াদি সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে বুঝানোর জন্যে নানা ধরনের দৃষ্টান্ত ও উপমা পেশ করে থাকে। এর ফলে সে সব জটিল বিষয়গুলো অত্যন্ত দৃশ্যমান ও জাজ্বল্যমান হয়ে তাদের সামনে ধরা পড়ে।

আলোচ্য আয়াতে সমুদ্রের দৃষ্টান্তও এই উদ্দেশ্যেই পেশ করা হয়েছে। কারণ সমুদ্র হচ্ছে চাক্ষুষ ও দৃশ্যমান এবং বিশালতা ও গভীরতার প্রতীক। অথচ এই বিশালতা ও গভীরতা সত্তেও তা হচ্ছে সীমিত ও অবিস্তৃত, আর আল্লাহর জানা বিষয়াদি হচ্ছে সীমাহীন ও গন্ডিহীন। এর আওতা পরিমাপ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই, এই বিশাল ও অসীম জ্ঞানের সমতুল্য জ্ঞানের দাবী করা তো দূরে থাক, মানুষের পক্ষে এই জ্ঞান লাভ করা বা লিপিবদ্ধ করাও সম্ভবপর নয়।

জীবন ও জগত সম্পর্কিত দু একটি ছোট খাটো রহস্য উদঘাটন করার ফলে মানুষকে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি ও আত্মগরিমা পেয়ে বসে। তখন সে মনে করে যে, জগতের তাবৎ জ্ঞানই বুঝি তার নখদর্পণে এসে গিয়েছে অথবা আসতে যাচ্ছে। কিন্তু যখন বিশাল অজানা ও অজ্ঞাত জগতের সম্মুখীন তাকে হতে হয় তখনই সে উপলব্ধি করতে পারে যে, সে এখনও অথৈ জ্ঞান সমুদ্রের তীরেই পড়ে আছে। সেই অথৈ সাগর আদিগন্ত বিস্তৃত মনে হলেও তার বিস্তৃতি কিন্তু দিগন্ত ছাড়িয়েও বহু দূর পর্যন্ত। আল্লাহর অফুরন্ত ও বিশাল জ্ঞান ভান্ডার থেকে মানুষ যতোটুকু আহরণ করতে পারে অথবা জানতে পারে– তার পরিমাণ খুবই সামান্য ও নগণ্য। অসীমের তুলনায় সসীমের অবস্থান যা হতে পারে এক্ষেত্রেও তাই।

মানুষ অজানাকে জানুক, এই জগতের অজানা রহস্য যতো পারে উদ্ঘাটন করুক কিন্তু বিদ্যার অহংকার বা জ্ঞানের অহংকার যেন তাকে পেয়ে না বসে। কারণ তার জ্ঞানের পরিধি ও বিস্তৃতি সমুদ্রের ন্যায় বিশাল হলেও আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় তা নিতান্ত নগণ্য ও তুচ্ছ। আল্লাহর জ্ঞানের আওতাধীন বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে সমুদ্রের পর সমুদ্র শেষ হলেও তা শেষ হওয়ার মতো নয়।

মানব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার চিত্রটি পেশ করার পর আলোচ্য সূরায় সর্বশেষ যে নিগূঢ় তত্ত্বটির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে তা হলো মনুষ্যত্বের সর্ব্বোচ পর্যায়। এই সর্ব্বোচ পর্যায়টি হচ্ছে পূর্ণাংগ রেসালাতের পর্যায়। কিন্তু তার পরেও প্রভুত্বের সর্ব্বোচ পর্যায়ের তুলনায় তা সীমিত। সে কথাই নিচের আয়াতে বলা হয়েছে, (আয়াত ১১০)

এটা হচ্ছে প্রভুত্বের সর্ব্বোচ আসন। নবুওত বা রেসালাতের আসন এর সমতুল্য কি ভাবে হতে পারে? কারণ, নবী রসূলরা তো রব বা প্রভু নন। তাঁরা মানুষ। এই মনুষ্যত্বের বাইরে তাদের কোনো অবস্থান নেই। তবে তাদের স্বতন্ত্র একটি মর্যাদা আছে, আর সেটা নবুওতের মর্যাদা। এই মর্যাদার অধিকারী হওয়ার ফলে তারা সর্ব্বোচ উৎস বা আল্লাহর কাছ থেকে ওহীপ্রাপ্ত হন। তাঁরা অবশ্যই মানুষ, তবে এমন মানুষ যাদের সম্পর্ক খোদায়ী উৎসের সাথে। তাঁরা এমন মানুষ যারা নিজেদের প্রভুর নির্দেশিত পথকে অতিক্রম করে যান না। তারা এমন মানব যারা শিখেন এবং অপরকে শিখান।

সেই মহান প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করার আকাংখা যদি কারো থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যই রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রদর্শিত পথে চলতে হবে, তাঁর আদর্শকেই আঁকড়িয়ে ধরতে হবে। কারণ, তাঁর আদর্শ ব্যতীত আর কোনো আদর্শই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাকে সৎকাজ করতে হবে এবং শেরেক ও বেদয়াত পরিহার করে চলতে হবে। আর এটাই হচ্ছে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সঠিক পন্থা।

আলোচ্য সূরার সূচনাও হয়েছিলো তাওহীদ বা একত্ববাদের বক্তব্য দিয়ে। আর সমাপ্তিও ঘটেছে এই তাওহীদকে কেন্দ্র করেই।

এক নযরে
তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'এর ২২ খন্ড

১ম খন্ড
সূরা আল ফাতেহা ও
সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

২য় খন্ড
সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

৩য় খন্ড
সূরা আলে ইমরান

৪র্থ খন্ড
সূরা আন নেসা

৫ম খন্ড
সূরা আল মায়েদা

৬ষ্ঠ খন্ড
সূরা আল আনয়াম

৭ম খন্ড
সূরা আল আ'রাফ

৮ম খন্ড
সূরা আল আনফাল

৯ম খন্ড
সূরা আত তাওবা

১০ম খন্ড
সূরা ইউনুস
সূরা হুদ

১১তম খন্ড
সূরা ইউসুফ
সূরা আর রা'দ
সূরা ইবরাহীম

১২তম খন্ড
সূরা আল হেজ্‌র
সূরা আন নাহ্‌ল
সূরা বনী ইসরাঈল
সূরা আল কাহ্‌ফ

১৩তম খন্ড
সূরা মারইয়াম
সূরা ত্বাহা
সূরা আল আম্বিয়া
সূরা আল হাজ্জ

১৪তম খন্ড
সূরা আল মোমেনুন
সূরা আন নূর
সূরা আল ফোরকান
সূরা আশ শোয়ারা

১৫তম খন্ড
সূরা আন নামল
সূরা আল কাছাছ
সূরা আল আনকাবুত
সূরা আর রোম

১৬তম খন্ড
সূরা লোকমান
সূরা আস সাজদা
সূরা আল আহযাব
সূরা সাবা

১৭তম খন্ড
সূরা ফাতের
সূরা ইয়াসিন
সূরা আছ ছাফফাত
সূরা ছোয়াদ
সূরা আঝ ঝুমার

১৮তম খন্ড
সূরা আল মোমেন
সূরা হা-মীম আস সাজদা
সূরা আশ শূ-রা
সূরা আয যোখরুফ
সূরা আদ দোখান
সূরা আল জাছিয়া

১৯তম খন্ড
সূরা আল আহকাফ
সূরা মোহাম্মদ
সূরা আল ফাতাহ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন-এর সম্মানিত ডাইরেক্টর

মোহতারামা খাদিজা আখতার রেজায়ী

রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত

বর্তমান সময়ের ৫টি মূল্যবান সীরাত গ্রন্থ

বিশ্ব সীরাত প্রতিযোগিতায় প্রায় ১২শ' পান্ডুলিপির মধ্যে
প্রথম পুরস্কার বিজয়ী গ্রন্থ

'আর রাহীকুল মাখতূম'

ঐতিহাসিক প্রামাণ্যচিত্র 'দ্যা ম্যাসেজ' ছবির কাহিনীর বাংলা রূপান্তর

'মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম'

প্রিয় নবীর ব্যক্তি জীবনের অনুপম সংগ্রহ

'তিনি চাঁদের চেয়ে সুন্দর'

প্রিয় নবীর সুন্নতের অনুশাসনগুলোর বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণধর্মী বই

'সুন্নতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান'

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সর্বাধিক
নির্ভরযোগ্য জীবনী গ্রন্থ

'সীরাতে ইবনে কাছীর'